

তমসার  
মা'আরেফুন  
সান্নাত

অষ্টম খণ্ড

তফসীরে  
মা'আরেফুল কোরআন  
অষ্টম খণ্ড

[সূরা মুহাম্মদ থেকে সূরা নাস]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান  
অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (অষ্টম খণ্ড)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২৪

ইফা প্রকাশনা : ৬৯২/৮

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭

ISBN : 984-06-0045-1

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫

নবম সংস্করণ (রাজস্ব)

নভেম্বর ২০১২

অগ্রহায়ণ ১৪১৯

মুহররম ১৪৩৩

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ আইউব আলী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

---

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (VOL. VIII.) : Bangla version by Mawlana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

E-mail : directorpubif@yahoo.com.

Website : islamicfoundationbd@yahoo.com.

Price : Tk. 550.00; US Dollar : 32.00

## মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিয়াপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাখিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত, এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত

[ চার ]

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

## প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আত্মা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতিপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্ঘাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যৱস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

বর্তমান সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী (ফারুক) নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন। এরপরও-এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল  
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

## অনুবাদকের আরয়

আল-হামদুলিল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । তাঁর অশেষ রহমতে 'তফসীরে' মা'আরেফুল কোরআন অষ্টম এবং শেষ খণ্ডটিরও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হলো ।

সর্বাধুনিক এবং সমকালীন এই সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থখানি অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি স্বর্ণীয় ঘটনা । অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে এ বিরাট কলেবর তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং মূল গ্রন্থকার হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়ারই ফলশ্রুতি বলতে হয় । এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার কথাও স্বর্ণীয় । এতদসঙ্গে বিপুল সংখ্যক উৎসাহী পাঠকের তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান কাজটি ত্বরান্বিত করার পথে বিশেষ সহায়ক হয়েছে ।

আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ তা'আলা এ বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এ কাজের যোগ্য প্রতিফল দান করুন ।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৮১ সনে আমি না-দান গোনাহ্গারকে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ যুগের সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রন্থ মা'আরেফুল-কোরআন বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন । নিজের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে প্রথমে আমি এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে ছিলাম যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত । এদিকে হিজরি পঞ্চদশ শতকের আগমনে আলমে-ইসলামের সর্বত্র যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে, বাংলার ঈমানদীপ্ত জনগণের অন্তরেও সে প্লাবনের ঢেউ এসে নতুন এক উদ্দীপনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে । সে পরিবেশের প্রভাবেই নবজাগরণের এ আবেগ-ঝরা দিনগুলোতে জাতির সামনে কিছু দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমিও উদ্বেলিত হয়েছিলাম । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন সচিব জনাব সাদেক উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি কাজ শুরু করেছিলাম । আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতই শেষ পর্যন্ত এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজতর করে দিয়েছে ।

যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহান কিতাবের খেদমত করার জন্য একদল নিষ্ঠাবান বান্দার শ্রম কবুল করেছেন । আমার ন্যায় একজন গোনাহ্গারকেও

যে তিনি তাঁর কিতাবের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন, এ দুর্লভ-সৌভাগ্যের শুকুর আমি কোন্ ভাষায় আদায় করবো !

জনাব শামসুল আলমের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহুইয়া এবং তার পর বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আবদুস সোবহান ও 'মা'আরেফুল কোরআন'-এর প্রকাশনা দ্রুত সমাপ্ত করার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ঢাকা মাদরাসায়ে-আলীয়ার শায়খুল হাদীস জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী এবং শ্রীপুর-ভাংনাহাটী আলীয়া মাদরাসার মোহাম্মেছ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয সাহেব আগা-গোড়া সবগুলি খণ্ডের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া আমি আরো যাদের তরফ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, প্রতিটি খণ্ডের ভূমিকাতেই তাঁদের কথা উল্লেখ করেছি।

এ বিরাট তফসীরখুটি দ্রুত অনুবাদ ও মুদ্রণের ফলে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুধী পাঠকগণের কেউ কেউ পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত এবং কিছু ভুল-ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবারো সবিনয় আরজ পেশ করছি, এ শেষ খণ্ডটিতেও যদি কোথাও কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে খণ্ডটি আরো নির্ভুল করে প্রকাশ করার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

রাব্বুল আলামীন ! তুমিই তোমার এ না-দান গোনাহ্‌গার বান্দাকে এ বিরাট কাজ সমাপ্ত করার তওফীক দান করেছ। এ জন্য শুকুর আদায় করার শক্তি দাও।। বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য এ তফসীরখানি কবুল কর! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন !!

বিনীত খাদেম

মুহিউদ্দীন খান

মাসিক মদীনা কার্যালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা



## দ্বিতীয় সংস্করণের আরম্ভ

আল্লাহ পাকের ঋাস রহমতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন এদেশের সুধী পাঠকগণের কাছে কতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা এ বিরাট গ্রন্থটির সব কয়টি খণ্ডের ২/৩টি সংস্করণের মাধ্যমেই অনুমান করা যেতে পারে। বলতে কি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-র আন্তরিক নিষ্ঠার ফলশ্রুতিই বোধ হয় তাঁর লিখিত তফসীরখানির এমন অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই যুগ-চাহিদা পূরণে সক্ষম কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে থাকেন। এ যুগের বিভিন্ন সমস্যার কোরআন ও সুন্নাহ সম্মত সহীহ সমাধান পেশ করার জন্য বোধ হয় আল্লাহ পাক এ উপমহাদেশের পরিমণ্ডলে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর লিখিত মা'আরেফুল-কোরআন এবং অন্যান্য কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

এ তফসীরের প্রতিটি সংস্করণই সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণেও ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছে। পাঠকগণের খেদমতে আরম্ভ, দোয়া করুন সবগুলো খণ্ডেরই সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার তওফীক আল্লাহ পাক যেন দান করেন।

বিনীত  
মুহিউদ্দীন খান

## নূতীগত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা মুহাম্মদ	১	বংশ ও ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য	১১৩
যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসন- কর্তার চারটি ক্রমতা	৬	ইসলাম ও ঈমান	১১৭
ইসলামে দাসত্ব	৬	সূরা ক্বাফ	১১৮
জিহাদ সিন্ধ হওয়ার রহস্য	১২	আকাশ প্রসঙ্গ	১২১
ইস্তিগফার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য	১৯	মৃত্যুর পর পুনরুত্থান	১২২
আত্মীয়তা বজায় রাখার তাক্বীদ	২৬	আল্লাহ ধর্মনির চাইতেও নিকটবর্তী	১২৮
ইয়াযীদের প্রতি অভিসম্পাত বৈধ কিনা ?	২৬	প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে	১৩০
সূরা ফাতহ	৩৭	আমলনামা লিগিবদ্ধকারী ফেরেশতা	১৩০
হদায়বিস্মায় ঘটনা	৩৯	প্রত্যেকটি কথা লিগিবদ্ধ করা হয়	১৩১
হদায়বিস্মায় সঞ্জি	৪৫	মৃত্যু যন্ত্রণা	১৩২
ইহরাম খোলা ও কুরবানী	৪৮	মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতা	১৩৩
সঞ্জির ফলাফল	৪৯	মৃত্যুর পর দৃষ্টি খুলে যাবে	১৩৩
ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়	৬১	সূরা যারিয়াত	১৪৪
সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দোষারোপ	৬৬	ইবাদতে রাগ্নি জাপরণ	১৪৯
রিষওয়ান রুক্ক	৬৬	রাগ্নির শেষ গ্রহণের বরকত ও ফযীলত	১৫০
সাহাবায়ে কিরাম প্রসঙ্গ	৭২	সঙ্গকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ	১৫১
ইনুশাআল্লাহ বলার তাক্বীদ	৭৬	মুহম্মাদদারির উত্তম নীতি-নীতি	১৫৮
সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী	৭৮	জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১৬৩
সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাম্মাতী	৮৩	সূরা তুর	১৬৬
সূরা হজুরাত	৮৫	মজলিসের কাফফারা	১৭৯
মোঙ্গসুত্ত ও শানে-নুযুল	৮৬	সূরা নজম	১৮১
আলিমদের আদব	৮৮	সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য	১৮৫
দুওয়া মোবারকের যিয়ারত	৮৯	মিঞ্জাজ প্রসঙ্গ	১৮৭
সাহাবীগণের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও জওয়াব	৯৪	জাম্মাত ও জাহাম্মামের ঈর্ষমান অকহান	১৯৩
সাহাবীগণের পারস্পরিক বাদানুবাদ	১০০	আল্লাহর দীদার	১৯৮
নাম ও লকব প্রসঙ্গ	১০৪		
গীবত প্রসঙ্গ	১০৭		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ	২১১	সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনু নুযায়ের	
মুসা ও ইব্রাহীম (আ)-এর সহীফা	২১২	গোল্লের ইতিহাস	৩৫৬
একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না	২১২	ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা	৩৫৮
ইসালে সওয়াব প্রসঙ্গ	২১৩	হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হশিয়ারী	৩৬০
সূরা ক্বামর	২১৮	ইজতেহাদী মতভেদ প্রসঙ্গ	৩৬০
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা	২২০	মুন্ধলবধ সম্পদ প্রসঙ্গ	৩৬৪
চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন	২২১	সম্পদ পুঞ্জীভূত করা প্রসঙ্গ	৩৬৭
ইজতিহাদ ও কোরআন	২২৫	রসুলের নির্দেশ প্রসঙ্গ	৩৬৯
সূরা আর-রহমান	২৩৪	দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	৩৭০
একটি বাক্য বারবার উল্লেখ করার ত্বাৎপর্য	২৩৫	মুহাজির প্রসঙ্গ	৩৭০
সূরা ওয়াক্বিয়া	২৬০	আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব	৩৭২
সূরার বৈশিষ্ট্য : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথোপকথন	২৬৫	বনু নুযায়েরের ধন -সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গ	৩৭৩
হাশরের ময়দানে মানুষের শ্রেণীবিভক্তি	২৬৬	আনসারগণের আত্মত্যাগ	৩৭৪
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা ?	২৬৭	মুহাজিরগণের বিনিময়	৩৭৮
কোরআন স্পর্শ করায় মাসআলা	২৮৪	হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্রতা	৩৭৯
সূরা হাদীদ	২৮৭	উম্মতের সাধারণ মুসলমান প্রসঙ্গ	৩৮০
শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার	২৮৯	সাহাবয়ে কিয়ামের প্রতি মহক্বত	৩৮০
মক্কা বিজয় ও সাহাবয়ে কিয়াম	২৯৫	বনু কায়নুকার নির্বাসন	৩৮৫
সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য	২৯৬	কিয়ামত প্রসঙ্গ	৩৮৯
হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার	৩০৬	সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৩৯৪
খেলাখুলা প্রসঙ্গ	৩১২	সূরা মুমতাহিনা	৩৯৫
সন্ন্যাসবাদ প্রসঙ্গ	৩২৫	বদর যুদ্ধ পরবর্তী মক্কার অবস্থা	৩৯৮
সূরা মুজাদালা	৩৩০	মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি	৩৯৯
জিহাদের সংজ্ঞা ও বিধান	৩৩৪	হদায়বিস্মার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ	৪১০
গোপন পরামর্শ সম্পর্কে নির্দেশ	৩৪৩	নারীদের আনুগত্যের শপথ	৪১৬
মজলিসের শিষ্টাচার	৩৪৫	সূরা সফ	৪২০
কাফির ও গোনাহগারদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা	৩৫১	দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য	৪২৫
সূরা হাশর	৩৫৩	ইজীজে রসুলে করীমের সুসংবাদ	৪২৬
		খৃষ্টানদের তিন দল	৪৩০
		সূরা জুম'আ'	৪৩২
		পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য	৪৩৫
		মৃত্যু কামনা জাম্মেয কিনা	৪৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান	৪৩৯	রসূলুল্লাহ (সা)-র মহৎ চরিত্র	৫৪১
জুম'আ প্রসঙ্গ	৪৪১	উদ্যানের মালিকদের কাহিনী	৫৪৪
জুম'আর পরে ব্যবসায় বরকত	৪৪৩	কিয়ামতের একটি যুক্তি	৫৪৭
সূরা মুনাফিকুন	৪৪৬	সূরা হাক্বা	৫৫১
দেশ ও বংশগত জাতীয়তা	৪৪৯	সূরা মা'আরিজ	৫৬২
মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রসঙ্গ	৪৫০	কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য	৫৬৮
ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য নেই	৪৫৪	যাকাতের পরিমাণ	৫৭১
সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা	৪৫৫	হস্তমৈথুন করা হারাম	৫৭১
মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা	৪৫৬	সর্ব প্রকার 'হক'-ই আমানত	৫৭২
সূরা তাগাবুন	৪৬২	সূরা নূহ	৫৭৩
কিয়ামত প্রসঙ্গ	৪৬৭	মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা	৫৭৮
গোনাহগার স্ত্রী ও সন্তান প্রসঙ্গ	৪৭২	কবরের আযাব	৫৮২
ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিরূপ পরীক্ষা	৪৭৩	সূরা জিন	৫৮৩
সূরা তালাক	৪৭৪	জিনদের স্বরূপ	৫৯০
বিবাহ ও তালাক গ্রহসঙ্গ	৪৭৯	রসূলুল্লাহর তায়ফ সফর	৫৯০
এক সাথে তিন তালাক দেওয়া	৪৮৭	জিন-সাহাবীর ঘটনা	৫৯২
বিপদাপদ থেকে মুক্তি	৪৯১	জিনদের আকাশ ভ্রমণ	৫৯৫
তালাকের ইদত সম্পর্কিত বিধান	৪৯২	গায়েব ও গায়েবের খবর প্রসঙ্গ	৫৯৭
পৃথিবীর সপ্তসুত্র প্রসঙ্গ	৪৯৯	সূরা মুযাম্মিল	৫৯৯
সূরা তাহরীম	৫০১	তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ	৬০৪
কোন হালাল বস্তুকে নিষেধ উপর হারাম করা প্রসঙ্গ	৫০৩	ইসমে যাতের যিকির	৬১০
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা	৫০৮	তাওয়াক্কুলের অর্থ	৬১২
তওবা প্রসঙ্গ	৫১১	তাহাজ্জুদ ফরয নয়	৬১৩
সূরা মুজক	৫১৪	সূরা মুদাসসির	৬১৮
মরণ ও জীবনের স্বরূপ	৫২৩	রসূলুল্লাহর প্রতি কতিপয় বিশেষ নির্দেশ	৬২৭
নেক আমল কি	৫২৪	আবু জাহল ও ওলীদের কথোপকথন	৬৩০
সূরা কলম	৫৩০	সন্তান-সন্ততি কাছে থাকার একটি নিয়ামত	৬৩২
কলম-এর অর্থ ও ফযীলত	৫৩৯	কাফিরের জন্য সুপারিশ	৬৩৪
		সূরা কিয়ামত	৬৩৬
		নফসের তিনটি প্রকার	৬৪১
		পুনরুত্থান প্রসঙ্গ	৬৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামের পিছনে কিরাআত প্রসঙ্গ	৬৪৫	সূরা বালাদ	৭৮০
সূরা দাহর	৬৪৮	চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য	৭৮৪
মানব সৃষ্টিতে আন্ধার অপূর্ব রহস্য	৬৫৫	অপরকে ও সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া	৭৮৬
সূরা মুরসালাত	৬৬০	সূরা শামস	৭৮৭
সূরা নাবা	৬৭০	কয়েকটি শপথের তাৎপর্য	৭৮৯
জাহামামে চিরকাল বসবাস প্রসঙ্গ	৬৭৮	সূরা লায়ল	৭৯৩
সূরা নাযিয়াত	৬৮২	কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল	৭৯৫
কবরে সওয়াব ও আযাব	৬৮৭	সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহামাম	
খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা	৬৯০	থেকে মুক্ত	৭৯৭
নফসের চক্রান্ত	৬৯৩	সূরা যোহা	৮০০
সূরা আবাসা	৬৯৩	কয়েকটি নিয়মত ও এ সম্পর্কিত	
সূরা তাকভীর	৭০৩	নির্দেশ	৮৮৩
সূরা ইনফিতার	৭১১	সূরা ইনশিরাহ	৮০৬
সূরা তাৎফীফ	৭১৫	শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত	
ওজনে কম দেওয়া	৭১৯	ব্যক্তিদের কর্তব্য	৮১০
সিজ্জীন ও ইল্লীন	৭২১	সূরা তীন	৮১১
জামাত ও জাহামামের অবস্থানস্থল	৭২১	সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক	
সূরা ইনশিকাক	৭২৭	সুন্দর	৮১৩
আন্ধার নির্দেশ দুই প্রকার	৭৩০	সূরা আলাক	৮১৬
আন্ধার দিকে প্রত্যাবর্তন	৭৩১	ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী	৮২০
মানুষের অস্তিত্ব ও তার শেষ মজিল	৭৩৪	কলম তিন প্রকার	৮২৪
সূরা বুরাজ	৭৩৮	লিখন জান সর্বপ্রথম কাকে দান	
সূরা তারেক	৭৪৫	করা হয়	৮২৫
সূরা আ'লা	৭৫০	রসূলুল্লাহকে লিখন শিক্ষা না	
বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য	৭৫৩	দেওয়ার রহস্য	৮২৫
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও আন্ধার দান	৭৫৫	সিজদায় দোয়া কবুল হয়	৮২৯
ইব্রাহিমী সহীফার বিষয়বস্তু	৭৫৮	সূরা কদর	৮৩০
সূরা গাশিয়া	৭৬০	লায়লাতুল কদরের অর্থ	৮৩১
জাহামামে ঘাস, রুক্ষ কিরাগে হবে	৭৬৩	শবে-কদর কোন রাত্রি ?	৮৩২
সূরা ফজর	৭৬৬	শবে-কদরের ফযীলত ও বিশেষ	
পাঁচটি বিষয়	৭৭০	দোয়া	৮৩২
রিযিকের স্বল্পতা ও বাহলা	৭৭৪	সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই	
ইয়াতীমের জন্য ব্যয়	৭৭৫	অবতীর্ণ হয়েছে	৮৩৩
কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা	৭৭৯	সূরা বাইয়্যিনাহ	৮৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা মিলমাল	৮৪১	মৃত্যু নিকটবর্তী হলে	৮৮৬
সূরা আদিয়াত	৮৪৪	সূরা লাহাব	৮৮৭
সূরা কারেয়া	৮৪৮	পরোক্ষে নিন্দাবাদ	৮৯০
সূরা তাকাসুর	৮৫০	সূরা ইখলাস	৮৯২
সূরা আছর	৮৫৪	সূরার ফযীলত	৮৯৩
মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার যুগ ও কালের প্রভাব	৮৫৫	শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা	৮৯৪
নাজাতের শর্ত	৮৫৭	সূরা ফালাক	৮৯৫
সূরা হমযাহা	৮৫৮	যাদুগ্রস্ত হওয়া বনাম নবুয়ত	৮৯৭
সূরা ফীল	৮৬১	সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ফযীলত	৮৯৭
হস্তীবাহিনীর ঘটনা	৮৬১	সূরা নাস	৯০১
সূরা কোরায়েশ	৮৬৭	শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব	৯০৪
কোরায়েশদের শ্রেষ্ঠত্ব	৮৬৮	সূরা নাস ও সূরা ফালাক এর মধ্যে পার্থক্য	৯০৫
সূরা মাউন	৮৭১	মানুষের শত্রু মানুষ ও শয়তান ও	৯০৫
সূরা কাউসার	৮৭৪	উভয় শত্রুর মোকাবিলায় ব্যবধান	৯০৫
হাউযে কাউসার	৮৭৬	শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর	৯০৭
সূরা কাফিরান	৮৭৯	কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তি	৯০৭
কাফিরদের সাথে শাস্তিচুক্তি প্রসঙ্গ	৮৮২		
সূরা নছর	৮৮৪		
কোরআনের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত	৮৮৫		

তফসীরে  
মা 'আরেফুল-কোরআন  
অষ্টম খণ্ড

سورة محمد

সূরা মুহাম্মাদ

মদীনার অবতীর্ণ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلَ أَعْمَالِهِمْ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  
كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ كَذَلِكَ  
يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে ।

(১) যারা কুফর করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফির, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা ( নিজেরাও ) কুফর করে এবং ( অপরকেও ) আল্লাহর পথ থেকে নিহৃত করে, ( যেমন কাফির সন্ন্যাসীদের অবস্থা ছিল, তারা ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য জ্ঞান ও মাল সবকিছু দ্বারা প্রচেষ্টা চালাত ), আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ( অর্থাৎ যেসব কর্মকে তারা ফলপ্রসূ মনে করে, ঈমান না থাকার কারণে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, বরং উহার মধ্যে কিছু কিছু কর্ম উল্টা তাদের শাস্তির কারণ হবে, যেমন, আল্লাহর পথে



বাধা সৃষ্টি করার কাজে অর্থকড়ি ব্যয় করা। আল্লাহ বলেন: <sup>وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى</sup> فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ

عليهم حسرة الخ (পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং

(তাদের বিশ্বাসের বিবরণ এই যে) তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, (যা মেনে চলাও জরুরী)। আল্লাহ তা'আলা তাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করবেন এবং (উভয় জাহানে) তাদের অবস্থা ভাল রাখবেন (ইহকালে এভাবে যে, তাদের সৎকর্ম করার তওফীক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং পরকালে এভাবে যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি এবং জাহাতে প্রবেশাধিকার পাবে)। এটা (অর্থাৎ মু'মিনদের সুখ-স্বাস্থ্য ও কাফিরদের দুর্গতি) এ কারণে যে, কাফিররা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে এবং ঈমানদাররা শুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। (ভ্রান্ত পথের পরিণাম যে ব্যর্থতা এবং শুদ্ধ পথের পরিণাম যে সাফল্য, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই কাফিররা ব্যর্থ মনোরথ হবে এবং মু'মিনগণ সফলকাম হবেন। ইসলাম

যে শুদ্ধপথ, এ সম্পর্কে সন্দেহ হলে <sup>أَمْ يَرْجُونَ</sup> مِنْ رَبِّهِمْ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ

প্রমাণ এই যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। পয়গম্বরের মো'জেয়াসমূহ বিশেষ করে কোরআনের অলৌকিকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত)। আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে (অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থা বর্ণনা করার মতই) মানুষের (উপকার ও হিদায়তের) জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, (যাতে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন—উভয় পন্থায় তাদেরকে হিদায়ত করা যায়)।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতালও। কেননা, এতে 'কিতাল' তথা জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত <sup>لَا يَأْتِيَنَّكُمْ</sup> مِنْ قَرَيْبٍ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি মক্কার অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বাস্তুজাহাজ দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন: হে মক্কা নগরী, জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কার অবতীর্ণ আয়াত গণ্য করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফিরদের সাহায্য জিহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে।

سَبِيلَ اللَّهِ (আল্লাহর পথ) বলে ইসলামকে  
 سَبِيلَ اللَّهِ—هُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِ الَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ

বোঝানো হয়েছে। **أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ** বলে কাফিরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হিফাজত করা, দানশীলতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফিরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

وَأَمْشُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ—যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎ কর্মের

কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ (স)-র রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষনবী মুহাম্মদ (স)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বাঙ্গকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

بِالْ—وَأَصْلِحْ بِأَعْمَالِهِمْ

অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ দেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আল্লাতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সাল্লমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَمْتُمْ  
 هُمْ فَشَدُّوا الوُثَاقِ بِأَمَّا مِنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فَدَاءُ حَتَّىٰ تَضَمَّ  
 الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

(৪) অন্তঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর তখন তাদেরকে মৃত্যু করে বেঁধে ফেল। অন্তঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুসকল অস্ত্র সংবরণ করবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বোক্তিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা সংস্কারকামী এবং কাফিররা অনর্থকামী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুফর ও কাফিরদের অনর্থ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতে জিহাদের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে)। অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদের খুব রক্তপাত ঘটিয়ে নাও, (এর অর্থ কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি অথবা কাফিরদের প্রবল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকাকার) তখন (কাফিরদেরকে বন্দী করে) খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমরা উভয় কাজ করতে পার) হয় তাদেরকে মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্ত করে দেবে, না হয় মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে। (এই যুদ্ধ ও বন্দী করার নির্দেশ তখন পর্যন্ত) যে পর্যন্ত না (শত্রু) যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করে। (অর্থাৎ হয় তারা ইসলাম কবুল করবে, না হয় মুসলমানদের যিম্মী হয়ে বসবাস করতে রাযী হবে। এরূপ করলে যুদ্ধ ও বন্দী কোন কিছুই করা জায়েয হবে না)।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। দুই. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কুপাবণত তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহাত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুজ্জাহ (সা) বলেছিলেন : আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল—যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুন্নায (রা) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার কথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তি-পণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরও উক্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হাসান, আতা (রা), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেরী, আহমদ, ইসহাক (রা) প্রমুখ ফিক্‌হবিদ ইমামের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে

আব্বাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাশী সানাউল্লাহ এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিতর্ক ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসুলুল্লাহ (সা) ষষ্ঠ হিজরীতে হদাযবিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাকির রসুলুল্লাহ (সা)-কে অভ্যক্তি হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানরীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রসুলুল্লাহ (সা) তাদেরকে জীবিত প্রেক্ষভার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ

أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ۝

এক রিওয়াজেত অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মামহাব এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের অনুরূপ মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারী বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিতর্ক ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলিমগণের মধ্যে আব্বাস ইবনে হুমাম (র) ‘ফতহুল কাদীর’ গ্রন্থে এই মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন : কুদুরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা ষায় না। এটা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত এক রিওয়াজেত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রিওয়াজেত ‘সিন্নারে কবীরে’ জমহরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উক্ত রিওয়াজেতের মধ্যে শেষোক্ত রিওয়াজেতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র) ‘মা-‘আনিউল আসানে’ একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসুলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্ম-পন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যে সব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়, বরং সবগুলো অক্ষাট্য আয়াত। কোন আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাফিররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোন-রূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন :

وهذا القول يروى من اهل المدينة والشافعي و ابي عبيد  
وحكاة الطحاوى مذ هبا عن ابي حنيفة والمشهور ما قد منا -

অর্থঃ মদীনার আলিমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবু ওবায়দে (র)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা : উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রয়ে উল্লেখের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (র) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত

করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের মুছবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পলু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে।—(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮)

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিচিত ছিল। সবাই জানত যে, এই উত্তম ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর মুছের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এখানে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপন ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্বে থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদুটের একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবানে কিরাম অসংখ্য মুছবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা খুচুতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসদের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় মুছবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও পোস্তাও লিবান তদীয় 'আরবের তমদুন' গ্রন্থে লিখেন :

“বিগত দ্বিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি ‘দাস’ শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিত্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দ্বারা আঁপটপুটে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাপ্তি কোনরূপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না।” --- কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃষ্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দারেরা মা'আরেকুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত। (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯)

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর—হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় শাব্দজীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপস্থাপিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে—হয় তাকে শাব্দজীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দেখাশোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রসুলে করীম (সা) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

اخو ا نكم جعلهم ا لله تعنت ايديكم فمن كا ن اخو ا تعنت يد ية فليطعمه  
ما يا كل وللهبسة مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فا ن كلفه يغلبه فليغفنه

তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কাজের ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে।—(বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ )

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি ; বরং প্রভুদেরকে **مِنْكُمْ** আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি

তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। মুছলিম সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে প্রাণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উজ্জ্বল তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উজ্জ্বল। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সম্ভাবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা) বলেন, দু'জাহানের নেতা হযরত রসুলে মকবুল (সা)-এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই : **الصلوة الصلوة**

**انقوا الله فيهما ملكت ايما نكم**—অর্থাৎ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।—( আবু দাউদ )

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও স্বাধেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই ডান-গরিমার যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই নামেযার দাসত্বকেও পর্যায়ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ক্রয়ীকৃত কোরআন ও হাদীসে তুর্নি তুর্নি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সংকর্ষ এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিক্হর বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালিশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্কারা, হত্যার কাফ্কারা, জিহাদের কাফ্কারা ও কসমের কাফ্কারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যান্যভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্কারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।—( মুসলিম ) সাহাবানে কিরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। ‘আমাজমুল ওয়াহ্‌হাজ’-এর প্রকৃকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছে :

হযরত আলেশা (রা)—৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম—১০০, হযরত ওসমান গনী (রা)—২০, হযরত আব্বাস (রা)—৭০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)—১০০০, হযরত মুজ কা'লা হিমইয়ারী (রা)—৮০০০ ( মাত্র এক দিনে ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)—৩০,০০০।—( ফতহুল আলাম, টীকা বুলুগল মারাম, নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোট কথা ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থার সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর মুক্তবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মুক্তবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোতাহাব অথবা ওলাজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততরূপ, স্বতরূপ শব্দপঙ্কেস সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শব্দ পঙ্কের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি যেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকে পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।



ذٰلِكَ ذَوٰكُوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَا تَتَّصِرُوْنَ مِنْهُمْ ۗ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ  
 بِبَعْضٍ ۗ وَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالُهُمْ ۝  
 سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۝  
 يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنَصَرُوا اللّٰهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝  
 وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَنَسَّاهُمْ ۗ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا  
 مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاحْبَطُ اَعْمَالَهُمْ ۝ اَقْلَمُ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا  
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَ لِلْكَافِرِيْنَ  
 اَمْثَالُهَا ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اَنَّ الْكَافِرِيْنَ  
 لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝

(৪-ক) একথা শুনে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হন, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফির, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। (৯) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাখিল করেছেন, তারা তা গৃহস্থ করে না। অতঃপর, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে জয় করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফিরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিহাদের) এই নির্দেশ (যা বর্ণিত হয়েছে) পালন কর। (কোন কোন অবস্থায় কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। এটা

বিশেষ তাৎপর্যের কারণে। নতুবা) আলাহ্ ইচ্ছা করলে (নিজেই নৈসর্গিক ও মর্ত্যের আশা ছাড়া) তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (যেমন পূর্ববর্তী উল্লেখের কাছ থেকে এমনি ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কারণ উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে, কাউকে বাড়ানো আক্রমণ করেছে এবং কাউকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এরূপ হলে তোমাদেরকে জিহাদ করতে হতো না)। কিন্তু (তোমাদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ এই জন্য দিয়েছেন যে) তিনি তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (মুসলমানদের পরীক্ষা এই যে, কে আলাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করে তা দেখা এবং কাফিরদের পরীক্ষা এই যে, জিহাদ ও হত্যার দৃশ্য দেখে কে হুঁশিয়ার হয়ে কে সত্যকে কবুল করে, তা দেখা। জিহাদে যেমন কাফিরদেরকে হত্যা করা সাক্ষ্য, তেমনি কাফিরদের হাতে নিহত হওয়াও ব্যর্থতা নয়। কেননা) যারা আলাহ্‌র পথে নিহত হন আলাহ্‌ তা'আলা তাদের কর্মকে (জিহাদের এই কর্মসহ) কখনও বিনষ্ট করবেন না। (বাহ্যিক মনে করা যায় যে, যখন তারা কাফিরদের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারল না এবং নিজেরাই নিহত হল, তখন যেন তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা তাদের কর্মের অপর একটি ফল অজিত হয়, যা বাহ্যিক সফলতার চাইতে বহুগুণে উত্তম। তা এই যে) আলাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (মনস্থির) মকসুদ পর্যন্ত (যা পরে বর্ণিত হবে) পৌঁছে দেবেন এবং তাদের অবস্থা (কবর, হাশর-পুলসিরাত ও পরকালের সব জায়গায়) ভাল রাখবেন। (কোথাও কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না) এবং (এই মনস্থির মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা এই যে) তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে। (ফলে প্রত্যেক জান্নাতী নিজ নিজ বাসস্থানে কোনরূপ হোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিবিবাসে পৌঁছে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদে বাহ্যিক পরাজয় অর্থাৎ নিজে নিহত হওয়াও বিরাট সাক্ষ্য। অতঃপর জিহাদের পার্থিব উপকারিতা ও স্বর্গীয় বর্ণনা করে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছেঃ) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আলাহ্‌কে (অর্থাৎ তার দীন প্রচারে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (এর পরিণতি দুনিয়াতেও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা—প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর পরিণামে হোক। কোন কোন মু'মিনের নিহত হওয়া কিংবা কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করা এর পরিণতি নয়) এবং (শত্রুর মুকাবিলায়) তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—(প্রথমেই হোক কিংবা সাময়িক পরাজয়ের পরে হোক আলাহ্‌ তাদেরকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রেখে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে বারবার এরূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনা) আর যারা কাফির তাদের জন্য (দুনিয়াতে মু'মিনদের মুকাবিলা করার সময়) দুর্ভোগ (ও পরাজয়) রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কর্মসমূহকে আলাহ্‌ তা'আলা নিষ্ফল করে দেবেন (যেমন সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা কাফিররা উত্তম জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং) এটা (অর্থাৎ কাফিরদের ক্ষতি ও কর্মসমূহের নিষ্ফল হওয়া) এ কারণে যে, তারা আলাহ্‌'র নাখিল করেছেন তা পছন্দ করেনা (বিশ্বাস-গতভাবেও এবং কর্মগতভাবেও) অতএব, আলাহ্‌ তাদের কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বরবাদ করে দিয়েছেন। (কেননা কুফর সর্বোচ্চ বিদ্রোহ। এর পরিণতি তাই। তারা যে আলাহ্‌র আশাবকে ভুল করে না) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, অতঃপর দেখেনি যে,

ভাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন (ভাদের জনশূন্য প্রাসাদ ও বাসস্থান দেখেই তা বোঝা যায়। অতএব, তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়। তারা কুফর থেকে বিরত না হলে) এ কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। (অন্তঃপর উত্তর পক্ষের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে)। এটা (অর্থাৎ মুসলমানদের সফলতা ও কাফিরদের ধ্বংস) এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অভিভাবক এবং কাফিরদের (এরূপ) কোন অভিভাবক নেই (যে আল্লাহর মুকাবিলায় তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারে। ফলে তারা উত্তর জাহানে অকৃতকার্য থাকে। মুসলমানরা কোন সময় দুনিয়াতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও পরিণামে সফল হবে। পরকালের সফলতা সুস্পষ্টই। অতএব, মুসলমান সর্বদা সফলকাম এবং কাফির সর্বদা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে থাকে)।

### আনুমানিক ভাষা বিবরণ

জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য :  $لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَاكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِثْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُبْذَرُونَ$

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহস্য। কেননা জিহাদকে আসমানী আশাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও আল্লাহ-দ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও স্বমীনের আশাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমা-তুল্লাহ আলমীনের করুণায় এই উম্মতকে এ ধরনের আশাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর ফলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আশাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও করুণা নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আশাবে নারী-পুরুষ, আবা-ল-রুহ-বিশিষ্টা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, বারো আল্লাহর ধর্মের হিফায়তকারীদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উত্তর পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহর নির্দেশে নিজের জ্ঞান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উচ্ছল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম ফব্বল করে।

وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ قَتَلُوا نَفْسَهُمْ

হয়েছে যে, তারা কুফর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সংকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন; অর্থাৎ তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সংকর্ম হার পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সংকর্ম তাদের গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

سَيُهَيِّدُهُمْ وَيَمْلِكُ بِالْهَمِّ এতে শহীদের দু'টি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। এক.

আল্লাহ্ তাকে হিদায়ত করবেন, দুই. তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়ারের অধিকারী হবে। আখিরাতে এই যে, সে কবরের আশাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মান থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হিদায়ত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনখিলে মকসূদ' অর্থাৎ জাহাতে পৌঁছিয়ে দেবেন; যেমন কোরআনে জাহাডীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জাহাতে পৌঁছে একথা বলবে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ

তাদেরকে কেবল জাহাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জাহাতে নিজ নিজ স্থান ও জাহাতের নিয়ামত তথা হর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জাহাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: সেই আল্লাহ্ কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রকে চিন, তার চাইতেও বেশী জাহাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা হবে। (মাযহারী) কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জাহাতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জাহাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার স্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكَافِرِينَ امثالها এখানে মস্তার কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য

সে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আশ্রাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিত হয়ে যেনো না।

مولى وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مولى لَهُمْ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক।

কোরআনের অন্যর কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ**

এতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কাফিরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ্ তা'আলা সবারই মালিক। মু'মিন-কাফির কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

إِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الدِّينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ جَدَّتْ تَجْرِىٰ مِنْ  
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ  
الْاَنْعَامُ وَالنّٰرُ مَثْوٰى لَّهُمْ ۝ وَكَآيِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً  
مِّنْ قَرْيَةٍ الَّتِيْ اَخْرَجْتِكُمْ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ اَفَمَنْ كَانَ  
عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُوِّنَ لَهُ سُوْءٌ عَمَلِهٖ ۗ وَاتَّبِعُوْا اَهْوَآءَهُمْ ۝  
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اَسِيْنٍ  
وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ حَمِيْمٍ لَّذِيْۤهٖ الشَّرِيْبَةُ  
وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفٰى ۗ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ  
وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَّآءٌ حَمِيْمًا  
فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নিঝরিপীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুর্দশ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার গালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোধনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেরাল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওলাদ দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ : তাতে আছে নিজলুয পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, গামকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবে নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায়

তাদের জন্য আছে রুকমান্নি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহিয়গাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়ীভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে ?

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, যার নিশ্চিন্দে নিরীক্ষণীয়সমূহ প্রবাহিত হবে। আর যারা কাফির, তারা ( দুনিয়াতে ) ভোগবিলাসে মত্ত আছে এবং ( পরকাল বিস্মৃত হয়ে ) চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। চতুষ্পদ জন্তুরা চিন্তা করে না যে, তাদেরকে কেন পানাহার করানো হচ্ছে এবং তাদের যিশ্মায় এর বিনিময়ে কি প্রাপ্য আছে ? তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। ( উপরে কাফিরদের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে আপনার শত্রুদের ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় এবং তাদের উদাসীনতা দেখে আপনারও দুঃখিত হওয়া সমীচীন নয়। ভোগবিলাসই তাদের বিরোধিতার কারণ। এমনকি, তারা আপনাকে অতিষ্ঠ করে মস্তকায় ও বসবাস করতে দেয়নি। কেননা ) আপনার যে জনপদ আপনাকে বাস্তবিতা থেকে উৎখাত করেছে, তদপেক্ষা অনেক শক্তিশালী বহু জনপদকে আমি ( আযাব দ্বারা ) ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। ( এমতাবস্থায় এরা কি ? এদের অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেই এদেরকে নির্মূল করতে পারেন। আপনি এদের ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস দেখে দুঃখিত হবেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে এদেরকেও শাস্তি দেবেন )। যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট ( ও প্রামাণ্য ) পথ অনুসরণ করে, সে কি তাদের সমান হতে পারে, যাদের কাছে তাদের কুকর্ম শোভনীয় মনে হয় এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ? ( অর্থাৎ উভয় দলের কাজকর্মে যখন তফাৎ আছে, তখন পরিণতিতেও তফাৎ হওয়া অবশ্যস্বাভাবী। যে সত্যপন্থী সে সওয়াবের এবং যে মিথ্যাপন্থী সে আযাব ও শাস্তির যোগ্য। এই সওয়াব ও শাস্তির বর্ণনা এই যে ) পরহিয়গারদেরকে যে জাহান্নামের ওয়াদা দেওয়া হয়, তার অবস্থা নিশ্চিন্দে : তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির অনেক নহর ( এই পানির পক্ষ ও স্বাদে কোন পরিবর্তন হবে না ) দুধের অনেক নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের অনেক নহর এবং পরিশোধিত মধুর অনেক নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রুকমান্নি ফলমূল এবং ( তাতে প্রবেশের পূর্বে ) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ( গোনাহের ) ক্ষমা। তারা কি তাদের সমান যারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভূঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে ?

### জানুয়ারিক জাভাব বিষয়

দুনিয়ার পানির রও, পক্ষ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাঁসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিষাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপকারের কারণে পান করা হয়, স্বেমন ভোম্বাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে

খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জাম্বাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জাম্বাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফ্বাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَلَيْهَا

يَلْزَمُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জাম্বাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশ্বাস উক্তি এই যে, জাম্বাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জাম্বাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুসরণ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নবীর পৃথিবীতে নেই।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ

(১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন তারা শিক্ত, তাদেরকে বলে : এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে জাম্বাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজদের খেলাল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) তারা সংগমপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সংগমপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং জাম্বাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত অবস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সূত্রাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[ হে নবী (সা) ] তাদের মধ্যে কতক ( অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায় আপনার প্রচার ও শিক্ষাদানের সময় বাহ্যত ) আপনার দিকে কান পাতে ( কিন্তু আন্তরিকভাবে মোটেও মনোযোগী হয় না )। অতঃপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে ( উঠে মজলিস ত্যাগ করে )

বাইরে যার, তখন জামান শিকিউ (সাহাবী)-দেরকে বলে : এইমাত্র (যখন আমিরা সজাজিসে হিজাম, তখন) তিনি কি বলেছিলেন ? (তাদের একথা বলাও ছিল এক প্রকার বিহীন বিশেষ। এতে করে একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা আপনার কথা-বার্তাকে প্রক্ষেপযোগ্যই মনে করি না। এটাও এক প্রকার কপটতাই ছিল)। এরাই তারা, যাদের জন্তে প্রাহ্লাই মোহির মেয়ে দিয়েছেন (কিন্তু তারা হিদায়ত থেকে দূরে সরে পড়েছে)। এবং তারা মিজেদের ধোলাজ-ধূলায় অনুসরণ করে। (তাদের সম্পদারের মধ্য থেকে) যারা সংপথে আছে (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে) আজাই তা'আলা তাদেরকে (নির্দেশাবলী গ্রহণ করার সময়) আরও বেশী হিদায়ত করেন (কিন্তু তারা মকুম নির্দেশাবলীতেও বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান আমায় বিপর্যয় বেড়ে যার অর্থাৎ তাদের ঈমানকে আরও বেশী শক্তিশালী করে দেন। এটাই সংকর্মের বৈশিষ্ট্য) এবং তাদেরকে ডাকওয়ার তওফীক দান করেন। (অতঃপর মুনাফিক-দের উদ্দেশ্যে এ মর্মে শক্তির খবর বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা আজাইর নির্দেশাবলী গুনেও প্রভা-বাহিত হয় না। এতে বোঝা যায় যে) তারা এ বিষয়েরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত অক্ষমাত তাদের উপর এসে পড়ুক। (একথা শাসানির উল্লিখে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও যে হিদায়ত অর্জন করছে না, তবে কি তারা কিয়ামতে হিদায়ত হাসিল করবে?) অতএব (মনে রেখ, কিয়ামত নিকটবর্তীই। সেমতে) তার করেকটি লক্ষণ তো এসেই গেছে। (সেমতে হাদীসদুটে স্বয়ং শেষ নবীর আগমন এবং নবুওয়ারতও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। চম্ভ বিখণ্ডিত করার ঘটনাটি যেমন রসুলুল্লাহ (সা)-এর মো'জেযা, তেমনি কিয়ামতের লক্ষণও। এসব লক্ষণ কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ঈমান আমা ও হিদায়ত লাভ করার ব্যাপারে কিয়ামতের অপেক্ষা করা নিরীত মূর্খতা। কেননা, সে সময়টি বোকার ও আমল করার সময় হবে না। বলা হয়েছে : ) যখন কিয়ামত এসে পড়বে, তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে ? ( অর্থাৎ তখন উপদেশ উপকারী হবে না )।

**আল্পম্বলিক ভাণ্ডিক বিখর**

اشرط নামের অর্থ আলামত, লক্ষণ। খাতামুল্লাবীয়ান (সা)-এর আবির্ভাবই কিয়াম-মতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা, খতামে-নবুওয়ারতও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত।

এমনিভাবে চম্ভ বিখণ্ডিত করার মো'জেযাকে কোরআনে **اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ**

বাক্য দ্বারা বাক্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গুমেছেন—মিশনাক্ত বিখরগুলো কিয়ামতের আলামত : জানচর্চা উঠে যাবে। জ্ঞানতা বেড়ে যাবে। বাতিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে ; ঐম্বলিক, পঞ্চাশ





জন মারীফ ভরণ-পাষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়াজেতে আছে, ইলম হাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে।—( বোধারী, মুসলিম )

হযরত আবু হরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতে রসূলল্লাহ্ (সা) বলেন : যখন যুদ্ধলশ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলশ মাল সাব্যস্ত করা হবে ( অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে ) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে ( অর্থাৎ আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে ) ইল্-মে-দীন পাখিব স্বার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাগাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুল্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গাঙ্কিকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উশ্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিশেনাজ বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো : একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুত্তির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَقَلِّبَكُمُ وَمَثُوكُمْ ۝

( ১৯ ) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনাদের ভুলের জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( যখন আপনি আল্লাহ্‌র অনুগত ও অবাধ্য উভয় শ্রেণীর অবস্থা ও পরিণতি শুনলেন, তখন ) আপনি ( উত্তমরূপে ) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। ( এতে ধর্মের স্বাবতীয় মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা এসে গেছে। কেননা, জেনে রাখুন, বলে পুরো-পুরি জেনে রাখা বোঝানো হয়েছে। পুরোপুরি জেনে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি আমলে আনা অপরিহার্য। মোটকথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বরূপ পালন করুন। যদি কোন সময় ভুলটি হয়ে যায় তা আপনার নিষ্পাতের কারণে গোনাহ্ নয়, বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চমর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ভুলটি। তাই ) আপনি ( এই বাহ্যিক ) ভুলটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্যও ( ক্ষমার দোয়া করতে থাকুন। একথাও স্মর্তব্য যে ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থানের ( অর্থাৎ সব অবস্থা ও কাজকর্মের ) খবর রাখেন।

জানুয়ারি জাতীয় বিশ্ব

আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের প্রার্থন্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন : তুমি কি কোরআনের এই বাণী প্রবণ করনি **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

**وَأَسْتَغْفِرَ لَذَنْبِكَ** এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যর আছে

**سَابِقُوا إِلَيَّ** আরও বলা হয়েছে : **اعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ**

**وَأَعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ** অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : **مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ**

**فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ** এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর এরপর বলা হয়েছে **مِّن رَّبِّكُمْ**

তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসুলুল্লাহ (সা) যদিও পূর্ব থেকে একথা জনতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর **وَأَسْتَغْفِرَ** অর্থাৎ ইস্তিগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসুলুল্লাহ (সা) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া সম্বন্ধে ছিল বিশেষে ইজ্তিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিহ্ন নয়। শরীমতের আইনে ইজ্তিহাদী ভুল গোনাহ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে **ذَنْبٌ** তথা গোনাহ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়, যেমন সূরা আবাসায় রসুলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কর্তার সতর্কবাণী এই ইজ্তিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজ্তিহাদী ভুল যদিও গোনাহ ছিল না, বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ বোঝানো যেতে পারে।

জাতীয় : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : ভয়মরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা

কর। ইবলীস বলে : আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎ কাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই)। এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مَثُوِيَّ مَثُوِيَّ مَثُوِيَّ مَثُوِيَّ مَثُوِيَّ

এর শাব্দিক অর্থ ওলটপালট হওয়া এবং مَثُوِيَّ শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। এক, যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং দুই, যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে مَثُوِيَّ শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مَثُوِيَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ

مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِثِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى

لَهُمْ ۖ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي

الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ

وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۗ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ

أَقْفَالٌهَا ۗ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَهُمْ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِسْرَارَهُمْ ۝ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ  
 وَأَذْبَارَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْحَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا  
 رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
 أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ ۖ وَتَعَرَّفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝  
 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ  
 وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۝  
 وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۝

(২০) যারা মু'মিন, তারা বলে : একটি সূরা নাখিল হয় না কেন ? অতঃপর যখন কোন দ্বার্বহীন সূরা নাখিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে যত্নাভয়ে মুর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সূতরাং ধ্বংস তাদের জন্য! (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোনআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তামাষক ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কায়দকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা জ্ঞান দেয়। (২৬) এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব, অপছন্দ করে : আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের ধোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ক্লেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে ? (২৮) এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিষ্ময় প্রকাশ করে দেবেন না ? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবারকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ ষাটাই করি ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মু'মিন, তারা (তো সর্বদা উৎসুক থাকে যে, আরও কালাম নাখিল হোক, যাতে ঈমান তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায়; আর সাবেক নির্দেশের ভাকীদ আসলে আরও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এই উৎসুক্যের কারণে) বলে, কোন (নতুন) সূরা নাখিল হয় না কেন? (নাখিল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত)। অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন (বিশ্লবস্তর) সূরা নাখিল হয় এবং (ঘটনাক্রমে) তাতে জিহাদেরও (পরিষ্কার) উল্লেখ থাকে, তখন হাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মুছাপ্রাপ্ত মানুষের মত (ভয়ানক দৃষ্টিতে) তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। (এরূপ তাকানোর কারণ ভয় ও কাপুরুষতা। কারণ, এখন ঈমানের দাবী সপ্রমাণের জন্য তাদের জিহাদে যেতে হবে। তারা যে এভাবে আলাহর নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে, অতএব (আসল কথা এই যে) সত্বরই তাদের দুর্ভোগ আসবে। (দুনিয়াতেও কোন বিপদে গ্রেফতার হবে, নতুবা পরকালে তো অবশ্যই হবে। অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোশামোদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু) তাদের আনুগত্য ও মিষ্টবাক্য (অর্থাৎ মিষ্টবাক্যের স্বরূপ) জানা আছে। (জিহাদের নির্দেশ নাখিল হওয়ার সময় তাদের অবস্থা দেখে এখন সবার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে)। অতঃপর (জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর) যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখন (ও) যদি তারা (ঈমানের দাবীতে) আলাহর কাছে সাচ্চা থাকে (অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পালন করে এবং ঠাণ্ডি মনে জিহাদ করে) তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (অর্থাৎ প্রথমে মুনাফিক থাকলে শেষেও যদি তওবা করত, তবু তাদের ঈমান গ্রহণীয় হত। অতঃপর জিহাদের ভাকীদ এবং যারা জিহাদে যোগদান না করে গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: তোমরা যে জিহাদকে পছন্দ কর না, তাঁতে তো একটি পাখিব ক্ষতিও আছে। সেমতে) যদি তোমরা এমনভাবে সবাই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে সম্ভবত তোমরা (অর্থাৎ সব মানুষ) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি জিহাদ ত্যাগ করা হয়, তবে অনর্থকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এরূপ ব্যবস্থা না থাকায় কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকার হরণ অবশ্যস্বাবী হয়ে পড়বে। সুতরাং যে জিহাদে পাখিব উপকারও আছে, তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অতঃপর মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে) এদেরকেই আলাহ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন (তাই বিধানাবলী পালন করার তওফীক নেই) অতঃপর (রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ) তাদেরকে (কবুলের নিয়তে বিধানাবলী প্রবণ করা থেকে) বধির করে দিয়েছেন এবং (সৎপথ দেখার ব্যাপারে তাদের (অন্তর) দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। (এরপর বলা হয়েছে যে, কোরআনে

জিহাদ ও অন্যান্য বিধিবিধানের অপরিহার্যতা, কোরআনের সত্যতার প্রমাণাদি, বিধানাবলীর পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উপকারিতা এবং বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা যে এদিকে ভ্রক্ষেপ করে না, তবে) তারা কি কোরআন (—এর অলৌকিকতা ও বিষয়বস্তু) সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? ফলে তারা জানতে পারে না) না (চিন্তা করে, কিন্তু) তাদের অন্তরে (অদৃশ্য ভাঙ্গা লেগে আছে? (এতদুভয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হয়েছে এবং উভয়টিও হতে পারে। বাস্তবে এ স্থলে উভয়টিই হয়েছে। প্রথমত তারা অস্বীকারের কারণে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনি এরপর এর শাস্তিধরূপ অন্তরে ভাঙ্গা লেগে গেছে। একে **ختم طبع** অর্থাৎ মোহর মারাও বলা হয়েছে। এর প্রমাণ এই আয়াত :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطَبَعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

—অতঃপর চিন্তা না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে : যারা সোজা পথ

(কোরআনের অলৌকিকতার মত সুভিগত প্রমাণাদি দ্বারা এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর মত ইতিহাসগত প্রমাণাদি দ্বারা) ব্যক্ত হওয়ার পর (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় (যে, ঈমান আনার ফলে অমুক অমুক বর্তমান অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাশিত উপকারিতা ফওত হয়ে যাবে। মোট-কথা, চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে হঠকারিতা। কারণ হিদায়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তারা উল্টো দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই হঠকারিতার পর শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভ্রাত ও কৃতিকর কর্মকে শোভন করে দেখিয়েছে। এর ফলে তারা চিন্তা করে না এবং চিন্তা না করার কারণে অন্তরে মোহর লেগেছে)। এটা (অর্থাৎ হিদায়ত সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দূরে সরে পড়া) এজন্য যে, তারা তাদেরকে—যারা আল্লাহর অরতীর্ণ বিধানাবলীকে (হিংসাবশত) অপছন্দ করে [ অর্থাৎ ইহদী সরদারগণ। তারা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি হিংসা পোষণ করত এবং সত্য জানা সত্ত্বেও অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করত। মোটকথা, মুনাফিকরা ইহদী সরদারদেরকে ] বলে : আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেব। (অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে মুহাম্মদের অনুসরণ করতে নিষেধ কর। এর দু'টি অংশ আছে : এক. বাহ্যিক অনুসরণ না করা এবং দুই. আন্তরিক অনুসরণ না করা। প্রথম অংশের ব্যাপারে তো আমরা উপকারিতাবশত তোমাদের কথা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে মেনে নেব। কেননা,

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সাথে, যেমন বলা হয়েছে : **اِنَّا مَعَكُمْ** উদ্দেশ্য এই যে,

সত্য থেকে মুখ ফিরানোর কারণ জাতিগত বিদ্বেষ এবং অন্ধ অনুকরণ। যদিও এ ধরনের কথাবার্তা মুনাফিকরা গোপনে বলে, কিন্তু) আল্লাহ তাদের গোপন কথাবার্তা (সম্বন্ধ) অবগত

জাহেদ। (ওহীর মাধ্যমে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আপনাকে সজ্ঞিত করে দেয়। অতঃপর

শাস্তিবাদী উচ্চারণিত হচ্ছে, যা <sup>أُولَىٰ</sup> <sup>أُولَىٰ</sup> <sup>أُولَىٰ</sup> এর তফসীর হিসেবে হতে পারে, অর্থাৎ তারা

যে এমন কাণ্ড করছে) তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন স্বেচ্ছপতা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে? ওটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে (হবে) যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি (অর্থাৎ সবটী সৃষ্টিকারী আমলসমূহ)-কে হুণা করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের (সৎ) কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) ব্যর্থ করে দিয়েছেন। (সূতরাং তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। কারণ কোন মকবুল আমল থাকলে তার বরকতে শাস্তি কিছু না কিছু

হাস পাড়। অতঃপর <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> -এর তফসীর হিসাবে বলা হচ্ছে :

যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) স্নেহ আছে, (এবং তারা তা গোপন করতে চায়) তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাদের অন্তরের বিষয় প্রকাশ করবেন না? (অর্থাৎ তারা ওটা কিভাবে মনে করতে পারে, যেকোনো আল্লাহ তা'আলা যে আলিমুল গাম্বব, তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত?) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, ফলে আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন। পূর্ণ পরিচয়ের অর্থ এই যে, তাদের চেহারার আকার-আকৃতি বলে দিতাম। যদিও রহস্যবশত আমি ওরূপ বলিনি, কিন্তু আপনি অবশ্যই কথার ভিত্তিতে এখনও তাদেরকে চিনতে পারতেন। (কেননা, তাদের কথাবার্তা সত্যের উপর ভিত্তি-শীল নয়। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে চিনার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। ফলে সত্য ও মিথ্যার প্রভাব অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলিত হত। এক হাদীসে আছে, সত্য প্রকাশ দান করে এবং মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করে। অতঃপর মু'মিন ও মুনাফিক সবাইকে একত্র সম্বোধন করে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে : ) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবার কর্মসমূহের খবর রাখেন। (সূতরাং মুসলমানদেরকে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান এবং মুনাফিকদেরকে তাদের কপটতা ও প্রভারণার শাস্তি দেখেন। অতঃপর জিহাদ

ইত্যাদির ন্যায় কঠিন বিধানাবলীর একটি রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যেমন, উপরে <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup>

<sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> <sup>أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ</sup> আয়াতে একটি রহস্য বর্ণিত হয়েছিল। আমি (কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ

দিয়ে) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (বাহ্যতও) তাদেরকে জেনে ও পৃথক করে) নিই, যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিই। (যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে অন্য নির্দেশাবলীও এবং মোজা-হাদা ও সবকের অবস্থার মধ্যে অন্যান্য অবস্থাও দাখিল হয়ে যান, সেজন্য এই বাক্য সংযুক্ত করা হয়েছে)।

আনুষ্ঠানিক ভাষা বিবরণ

سورة المائدة

এর শাসনিক অর্থ মজবুত ও অমত। এই আতিথানিক

অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই **مؤتمنة** কিং শরীয়তের পবিত্রতার **مؤتمنة** বলটি **مؤتمنة** তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে 'মোহাকামাহ্' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা যমসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাডানাহ (র) হলেন : যেসব সূরার মুক্ত ও জিহাদের বিধামাবলী বিখ্যত হয়েছে, সেগুলো সব 'মোহাকামাহ্' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহাকামাহ্ শব্দ যুক্তি করে জিহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুন্দর উল্লেখ আসছে।— (কুরতুবী)

وَأُولَىٰ لَكُمْ أَرْبَابُ مَا يَرْزُقُكُمْ وَأُولَىٰ لَهُمْ أَرْبَابُ مَا يَرْزُقُكُمْ وَأُولَىٰ لَهُمْ أَرْبَابُ مَا يَرْزُقُكُمْ

অন্যদের কর্তৃত্বসমূহ আসল।—(কুরতুবী)

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَرِّمْنَا الْبُيُوتَ الْمَسْكُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَأُولَىٰ لَكُمْ أَرْبَابُ مَا يَرْزُقُكُمْ وَأُولَىٰ لَهُمْ أَرْبَابُ مَا يَرْزُقُكُمْ وَأُولَىٰ لَهُمْ أَرْبَابُ مَا يَرْزُقُكُمْ

আতিথানিক দিক দিয়ে **تولى** শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। এক. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দুই. কোম মনের উপর শাসন ক্রমতা লাভ করা। আরোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীলের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবু হাইয়ান (র) বাহুরে-মুহীতে এই অর্থকেই অপ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধামাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও—জিহাদের বিধামও এর অন্তর্ভুক্ত, তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, আর অজ্ঞানতার পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক সোজা অন্য গোত্রের উপর হান্দা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে রহতে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটাসেই সন্তান জিহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যত মজবুত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পড়া, পণ্ডিত আরকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অহমিল্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্বন্ধিত ও সুসংহত হয়। রহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে **تولى** শব্দের অর্থ 'শাসন ও শাসন ক্রমতা লাভ করা' দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের যমোবাছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ সেল ও জাতির শাসনক্রমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ হাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অমর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।



আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ : رَحِمَ اَرْحَامِ শব্দটি এর বহুবচন ।

এর অর্থ জননীর গর্ভাশয় । সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সৃষ্টিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رَحِمَ শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে তফসীরে রুহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, رَحِمَ اَرْحَامِ ও ذَوَى الْاَرْحَامِ শব্দ কোন কোন আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত । ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাকীদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও অন্য দু'জন সাহাবী থেকে এই বিশ্বয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্ক-শীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহায়ক ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও । অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ নেই।—( আবু দাউদ-তিরমিযী ) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আম্বু রুজি ও রুযী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহায়ক ব্যবহার করে। সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সন্ধ্যাবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহাসও করে, তবুও তার সাথে তোমার সন্ধ্যাবহার করা উচিত। সহীহ বুখারীতে আছে :

ليس الوا صل بالمكا في ولكن الوا صل الذي اذ ا قطعت رحمة وصلها  
অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সন্ধ্যাবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সন্ধ্যাবহার করে, বরং সেই সন্ধ্যাবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সন্ধ্যাবহার অব্যাহত রাখে।—( ইবনে কাসীর )

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ—অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) এই আয়াতদুটাই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাদী গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্কের ছিন্ন হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরাগবাদী বিক্রয় করা হারাম।—( হাকেম )

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা : হযরত ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : সে ব্যক্তির প্রতি কোন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন ?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন : এজিদের চাইতে অধিক আশ্বীয়তার বন্ধন ছিন্ন-কারী আর কে হবে, যে রসুলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্ক ও আশ্বীয়তার প্রতিও ভ্রাক্ষেপ করেনি ? কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণ-সহ অভিসম্পাত করা জায়েয, যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, দুক্তকারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ইত্যাদি।—(রাহুল মা'আনী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৭২)

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا—অন্তরে ভালো লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য

আয়াতে **ختم** ও **طمع** অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যাঙ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গোনাকে লিপ্ত থাকে। (নাউমুল্লাহ মিনহ)

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ—এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কঠী বলা

হয়েছে। এক. **سَوَّلَ**—এর অর্থ সুশোভিত করা, অর্থাৎ মন্দ বিষয় অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া। দুই. **أَمْلَىٰ** এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দ কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَاثَهُمْ

**أَمْ حَسِبَ** শব্দটি **أَضْغَاثَهُمْ** এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিবেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং বাহ্যত রসুলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মহক্বাত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিবেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ রক্বুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিবেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন ? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাতাতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যশ্বারা বোঝা যায় যে, তারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাতাতে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فُلُجَّتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ—অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে

আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যশ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে

لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে বাস্তবগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম : কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লক্ষিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তর্গত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আলাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ওসমান পনী (রা) বলেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আলাহ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সমস্ত তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আলাহ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়া হয়েছিল। মসনদে আহমদে ওক্বা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) একবার এক খোতবার হস্তি জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

حَتَّى نَعْلَمَ الْمَجَا هِدِّينَ مِنْكُمْ — আলাহ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল

থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আলাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনা-ভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া।—(ইবনে কাসীর)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ  
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجِطُّ  
 أَعْمَالَهُمْ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
 وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا

إِلَى السَّلَامِ ۗ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝  
 إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ  
 أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ إِنَّ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَ  
 يُجْزِمُ أَمْغَانَكُمْ ۝ هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ  
 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ  
 ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

(৩২) নিশ্চয় যারা কাফির এবং জাহান্নাম পথে থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সংগে ব্যক্তি হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা জাহান্নাম কোনই প্রতি করতে পারবে না এবং তিনি বার্থ করে দিচ্ছে তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা জাহান্নাম অনুপাত্য কর, রসূল (সা)-এর অনুপাত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফির এবং জাহান্নাম পথে থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় যারা যান, জাহান্নাম কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হরো না এবং সজির আহ্বান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। জাহান্নামই তোমাদের সাথে আইন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম ছাড়া করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, জাহান্নাম তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) ওন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে জাহান্নাম পথে ব্যর্থ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ রূপগতা করছে। যারা রূপগতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই রূপগতা করছে। জাহান্নাম অতাবমুত্ত এবং তোমরা অতাবমুত্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

তৎসারের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা কাফির এবং (অন্য মানুষকেও) জাহান্নাম পথে (অর্থাৎ সজ্জাধর্ম) থেকে

ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ ( অর্থাৎ ধর্মের ) পথ ( যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মুশরিক-দের জন্য ও ইতিহাসগত প্রমাণাদির মাধ্যমে কিতাবধারীদের জন্য ) বাতুল হওয়ার পর রসূল (স)-এর বিরোধিতা করে, তারা আলাহর ( অর্থাৎ আলাহর ধর্মের ) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না ( বরং এই ধর্ম সর্বাবস্থায় পূর্ণতা লাভ করবে। সেমতে তাই হয়েছে ) এবং আলাহ তা'আলা তাদের প্রচেষ্টাকে ( যা সত্য ধর্ম মিটানোর জন্য তারা করছে ) নস্যাৎ করে দেবেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আলাহর আনুগত্য কর এবং [ যেহেতু রসূল (স) আলাহরই বিধান বর্ণনা করেন—বিশেষ করে ওহীর মাধ্যমে বর্ণিত বিধান হোক অথবা ওহী বর্ণিত সামগ্রিক বিধির আওতাভুক্ত বিধান হোক—তাই ] রসূল (স)-এর (ও) আনুগত্য কর এবং ( কাফির-দের ন্যায় আলাহ ও রসূলের বিরোধিতা করে ) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। ( এর বিবরণ আনুশঙ্গিক ভাওয়া বিষয়ে আসবে )। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আলাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, আলাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ( ক্ষমা না করার জন্য কুরানের সাথে আলাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা শর্ত নয়; বরং শুধু মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকারই এটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অধিক ভৎসনার জন্য এই বাস্তব কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে যে, তখনকার কাফির সরদারদের মধ্যে এই দোষটিও বিদ্যমান ছিল। যখন জানা গেল যে, মুসলমানরা আলাহর প্রিয় এবং কাফিররা অপ্রিয়, তখন হে মুসলমানগণ) তোমরা ( কাফিরদের মুকাবিলায় ) হীনবল হয়ে না এবং ( হীনবল হয়ে তাদেরকে ) সজ্জির আহ্বান জানিও না, তোমরাই প্রবল হবে ( এবং তারা পরাভূত হবে। কেননা, তোমরা প্রিয় ও তারা অপ্রিয় )। আলাহ তোমাদের সাথে আছেন ( এটা তোমাদের পার্থিব সাফল্য এবং পরকালে এই সাফল্য হবে যে ) তিনি তোমাদের কর্মকে ( অর্থাৎ কর্মের সওয়ালকে ) হাস করবেন না। ( এটা হচ্ছে জিহাদের উৎসাহ প্রদান। অতঃপর দুনিয়ার রূপভঙ্গুরতা উল্লেখ করে জিহাদের উৎসাহ এবং আলাহর পথে ব্যয় করার ভূমিকা প্রদান করা হচ্ছে ) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা। ( এতে যদি নিজের উপকারের জন্য জান ও মালকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এই উপকারই কর্মদিনের এবং এর সারমর্মই কি ? ) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংশয় অবলম্বন কর, ( এতে জান ও মালের বিনিময়ে জিহাদও এসে গেছে ) তবে আলাহ নিজের কাছ থেকে তোমাদের উপকার করবেন এভাবে যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং ( তোমাদের কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। সেমতে ) তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ ( ও যা প্রাণের তুলনায় সহজ নিজের উপকারের জন্য ) চাইবেন না, ( যা দেওয়া সহজ তাই যখন চাইবেন না, তখন যা দেওয়া কঠিন তা কিরাপে চাইবেন? বলা বাহুল্য, আমাদের জান ও মাল খরচ করলে আলাহ

তা'আলার কোন উপকার হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। যেমন আলাহ বলেন : وَهُوَ يَطْعَمُ

وَأَسْمَاءُ সেমতে ) যদি ( পরীক্ষারূপ ) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান, অতঃপর

তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করেন ( অর্থাৎ সমৃদ্ধ ধনসম্পদ চান ), তবে তোমরা ( অর্থাৎ তোমাদের অধিকাংশ লোক ) কাৰ্পণ্য করবে ( অর্থাৎ দিতে চাইবে না, তখন আলাহ তা'আলা

তোমাদের অনীহা প্রকাশ করে দেবেন। তাই এই সম্ভবপর বিষয়টিকেও বাস্তবায়িত করা হয়নি)। হ্যাঁ, তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে (যার উপকার নিশ্চিতরূপে জোমরাই পাবে— স্বল্প পরিমাণ ধনসম্পদ) ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয় (অবশিষ্ট বিপুল ধনসম্পদ তোমাদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয়) অতঃপর (এর জন্যও) তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, তারা (প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। অর্থাৎ নিজেদেরকেই এর চিরস্থায়ী উপকার থেকে বঞ্চিত রাখে) আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন (যে তাঁর ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে) এবং তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী। (তোমাদের এই মুখাপেক্ষিতার কারণেই তোমাদেরকে ব্যয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পরকালে তোমাদের সওয়াব দরকার হবে। এসব কর্মই সওয়াব লাভের উপায়)। যদি তোমরা (আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না (বরং অত্যন্ত অনুগত হবে। এই কাজ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং এভাবে সেই রহস্যপূর্ণতা লাভ করবে)।

### জানুহজিক আতবা বিশ্ব

ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله — আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক

এবং ইহদী বনী কোরাইশ্বা ও বনী নুসায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ-কাফিরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বান্ধজন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফির বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

و سيحبط أعمالهم — এখানে 'কর্ম বিনশ্ত' করার অর্থ এরূপও হতে পারে যে,

ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিকাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, ঋয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে — গ্রহণযোগ্য হবে না।

لا تبطلوا أعمالكم — কোরআন পাক এ স্থলে **حبط** এর পরিবর্তে **ابطال**

উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে **حبط** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফিরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুর্তাদ তথা কাফির হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোম কোম সৎ কর্মের জন্য জমা সৎ কর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎ কর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা বাস্তবাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে, তাতে সিন্মা তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-হাশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কোরআন পাকে বলা

হয়েছে : **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** জমাতি বলা

হয়েছে : **إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْكَافِرِينَ** অর্থাৎ এই যে সৎকর্ম সিন্মা ও মামি-হাশের

উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে থাকে। এমনিভাবে সদকা-ধরনাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

**لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى**— অর্থাৎ অনুগ্রহের বড়াই করে

অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-ধরনাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎ কর্মসমূহকে গোমাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন- ইবনে জুরয়েজ বলেন : **بِالْمَنِّ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمَةِ**— ফেমনা

আহলে সুন্নত দলের একমত্রে কুকুর ও শিরক ছাড়া কোম কবীরা গোমাইও এমম মেই, যা মুমিনদের সৎ কর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে মিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবছার তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায রোযা বাতিল হয়ে গেছে—এগুলোর কাযা কর। অর্থাৎ, সেসব গোমাই ছারাই সৎ কর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎ কর্ম কবুল হওয়ার জন্য শর্ত, যেমন সিন্মা ও মামি-হাশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎ কর্ম কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সত্ত্বপন্ন যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎ কর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎ কর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবছার এটা সকল গোমাহর ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। ধার আমলে গোমাহর প্রাধান্য থাকবে, তার অঙ্গ সৎ কর্মেও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না; বরং সে নিম্নমানুষায়ী গোমাহর শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু পরিমাণে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোম সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত মফল নামায অথবা রোযা শুরু করে বিমা ওবরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাতার আওতাভূত এবং মাজারেষ। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতবাহি তাই। তিনি বলেন : যে সৎ কর্ম প্রথমে করায় অযাবী ওয়াযিব ছিল না, কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম মূল করা আলোচ্য আয়াতদুল্টে করায় হয়ে থাকে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিমা ওবরে ছেড়ে দিলে অথবা

ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গোনাহ্‌গার হবে এবং কাযা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে গোনাহ্‌গারও হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ, প্রথমে যখন এই আমল ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফরয ও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান। তফসীরে মাযহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তির এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফিরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরাপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও शामिल ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফির অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে অঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ—এ আয়াতে কাফিরদেরকে সজির আহবান

وَإِنْ جَنَّحُوا لِلْسَّلْمِ—আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَأَجْنَحُ لَهَا—অর্থাৎ কাফিররা যদি সজির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে

পড়। এ থেকে সজি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে সজির প্রস্তাব হলে তোমরা সজি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সজির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সজির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে

فَلَا تَهِنُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব

নিষে যে সজি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَإِنْ



جَنَحُوا<sup>١</sup> আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সজ্জি

করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَنْ يَتْرُكُمْ<sup>٢</sup> أَعْمَالَكُمْ<sup>٣</sup>—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান

হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কল্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব কল্ট করলেও মু'মিন অকৃতকার্য নয়।

أِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا<sup>٤</sup>—সংসারজাসজিই মানুষের জনজিহাদে বাধা-

দানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহত্বতাকে পরকালের স্থায়ী আক্ষর নিয়ামতের মহত্বের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْئَلُكُمْ<sup>٥</sup> أَمْوَالَكُمْ<sup>٦</sup>—আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ

তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকাবর বিধান এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন : لَا يَسْئَلُكُمْ<sup>٧</sup>

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্য চান না, বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও

يُؤْتِكُمْ<sup>٨</sup> أَجْرَكُمْ<sup>٩</sup> শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে

আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা

হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত : مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ<sup>١٠</sup>—অর্থাৎ আল্লাহ

বলেন : আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর

প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, <sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> لَا يَسْئَلُكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উসায়নীর উক্তি।—(কুরতুবী) পরবর্তী

আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে : <sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> يَحْفَا ن يَسْئَلُكُمْ فِيحْفَا

শব্দটি <sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> حَفَا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে <sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> لَا يَسْئَلُكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয়

আয়াতে <sup>فِيحْفَا</sup> فِيحْفَا সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন—আল্লাহ তা'আলার কোন উপকার নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চান নি। সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সম্ভটটিতে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

<sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> يُخْرِجُ أَضْفَانَكُمْ শব্দটি <sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> ضَعْفَان এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্রোহ

ও গোপন অপ্রিয়তা। এ স্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় হেঁকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

<sup>اَسْأَلُكُمْ</sup> تَدْعُونَ لِنُفْقَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْتَغِلْ—অর্থাৎ তোমাদেরকে

তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের

কেউ কেউ এতে কুপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে : **وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ**

— অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতেও কুপণতা করে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না ;

বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরম তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট

করে বলা হয়েছে : **وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ**— অর্থাৎ আল্লাহ

অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর

করা। **وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ**

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদে আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হিফায়ত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্য অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন : এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন সাহাবান্নে-কিরামের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ ! (সা) তাঁরা কোন্ জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিশ্বাস হবে না? রসূলুল্লাহ (সা) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা)-র উরুতে হাত মেরে বললেন : সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সন্তোষমণ্ডলস্থ নকুলেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছেতে পারে না) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্য ধর্ম হাসিল করত এবং তা মেনে চলত।—(তিরমিযী, হাকেম, মায়হারী)

শায়খ আলীমুদ্দীন সুন্নুতী ইমাম আবু হানীফা (র)-র প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন : আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন।—(তফসীরে-মায়হারীর প্রাক্ত-টীকা)

سورة الفتح  
সূরা ফাত্‌হ

মদীনায়ে অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

وَيُنصركَ اللهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে।

- (১) নিশ্চয় আমি আগনার জন্য এমন একটা ফরসাতা করে দিচ্ছি, যা সুন্দর  
(২) যাতে আল্লাহ আগনার জ্বালাত ও ভবিষ্যত স্তূটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আগনার  
প্রতি তাঁর নিলামত পূর্ণ করেন ও আগনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং  
আগনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি ( হৃদয়বিয়ার সজ্জির মাধ্যমে ) আগনাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান  
করেছি। অর্থাৎ হৃদয়বিয়ার সজ্জির এই ফারদা হয়েছে যে, এটা একটা আকাঙ্ক্ষিত  
বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে সজ্জিটিই বিজয়ের রূপ পরিগ্রহ  
করেছে। মক্কা বিজয়কে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলার কারণ এই যে, ইসলামী শরীয়াতে বিজয়ের  
উদ্দেশ্য রাজ্য করতলগত হওয়া নয়; বরং ইসলামকে প্রবল করা উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের  
মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে হাসিল হয়ে যায়। কেননা, আরবের গোত্রসমূহ এই অপেক্ষায়  
ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা) তাঁর স্বপোত্রের মুকাবিলায় বিজয়ী হলে আমরাও তাঁর আনুগত্য  
স্বীকার করে নেব। মক্কা বিজিত হলে পর চতুর্দিক থেকে আরবের গোত্রসমূহ আগমন করতে  
থাকে এবং নিজে অথবা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।  
( বুখারী ) মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যপাদি ফুটে উঠে, তাই একে প্রকাশ্য  
বিজয় বলা হয়েছে। হৃদয়বিয়ার সজ্জি ছিল এই বিজয়ের কারণ ও উপায়। কারণ, মক্কাবাসী-  
দের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে মুসলমানরা নিজেদের শক্তি ও সমরোপকরণ  
বৃদ্ধি করার অবকাশ পেল না। হৃদয়বিয়ার সজ্জি হওয়ার ফলে মুসলমানরা নির্বিশেষে তাদের  
প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের

সংখ্যা বেড়ে যায়। খায়বর বিজয়ের ফলে সমরোপকরণের দিক দিয়ে তারা অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করার মত শক্তিশালী হয়ে যায়। এরপর কোরাইশদের পক্ষ থেকে যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) দশ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। মক্কাবাসীরা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, বেশি যুদ্ধ করতে হল না এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যুদ্ধ যা হল, তা এতই সামান্য ও সীমাবদ্ধ ছিল যে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না সন্ধির মাধ্যমে—এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, এভাবে হৃদয়বিয়ার সন্ধি বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। তাই রূপক অর্থে এই সন্ধিকেই বিজয় বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। অতঃপর এই বিজয়ের ধর্মীয় ও ইহলৌকিক ফলাফল ও বরকত বর্ণিত হচ্ছে যে, এই বিজয় এ কারণে হয়েছে) যাতে দীন প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে (আপনার প্রচেষ্টার ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে, এর ফলে আপনার সওয়াব অনেক বেড়ে যায় এবং অধিক সওয়াব ও নৈকট্যের বরকতে) আল্লাহ্ আপনার সব অতীত ও ভবিষ্যত গুণিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ (যেমন নবুওয়ত দান, কোরআন দান, জ্ঞান দান ও কুর্মে'র সওয়াব দান) পূর্ণ করেন, (এভাবে যে, আপনার সওয়াব ও নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই দুইটি নিয়ামত পরকাল সম্পর্কিত। আরও দুইটি নিয়ামত ইহলৌকিক আছে। তা এই যে) আপনাকে (নির্বিশেষে ধর্মের) সরল পথে পরিচালিত করেন (আপনি সরল পথে চলেন—এটা যদিও পূর্ব থেকে নিশ্চিত, কিন্তু এতে কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হত। এখন এই বাধা থাকবে না)। এবং (অপর ইহলৌকিক নিয়ামত এই যে) আল্লাহ্ আপনাকে এমন বিজয় দান করেন, যাতে শক্তিই শক্তি থাকে। [অর্থাৎ যার পর আপনাকে কারো সামনে মাথা নত করতে না হয়। সেমতে তাই হয়েছে। সমস্ত আরব উপদ্বীপ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়ে যায়]।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেরী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাতহ্ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে-কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকার-রযা তপস্রীক্ষ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হৃদয়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায়া ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত, হযরত ফারুককে আহম (রা), এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইজিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। সন্ধির বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওমরার ইহ্রাম খুলে হৃদয়বিয়া থেকে ফেরত রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সমস্ত এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সমস্ত এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃত-পক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক, কিন্তু আমরা হদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেন : আমি হদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আশেখ বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়, কিন্তু আমরা হদায়বিয়ার ঘটনায় 'বয়াতে-রিয়ওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি যুদ্ধের নীচে উপস্থিত চৌদ্দ সাহাবীর কাছ থেকে জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বয়াতের আলোচনাও করা হয়েছে।—( ইবনে-কাসীর )

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তফসীলে ইবনে কাসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তফসীরে মাহহারীতে আরও বেশী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বরাতে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মো'জেযা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিধৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যে-গুলোর সাথে সূরার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা শুবই সহজ হয়ে যাবে।

**হদায়বিয়ার ঘটনা :** হদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিবর্ত অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে 'শমীসা' বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

**প্রথম অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন :** আবদ ইবনে হমায়দ, ইবনে জবীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন, তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুগুন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহ্‌র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পন্নগছরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তব রূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে-কিরামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।—( বয়ানুল কোরআন )

**দ্বিতীয় অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে-কিরাম ও মক্কাবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অস্বীকার করা :** ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশংকা দেখা দিল যে, মক্কার কোরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদীনায় নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক

গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল : মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।—(মায়হারী)

**তৃতীয় অংশ মক্কাভিত্তিক যাত্রা :** ইমাম আহমদ, বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে মতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাসওয়ান্নার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হল। অধিকাংশ রেওয়ান্নাতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা)—র স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবান্নে-কিরামসহ মিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহলায়ফায় পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধেন।—(মায়হারী)

**চতুর্থ অংশ মক্কাবাসীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি :** রসূলুল্লাহ (সা) একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেছেন—এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল এবং বলল : মুহাম্মদ (সা) সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন করছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দিই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তাঁর মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল : আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রসূলুল্লাহ (সা)—কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সকাফ গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রসূলুল্লাহ (সা)—কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

**সংবাদ পৌঁছানোর একটি অজ্ঞাবহীত সুরল পদ্ধতি :** তারা রসূলুল্লাহ (সা)—র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)—র পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয়—যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালারা উচ্চস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালারা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)—র গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

**রসূলুল্লাহ (সা)—র সংবাদ প্রেরক :** মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রসূলুল্লাহ (সা) বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরোক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : কোরাইশদের জন্য আরুপ, কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রপোস্থাদানা এতটুকু দমেনি।

আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সবে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হলে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কোরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উল্টুপীর পশ্চিমধ্যে বসে যাওয়া : অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে একত্র করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন : আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন, কারও সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা বনী ইসরাঈলের মত নই যে, আপনাকে

বলে দেব : **أَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا** (আপনি ও আপনার

পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেন : বাস, এখন আল্লাহর নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌঁছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কিবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওক্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল : আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাযরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরও নামায আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাযের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাযের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রু পক্ষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ : হদায়বিস্বায় একটি মো'জেযা : রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হদায়বিস্বায় নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উল্টুপীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উল্টুপী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কি'রাম



চেষ্টা করেও উক্তীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন : কাসওয়ান্ডা অবাধ্য হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কাসওয়ান্ডার কোন কসুর নেই। তাঁর এরূপ অড্য়াস কখনও ছিল না। তাকে তো সেই আন্নাহ্ বাধা দিচ্ছেন, যিনি 'আসহাবে-ক্বীন' তথা হস্তী-বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [ রসূলুল্লাহ্ (সা) সত্ত্বত তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভব এটা নয় ]। তিনি বললেন : যার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আজিকার দিনে আন্নাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোন কথা কোরাইশরা আমাদের বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উক্তীকে একটি আওয়াজ দিতেই উক্তী উঠে দাঁড়াল। রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদে দিক থেকে সরে গিয়ে হদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অংশে একটি মাত্র কূপ ছিল, যাতে অল্প অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কূপে পড়ত। সেমতে এই কূপের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা প্রকাশ পেল, তিনি কূপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীর কূপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কূপের পানি ফুলে ফেঁপে কূপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোন অভাব রইল না।

**সপ্তম অংশ :** প্রতিনিধিদলের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা : অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ালীদ সন্নীগণসহ আগমন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বলল : কোরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মুকাবিলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রসূলে করীম (সা) বললেন : আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন : কোরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নিদিষ্ট মেরাদেদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আনবদের মুকাবিলার ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কোরাইশদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কোরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আন্নাহ্‌র কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কোরাইশদেরকে এই পন্থায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র-সরদার ওরওয়া ইবনে মসউদ বলল : বুদায়েল কি বলতে চায়, তা শুনা দরকার। কথাবার্তা শুনে ওরওয়া কোরাইশ সরদারদেরকে বলল : মুহাম্মদ যা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাদের তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আনয় করল : আপনি যদি স্বগোত্র কোরাইশকে নিশ্চই করে দেন, তবে এটা কি করে ভাল কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো ওনেছেন যে, কোন

ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সে সাহাবায়ে কিরামের এই আছোৎসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি ওষু করলে সাহাবায়ে কিরাম ওষুর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরুওয়া ফিরে গিয়ে কোরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল : আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ্ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আছোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আছোৎসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কোরাইশরা বলে দিল : আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরুওয়ান্নার কথায় কর্ণপাত করা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কিরামকে ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তুসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বোঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লাহ্‌য় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আল্লাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরুওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জওয়াব কোরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

**অষ্টম অংশ :** হযরত ওসমান (রা)-কে পয়গামসহ প্রেরণ করা : ইমাম বায়হাকী হযরত ওরুওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কোরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে নিজের কোন লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ্ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন : কোরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কর্তার-তার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোন লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওসমান (রা)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেসে সান্দ্বনা দেবে যে, তোমরা অস্থির হয়ে না। ইনশাআল্লাহ্ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপদাপদ দূর হওয়ার সমস্ত নিকটবর্তী। হযরত ওসমান (রা) প্রথমে বাজদাহে অবস্থানকারী কোরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরুওয়া ইবনে মসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল : আমরা পয়গাম

শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জওয়াব শুনে হযরত ওসমান (রা) যখন মক্কায় দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাদ্দদের সাথে দেখা হল। আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বলল : আপনি মক্কায় পন্নগাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত ওসমান (রা)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র বনু সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান (রা) এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পন্নগাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত ওসমান (রা) দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পন্নগাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম বলল। পন্নগাম পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-কে বলল : আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াক্ক করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন : আমি তওয়াক্ক করতে পারি না, যে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াক্ক না করেন। হযরত ওসমান (রা) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কোরাইশদের রাযী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

**নবম অংশ :** মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর-জনের গ্রেফতারী : ইতিমধ্যে কোরাইশরা তাদের পক্ষাশজন লোককে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল, এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হিফায়ত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা) মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশজন মুসলমান মক্কা পৌঁছেছিলেন। কোরাইশরা তাদের পক্ষাশজনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কোরাইশদের একদল সৈন্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনায় শহীদ হলেন। মুসলমানরা কোরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

**দশম অংশ :** বায়'আতে-রিশওয়ানের ঘটনা : হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একটি রুক্কের নীচে একত্র করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এই সূরায় এই বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসসমূহে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন : এটা ওসমানের বায়'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায়'আত করলেন। এই বিশেষ ফযীলত হযরত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

**একাদশ অংশ :** হুদায়বিয়ার ঘটনা : অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আলাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সজ্জি স্বাপনে উদ্যোগী

হয়ে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়লাভাব ইবনে আব্দুল ওযযা ও মুকরিম ইবনে হিকসকে ওযর পেশ করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরম্ভ করল : ইয়া রাসূলান্নাহ্ ! হযরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মসনদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার

هُوَ الَّذِي كَفَّ

أَيُّدِيَهُمْ عَنْكُمْ

আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও

তাঁর সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিযওয়ানে সাহাবায়ে কিরামের প্রাণচাকলা ও আত্মনিবেদনের অত্মতপ্ত অবস্থা কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কোরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বলল : এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাখাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পন্থাগাম নিয়ে পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাত্রই বললেন : মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সন্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বসে গেলেন এবং ওস্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অন্তর্সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সসন্ত্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কোরাইশদের পন্থাগাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কিরাম তখন ওমরা না করে ইহ্রাম খুলে ফেলতে সন্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কখনও উচ্চ এবং কখনও নম্র হল। ওস্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা না। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সন্মত হলেন। সোহায়েল বলল : আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করি। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন : লিখ, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল : 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন, অর্থাৎ 'বাইম্বমিকা আল্লাহমা'। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে মিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন : লিখ এই অঙ্গীকারনামা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপত্তি জানিয়ে বলল : যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনও বায়তুন্নাহ্ থেকে বাখা দান করতাম না। সন্ধিপত্রে কোন এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোন শব্দ থাকার উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করাম। রসূলুল্লাহ্

(স) তাও মেনে নিস্নে হযরত আলী (রা)-কে বললেন : স্বা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরম্ভ করলেন : আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হযায়্নর ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী (রা)-র হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন : কাটবেন না এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (স) ব্যতীত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল। তখন রসুলুল্লাহ (স) সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিস্নে নিলেন এবং নিরঙ্কর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন :

هذا ما قضى محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو اهلها على وضع  
الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم  
عن بعض -

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (স) বললেন : আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাতত আমা-  
দেরকে তওয়াক্ক করতে দিতে হবে। সোহায়েল বলল : আল্লাহর কসম, এটা হতে পারে  
না। শেষ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ (স) তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত  
এই মর্মে জিপিবেদ্ব করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি  
ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দেবেন যদিও সে আপনার  
ধর্মান্বলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উথিত হল।  
তারা বলল : সোবহানাল্লাহ! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে  
ফিরিয়ে দেব—এটা কিরাপে সম্ভবপর? কিন্তু রসুলুল্লাহ (স) এই শর্তও মেনে নিলেন এবং  
বললেন : আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ তা'আলাই  
আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের  
কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ  
তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দেবেন। হযরত বারা (রা) এই সন্ধির সারমর্মে  
তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন : এক. তাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা  
তাকে ফিরিয়ে দেব। দুই. আমাদের কোন লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দেবে  
না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান  
করব এবং অধিক অস্ত্র নিস্নে আসব না। পরিশেষে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা মক্কাবাসী ও  
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে  
না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল  
হবে এবং যার মনে চাইবে কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খোযায়্যা গোত্র

লাকিন্বে উঠল এবং বলল : আমরা মুহাম্মদের অসীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বনু বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল : আমরা কোরাইশদের অসীকারে দাখিল হচ্ছি।

সন্ধির শর্তাবলীর কারণে সাহাবান্নে কিরামের অসন্তুষ্টি ও মর্মবেদনা : যখন সন্ধির উপরোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলান্নাহ্ ! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বললেন : অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা) বললেন : আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কি মিথ্যান্ন পতিত নয় ? তিনি বললেন : অবশ্যই। হযরত ওমর (রা) আরম্ভ করলেন : আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জালাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহালামে নয় কি ? তিনি বললেন : অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা) বললেন : তবে আমরা কেন ওমরা না করে ফিরে যাবার অপমানকে কবুল করে নেব ? রসূলুন্নাহ্ (সা) বললেন : আমি আল্লাহর বান্দা এবং রসূল হয়ে কখনও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ আমাকে ষিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা) আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলান্নাহ্ ! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুন্নাহর কাছে যাব এবং তওয়াক্ফ করব ? তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে ? হযরত ওমর (রা) বললেন : না, আপনি একরূপ বলেন নি। তিনি বললেন : মনে রাখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি বায়তুন্নাহর কাছে যাবে এবং তওয়াক্ফ করবে।

হযরত ওমর (রা) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্লেভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রসূলুন্নাহ্ (সা)-র সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : আরে ভাই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল, তিনি আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারুক-আযমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন : আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোন সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবু ওবায়দা (রা) তাকে বোঝালেন এবং বললেন : শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। ফারুক আযম (রা) বললেন : আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা) বলেন : আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোযা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ত্রুটি মাক্ফ হয়ে যায়।

আল্লাহও একটি দুর্ঘটনা : চুক্তি পালনে রসূলুন্নাহ্ (সা)-র অপূর্ব কর্মতৎপরতা : যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবান্নে কিরামের অসন্তুষ্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কোরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েজ ইবনে আমরের পুত্র আবু জন্দল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মস্তাক্ফ বন্দী করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর অকথা নির্ষাভনও চালানো হত।

সে কোনরূপে পলায়ন করে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কয়েকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখোলাক কাজ হচ্ছে। আবু জন্দলকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোন শর্ত মেনে নিতে রাজী নই। রসুলুল্লাহ (সা) চুক্তিসূত্রে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আবু জন্দলকে ডেকে বললেন : আবু জন্দল, তুমি আরও কিছুদিন সবর কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্লম মুসলমানের জন্য শীঘ্রই মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। আবু জন্দলের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরও বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মক্কা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধিপত্র চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবু বকর, ওমর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওসর, সাদ ইবনে আবী ওয়াল্লাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ স্বাক্ষর করলেন এবং কোরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা স্বাক্ষর করল।

**ইহরাম খোলা ও কুরবানী কল্পা :** চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হলে রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই সঙ্গে কুরবানীর খেসব জন্তু আছে, সেগুলো কুরবানী করে ফেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম খুলে ফেল। উপযুক্ত দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কিরাম যেন সন্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও তারা স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করলেন মা। ফলে রসুলুল্লাহ (সা) দুঃখিত হলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে পৌঁছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মুল মুমিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন : আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরফা শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করছে। আপনি সবার সামনে নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডন এবং নিজের জন্তু কুরবানী করুন। পরামর্শ অনুযায়ী রসুলুল্লাহ (সা) তাই করলেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কিরাম সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডলেন ও কুরবানী করলেন, রসুলুল্লাহ (সা) সবার জন্য দোয়া করলেন।

রসুলুল্লাহ (সা) হদারবিয়ার উনিশ দিন এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহরান অত্যুপর আসকামে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর সব মুসলমানের পাথের প্রায় মিশ্রণ হয়ে গেল। আহাৰ বস্ত্র সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। রসুলুল্লাহ (সা) একটি দস্তুরখামি বিহালেন এবং সবাইকে আদেশ দিলেন—যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত আহাৰ বস্ত্র দস্তুরখামে একত্র হয়ে গেল। চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ ছিল। রসুলুল্লাহ (সা) দোয়া করলেন এবং সবাইকে খাওয়া শুরু করার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বর্ণমা করেন চৌদ্দশ লোক এই খাদ্য খুব পেট ভরে আহার করল এবং নিজ নিজ পাত্র ভরে মিল। এরপরও পূর্বের মায় আহাৰ বস্ত্র অবশিষ্ট ছিল। এই সফরের এটা ছিল বিতান মোজ্জিয়া। রসুলুল্লাহ (সা) এই দৃশ্য দেখে খুবই খুশি হলেন।

সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সজ্জির শর্তাবলী ওমরা ব্যতিরেকে ও মুক্কে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূল (সা)-এর আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) 'ফুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্‌হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ার হযরত ওমর (রা) আবার প্রশ্ন করে বসলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! এটা কি বিজয় ? তিনি বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই উাম্বোর সামনেও সাহাবায়ে কিরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হদায়বিয়া সজ্জির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ : এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীর সামনে তাদের অন্যান্য জেদ ও হঠকানিতা ফুটে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বৃদায়েল ইবনে ওম্মারাকা এবং ওরওয়্যা ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কিরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সন্ত্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সজ্জি করতে সন্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এর চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ ঝলগক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্রসন্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং পরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত সজ্জি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদ্মতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্য বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হদায়বিয়ার সজ্জির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমর শক্তি সুসংহত হয়। সজ্জির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের দরুন যখন



রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ-একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কা গমনকারী আশ্বনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্ভিন্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্য তড়িঘড়ি আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আঞ্জাহর দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সঙ্কস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে—এ বিষয়ে ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোট কথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কিরাম নিশ্চিত্তে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন, মাথা মুগুন ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাতাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হচ্ছের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা) বললেন : নিঃসন্দেহ কোন বিজয় হদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আঞ্জাহ্ ও রসূল (সা)-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আঞ্জাহ্ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাত্‌হে' আঞ্জাহ্ তা'আলা হদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

ক-লাম-لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَمَا تَأَخَّرَ

কারাগ বর্ণনার জন্য ধরা হলে এর সারনর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অজিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : এক. আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাক্ করা। সূরা মহাশমদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে **ذُنُوبُهُمْ** অথবা **عَصِيَانُهُمْ** (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ভুলটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে **ذُنُوبُهُمْ** তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত

করা হয়েছে। مَا تَقْدُمُ বলে নব্বয়তের পূর্ববর্তী ছুটি এবং مَا تَأَخَّرُ বলে নব্বয়ত লাভের পরবর্তী ছুটি বোঝানো হয়েছে। —(মায়হারী) প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্য যে, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আন্কার লাভ করা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ছুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। —(বয়ানুল-কোরআন)

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا —এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রম

হয় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাত্‌হিয়ার তফসীরে 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'হিদায়ত' একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হিদায়তের অর্থ অভীষ্ট মনষিণের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীষ্ট মনষিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যিকতা বাকী থাকে। কোন রহতম ও লী এমনকি নবী-রসুলও এই আবশ্যিকতা থেকে মুক্ত

হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সা)-কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়ত তথা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যাচ্চ স্তর রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন, যাকে

يَهْدِيكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا —এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তার একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۚ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ يُكْفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ  
 اللَّهِ قَوْلًا عَظِيمًا ۚ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ  
 وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ ۚ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ ۚ عَلَيْهِمْ  
 دَائِرَةُ السُّوءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
 جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

(৪) তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাখিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নতোমগুল ও ডুমগুলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বত্র, প্রত্যাময়। (৫) ঈমান এজন্য বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জালাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহা-সাক্ষ্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ সন্দর্কে মন্দ ধারণা গোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নতোমগুল ও ডুমগুলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রত্যাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন। (যার প্রতিক্রিয়া দু'টি— এক. জিহাদের বায়'আতের সময় এগিয়ে যাওয়া, সংকল্প ও সাহসিকতা, যেমন বায়'আতে রিয়ওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই. কাকিরদের অন্যান্য হঠকারিতার সময় নিজেদের জোশ ও ক্রোধকে বশে রাখা। হৃদয়বিষার ঘটনার দশম অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী <sup>١١</sup>فَا نَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ <sup>١٢</sup>আম্মাতেও <sup>١٣</sup>বর্ণিত হবে)। যাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। কেননা, আসিলে রসূলুল্লাহ (সা)-র আনুগত্য ঈমানের নূর হুজ্বি পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায়

প্রত্যেক দিক দিয়ে রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্যের পরীক্ষা হয়েছে। রসূল (সা) যখন জিহাদের ডাক দিলেন এবং বায়'আত নিলেন তখন সবাই হাশ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বায়'আত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (সা) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর আনুগত্যে মাথানত করে দিলেন এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীব) আল্লাহ্‌রই। তাই কাফিরদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন, যেমন বদর, আহযাব ও হুনায়নের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফিরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয় এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতস্তত করা সমীচীন নয়। জিহাদকরণ ও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা (উপযোগিতা সম্পর্কে) সর্বত্র, প্রভাময়, [ জিহাদকরণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রসূল (সা)-এর আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। অতঃপর ঈমান বৃদ্ধির ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে : ] এবং যাতে আল্লাহ্ ( এই আনুগত্যের বদৌলতে ) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখায় তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে ( এই আনুগত্যের বদৌলতে ) তাদের পাপ মোচন করেন [ কেননা পাপ কর্ম থেকে তওবা এবং সংকল্প সর্পাদান সবই রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যে দাখিল, যা সমস্ত পাপ মোচনকারী ] এটা ( অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল ) আল্লাহ্‌র কাছে মহা সাফল্য। ( এই আয়াতে প্রথম মু'মিনদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নাযিল করার নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এই নিয়ামত রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্যে জাম্মাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করারই ফল। অতঃপর এই প্রশান্তির ফল হিসাবেই মুনাফিকদের এ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এই বঞ্চিত হওয়ার কারণে আযাবে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশান্তি মুসলমানদের অন্তরে নাযিল করেছেন এবং কাফিরদের অন্তরে নাযিল করেন নি ] যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীদেরকে ( তাদের কুফরের কারণে ) শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা পোষণ করে। ( এখানে পূর্বাগত বর্ণনাদুর্ভেদে তাদের কুধারণা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ওমরা করার জন্য মক্কার দিকে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অস্বীকার করে পরম্পরে একথা বলেছিল : তারা আমাদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে জড়িত করতে চায়। তাদেরকে যেতে দাও। তারা জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। এ ধরনের উক্তি মুনাফিকদেরই হতে পারে। ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে সমস্ত কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস এই কুধারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সব কাফির ও মুশরিকের জন্য এই শাস্তির সংবাদ যে, দুনিয়াতে ) তারা বিপর্যয়ে

পতিত হবে। (সেমতে কিছুদিন পরেই তারা নিহত ও বন্দী হয়েছে। মুনাফিকদের সারা জীবন আক্ষেপ ও পরিতাপের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল)। এবং (পরকালে) আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটা খুবই মন্দ তিকানা। (অতঃপর এই শাস্তির এ বলে আরো দৃঢ় করা হচ্ছে যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান। ইচ্ছা করলে যে কোন একটি বাহিনী দ্বারা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। কারণ তারা এরই উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি) প্রজাময় (তাই উপযোগিতার কারণে শাস্তিদানের ব্যাপারে অবকাশ দেন)।

### আনুগত্যিক জাতব্য বিষয়

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হৃদয়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আনয় করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্য। এগুলো আপনার জন্য মোবারক হোক; কিন্তু আমাদের জন্য কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হৃদয়বিয়ার উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূল (সা)-এর আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলো সব মু'মিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সেই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنَّا ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَاهَدَ لَنَا بِبَيْعَةٍ وَكَفَرَ بِهَا فَهُنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, জাতি অবশ্যই সে তা

নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কুত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( হে মুহাম্মদ ! ) আমি আপনাকে ( কিয়ামতের দিন উম্মতের ক্রিয়াকর্মের ) সাক্ষ্য-দাতা রূপে ( সাধারণত ) এবং ( দুনিয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে ) সুসংবাদদাতা রূপে এবং ( কাফিরদেরকে ) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, ( হে মুসলমানগণ ! আমি তাঁকে এ কারণে রসূল করে প্রেরণ করেছি ) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে ( ধর্মের কাজে ) সাহায্য ও সম্মান কর ( বিশ্বাসগতভাবেও অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বশুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করে এবং কার্য-গতভাবেও অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করে )। এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ( ও মহিমা ) ঘোষণা কর। ( এই পবিত্রতা ঘোষণার তফসীর নামায হলে সকাল-সন্ধ্যায় ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণ যিকর যদিও তা মুস্তাহাব হয়—বোঝানো হয়েছে। অতঃপর কতিপয় বিশেষ হুক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে : ) যারা আপনার কাছে ( হৃদয়বিয়ার দিবসে এ বিষয়ে ) শপথ করছে ( অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছে ) যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করবে না, তারা বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শপথ করছে। ( কেননা, উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ বিষয়ে শপথ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তারা প্রতিপালন করবে। অতএব যেন ) আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর ( শপথ করার পর ) যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে ( অর্থাৎ আনুগত্যের পরিবর্তে বিরুদ্ধাচরণ করবে ), তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তার উপরই বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সত্বরই আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বায়'আতে রিয়-ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ্ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের হুক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সন্তম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে :

نَذِيرٌ وَ مَبَشِّرٌ شَاهِدٌ

فَكَيْفَ! ذَا শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নিসার

جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে

এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। সূরা নিসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন : পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাক্ষ্য তাঁর আমনের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পূর্ণা ও পাপ কাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।—(কুরতুবী)

بَشِيرٍ শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نَذِيرٍ শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য

এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের আনুগত্যশীল মু'মিনদেরকে জাহ্নাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাফির পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসুল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়—

وَسَبِّحْهُ وَحَمْدُهُ  
وَسَبِّحْهُ وَحَمْدُهُ  
وَسَبِّحْهُ وَحَمْدُهُ  
تَسْبِيحًا وَحَمْدًا  
وَتَسْبِيحًا وَحَمْدًا  
وَتَسْبِيحًا وَحَمْدًا

تَعَزُّوهُ—শব্দটি তَعَزُّوهُ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দশুকেও এ কারণে تَعَزُّوهُ বলা হয় যে, অপরাধীকে দশু দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়।  
—(মুফরাদাতুল-কোরআন)

تَسْبِيحًا—শব্দটি تَسْبِيحًا ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সন্মান করা।

শব্দটি تَسْبِيحًا ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিত-রূপে আল্লাহর জন্যই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর দীনকে ও রসুলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসুলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসুলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকার-শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : যারা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বায়'আত করেছে। কারণ, এই বায়'আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সম্মতি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসুলের হাতে হাত রেখে বায়'আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বায়'আত করল। আল্লাহর হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দূরস্ত নয়।

বান্ধ'আতের আসল শর্ত কোন বিশেষ কাজের জন্য শপথ গ্রহণ করা। একজন অপরাধনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বান্ধ'আতের প্রাচীন ও মসনূন তরীকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অস্বীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনত ওম্মাজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বান্ধ'আতের অস্বীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আলাহ্ ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অস্বীকার পূর্ণ করবে, আলাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا  
 فَاسْتَغْفِرْنَا ۖ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ  
 فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ  
 بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ  
 لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۖ وَزَيْنَ ذَلِكَ  
 فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝  
 وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝  
 وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(১১) মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে : আমাদের আামাদের খন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন : আলাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আলাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবতী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আলাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব



কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্রমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্রমান্বীল, পরম মেহেরবান।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব মরুবাসী (হৃদয়বিয়া সফর থেকে) পশ্চাতে রয়ে গেছে, (সফরে শরীক হয়নি) তারা সত্বরই (যখন আপনি মদীনায় পৌঁছবেন) আপনাকে (মিছামিহি) বলবে (আমরা আপনার সাথে যাইনি কারণ) আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য (এই ভ্রুটি) মার্জনার দোয়া করুন। (এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে বলেনঃ) তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। [অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যখন আপনার কাছে এই ওয়র পেশ করে, তখন] আপনি বলে দিন (প্রথমত এই ওয়র সত্য হলেও আল্লাহ ও রসূলের অকাটা নির্দেশের মুকাবিলায় তুচ্ছ ও বাতিল গণ্য হত। কেননা, আমি জিজ্ঞাসা করি,) আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার করার ইচ্ছা করলে কে তাঁর সামনে তোমাদের জন্য (উপকার ক্ষতি ইত্যাদি) কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে? (অর্থাৎ তোমাদের সত্তা অথবা তোমাদের ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে উপকার অথবা ক্ষতি তকদীরে অবধারিত হয়ে গেছে, তাঁর খেলাফ করার ক্ষমতা কারও নেই। তবে শরীয়ত অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আশংকার ওয়র কবুল করে অনুমতি দিয়েছে, যদি সেই ওয়র বাস্তবে সত্য হয়। আলোচ্য প্রশ্নে শরীয়ত বাড়ী-ঘরের ব্যস্ততাকে গ্রহণযোগ্য ওয়র সাব্যস্ত করেনি যদিও তা বাস্তবসম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, তোমাদের পেশকৃত এই ওয়র সত্যও নয়। তোমরা মনে কর যে, আমি এই মিথ্যা সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু সত্য এই যে,) আল্লাহ তা'আলা (যিনি) তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত (তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে, তোমাদের অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা বর্ণনা করছ) বরং (আসল কারণ এই যে,) তোমরা মনে করেছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ কখনও তাঁদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না (মুশরিকদের হাতে সবাই প্রাণ হারাবে) এবং এই ধারণা তোমাদের মনেও খুব সুখকর ছিল (আল্লাহ ও রসূলের প্রতি শত্রুতার কারণে এটা তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল)। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা (এসব কুফরী ধারণার কারণে) এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় ছিলে। (এসব শাস্তির খবর শুনে তোমরা এখনও ঈমানদার হয়ে গেলে ভাল, নতুবা) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (মু'মিন ও অবিশ্বাসীদের জন্য এই আইন রচনার কারণে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্রমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (কাফির যদিও শাস্তির যোগ্য হয়, কিন্তু) আল্লাহ ক্রমান্বীল, পরম দয়ালু (কাজেই সেও খাঁটি মনে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকেও ক্রমা করে দেন)।

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা)

হদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা ভালবাহানার আশ্রয় নেয়। হদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াম্মেত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا مَا ذَرَوْنَا  
 نَتَّبِعُكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا  
 كَذٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيُقُولُونَ بَلْ تَصُدُّونَنَا ۚ بَلْ  
 كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ  
 إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شٰدِدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِن تَطِيعُوا  
 يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ  
 يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ كَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ  
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطْعِرِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ  
 جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে : আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন : তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে : বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুভাসীদেরকে বলে দিন : আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহৃত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭) অজ্ঞের জন্য, স্বজের জন্য ও রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি জাহা্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা সত্বরই যখন (খায়বরের) যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (হদায়বিয়ার সফর থেকে) পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে : আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যাবার অনুমতি দাও। (এই আবেদনের কারণ ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করা। লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাশাও করত। কিন্তু হদায়বিয়ার সফরে কষ্ট ও ধ্বংসই অধিক প্রত্যাশিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : ) তারা আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। (অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ ছিল এই যে, এই যুদ্ধে তারাই যাবে, যারা হদায়বিয়া ও বায়'আতে রিস্তওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না; বিশেষত তারা যাবে না, যারা হদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেনি এবং নানা ভালবাহানার আশ্রয় নিয়েছে।) অতএব, আপনি বলে দিন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আমরা মঞ্জুর করতে পারি না। কারণ, এতে আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করার গোনাহ আছে। কেননা,) আল্লাহ প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ [ হদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পথেই আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বর যুদ্ধে হদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারীদের ব্যতীত কেউ যাবে না। বাহ্যত এই আদেশ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আদেশ অপত্তিত ওহীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সা) লাভ করেছিলেন। এরূপ অপত্তিত ওহী হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। একথাও সন্দেহপর যে, হদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে

অবতীর্ণ সূরা ফাত্বাহের **أَتَا بِهِمْ فَتَعَا قَرِيبًا** আয়াতে খায়বরের বিজয় বোঝানো

হয়েছে। সেমতে এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, খায়বরের বিজয় হদায়বিয়ার অংশগ্রহণ-কারিগণই লাভ করবে। আপনার এই কথা শুনে উত্তরে ] তখন তারা বলবে : [ বাহ্যত এখানে রসুলুল্লাহ (সা)-র মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা অন্যদেরকে বলবে যে, আমাদের সাথে না নেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর আদেশ নয় ] বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করছ। (তাই আমাদের অংশগ্রহণ তোমাদের মনঃপূত নয়। অথচ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহের কোন নামগন্ধও নেই।) বরং তারা অম্মই বুঝে। (পুরাপুরি বুঝলে আল্লাহর এই আদেশের রহস্য অনান্যসেই বুঝতে পারত যে, হদায়বিয়ার মুসলমানরা একটি বৃহত্তর আশংকার সম্মুখীন হয়েছে এবং অগ্নিপন্নীকায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মুনাফিকরা তাদের পাখিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটাই বিশেষভাবে মুসলমানদের খায়বর যুদ্ধে যাওয়ার এবং মুনাফিকদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এ পর্যন্ত খায়বর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর অপর একটি ঘটনা ইরশাদ হচ্ছে : ) আপনি পশ্চাতে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে (আরও) বলে দিন, (এক খায়বর যুদ্ধে না গেলে তাতে কি হল, সওয়াব হাসিল করার আরও অনেক সুযোগ ভবিষ্যতে আসবে। সেমতে) সত্বরই তোমরা এমন লোকদের প্রতি (যুদ্ধ করার জন্য) আহূত হবে, যারা কঠোর যোদ্ধা (এখানে পারস্য ও রোমের সাথে যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে)। [ দুররে মনসুর ] কেননা, তাদের সেনাবাহিনী ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রে সূক্ষ্ম। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও জিযিয়া দানে স্বীকৃত

হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এ কাজের জন্য আহূত হবে) অতএব (তখন) যদি তোমরা আনুগত্য কর (এবং তাদের সাথে জিহাদ কর) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা তখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, যেমন ইতিপূর্বে (হদায়বিয়া) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তবে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (তবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিগণ এর আওতা বহির্ভূত। সেমতে) অক্ষের জন্য কোন গোনাহ্ নেই, খজের জন্য কোন গোনাহ্ নেই এবং রুগ্নের জন্য কোন গোনাহ্ নেই। (উপরে জিহাদকারীদের জন্য জামাত ও নিয়ামতের যে ওয়াদা এবং জিহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যে শাস্তির খবর উচ্চারণিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয় বরং) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল(স)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জামাতে দাখিল করা হবে, যার নিশ্চিন্দেগে নদী প্রবাহিত এবং যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

### আনুশঙ্গিক জামাতা বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (স) মখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন, যাঁরা হদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিয়াওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (স)-কে খায়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওষর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল, হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহার ও হদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জিহাদে শরীক হওয়ার

ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে : **يُرِيدُونَ أَن**

**يُرِيدُونَ أَن** তারা আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়।

এই আদেশের অর্থ খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর **كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ** বাক্যেও হদায়বিয়ার অংশগ্রহণ-

কারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহ্‌র কালাম' ও 'আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন' বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে ?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহ্‌র কালামের হুকুম রাখে : আলিমগণ বলেন : হদায়বিয়ার

অংশগ্রহণকারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা 'ওহী গাম্বর-মতলু' অর্থাৎ অপত্তিত ওহীর মাধ্যমে হদায়বিয়ায় সফরে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহ্‌র কালাম' ও 'আল্লাহ্‌ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীস-সমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্‌র কালাম'-ও আল্লাহ্‌র উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মব্রত লোক রসূলুল্লাহ্ (স)-র হাদীসকে ধর্মীয় প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মব্রততা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে

وَأَنَا بِهِم فَتَحًا قَرِيبًا — তফসীরবিদগণের ঐক-

মত্যে এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআন খায়বর বিজয় ও তার মুক্‌লখ সম্পদ হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই 'আল্লাহ্‌র কালাম' ও 'আল্লাহ্‌র উক্তি'র অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে মুক্‌লখ সম্পদের ওয়াদা তো আছে, কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই মুক্‌লখ সম্পদ হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, 'আল্লাহ্‌র কালাম' ও আল্লাহ্‌র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'আল্লাহ্‌র কালাম' বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে :

فَأَسْأَلُكَ نَوْكَ لِلتَّخْرُوجِ - فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تَقَاتِلُوا  
مَعِيَ عَدُوًّا - إِنْكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعُودِ أَوْ لَمَرَّةً -

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক মুক্‌ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যার সমকাল খায়বর মুক্‌লের পর নবম হিজরী।—( কুরতুবী )

قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا — এতে হদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদেরকে তাকীদ

সহকারে বলা হয়েছে : তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খায়বর মুক্‌লের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। উবিষ্যতে অন্য কোন জিহাদেও শরীক হতে পারবে না—আয়াত থেকে এটা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (স)-র সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন মুক্‌লে অংশগ্রহণ করেছেন।—( রাহুল মা'আনী )

হদায়বিয়ায় সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল : হদায়বিয়ায় সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল,

তাদের সবাইকে খালিবরের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাদ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সম্মষ্টিটির জন্য পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সাস্ত্রনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খালিবর যুদ্ধ হৃদয়বিদায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনেপ্রাণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সা)-এর ইত্তিকালের পর প্রকাশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿سَتَذْعَبُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ অর্থাৎ এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে

জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধা জাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রসূলুল্লাহ (সা)-র জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমত, এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মক্কাবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়ত, এরপর এমন কোন বীরযোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করেছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মক্কাবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বিনামুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হনায়ন যুদ্ধেও মক্কাবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীরযোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মুকাবিলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কিসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে।—(কুরতুবী)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন : আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সা)-র ইত্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি আমাদেরকে বনী হনায়ফা ও মোসায়লামা কায়যাবের জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর মধ্যে দাখিল থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর বলেন : হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আমম (রা)-এর খিলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

حَتَّىٰ يُسَلِّمُوا — هَيَّرَتْهُمَا الْوَيْلُ وَالْخَوْفُ — تَقَاتَلُوا نَهْمٌ أَوْ يُسَلِّمُونَ

বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী **أَوْ** অব্যয়কে **حَتَّىٰ** এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ — هَيَّرَتْهُمَا الْوَيْلُ وَالْخَوْفُ — هَيَّرَتْهُمَا الْوَيْلُ وَالْخَوْفُ

আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাতপদদের জন্য শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খজ ও রুগ্নকে জিহাদের আদেশের আওতা-বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে।—(কুরতুবী)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا  
قَرِيبًا ۝ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝  
وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ  
أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۝ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا  
مُّسْتَقِيمًا ۝ ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

(১৮) আলাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা যুদ্ধের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আলাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাখিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে মুছলম্ব সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আলাহ্ পরাক্রমশালী; প্রজাময়। (২০) আলাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণে মুছলম্ব সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তম্ভ

করে দিয়েছেন—যাতে এটা মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেটন করে আছেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে কামতাবান।

### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই আল্লাহ্ (আপনার সফরসঙ্গী) মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা আপনার কাছে হুকের নীচে (জিহাদে দৃঢ়পদ থাকার) শপথ করছিল। তাদের অন্তরে যা কিছু (আন্তরিকতা ও অস্বীকার পূর্ণ করার সংকল্প) ছিল, আল্লাহ্ তাও অবগত ছিলেন। (তখন) আল্লাহ্ তাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেন। (ফলে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তারা মোটেই ইতস্তত করেনি। এগুলো ছিল ইস্তিন্ন বহির্ভূত নিয়ামত। এর সাথে কিছু ইস্তিন্নগ্রাহ্য নিয়ামতও তাদেরকে দেওয়া হয়। সেমতে) তাদেরকে বিজয় দান করেন (অর্থাৎ খায়বর বিজয়) এবং (এই বিজয়ে) বিপুল পরিমাণ সুছলবধ সম্পদও (দিলেন) যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রভাময়। (স্বীয় কুদরত ও রহস্য বলে যখন যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। এই খায়বর বিজয়ই শেষ নয়, বরং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (আরও) বিপুল পরিমাণ সুছলবধ সম্পদের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা লাভ করবে। অতএব (সেসব সম্পদের মধ্য থেকে) এটা তোমাদেরকে তাৎক্ষণিক দান করেছেন এবং (এই দানের জন্য খায়বরবাসী ও তাদের মিল) লোকদের হাত তোমাদের থেকে স্তবধ করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ সবার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তারা আর বেশী হাত বাড়ানোর সাহস পায়নি। এতে করে তোমাদের পার্থিব উপকারও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা আরাম ও স্বাস্থ্য লাভ কর) এবং (স্বীয় উপকারও ছিল) যাতে এটা (অর্থাৎ এই ঘটনা) মু'মিনদের জন্য (অন্যান্য ওয়াদা সত্য হওয়ার) এক নিদর্শন হয় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আরও মজবুত হয়) এবং যাতে (এই নিদর্শনের মাধ্যমে) তোমাদেরকে (হুজরাতের জন্য) সরল পথে পরিচালিত করেন (যানে তাওম্বালু তথা আল্লাহ্‌র উপর তকসীর পথে। উদ্দেশ্য এই যে, তিরদিনের জন্য এই ঘটনা দ্বারা করে যাকে আল্লাহ্‌র প্রতি জাহা রাখ। এতদূর পর্যায় উপকার দৃষ্টি হয়ে যায়। এক ভবিষ্যৎ ও বিবাসগত উপকার, যা **لَتَكُونَنَّ** বলে বাণিত হয়েছে এবং দুই কর্মসূত ও চরিত্রসূত উপকার, যা **لَتَكُونَنَّ** বলে বাণিত করা হয়েছে)। এবং আরও একটি বিজয় (প্রতিশ্রুত) রয়েছে, যা (এ পর্যন্ত) তোমাদের অধিকারে আসেনি (অর্থাৎ মক্কা বিজয়। যা তখন পর্যন্ত বাস্তব রূপ লাভ করেনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা বেটন করে আছেন (যখন ইচ্ছা করবেন, তোমাদেরকে দান করবেন) এবং (এরই কি বিশেষত্ব) আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।



সান্নাতুল-ইব্রাহীম

وَقَدْ رَفَىٰ مِنَ اللَّهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

হসরতবিহার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও

এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তাই তাৎপর্য। এই আয়াতের অর্থ এই যে এই শপথের অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সীমিত সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ আয়াতই একে 'যাযুজ' বলা হয়। এটি সন্তুষ্টির শব্দও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথের অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং হাটসরতের অসীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর প্রদান করা। মুখাবী ও মুসলিমের হসরত জমি'র (রা) বর্ণনা করেন, হসরতবিহার হিসে আয়াতের সংখ্যা ছিল ত্রিশ। রসূলুল্লাহ (সা) আয়াতেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : **فَلَمْ خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ**

তোমরা দুপূর্বের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; সহীহ মুসলিমের উল্লেখ বাণীর থেকে বর্ণিত আছে : **لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّنِي يَأْمُرُ بِتَحْتِ الشَّجَرَةِ**। এই বাক্যের সীমিত শপথ করছে, তাহলে কেউ আয়াতের অংশ গ্রহণ করে না।— (বানুয়াসী) তাই এই শপথের অংশগ্রহণকারীদের অসম্মান বন্ধ করে অংশগ্রহণকারীদের সম্মান হতে পারে। তাঁদের সন্তুষ্টি ঘোষণা করার জন্য ও হাদীসে আয়াতের সন্তুষ্টি ও আয়াতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, যেহেতু হসরতবিহার শপথের অংশগ্রহণকারীদের জন্যও এরূপ সুসংবাদ উল্লিখিত আছে।

এখন সুসংবাদ সাক্ষ্য করে যে, তাঁদের সম্মান প্রদান করা জীবনব্যয়মূল্যে প্রশংসা ও সম্মানের উপরে হবে। যেহেতু, আয়াতের সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েই সন্দেহভুক্ত নয়।

সান্নাতুল-ইব্রাহীমের প্রতি সোপানোপ এবং তাঁদের দুই-প্রতি মিলে জামাতা ও শিখর করা এই আয়াতের পরিণতি; তাহলেই-মাখায়াতে বলা হয়েছে; আয়াতের আয়াতে আয়াত তা'আলা মেরব সম্মানিত ব্যক্তি সপক্ষে কথা ও মাপফি'রাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুলের কথা বোঝা হতো বা তাহলে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এমতাবস্থার তাঁদের যে সখ্য করতলও প্রশংসাই ও উত্তম নয়, সে-কাজের কাফেরানা ও নির্যাতনের প্রত্যাহারের পরিণতি করা হওয়াগতনক এবং এই আয়াতের পরিণতি। ক্রমশী সশ্রদ্ধার হসরত আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নির্যাতনের দোষ আয়োপ করে। আয়াতের আয়াত তাদের উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

বিশ্বস্তানি বুক। আয়াতে যে ক্রমের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবুল বুক। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে পমন করত এবং এই বুকটির সীমিত নামায আদায় করত। হসরত ক্রমশীকে আযম (রা) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অস্ত্র কোরেন্দা পূর্ববর্তী উল্লেখের ন্যায় এই বুকটির পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশংকার

তিনি কৃষ্ণাঙ্গী কাটিয়ে দেন। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গী ও মুসলিমের কেওসম্মেলিত হওয়ার ভারের ইবনে  
 অকবুর রহমনি বলেন : আমি একবার হুজ্জত মাওসার পথে এক আমরায় কিছু সংখ্যক  
 লোককে একত্রিত করে নামায পড়তে দেখেছিলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : এটা  
 কোন মুসলিম? তারা বলল : এটা সেই কৃষ্ণ, যার নীচে রসুলুল্লাহ (সা) জিমওয়ানের  
 শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সন্ন্যাসী ইবনে মুসাইয়িবের কাছে উপস্থিত হয়ে  
 এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন : আমার পিতা বাহু'আতে জিমওয়ানে অংশগ্রহণ-  
 কারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : আমার মতন পরবর্তী কালের মুসলিম  
 উপস্থিত হবে, তখন অনেক কোঁড়াখুঁড়ির পরেও কৃষ্ণাঙ্গী সন্ধান পাইনি। অতঃপর সন্ন্যাসী  
 ইবনে মুসাইয়িব বললেন : রসুলুল্লাহ (সা)-র যেসব সাহাবী এই বাহু'আতে শরীক ছিলেন,  
 তাঁরা হুজ্জত এই কৃষ্ণায় সন্ধান পাবেনি, আর তুমি তা খেলে দেখবে। অশুভের, কিম্বদন্তি।  
 তুমি কি তাঁদের হাইতে অধিক জান?—(রহমনি মা'আনী)

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা মিছন অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি  
 কৃষ্ণ মিস্রিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জতোঃ হয়ে নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত  
 ফাল্লকে আবয় (রা) একথাও জানতেন যে, এটা সেই কৃষ্ণ নয়। তাই অবাকের নয় যে,  
 তিনি শিরকের আশংকা বোধ করে সেই কৃষ্ণাঙ্গীও কর্তন করিয়ে দেন।

খানকর বিজয় : খানকর প্রকৃতপক্ষে কব জুরগম, মূর্খ ও বগ-বালিষ্ট সমন্বিত একটি  
 বিদগ্ধ ওয়াফায় রাক।—(মাসহাবী)

وَأَن تَمَّ لَلْعَاقِبِينَ ۝— অর্থ বিজয়ের সূর্য সন্ধ্যাভ্যন্তরীণ হুজ্জত

বিজয়। হদাযবিয়া থেকে প্রত্যাহারের পর এই বিজয় বাস্তব রূপ লাভ করে। এক হুজ্জত-  
 কালের অনুযায়ী হদাযবিয়া থেকে বিদগ্ধ ওয়াফায় পর, রসুলুল্লাহ (সা) সন্ন্যাসী দেখ গিন এবং  
 অথবা এক হুজ্জতের অনুযায়ী কৃষ্ণ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর খানকরের উদ্দেশ্যে হুজ্জত  
 হয়ে যান। ইবনে হুজ্জতের কেওসম্মেলিত অনুযায়ী তিনি বিদগ্ধ ওয়াফায় হদাযবিয়া  
 করেন এবং সম্পূর্ণ হুজ্জতের সূর্য সন্ধ্যাভ্যন্তরীণ হুজ্জত পড়তে পারেন। হুজ্জত পড়তে  
 বিজিত হয়। ওয়াফায়ের সাহাবী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হুজ্জতের ইবনে হুজ্জতের  
 এ হুজ্জতের অধিকতর প্ররপযোগ্য।—(মাসহাবী)

মোটকথা প্রমাণিত হল যে, খানকর বিজয়ের ঘটনা হদাযবিয়ার সন্ধানের বেশ কিছু  
 দিন পরে সংঘটিত হয়। সূর্য সন্ধ্যা যে হদাযবিয়ার সন্ধানকালে জরুরী হয়েছিল এ বিষয়ে  
 কোনও বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূর্য জখনই নামিল হয়েছিল,  
 না কিছু সংখ্যক আয়াত পরে নামিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সন্ধান হলে আলোচ্য আয়াত-  
 সমূহে খানকরের আলোচনা জরুরী হুজ্জতের হিসাবে হয়েছে এবং ঘটনাটি মে আকটা ও মিস্রিষ্ট  
 —একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই অস্বীকৃত পদরাজ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খেয়াল  
 অবস্থা সন্ধান হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পর জরুরী হুজ্জতের সন্ধান করা যায়।

—وَمَعَا نِمَ كَثِيرَةً يَا خُذُ وَنَهَا—এতে খায়বর মুছলম্ব সম্পদ বোঝানো হয়েছে,

যশ্ভারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাস্থ্য অর্জিত হয়।

—وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَعَا نِمَ كَثِيرَةً تَأْ خُذُ وَنَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ—এখানে

কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও মুছলম্ব সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহর নির্দেশে হদায়বিস্বায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্য ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি, বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবাকে কিয়ামের কাছে ব্যক্ত করেন।

—وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ—আয়াতে খায়বরবাসী কাফির সম্প্রদায়কে

বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেন নি। ইমাম বগভী বলেন : গাতফান গোত্র খায়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক খায়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লণকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের কাছাকাছি চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। —(মায়হারী)

—وَيُؤْتِيَكُمْ مِنْهَا مَتْرَفًا مُتَقَرِّبًا—সরভূমির আশ্রয় এবং হিদায়তের

উপায়। এখানে-এই অর্থ-বোঝানো হয়েছে, যা প্রমাণিত ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী সন্তোষ।

—وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা

মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাসীম নন। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কান তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

وَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ  
 لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
 عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّهُ ۗ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ  
 وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فُقُصِبِيبِكُمْ مِنْهُمْ  
 مَعْرَةٌ ۖ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا  
 لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  
 سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى  
 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

(২২) যদি কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পের না। (২৩) এটাই আল্লাহর নীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারণিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কার কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের গিল্টি হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজান্তেসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেওয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে মুখতাযুনের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ

তার রসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাখিল করলেন এবং তাদের জন্য সংকল্পের স্বাক্ষর অপরিহার্য করে দিলেন। যত্নত তারাই ছিল এর অধিকতর খোলা ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রাপ্ত।

**তফসীরের সাঙ্গ-সংক্ষেপ**

(যেহেতু কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সমস্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, যা পরে খণ্ডিত হবে, সেহেতু) যদি এই সন্ধি না হইত, বরং) কাফিররা তোমাদের যুঝাবিলা করত, তবে (সেইসব কারণবশত) অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, অন্তঃপন্ন তারা কোম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেল না। আল্লাহ্ (কাফিরদের জন্য) এই স্বীকৃতিই করে রেখেছেন, যা পূর্বে থেকে তামি অর্থাৎ (যে, মুকলবিলায় সত্যপন্থীরা জম্মী ও মিথ্যাপন্থীরা পরাজিত হইল। কখনও কোন পন্থী ও উপযোগিতার কারণে ততো বিলম্ব হওয়া এর পরিপন্থী নয়)। আদনি আল্লাহ্ রীতিতে (কোন কাসির তরফ থেকে) কোম পরিবর্তন পাবেন না (যে, আল্লাহ্ কোম কাজ করিতে চাইবেন এবং কেউ তা হতে দেবে না)। তিনিই তাদের হাতকে তোমাদের থেকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করা থেকে) এবং তোমাদের হাতকে তাদের (হত্যা) থেকে মক্ষায় (অর্থাৎ মক্ষার অদূরে হদায়বিলায়) মিথ্যাকরে তোমাদেরকে তাদের উপর জম্মী করার পর। [এখানে সূরার শুরুতে উল্লিখিত হদায়বিলায় কাহিনীর অষ্টম অংশে বর্ণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাহায্যে কিরাম ফেরাইনদের সকাশ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষতার করেছিলেন। এছাড়া আরও কিছু লোক প্রেক্ষতার হয়ে মুসলমানদের অধিকার চলে এসেছিল। তখন মুসলমানরা যদি তাদেরকে হত্যা করত, তবে অপরদিকে মক্ষায় আটক হওয়ার ওসমান গনি (রা) ও কিছুসংখ্যক মুসলমানকেও কাফিররা হত্যা করে দিত। এর অবশ্যস্বার্থী পরিণতি ছিল উভয় পক্ষে তুখুল মুক শুক হয়ে যাওয়া। যদিও উল্লিখিত প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একথাও বলে দিয়েছেন যে, মুক হলেও বিজয় মুসলমানের হত, তথাপি আল্লাহ্ জানে তখন মুক না হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের সুইত্তম স্বার্থ মিহিত ছিল। তাই এদিকে কাফির বন্দীদেরকে হত্যা না করার বিষয়টি মুসলমানদের অন্তরে জাগ্রিত করে দিলেন। এখানে মুসলমানদের হাত তাদের হত্যা থেকে মিথ্যাকরে করলেন। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরাইনদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা সন্ধির প্রতি অক্ষুণ্ট হয়ে সোহাবেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পাঠিয়ে দিল। উভাবে প্রত্যক্ষ আল্লাহ্ তা'আলা মুক না হওয়ার বিষয়ী ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন।] তোমরা যা করছিলে, আল্লাহ্ (তখন) তা দেখছিলেন (এবং তিনি তোমাদের কাজের পরিণতি জানিতেন। তাই মুক শুরু হয়ে যাওয়ার মত কোন কাজ হতে পেল না। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মুক হলে কাফিররা কিভাবে এবং কেন পরাজিত হত) তারাই তো ফুফুরী করেছে এবং হত্যা তাদেরকে (ওসরা করার জন্য) অসজিদে-হারামে উপস্থিতি থেকে বাধা দিয়েছে। (এখানে অসজিদে-হারাম এবং সাফা-আরুওয়ার অধ্যবর্তী সন্ধির দৃশ্য এ উভয়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তওরাক যেহেতু আশল ও সর্বপ্রথম এবং তা অসজিদে-হারামে সম্পন্ন হইল, তাই শুধু অসজিদে-হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (হদায়বিলায়) অবস্থানকৃত কুরবানীর ওস্তুলোকে হযা'আনে পৌহতে বাধা দিয়েছে। অন্য কুরবানীর

হুসন হুসনই কিনা। তারা উত্তরজাতিকে কিনা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয়নি। তাদের এহেম অপসর্গ্য একই পথের হেরেবে বলে এহেম উলুস কলার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলে তাদেরকে পশু দস্ত করে দেওয়া হোক। কিন্তু কোন কোন রহস্য এই দাবী পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। তখনো একটি রহস্য ছিল এই যে, তখন মস্কায় অনেক মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী ও নির্ধাতিত ছিল। হদায়বিল্লর কাহিনীর দশম অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আবু জনজের কফিরদের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন যুদ্ধ শুরু হলে লোকে অজান্তসারে এক মুসলমানও রুতিভ্রস্ত হত এবং হুসন মুসলমানদের হাতেই তাদের নিহত হওয়ার আশংকা ছিল। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ তন্তে-দুঃখিত ও অমুতশ্ত হত। এই আশঙ্কা তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেম। পরবর্তী আশঙ্কায় এই বিধরকতই বর্ণিত হয়েছে। যদি (মস্কায় তখন) অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারী না থাকত, বাসদেরক ভেদর জানতেন না। অর্থাৎ তাদের দিগন্ত হুসন যা'ওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরও দুঃখিত, অমুতশ্ত ও রুতিভ্রস্ত না হতে, তবে সব কিসসা চুবিরে দেওয়া হত, কিন্তু এ কারণে দুঃমনো হয়নি, যাতে আশঙ্কা তা'আলা হুসন ইচ্ছা কীর রহস্যতে দাখিল করে নেম। (সেমতে-যুদ্ধ না হওয়ার ফলে সেই মুসলমানগণ যেহে লোকে এবং ভেদর তাদেরক হত্যা করার পরিস্থাপ থেকে মুক্ত রহলে গেই। তবে) যদি তারা (অর্থাৎ আটক মুসলমানরা মস্কা থেকে কোথাও) সরে যেত, তবে (মস্কাবাসীদের মধ্যে) হারু কাফির, আমি তাদেরকে (মুসলমানদের হাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (এই কাফিরদের পশু দস্ত ও নিহত হওয়ার আশঙ্কা এবং কবরশ ছিল) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করত—মুর্খতা হুসর জেদ। (এই জেদ বলে বিসমিল্লাহ ও রসুল শব্দ লেখার বেলায় তাদের কাফরানকে বোকারো হয়েছে। উপরে হদায়বিল্লর সাঙ্গিপত্রের বর্ণনার একথা উল্লিখিত হয়েছে) অন্তরক (এক ফলে মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষে নিশত হয়ে পড়াই সম্ভব ছিল, কিন্তু) আশঙ্কা তা'আলা তাঁর রসুল ও মু'মিনদের নিজেদের পক্ষ থেকে সহনশীলতা দান করলেন। (ফলে তাঁর উপরোক্ত বাক্য সিপিবিদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করলেন না এবং সন্ধি হয়ে গেল) এবং (তখন) আশঙ্কা তা'আলা মুসলমানদেরকে তাকওয়ার বাকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তাকওয়ার বাক্য বলে কায়েমানে-তাই-কোয়া অর্থাৎ শুওহীদ ও রিসালতের স্বীকারোক্তি ঘোষনো হয়েছে। তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ এই যে, শুওহীদ ও রিসালত বিলাস করার ফল হুসন আশঙ্কা ও রসুলের আশ্রয় গন্ত। মানসিক উত্তেজনার বিপরীতে মুসলমানেরা যে সংঘর্ষে ও বৈধের পরিচয় দিয়েছিল, তাঁর একমাত্র কারণ ছিল রসুল্লাহ (সাঁ)-র আদেশ। এহেম কলিত উত্তেজনা করু মুহুতে রসুল (সাঁ)-এর আনুসত্যকেই তাকওয়ার বাকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি বলা হয়েছে। বস্তান্তে সূর্য্যই (মুসলমানরাই) এক (অর্থাৎ তাকওয়ার বাকের দুসিয়তেও) অধিক হোয়া। (কারণ, তাদের অন্তরে সত্যের অস্বৈধী রয়েছে। এই অস্বৈধী প্রধান পর্যন্ত পৌঁছার) এবং (পরবর্তেও) এর (সত্ত্বাবের) উপযুক্ত। আশঙ্কা সববিধয়ে সম্যক জাত।

আনুমানিক জাতক্য বিধর

بَطْنِ مَكَّةَ—এর আসল অর্থ মস্কা নহরই, কিন্তু এখানে হদায়বিল্লর হুসন

বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিহিত হওয়ার কারণে হদায়বিন্যাসকেই 'বাতনে মক্কা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাক্কা মায়হাবের আলিমগণ হদায়বিন্যাস কিছু অংশকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। **أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّةً**

এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুরবানী করে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কুরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কুরবানীর ন্যায় এর জন্যও হেরেমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাক্কাইদের মতে এর জন্যই হেরেমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানীর জন্য কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে এই যে, খোদ হানাক্কাই আলিমগণ একথাও বলেন যে, হদায়বিন্যাস কতক অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হেরেমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কুরবানী হেরেমের যে কোন অংশে করে দেওয়া যথেষ্ট; কিন্তু মিনার অভ্যন্তরে 'মানহার' (কোরবানগাহ) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানী করা উত্তম। কাফিররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

**مَعْرَةٌ—فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغِيرَ عِلْمٍ** শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ বর্ণনা

করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যত সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অভ্যাসসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফিররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এ ছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হত।

সাহাবায়ে কিরামকে দোষযুক্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা: ইমাম কুরতুবী বলেন: অভ্যাসসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই। ভুলবশত হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার।

**لِيُذْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ**—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই

কল্পে মুসলমানদের অন্তরে সংঘম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ

জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

تَزِيلُ—لَوْ تَزِيلُوا শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায়

আটক মুসলমানগণ যদি কাফিরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফিরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَمَزُوا فِي عُرْوَاتِ الْأَمَاةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَمَزُوا فِي عُرْوَاتِ الْأَمَاةِ—'কলেমায়-তাকওয়া'

বলে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের-কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায় কুরআনকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ তো তাঁদেরকে কলেমায় ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۗ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  
 إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُخْلِقِينَ رُءُوسِكُمْ ۖ وَمُقَصِّرِينَ ۗ لَا تَخَافُونَ ۗ  
 فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝  
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ  
 كُلِّهِ ۗ وَكَفَرِ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ  
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا أَيَّبَتُّغُونَ ۖ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ  
 وَرِضْوَانًا ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي وُجُوهِهِمْ ۖ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۗ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي  
 التَّوْرَةِ ۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ تَكْوِيمًا ۖ خَرَجَ سَطْرُهُ فَازَرَهُ



فَأَسْخَطُوا قُلُوبَنَا بِسُوءِ الْفِعْلِ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الْأَعْيَانِ  
وَعَدَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

(২৭) আরাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আরাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং বেশ কতিপ অবস্থায়। তোমরা কাউকে তন্ন করবে না। অন্তঃপন্ন তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাকারনে আরাহ্ যাচ্ছে। (২৯) মুহাম্মদ আরাহ্‌র রসূল এবং তাঁর সহচরসম কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আরাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রক্ষা ও সিঁজদারত দেখাবেন। তাদের দুঃখভঞ্জন করেছেন সিঁজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা একগই এবং ইজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাহ বা থেকে নির্গত হয় ফিশলর, অন্তঃপন্ন তা মস্ত ও মজবুত হয় এবং কাওর-উপর দীওয়ার পূত্রভাবে—চাষীকে জানন্দে অভিভূত করে—যাতে আরাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অভক্ষীলা স্থিতি করেন। তাদের মধ্যে দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, আরাহ্ তাদেরকে রক্ষা ও মহাপুরকারের ওয়াদা দিয়েছেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আরাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবের অনুসরণ। ইশ্রাআরাহ্ তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কর্তন করবে। (সেযন্তে পরবর্তী বছর তাই হয়েছে। এ বছর এরূপ না হওয়ার কারণ এই যে) আরাহ্ সৈসব বিষয়-(ও রহস্য) জানেন, যা তোমরা জান না। (তন্মধ্যে একটি রহস্য এই যে) এর (অর্থাৎ এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার) আগে তোমাদেরকে (খালিবরের) একটি আসন্ন বিজয় দিয়েছেন (যাতে তুম্বান্না মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরজাম অর্জিত হয়ে যায় এবং তাঁরা নিশ্চিন্তে ওয়রা পালন করতে পারে। বাস্তব তাই হয়েছে) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত (অর্থাৎ মেরাজাম) ও সত্য দীম (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (অর্থাৎ ইসলামকে) অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। (এই জয় প্রমাণ ও দলীলের দিক দিয়ে তো চিরকাল জয়র থাকবে এবং শান-শওকত ও রাজত্বের দিক দিয়েও একটি শর্ত সহকারে প্রাধান্য থাকবে। শর্তটি এই যে, এই ধর্মাবলম্বীরা অর্থাৎ মুসলমানরা যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এই শর্তের অনুপস্থিতিতে বাহ্যিক জয়ের ওয়াদা মেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই শর্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সাথে সম্পর্কিত পরবর্তী আয়াতে এই যোগ্যতার উল্লেখ আছে। তাই এই আয়াত একদিকে যেমন রসূলআরাহ্ (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপনদিকে সাহাবায়ে কিরামের

অন্য বিজয় লাভেরও সুসংবাদ আছে। বাস্তবে তাই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (স)-র ওফসতের পর পঠিত বছর অতিক্রান্ত না হতেই ইসলাম ও কোরআন বিজয়ীবেশে বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর্ততা যুগের জেদ পোষণকারীরা যদি আপনায় নামের সাথে 'রসুল' শব্দ সংযুক্ত করে লিখতে অসম্মত হয়, তবে আগনি দুঃখ করবেন না। কেননা, আপনায় রিসালতের) সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট। ( জিনি আপনায় রিসালতকে সুস্পষ্ট হুক্তি ও প্রকাশ্য মো'জেহার মাধ্যমে সপ্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে ) মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। [ এখানে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'—এই পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্ততা যুগের জেদ পোষণকারীরা আপনায় নামের সাথে 'রসুলুল্লাহ' লিখতে পছন্দ না করলে তাতে কি আসে যায়, আল্লাহ এই বাক্য আপনায় নামের সাথে লিখে দিয়েছেন, যা কিরামত পর্যন্ত পঠিত হবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স)-র অনুসারী সাহাবায়ের কিরামতের শুভাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখ করা হচ্ছে : ] যারা সংসর্গপ্রাপ্ত, (এতে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন সংসর্গপ্রাপ্ত সকল সাহাবীই দাখিল আছেন। যারা হাদায়বিহার তাঁর সহচর ছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য। মতলব এই যে, সকল সাহাবায়ের কিরামতই এসব ভূপে ভূপাশিত )। তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকৌশল (এবং) নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। ( হে পাঠক ) তুমি তাদেরকে দেখবে যে, কখনও কষ্ট করছে, কখনও সিজদা করছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কাশনা করছে। তাদের দুঃখমুখে সিজদার চিহ্ন প্রস্কৃষ্টিত। ( এই চিহ্ন যারা খুস্ত-খুস্তু উম্মা খিনর ও মল্লতায় উজ্জল অন্তা বোঝানো হয়েছে, যা খু'খিন ও পরফিহসার লোকদের চেহারায়ে প্রস্কৃষ্টিত হতে দেখা যায়। ) এগুলো ( অর্থাৎ তাদের এই শুভাবলী ) তওরাতে আছে এবং ইজিলে তাদের এই ভূপ ( উল্লিখিত ) রয়েছে, যেখন এককটি চারাগাহ, যা থেকে নির্গত হস্ত খিনলর, অতঃপর ( হুক্তিকা, পানি, বায়ু ইত্যাদি থেকে খাদ্য লাভ করে ) তা শক্ত ও মজবুত হয়, অতঃপর আরও মোটা হয় এবং কাণের উপর দাঁড়ায়, ( সবুজ ও সতেজ হওয়ার কারণে ) চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে (এখনভাবে সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। এরপর প্রত্যহ শক্তি হুক্তি পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ের কিরামতের এই প্রমাণটি এজন্য দান করেছেন ) যাতে ( তাদের এ অবস্থা যারা ) কাফিরদের অন্তর্দ্বীপা হুক্তি করেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সংকর্ষ করেছে, আল্লাহ ( পরকালে ) তাদেরকে ( সোনাদেহর ) কমা এবং ( ইবাদতের কারণে ) মহা পুরকারের ওলাদা দিয়েছেন।

**আল্লামারিক ভাষ্যক বিহার**

হাদায়বিহার সক্তি চুড়া হতে সজে একখা হির হরে খায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং শুধরা সাজন কাতিয়েকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। যলা-বাহলা, সাহাবায়ের কিরামত শুধরা সাজনের সংকল্প রসুলুল্লাহ (স)-র এককটি হরের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যত এর বিপরীত হতে দেখে মনরও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাখাচাড়া দিয়ে উঠতে পারল যে, ( নাউযবিলাহ ) রসুলুল্লাহ (স)-র স্বর সত্য হজ না। অপরদিকে কাফির-যুমাফিররা সুসজধানদেরকে বিপ্রুপ করল যে, তোমাদের রসুলের স্বর সত্য

নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য **لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ** —আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।  
—( বায়হাকী )

কذب শব্দটি **صَدَقَ** —এর বিপরীতে **لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّؤْيَا بِالْحَقِّ**

কথাবার্তার ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে **صَدَقَ** এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে **كَذَبَ** বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।

তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা, যেমন কোরআনে আছে : **وَجَالَ**

**صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ** অর্থাৎ তারা তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় **صَدَقَ** শব্দের দু'টি **مَفْعُول** থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম **مَفْعُول** হচ্ছে **رَسُولَهُ** এবং দ্বিতীয় **مَفْعُول** হচ্ছে **رُؤْيَا** —আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাক্ষা দেখিয়েছেন।—( বায়হাকী ) যদিও এই সাক্ষা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত শব্দবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাটা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে :

**لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ** —অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত

আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশত সাহাবায়ে কিরাম এ বছরই সফরের সংকল্প বন্ধ ফেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হৃদয়বিষ্ময় সঞ্জির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রথমেই হযরত ওমর (রা)-এর জওয়াবে বলেছিলেন : আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নে কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে।—( কুরতুবী )

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য 'ইনশাআল্লাহ্' বলার তাকীদ : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে—যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল—'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু স্বীয় রসূল ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলাও 'ইনশা-আল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন।—( কুরতুবী )

**مَحَلَّتَيْنِ رُؤْيَاكُمْ وَمَقْتَصِرَيْنِ** —সহীহ বুখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা

ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন।

এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন।  
—(কুরতুবী)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا — অর্থাৎ এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে

প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আলাহ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আলাহ জানতেন—তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আলাহর ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাধীন্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক।

এ কারণেই বলা হয়েছে : فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا — অর্থাৎ স্বপ্ন

বাস্তব রূপ লাভ করার আগে খায়বরের আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ন বিজয় বলে খোদা হদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাতে মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে রহতম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না, কিন্তু আলাহ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল।—(কুরতুবী)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

বিজয়, মুসলিম সম্পদের ওরফে এবং বিশেষভাবে হদায়বিয়ার সংশ্লিষ্ট হওয়ার সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর পক্ষে বলা ও সূর্যোদয় উল্লিখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসর্গে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নিম্নমত ও সুসংবাদ রসুলুল্লাহ (সা)-র আনুগত্য ও সত্যমানের স্বর্ণিণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যমান ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য, রিলায়েত অস্বীকারকারীদের মুক্তি খতন করার জন্য এবং হদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল সেগুলো দূরীকরণের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং আসতের সন্ধর্ভের উপর রসুলুল্লাহ (সা)-র দাঁতকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ — সমগ্র কোরআনে শেষ নবী (সা)-র নাম উল্লেখ করার

পরিবর্তে সাধারণত গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাগন পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা

হয়েছে। যেমন يَا عِيسَى - يَا مُوسَى - يَا إِبْرَاهِيمَ সময় কোরআনে মার

চাল জামগার তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হাদিসবিদ্যার সন্ধিপক্ষে হযরত আলী (রা) যখন তাঁর মাম 'মুহাম্মাদুল-রাসুলুজাহ্' লিখিবল কয়েন, তখন কাফিররা এটা মিটিয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল-জাহ্' লিখিবল করতে পীড়াপীড়ি করে। রসুলুজাহ্ (স) জাহাহর আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে জাহাহ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে 'রাসুলুজাহ্' শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِينَ مَعَهُ - এখান থেকে সাহাবায়ে কিরামের ওপাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

যদিও এতে সর্বপ্রথম হাদিসবিদ্যা ও বায়'আতে রিসওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেয়কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু ডামার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে সাধিল আছেন। কেমনা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের ওপাবলী, ফেরত ও বিশেষ লক্ষণাদি : এ স্থলে জাহাহ তা'আলা রসুলুজাহ্ (স)-র রিসালত ও তাঁর মীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা স্বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের ওপাবলী, ফেরত ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হাদিসবিদ্যার সন্ধির সময় পৃথীত তাঁদের কঠোর পরীকার পুরস্কার আছে। কেমনা, হাদিসবিদ্যা, বিদ্বান ও প্রোগ্রাম বিদগকে সন্ধি সম্পর্কিত হওয়ার ফলে এখান পালমে বাখড়া সঙ্গেও তাঁদের এতটুকু পদস্বলন হতনি বলে তাঁরা নিজস্ববিধীয় আধুনিকতা ও ইমানী বক্তব্যে পরিচয় দেয়। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ওপাবলী-ও লক্ষণাদি বিস্তারিত স্বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য বিহিত মরত্ব ও বিস্তারিত বরত-রসুলুজাহ্ (স)-র পদ-সন্ধির মরত্ব জ্ঞান-লবী-মদুল-প্রোগ্রাম-হাদিস-বা। বিস্তারিত উল্লেখের জায়, কোরআনের সাথে সাহাবী-সেহাবে-রসুলু-হিসাবে হাদিসে জাবেব এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেয়েন। তাই কোরআনেও তাঁদের ওপাবলী-ও লক্ষণাদি-স্বর্ণনা করে মুহাম্মাদকে তাঁদের রসুলুজাহ্ উল্লেখ করেছেন। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম হে-প্রণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই জে-তাঁরা কাফিরদের মুকাখিলার মর-কর্তব্য এবং মিজেসের মধ্যে পরস্পরে সম্মানবোধিত। কাফিরদের মুকাখিলার তাঁদের মরত্বতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হাদিসবিদ্যার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কিরামের পাশ্চাত্তিক সহামুত্তি ও জাহাহতামের উল্লেখ দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে শ্রান্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সন্ধিক্রমে মুহাজিরদেরকে অংশীদার মরত্ব আহ্বান জানায়। কোরআনে

সাহাবায়ে কিরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সান্ন্যমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভাষাবাসা অথবা হিংসাপরাজনিত কোনো কিছুই নিজের জন্য নয়; বরং সব আলাহ্ তাঁ'আলা ও তাঁর রসূলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ইমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ মুখারী ও জামায়া হাদীস দ্বয়ে আছে : **مِنِ احِبِّ لِلّٰهِ وَابْنِهَا**

**فَلَمَّا اسْتَكْمَلُوا اِيْمَانَهُمْ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভাষাবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আলাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ইমানকে পূর্ণতা লাভ করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের মুকাবিলায় কঠোর ছিলেন—এ কথাই অর্থ এলাপ নয় যে, তাঁরা কোন সময় কোন কাফিরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আলাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাফিগ্যের ব্যাপারে তো অন্তঃ কোরআনের কুরসাল্লা এই যে :

**لَا يُلَاقِيهَا كُمْ اَللّٰهُ — — اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ** অর্থাৎ যেসব কাফির

মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যত মুক্তরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আলাহ্ তাঁ'আলা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফিরদের সাথে দয়া-দাফিগ্য-মূলক স্বাধিকার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ম্যাক ও সুবিচারের দামদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ম্যাক ও ইনসাকের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বিধ নয়।

সাহাবায়ে কিরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণত রুকু-সিজদা ও নব্বইত্ব অঙ্গুষ্ঠান থাকেন। তাঁদেরকে অধিকরণে সময় এ কাজেই জিহাদ থাকার মাক। প্রথম গুণটি পূর্ণ ইমানের জামাত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আনলের পরিচায়ক।

**سَيَمُوكُم مِّنْ وَّرَائِكُمْ فَوَلِّوْهُمْ اَنْفُسِكُمْ وَاغْلِبُوْهُمْ** অর্থাৎ তোমাদের পিছন থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে আসবে। তোমাদের পিছন ফিরাও এবং তাদেরকে পরাজিত কর।

অর্থাৎ নামায তাঁদের জীবনের এমন দ্রুত হয়ে গেছে যে, নামায ও সিজদার বিষয়ে ঠিক তাঁদের দুইমুহুরে উল্লিখিত হয়। এখানে 'সিজদার চিহ্ন' বলে সেই মুহুরে আত্ম সিজদার স্বাক্ষর; যা দলের এবং শিবির ও মন্ত্রণার প্রত্যয়ে প্রত্যেক ইয়াহুদকারীর মুখমণ্ডলে প্রয়োগ করা হয়। কপালে সিজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত জাহাজুদ নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী কুটে উঠে। ইবনে মাজার এক গিওরায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

**مِنِ كَثُرِ صَلَوَاتِهِ لَالِئِلْ حَسَنٍ وَجِهَةٌ بِالنَّهَارِ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। স্বয়ংক্রিয় হাজার বসরী (র) বলেন : এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিরামতের দিল প্রকাশ পাবে।

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطَاةً

উপরে সাহাবায়ে কিরামের সিজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইজিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন—পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) ও বালাকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে হজ্জের অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে : এক. **فِي التَّوْرَةِ** এ পাঠবিরতি

করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতে বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর **مَثَلُهُمْ**

**فِي الْاِنْجِيلِ** এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কিরামের

দৃষ্টান্ত সেই চারসাতছয় বকর, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্ত কাণ্ড-বিশিষ্ট ফল হয়ে যায়।

দুই. **فِي التَّوْرَةِ** এ পাঠবিরতি না করা, বরং **فِي الْاِنْجِيلِ** এ পাঠবিরতি

করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইজিলেও রয়েছে।

অতঃপর **كَزَرْعٍ** কে একটি কৃষকের দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করা। **فِي التَّوْرَةِ** এ বর্ণনা

না করা এবং **فِي الْاِنْجِيلِ** এ শেষ না করা। অতঃপর **ذَلِكَ** কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে

ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইজীল উভয়ের মধ্যে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত

চারসাতছয় ন্যায়। বর্তমান যুগে তওরাত ও ইজীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো

দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু

বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ

তফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম

দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইজীলে আছে। ইমাম বগভী (র) বলেন : ইজীলে

সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাভাদাহ্ (র) বলেন : সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত ইজীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারাগাহের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সব কাজের আদেশ এবং অসং কাজে বাধা প্রদান করবে। (মায়হারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইজীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিশ্চরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে :

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শারীর থেকে তাদের কাছে যাহিক্ব হজেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আশ্রয়প্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত শরীরও ছিল। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে।  
—(তওরাত : বাবে এন্তেরা)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ্' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীরও থাকবে বলে

أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

—এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন—কথা থেকে

رَحِمًا وَبَيْنَهُمْ

এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। ইযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে

এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই প্রসঙ্গটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (র) খৃষ্টান মতবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য ফিল্ডার নামক পাদ্রীর জওরাবে লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইজীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সন্নিহার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইজীল : মাতা) ইজীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, আল্লাহর রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রান্নিতে নিপ্রা যায় ও দিনে জাপ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বৃষ্টি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁটি লাগায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে।—(ইযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لَيُفِيضُنَّ بِهِمُ الْكُفَّارَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে উল্লিখিত ওলে



স্বপ্নাশ্রিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যান্নতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের অন্তর্জালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবু ওরুওয়া মুবায়রী (র) বলেন : একবার আমরা ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জামৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করে যখন

لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন : যার অন্তরে

কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে।—(কুরতুবী) ইমাম মালিক (র) একথা বলেন নি যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফিরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

—এই অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস

স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কিরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক **مِنْ**-এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর, যেমন **فَا جْتَنَّبُوا**

**رَجَسَ مِنَ الْأَوْتَانِ** এখানে **الْرِجْسِ مِنَ الْأَوْتَانِ**

হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে **الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ** -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ স্থলে **مِنْ**-কে 'কতক'-এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যে সব সাহাবী হদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে-রিয়ওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎ কর্মের উপর কাম্যেয় থাকেন। কারণ, আল্লাহ্ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন-না-কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয়

সম্প্রতি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (র) ইস্তিয়ারের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন : **وَمِنْ رِضَىٰ اللَّهِ عَنَّا لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهَا أَبَدًا** অর্থাৎ আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : বায়‘আতে-রিয়ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যই যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কল্লও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই আদিল ও সিকাহ।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহাতি, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হের প্রতিপন্ন করা গোনাহ : কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে :

**الزَّمَمُ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحِبُّوا بِهَا** এবং **لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ**  
এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে :

**يَوْمَ لَا يَجْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ**  
**الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَفَعَهُمْ**  
**عَنَّا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ**

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَلَا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ**

অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ ‘হসনা’ তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা

আহ্জিয়ায় ‘হসনা’ সম্পর্কে বলা হয়েছে : **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ**

**مِنَّا الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** অর্থাৎ হাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে

পূর্বেই হসনার ফলসাজা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ** অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে, ) তোমাদের কেউ যদি ওহদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না এমনকি অর্ধ মুদেরও

না। মুদ আবেবর একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি।—(বুখারী)।  
হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের  
মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে  
চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন—আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)।  
—(বায়হার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে :

اللَّهُ اللهُ في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم  
فبغبى اُحبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى  
ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله فهو شك ان ياخذ - ٥

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর  
তাদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে  
ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ  
রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়,  
সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহকে  
কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ আযাবে শ্রেষ্ঠতার করবেন।—(তিরমিযী)

আয়াত ও হাদীস এ সম্পর্কে অনেক। 'মকামে-সাহাবা' নামক গ্রন্থে আমি এগুলো  
সম্বলিত করেছি। সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ—এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত।  
সাহাবায়ে-কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা  
ও ঘটনাঘটিষ্ট করা অথবা চূপ থাকার বিষয়টিও এই গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন  
মাকিন তার কিছু অংশ সূরা মুহাম্মদের তফসীরে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে  
পারে !

سورة العجرات  
সূরা ইজুরাত

মদীনার অবতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ  
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ  
لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ  
يَغْضُونَ أَسْوَاطَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ  
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ  
يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে।

(১) মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনে, সবকিছু জানেন। (২) মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কঠম্বরের উপর তোমাদের কঠম্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু করে কথা বল, তাঁর সাথে সেই রূপ উঁচু করে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিশ্চল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজদের কঠম্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৪) যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচু করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অযব্ব। (৫) যদি তারা আপনাকে বের করে তাদের কাছে

আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য মজলজনক হত। আল্লাহ্ ক্রমাশীল, পরম দয়ালু।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূরার ষোড়শ ও শানে-নুহুল : পূর্ববর্তী দুই সূরায় জিহাদের বিধান ছিল, যশ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিল্পাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষত সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে—তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রা) কা'কা' ইবনে হালিকিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত ওমর (রা) আকরা' ইবনে হাবেসের নাম পেশ করলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কঠোর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—( বুখারী )

মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের ( অনুমতির ) আগে ( কোন কথা কিংবা কাজে ) অগ্রণী হয়ো না। [ অর্থাৎ যে পর্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিতে অথবা স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তার অনুমতি না হয়, কথাবার্তা বলো না, যেমন উপরোক্ত ঘটনায় অপেক্ষা করা উচিত ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কিছু বলুন অথবা উপস্থিত লোকদেরকে জিভাসা করুন। এরূপ অপেক্ষা না করেই নিজের পক্ষ থেকে কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া সমীচীন ছিল না ]। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ( তোমাদের সব কথাবার্তা ) শুনে ( এবং তোমাদের ক্রিয়াকর্ম ) জানেন। মু'মিনগণ, তোমরা পরস্পরের কঠোরতার উপর তোমাদের কঠোর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেমন খোলাখুলি কথাবার্তা বল, পরস্পরের সাথে সেরূপ খোলাখুলি কথাবার্তা বলো না। ( অর্থাৎ পরস্পরে কথা বলার সময় তাঁর সামনে উঁচু করে কথা বলো না এবং স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলার সময় সমান স্বরে বলো না )। এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অভ্যাসসারে নিষ্ফল হয়ে যাবে। [ উদ্দেশ্য এই যে, দৃশ্যত নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে কথা বলা এবং পরস্পরে খোলাখুলি কথা বলার অনুরূপ উঁচু করে কথা বলা এক প্রকার ধ্বংস। অনুসারী ও খাদিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক হতে পারে। আল্লাহ্ র রসূলকে কষ্ট দেওয়া যাবতীয় সংকর্মে বরবাদ করে দেওয়ার নামান্তর। তবে মাঝে মাঝে মানসিক প্রফুল্লতার সময় এরূপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রসূলের জন্য কষ্টদায়ক না হওয়ার কারণে এ ধরনের কথাবার্তা সংকর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ হবে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কষ্টদায়ক হবে না, তা জানা বস্তুর পক্ষে সহজ নয়। বস্তুর হযরত এরূপ মনে করে কথা বলবে যে, এই কথায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হবে না, কিন্তু বাস্তবে তা দ্বারা কষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার কথা তার সংকর্মে বরবাদ করে দেবে, যদিও সে ধারণাও করতে পারবে না যে, তার এই কথা দ্বারা তার কতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই কঠোর উঁচু করতে

এবং জোরে কথা বলতে সর্বাধিক নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ ধরনের কিছু সংখ্যক কথাবার্তা যদিও কর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ নয়, কিন্তু তা নিদিষ্ট করা কঠিন। তাই যাবতীয় খোলাখুলি কথাবার্তাই বর্জন করা বিধেয়। এ পর্যন্ত উঁচুরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর কঠোর নীচু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে :]

নিশ্চয় যারা আঞ্জাহর রসূলের সামনে নিজেদের কঠোর নীচু করে, আঞ্জাহ তাদের অন্তরে তাকওয়ার জন্য নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাদের অন্তরে তাকওয়ার পরিপন্থী কোন বিষয় আসেই না : উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, এই বিশেষ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়া গুণে গুণান্বিত। তিরমিশীর এক হাদীসে পূর্ণ তাকওয়ার বর্ণনা এরূপ ভাষায় বিবৃত হয়েছে : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع

س ما لا بأس به أخذ والما به بأس

পারে না, যে পর্যন্ত না সে গোনাহ্ নয়, এমন কিছু বিষয়ও বর্জন করে। এই ভয়ে যে, এগুলো তাকে গোনাহে লিপ্ত করে দিতে পারে। অর্থাৎ গোনাহের আশংকা আছে, এমন বিষয়াদিকেও সে বর্জন করে। উদাহরণত কঠোর উঁচু করার এমন এক প্রকার আছে, যাতে গোনাহ নেই। অর্থাৎ হস্তদ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কণ্ঠ হয় না এবং এক প্রকার এমন আছে, যাতে গোনাহ আছে, অর্থাৎ হস্তদ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কণ্ঠ হয়। এখন পূর্ণ তাকওয়া হল সর্বাধিক কঠোর উঁচু করাকে বর্জন করা। অতঃপর তাদের কর্মের পারলৌকিক ফায়দা বর্ণিত হচ্ছে : ) তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের ঘটনা এই যে, এই বনী তামীম গোত্রই যখন পুনরায় রসূলজাহ্ (সঃ)-র খিদমতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন না। বরং বিবিগণের কোন এক কক্ষে ছিলেন। তারা ছিল আনাড়ি প্রামাণ্য লোক। সেমতে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁর নাম উচ্চারণ করে ডাকতে লাগল :

يا محمد أخرج الينا

হে মুহাম্মদ, আমাদের কাছে বের হয়ে আসুন। এর

পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(দুররে মনসুর) যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ (বুদ্ধিমান হলে আপনার সাথে শিল্পীচারমূলক ব্যবহার করত এবং এভাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার শৃষ্ঠতা প্রদর্শন করত না। أكثرهم বলার কারণ হয় এই যে, তাদের কেউ কেউ আসলে অবুঝ ছিল না, অন্যের দেখাদেখি এ কাজে লিপ্ত হয়েছিল। না হয় যাতে কেউ উত্তেজিত না হয়, সেজন্য أكثرهم বলা হয়েছে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকই ধারণা করতে পারে যে, বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। ওয়ায-নসিহতের ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর কথাবার্তা থেকে সাবধান থাকাই নিয়ম। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত (সামান্য) সবর (ও অপেক্ষা) করত, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত (কেননা এটাই ছিল শিল্পীচারের কথা। তারা এখনও গুণবা করলে ক্ষমা পাবে, কেননা,) আঞ্জাহ্ ক্রমাশীল, পরম দয়ালু।

### আনুমানিক ভাষ্য বিবরণ

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতারণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাশী আবু বকর ইবনে আরাবী (র) বলেন : সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বুখারীর বর্ণনা মতে তকসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

بَيْنَ الْهَدْيَيْنِ - لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

হাভের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে অগ্রবর্তী হওয়া না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিবেদন করা হয়েছে, কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে অগ্রণী হওয়া না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনিই যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ান মজলিসে কেউ যেন তাঁর আসে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত যারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হত।

আলিম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত : কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলিম ও মাশায়খের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিশ্চিন্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবুদারদা (রা)-কে হযরত আবু বকর (রা)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন : তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমা থেকে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন : দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রাহল-বয়ান) তাই আলিমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে কঠোরকে তাঁর কঠোরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উঁচু করে কথা বলা—যেমন পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতারণের পর সাহাবায়ে কিয়ামের অবস্থা পাশ্চৈ যায়। হযরত আবু বকর (রা) আশ্রয় করেন : ইম্মা রাসূলুল্লাহ (সা), আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনাদের সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বায়হাকী) হযরত ওমর (রা) এরপর থেকে এত আন্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত।—(সেহাহ) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কঠোর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে রুন্দন করলেন এবং কঠোর নীচু করলেন।—(দুররে-মনসুর)

রওশা মোবারকের সামনেও বেশী উঁচু করে সাজাম ও কাজাম করা নিষিদ্ধ : কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (র) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলিম বলেন : তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচু করে সাজাম ও কাজাম করা আদবের খিলাফ। এমনভাবে যে মজলিসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বেআদবী। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত, তখন সবার জন্য চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। এমনভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে বাক্যাবলী শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করা বেআদবী।

মাস'আলা : পরগছরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পরগছরের উপর অপ্রণী হওয়ার নিষেধাজ্ঞায় যেমন আলিমগণ দাখিল আছেন, তেমনিভাবে আওয়াম উঁচু করারও বিধান তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উঁচু করে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়াম চাপা পড়ে যায়।—(কুরতুবী)

أَنْ تَعْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ — অর্থাৎ তোমাদের কঠোরকে নবীর

কঠোর থেকে উঁচু করা না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এ স্থলে শরীয়তের স্বীকৃত মুজনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় : এক. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতার ঐকমত্যে একমাত্র কুফরই সংকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সংকর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মু'মিন তথা সাহাবায়ে কিরামকে সন্দেহন করা হয়েছে এবং

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

أَمْنُوا শব্দযোগে সন্দেহন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফর নয়। অত-

এব আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? দুই. ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মু'মিন হয় না। এমনভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফর অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টত

أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা টেরও পাবে না। অতএব এখানে খাঁটি কুফরের শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যম্বাযরা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানগণ, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কঠোর থেকে নিজেদের কঠোরকে উঁচু করা এবং উচ্চ করে কথা বলা থেকে বিরত থেকে। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অপ্রণী হওয়া



অথবা তাঁর কঠোরতার উপর নিজেদের কঠোরতা উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও আশংকা আছে, যা রসূলকে কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে কিরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কঠোরতা করা যায় না, কিন্তু অপ্রণী হওয়া ও কঠোরতার উঁচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তন্দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহ্ করে, তাদের থেকে তওবা ও সংকর্মে তওফীক হিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহনিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গোনাহ্, যন্দ্বারা তওফীক হিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অপ্রণী হওয়া এবং কঠোরতা উঁচু করা দ্বারাও তওফীক হিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত সংকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুফর ও সংকর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলিম বলেনঃ বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবী ও মাঝে মাঝে তওফীক হিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون

—এই আয়াতে নবী করীম (সা)-এর তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষত গোঁয়ারতুমি সহকারে নাম নিয়ে আহ্বান করা বেআদবী। এটা বুক্কাইমানের কাজ নয়। **حجرات** শব্দটি **حجر**-এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে **حجر** বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সা)-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক হজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পাল্লাক্রমে এসব হজরায় তশরীফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়াজেতক্রমে লিখেন : এসব হজরা খজুর শাখা দ্বারা নিমিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা বুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি এসব হজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজ-ত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেন নি।

শানে-মুহল্ল : ইমাম বগভী (র) কাতাদাহ্ (রা)-র রেওয়াজেতক্রমে বর্ণনা করেন,

বনু তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনার উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক হজরাত বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল প্রামা এবং সামাজিকতার নীতি-নীতি সম্পর্কে অভ্য। কাজেই তারা হজরাত বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল : **أخرج**

**الهناء يا محمد**—এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকা-ডাকি করতে মিশেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। মসনদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থেও এই রেওয়াজেতে বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—( মাযহারী )

সাহাবী ও তাবয়ীগণ তাঁদের আলিম ও মাশায়খের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে—আমি যখন কোন আলিম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন : হে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচাত ভাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর উত্তরে বলতেন : আলিম জাতির জন্য পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিলেছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হযরত আবু ওবায়দা (রা) বলেন : আমি কোন দিন কোন আলিমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দিইনি, বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।—(রাহল-মা'আনী )

মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতে **الْتِمُّ** কথাটি যুক্ত হওয়ার প্রমাণিত হয় যে,

ততক্ষণ সবার ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়, বরং তিনি নিজে যখন আগন্তুদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا**

**قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَّا مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ۝**

(৬) সু'মিনগণ! যদি কোন পাপচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ জানলেন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অভ্যভাবত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, (যাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে) তবে (যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না; বরং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে) তা খুব পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

### আনুমানিক সাত্তব্য বিষয়

শানে-মুহুল : মসনদে আহমদের বরাতে দিল্লি ইবনে কাসীর এই আয়াত অব-  
তরণেই ঘটনা এরাপ বর্ণনা করেছেন যে, বনু মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মু'মিনীন  
হযরত জুয়ান্নিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে মেরার বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সা)-র  
খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের  
আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করে যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম  
এবং বললাম : এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের  
দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে, আমি তাদের যাকাত  
একশ্ব করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত  
কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তাঁর হাতে সোপর্দ  
করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং  
দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত আগমন করল  
না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবত রসূলুল্লাহ (সা) কোন কারণে আমাদের  
প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানো কিছুতেই সম্ভবপর  
নয়। হারেস এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ  
করলেন এবং সবাই মিলে রসূলুল্লাহ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন।  
এদিকে রসূলুল্লাহ (সা) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে যাকাত গ্রহণের  
জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র মনে এই ধারণা জাগ্রত  
হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তাঁর পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তাঁরা তাকে  
পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন  
এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে স্নেহে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে  
হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওলালীদ  
(রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী রও-  
য়ানা হল এবং ওদিক থেকে হারেস তাঁর সঙ্গিগণসহ রসূলুল্লাহ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত  
হওয়ার জন্য বের হলেন। মদীনার অদূরে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুজাহিদ বাহিনী  
দেখে হারেস জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর  
হল : আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে  
ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাভর্তনের কাহিনী শুনানো হল এবং ওয়ালা-  
দের এই বিরুদ্ধিও শুনানো হল যে, বনু মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে

হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেস বললেন : সেই আজাহর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলীদ ইবনে ওক্বাকে দেখি-ওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ ? হারেস বললেন : কখনই নয়, সেই আজাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হস্ত, বোধ হয়, আপনি কোন ভুলটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বললেন, এই ঘটনার পরিপ্ৰেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, ওলীদ ইবনে ওক্বা (রা) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানিত যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সম্প্রদেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরম্ভ করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নয়, বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) রাহি বেলায় বস্তির নিকটে পৌঁছে গোপনে কয়েকজন ওপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়ম এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইয়নামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালিদ (রা) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে সমস্ত রূডান্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্ৰেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (এটা ইবনে কাসীরের একাধিক রেওয়াজেতের সার-সংক্ষেপ)।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাস'আলা : ইমাম জাসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কিন্নায়াত হচ্ছে :

فَتَنَّبَهُوا

অর্থাৎ তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করো না, বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসিকের খবর কবুল করা যখন না-জায়েয তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর,

যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। এ কারণেই অধিকাংশ আলিমের মতে ফাসিকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে ফাসিকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ **لَوْ أَن تَضَيُّرًا تَوْ مَاتَا بِجَهَا لَه** বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণত কোন ফাসিক বরং কাফিরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েয। ফিকহ্ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রর ও জওয়াব : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসিকও হতে পারে। এটা **لَوْ أَن تَضَيُّرًا تَوْ مَاتَا بِجَهَا لَه** এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ সকল সাহাবীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আলামা আলুসী (র) রাহুল-মা'আনীতে বলেন : অধিকাংশ আলিম যে মাহহাব ও মতবাদ গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহও সংঘটিত হতে পারে, 'যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ হলে তাঁদের বেলায়ও শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওম্মান জমাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তওবা করে পবিত্র হন নি। কোরআন পাক **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আলাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ ক্রমা করা ব্যতীত আলাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবু ইয়াল্লা (র) বলেন : সন্তুষ্টি আলাহ তা'আলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি তাঁদের জন্যই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরামের বিরূপ দলের মধ্য থেকে গুণাগুণিত কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে করীম (সা)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎ কর্ম ছিল। নবী করীম (সা) ও ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আলাহ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্য এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও প্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় সারা জীবনের মধ্যে কোন গোনাহ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আলাহ তা'আলা ও তাঁর

রসূল (সা)—এর মাহাত্ম্য ও মহক্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন, বরং নিজেকে শাস্তির জন্য নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়ত কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পূণ্য কাজ নিজেও গোনাহের কাফকারা হয়ে যায়। বলা

হয়েছে : **انَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِسُ السَّيِّئَاتِ** — বিশেষত সাহাবায়ে কিরামের

পূণ্যকাজ গোনাহের কাফকারা হবেই। কারণ, তাঁদের পূণ্য কাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবু দাউদ ও তিরমিধী হযরত সায়ীদ ইবনে য়ান্নাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

**والله ليمشهد رجل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يغير فية  
وجهة خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح -**

“আল্লাহর কসম, তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সা)—এর সাথে জিহাদে শরীক হওয়া—যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধুলি ধূসরিত হয়ে যায়—তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আ)—এর আম্বুফাল দান করা হয়।” অতএব গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তাঁদের কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। তাই রসূলুল্লাহ (সা)—র যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসিক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউম্বিল্লাহ্) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসিক বলা বৈধ নয়। — (রাহল-মা’আনী)

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওজীদ ইবনে ওকবা (রা)—র ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসিক বলা হয়েছে—একথা অকাঠ্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলার মত কোন কাজ তিনি করেন নি। এই ঘটনায়ও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেনই তিনি মোস্তাজিক সোত্র সম্পর্কে একটি বাস্তবে প্রাচ্য সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনার্সাসেই তা হতে পারে, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসিকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওজীদ ইবনে ওকবা (রা) ফাসিক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ (সা) কেবল তাঁর খবরের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)—কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরে ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না, তখন ফাসিকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী

ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুন্দর। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী **وَأَن طَأْفَنَانِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ** আয়াতেও বর্ণিত হবে।

**وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوِ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْوَعْصِيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۝ فَضَلَّأَمِّنَ اللَّهُ وَنِعْمَهُ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝**

(৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবেদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ইমানের মহাবল সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হাদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সংগঠিত অবলম্বনকারী। (৮) এটি আল্লাহর রূপ ও নিয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (বিদ্যমান) আছেন (যা আল্লাহর বড় নিয়ামত, যেমন আল্লাহ বলেন : **لَقَدْ مِّنَ اللَّهِ الْخَبْرُ**—এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এই যে, কোন ব্যাপারে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না যদিও তা পাখিব ব্যাপার হয় এবং পাখিব ব্যাপারাদিতে তিনি তোমাদের মতামত মেনে নেবেন, এরূপ চিন্তা করো না। কেননা) তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবেদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। (কারণ, সেটা উপযোগিতার খেলাফ হলে তদনুযায়ী কাজ করার মধ্যে অবশ্যই ক্ষতি হবে। কিন্তু রসূলের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে সেরূপ হবে না। কেননা, পাখিব ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সেটা উপযোগিতার খেলাফ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও অব্যাহত ও নবু-ওয়ালতের পরিপন্থী নয়, কিন্তু প্রথমত এরূপ সম্ভাবনা বিশিষ্ট ব্যাপার খুবই কম হবে। হলে যদিও তাতে উপযোগিতা নষ্টও হয়ে যায়, তবে এই উপযোগিতার বিরুদ্ধ অর্থাৎ পুরস্কার ও রসূলের আনুগত্যের সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু তোমাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যাপার এমন হবে, যাতে উপযোগিতা তোমাদের মতামতের অনুকূলে থাকবে; কিন্তু তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে ক্ষতির আশংকাই বেশী থাকবে এবং এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'অনেক বিষয়ে' কথাটির উপকারিতাও জামা দেয়। ছোটখাটো, আল্লাহর রসূল তোমাদের কতানুযায়ী কাজ করলে তোমরাই বিপদগ্রস্ত হতে। কিন্তু আল্লাহ (তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এভাবে

যে) তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহাব্যত সৃষ্টি করেছেন এবং তা (অর্জনে) হাদিসগ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাগাচীর (অর্থাৎ কবিরা সোনাহ্) ও (যে কোন) মাকরুহানীর (অর্থাৎ সগীরা সোনাহ্) প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (ফলে তোমরা সর্বদা রসূলের সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর এবং রসূলের সন্তুষ্টি বিধানকারী নির্দেশাবলী মেনে চল। যেহেতু তোমরা যখন জানিতে পেরেছ যে, সাংসারিক বিষয়াদিতেও রসূলের আনুগত্য ওয়াজিব এবং পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না, তখন তোমরা অনভিবিজ্ঞ এই নির্দেশও কবুল করে নিয়োহ এবং কবুল করে ঈমানকে জারুও পূর্ণ করে নিয়োহ)। তারাই আলাহ্ তা'আলার রূপা ও অনুগ্রহে সং পথ অন্বেষণকারী। আলাহ্ (এসব নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তিনি এসবের উপযোগিতা সম্পর্কে) সবিশেষ জ্ঞাত এবং (যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময়, (তাই এসব নির্দেশ ওয়াজিব করে দিয়েছেন)।

### আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা ও মুস্তালিক গোত্রের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবানে কিরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইবনে ওকবাব খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেন নি এবং তদন্তের জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবানে কিরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বনু মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্ষাদাবোধের কারণে ছিল, কিন্তু তোমাদের মতামত নিভুল ছিল না। রসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল।—(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরন্ত, কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সা) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরন্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আলাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে দুরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কৃত্রিমি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসূলের আনুগত্যের আভির্নে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে।

مستم



عَدْتِ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পৌনহাও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়। এখানে উক্ত অর্থের সম্ভাবনা আছে।—(কুরতুবী)

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ  
بَغْتُمْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ  
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(৯) যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায্যনুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাক করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাককারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে—যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল কারণ দূর করে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে দাও)। অতঃপর যদি (মীমাংসার চেষ্টার পরও) তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, (এবং যুদ্ধ-বিরতি কাঁধকর না করে) তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহর নির্দেশ বলে যুদ্ধ-বিরতি বোঝানো হয়েছে)। এরপর যদি আক্রমণকারী দল (আল্লাহর নির্দেশের দিকে) ফিরে আসে (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়), তবে তাদের মধ্যে ন্যায্যনুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ শরীয়তের বিধানানুযায়ী ব্যাপারটি মীমাংসা করে দাও। শুধু যুদ্ধ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়ো না। মীমাংসা না হলে পুনরায় যুদ্ধ বাধাবার আশংকা থাকবে)। এবং ইনসাক কর। (অর্থাৎ কোন মানসিক স্বার্থকে প্রবল হতে দিয়ো না)। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইনসাককারীদেরকে পছন্দ করেন। (পারস্পরিক মীমাংসার আদেশ দেওয়ার কারণ এই যে) মু'মিনরা তো (ধর্মীয় অভিন্নতা তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে একে অপরের) ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের

মধ্যে মীমাংসা করে দাও (যাতে ইসলামী শ্রাভূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে)। এবং (মীমাংসার সময়) আল্লাহকে ভয় কর (অর্থাৎ শরীয়তের মীমাংসার প্রতি লক্ষ্য রাখ), যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

### আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিষয়

**পূর্বাঙ্গ সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র হুক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত ক্রীতিনীতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

**শানে-নুযুল :** এসব আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে তফসীলবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় ছোট মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘোধন করা হয়েছে। —(বাহর; রাহল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সঙ্ঘোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমির, সরদার অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবাদমান উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। —(বয়ানুল কোরআন)

**মাসয়ুদ :** মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক বিবাদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমেই অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে নিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীরা ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে বিতীর্ণ পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিব বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে প্রেক্ষতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাদী করা হবে না এবং তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যর্পণ করা

হবে। আয়াতে বলা হয়েছে : **فَأَنفَاءتْ نَأْمَلِعُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ**

**وَأَقْسَطُوا** অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে শুধু যুদ্ধ-বিরতিই

স্বত্বটি হবে না, বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন-পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্বামী দ্রাভূয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উত্তর-পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইন-সাফের তাকীদ করেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

**মাস'আলা :** যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ প্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যশ্বারা খোদ ইমামের অন্যান্য-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সম্বন্ধ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মায়হারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেরী বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।—(মায়হারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উত্তর পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে; যেমন জমল ও সিকফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

**সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ :** ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবী (রা) বলেন : এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উত্তর পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের কিস্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জম-জমল ও সিকফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অস্পষ্ট নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে :

কোন সাহাবীকে অকাটা ও নিশ্চিতরূপে ব্রাহ্ম বলা জ্ঞায়েষ নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সবদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সা) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে রুমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) হযরত তালহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন : **أَنَّ طَلْحَةَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ** অর্থাৎ তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-র যুদ্ধের জন্য হুবের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই-কাজকে ব্রাহ্ম এবং কর্তব্য পালনে ভ্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদতের মর্তব্য অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন : **يُبَايِعُ الرَّعْرَعَةَ هَتَاكًا لِلْجَاهِلِيَّةِ** আছে।

হযরত আলী (রা) বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা (রা) ও হযরত সুবায়ন (রা) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহগার ছিলেন না। এরূপ হলে রসুলুল্লাহ (সা) হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং সুবায়নের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জাহান্নামের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যারা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ব্রাহ্ম বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কালোম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে উৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফযিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরন্ত নয়। জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হয় : সাহাবীয়ে কিয়ামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

**تَلَكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ**

عَمَلًا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রসঙ্গ জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন : এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেন নি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত প্রাস্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন : আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসূফ (আ) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুসরণ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হবহ তাই।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন : সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী (র) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন : এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন : আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا  
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ  
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ

## بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

(১১) হে মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাই। যারা এহেন কাজ থেকে তওবানা করে, তাহাই জালিম।

### তফসীরের সারি-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, পুরুষরা যেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আল্লাহর কাছে) উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারিণীদের) অপেক্ষা (আল্লাহর কাছে) শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (কেননা, এগুলো গোনাই)। বিশ্বাস স্থাপন করার পর (মুসলমানের প্রতি) গোনাইর নাম আরোপিত হওয়া (-ই) মন্দ। (অর্থাৎ মুসলমানকে এ কথা বলা যে, সে আল্লাহর নাকরমানী করে যা স্থাপার বিষয়। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাক)। যারা (এহেন কাজ থেকে) বিরত না হয়, তারা জালিম (অর্থাৎ বান্দার হক নষ্টকারী। জালিমরা যে শাস্তি পাবে, তারাও তাই পাবে)।

### জাম্বুরিক ভাষ্য বিষয়

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সা)-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধাম উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতিনীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক. কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, দুই. কাউকে দোষারোপ করা, এবং তিন. কাউকে অপমান করা অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন : কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতার হাসতে থাকে, তাকে **تمسخر - مستخر** ও **استهزأ** বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা বায় অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কানও কক্ষান্তরে অপমানের ভঙ্গিতে বিপ্লব করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন : শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনকি কানও সম্পর্কে আলোচনা করাকে **تمسخر و مستخر** বলা হয়। কোরআনের বর্ণনা যাতে এগুলো সব হারাম।

কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে **سَفَرِيَّة** তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এছাড়া পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত, যদিও রূপক ভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে 'কওম' শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে **نِسَاء** শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রসঙ্গ ওঠে না। আল্লাতের সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির দেখে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন-প্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবত এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রিত পূর্ববর্তী বুয়ূর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহ্‌বিল (রা) বলেন : কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উপেক্ষ হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে যে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।—( কুরতুবী )

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ামেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধনদৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন : এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিন্তরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা মন্দ ভাল মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা, আল্লাহ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুর্মেয়র কাফকারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুর্মেয় মিশ্র দেখে, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে করে, কিন্তু তাকে হেয় ও লাক্ষিত মনে করার অনুমতি নেই। আল্লাতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে

এবং দোষের কারণে ভৎসনা করা, ইরশাদ হয়েছে : **لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ** — অর্থাৎ

তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি **لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ**—এর মতই, যার অর্থ তোমরা নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা এক দিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রায়ই তো এরূপ হয়েছে যার যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সম্বন্ধ করা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেওয়া **لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ**—এর অর্থ ভাই। অর্থাৎ তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সে-ও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলামি বলেন : **وَلَيْسَ عَهْوِبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْمَلٌ** অর্থাৎ তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সে-ও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সেই কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলামিগণ বলেন : নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরূপ করে, সে অপরকে দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুস্তানের সর্বশেষ মুসলমান বাদশাহ্, শূফর চমৎকার করেছেন :

نه تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر۔۔۔ رہے نہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر  
پڑی اپنی براؤں پر جو نظر - تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্বন্ধন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণত কাউকে খজ, ছোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবু জুবারের অনিসারী (রা) বলেন : এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য দেওয়া ও লক্ষিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনি সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবাদের কিরাম বলতেন : ইয়া রসুলুল্লাহ্, সে এই নাম শুনে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিক্রান্তে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : **تَنَّا بَرَّوْا بِالْأَلْقَابِ**—এর অর্থ হচ্ছে

কেউ কোন সোনাহ্ অথবা মন্দ কাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে



ডাকা। উদাহরণত চোর, ব্যক্তিতারী অথবা শয়্যাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি ছুরি, ধিনা, শয়্যাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে জতীত কুফর দ্বারা লক্ষ্য দেওয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কেমন মুসলমানকে এমন গোনাই দ্বারা লক্ষ্য দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে তাকে সেই গোনাই লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লিপ্ত করার দায়িত্ব অর্থাৎ তা'আলা গ্রহণ করেন।—(কুরতুবী)।

কোন কোন নামের ব্যক্তির নাম : কোন কোন লোকের এমন নাম খ্যাত হলে হয়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেমে মা। এমনতরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লিপ্ত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত, যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে **أحدب**—**أعرج** ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে **ذو الوديين** নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র)-কে জিতঙ্গা করা হয় : হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয়, যেমন **سروان** ইত্যাদি এসব। পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েয কি না? তিনি বললেন : দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েয।—(কুরতুবী)।

ডাল নামে ডাকা সূরত : রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মু'মিনের হক্ অপরা মু'মিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। এ কারণেই আরবে ডাল নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও ডা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন—হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে 'আতীক,' হযরত ওমর (রা)-কে 'ফারুক,' হযরত হামযা (রা)-কে 'আসাদুল্লাহ্' এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে 'সাইফুল্লাহ্' পদবী দান করেছিলেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ  
 الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ  
 أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

(৬২) হে মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। মিশ্রণ কতক ধারণা গোমায়ী এবং ভোগদীর্ঘ বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ করে না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিশ্চয় না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করি পছন্দ করবে? বস্তত

তোমরা তো একে ঘূণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

### ভক্তসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। ( তাই ধারণার যত প্রকার আছে, সবগুলোর বিধান জেনে নাও যে, কোন ধারণা জায়েয এবং কোনটি নাজায়েয। এরপর জায়েয ধারণার মধ্যেই থাক )। এবং ( কারও দোষের ) সজ্ঞান করো না। কেউ যেন কারও গীবত তথা পশ্চাতে নিন্দাও না করে। ( এরপর গীবতের নিন্দা করে বলা হয়েছে ) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভ্রাতার মাংস উদ্ধরণ করবে? একে তো তোমরা ( অবশ্যই ) ধারণা মনে কর ( অতএব বুঝে নাও যে, কোন ভ্রাতার গীবতও এরই মত )। আল্লাহ্কে ভয় কর ( গীবত পরিত্যাগ করে তওবা করে নাও )। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতেও পারম্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। এক. **ظن** তথা ধারণা, দুই. **تفحس** অর্থাৎ কোন গোপন দোষ সজ্ঞান করা, এবং তিন. গীবত অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে গুলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় **ظن** এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমত বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, এরপর কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলিম ও ফিকহবিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন : ধারণা বলে এ স্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবু বকর জাসসাস 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত আবের (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

তোমাদের কারও আল্লাহ্‌র

প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মুতাহারন করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে **أنا عند ظن عبدي بي** — অর্থাৎ আমি আমার বান্দার সাথে তোমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন তার অম্মার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে

জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সংকল্পপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَيُّكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ كَذِبٌ — অর্থাৎ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।

এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যেমন পারম্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালার নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্য ফয়সালা দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাও ওয়াজিব। এমনিভাবে যে আঙ্গণায় কিবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিস্বরূপ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামামের রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাক'আত পড়া হয়েছে, না চার রাক'আত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাক'আত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যায়।—(জাসাস)

কুরতুবী বলেন : কোরআনে বলা হয়েছে :

—لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَفْسُسِهِمْ خَيْرًا

মু'মিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাকীদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে **الظَّنُّ سَوْءُ الْعِزْمِ** — অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেসব ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আত্মা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে গাঞ্চিত করবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (রা)-র নিশ্চিন্ত উক্তির অর্থই তাই।

نَكَة دَارٍ وَأَنْ شَوْخٌ دَرِكْسَةٌ دَرٍ - كَذَابٌ فَهْمَةٌ خَلْقٌ وَكَيْسَةٌ بَرٍ

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে **تَجَسَّس**, অর্থাৎ কারও দোষ সন্ধান করা। এই শব্দে দুটি কিস্তি আছে। এক **لَا تَجَسَّسُوا**—জীম সহকারে, এবং **وَلَا تَحْصُرُوا** হ্যাঁ সহকারে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসজিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে **لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحْصُرُوا** উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফান উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে **تَجَسَّس** এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হ্যাঁ সহকারে **تَحْصُر** এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা।

সূরা ইউসুফে **تَجَسَّسُوا مِنْ يُونُسَافٍ وَأَخِيهِ** আয়াতে এই অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

**لَا تَتَّبِعُوا الْمُصَلِّينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنْ مِنْ اتَّبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ -**

মুসলমানদের গীবত করা না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ক্ষতি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। —(কুরতুবী)

ফরানুল কোরআনে আছে গোপনে অথবা নিস্তার ভাঁন করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, **تَجَسَّس**—এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হিফায়তের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারী গোপন স্বত্বাভি ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা, মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে ‘অনুপস্থিতিতে’ কথা থেকে এরূপ বোঝা সম্ভব নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, কিন্তু **لَمْ** তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

**أَيُّعِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَعْمَ أُخِيهِ مَيْتًا**—এই আয়াত কোন মুসল-

মানের কেইফতী ও অপমানকে তার মাংস খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইআফতী জীবিত মানুষের মাংস টেনে টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। **لَمْ** শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে, যেমন

**وَيَلْ لَكَ** এবং **لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ**

همزة لمرز—সংলিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কণ্ঠদায়ক কথা-

বার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস উচ্চণের সমতুল্য। মৃত মানুষের মাংস উচ্চণ করলে যেমন তার কোন কণ্ঠ হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, স্তম্ভও কোন কণ্ঠ হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের মাংস খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস উচ্চণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারণ ও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই একত্র দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধার্মিক সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে ভাষ্যবধি থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মুন (রা) বলেন : একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সন্নী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে—একে উচ্চণ কর। আমি বললাম : আমি একে কেন উচ্চণ করব? সে বলল : কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল : হ্যাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সশ্রমত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মুন (রা) নিজে কখনও কারও গীবত করেন নি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করতে দেন নি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত শবে মিরাজের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গোলাম যাদের নখ ছিল তাঁমার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম—এরা কারা? তিনি বললেন : এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইচ্ছতহানি করত।—(মাসহারী)

হযরত আবু সায়ীদ (রা) ও জাবের (রা)-এর রেওয়াজে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الغيبة أشد من الزنا অর্থাৎ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ। সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার

পর তওবা করলে তার গোমাহ্ মাক্ফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোমাহ্ প্রতিপক্ষের মাক্ফ না করার পর্যন্ত মাক্ফ হয় না।—( মাফফুহী )

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহর হুক ও বান্দার হুক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাক্ফ নেওয়া জরুরী। কোম কোম আজিম বলেন : যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌছা পর্যন্ত বান্দার হুক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া জরুরী নয়।—( রাহল মা'আনী ) কিন্তু বয়ানুল কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : এমতাব্বাহার যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোমাহ্ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাতা হয়ে যায়, তবে তার কাফফারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে : হে আল্লাহ! আমার ও তার গোমাহ্ মাক্ফ কর। হযরত আমাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) তাই বলেছেন।

মাস'আলা : শিশু, উম্মাদ এবং কাফির যিম্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফিরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সমস্ত নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাক্ফরাহ।

মাস'আলা : গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণত ঋণকে হের করার উদ্দেশ্যে তার মত হইটে দেখানো।

মাস'আলা : কোন কোন রেওয়াজে থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণত কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারণ ও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতাটি শরীকসম্মত হতে হবে। উদাহরণত কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সাহায্যে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারণ সত্য ও স্ত্রীর বিক্রমে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোমাহ্ করে এবং নিজের পাণীটারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আঁগোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সমস্ত নষ্ট করার কারণে মাক্ফরাহ।—( বয়ানুল কোরআন, রাহল-মা'আনী ) এসব মাস'আলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারণ দোষ আঁগোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হের করা না হওয়া চাই, বরং প্রয়োজনবশতই আঁগোচনা হওয়া চাই।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلٍ لِّتَمَارِقُوا إِنَّ أَصْحَابَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُم ۚ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

(১৩) হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্বুর খবর রাখেন।

### তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব, আমি তোমাদের (সবাই)-কে এক পুরুষ ও এক নারী (অর্থাৎ আদম হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। (তাই এদিক দিয়ে সব মানুষ সমান) এবং (এরপর যে পার্থক্য রেখেছেন যে) তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন, (এটা শুধু এ জন্য) যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (এতে অনেক উপযোগিতা রয়েছে। এজন্য নয় যে, তোমরা পরস্পরে গবিত হবে। কেননা) আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। (পরহিযগারীর পুরোপুরি অর্থবা কেউ জানে না, বরং এটা একমাত্র) আল্লাহ তা'আলা-পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি স্বকর রাখেন (অতএব তোমরা কোন বংশমর্যাদা ও জাতিত্ব নিয়ে গর্ব করো না)।

### আনুযায়িক জাতব্য বিষয়

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক নীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণা মনে না করে এবং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ডিক্টিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃত-পক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ডিক্টি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে : সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-সৌভাগ্যের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য।

শাসি-মুহুজ : এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন মাখিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সা) হযরত বিলাল হাবশী (রা)-কে মুসাময়িন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অধিবাসিন কোরাইশীদের একজন বলল : আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুসিন দেখতে ছয়মি। হযরত ইবনে হিশাম বলল : মুহাম্মদ কি ইসলামে-হারামে আমান দেওয়ার জন্য এই কাল কীক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন না? আবু









মনে করো না। (কেননা, খৃষ্টতা বাদ দিলেও তোমাদের মুসলমান হওয়ারই অভিযুক্তি আমার কি উপকার করে এবং মুসলমান না হওয়ারই অভিযুক্তি আমার কি ক্ষতি? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদেরই পরকালের উপকার এবং মিথ্যাবাদী হলে মুসলমানদেরই ইহবিশ্বের উপকার আছে অর্থাৎ তোমরা হাদ্দা, কারাবাস ইত্যাদি থেকে বেঁচে গেলে তখন অতএব আমরকে ধনা করে মনে করা নিতাই নিবুদ্ধি।) বরং আল্লাহ ইমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধনা করেছেন। যদি তোমরা (ইমানের এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (কেননা, ইমান একটি বড় নিয়ামত, আল্লাহর শিষ্টা ও তওফীক ব্যতীত অর্জিত হয় না। এমন বড় নিয়ামত দান করেছেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। সুতরাং ধোঁকা ও ধনা করেই মনে করা থেকে বিরত হও। মনে রেখো, ) আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব স্রষ্টা বিষয় জানেন। (এই ব্রাপক জানের কারণে) তোমরা যা কর, আল্লাহ তাও জানেন। (এই জান অনুযায়ীই তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। অতএব তাঁর সামনে মিথ্যা স্বাক্ষর করার দা কি?

**আনুবাদিক জীবন বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহিসগারী। এই পরহিসগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই পবিত্রতার দাবী করা বেধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ইমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অস্তুর বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিতুই মূমিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সন্ন্যাস প্রথমে নবী করীম (সা)-এর হক অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম প্রচণ্ড হওয়ার হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুজুল : ইমাম বগভী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আয়াত অবতরণের ঘটনা এই যে, বনু আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনার রসুলুল্লাহ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন। তারা অন্তরগতভাবে মূমিন ছিল না। শুধু মদীনা শহরত লোকের জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল। বাস্তবে মূমিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা ভুল ও বেধবর ছিল। মদীনার পথে ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে একে তো ইমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত তাঁকে খেঁচা দিতে চাইল এবং তৃতীয়ত মুসলমান হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সা)-কে ধনা করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা যখন এ অবস্থায় লোক সীর্ষকালসম্পন্ন আশ্রয় সাধে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছিল, তখন এক মুক্ করছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আশ্রয়কামিনা পক্ষ হচ্ছিল। অপেক্ষার কালে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। কাজেই তরুণীদের সদিচ্ছাকে মূল্যবান ও মূল্যবান। এটা ছিল রসুলুল্লাহ (সা)-র শানে একই অবস্থা খৃষ্টতা থেকে কারণ; এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেরেই মুসলমানদের সৎকর্ম হওয়ার উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য হ্রাস করল। হাদ্দা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিল। যদি তারা খৃষ্ট হিতাই হিতা মুসলমান হয়ে যেত। তবে রসুলুল্লাহ (সা)-র নব্ব—স্বয়ং-কাজেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য

আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী-ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا—তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার

ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে : তোমাদের 'ঈমান এনেছি' বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর **أَسْلَمْنَا** 'ইসলাম কবুল করেছি' বলতে পার। কেননা, ইসলামের শাসনিক অর্থ বাহ্যিক কাজকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব আভিধানিক অর্থে **أَسْلَمْنَا** বলতে শুরু ছিল।

ইসলাম ও ঈমানে সম্পর্ক আছে কি : উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে—পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াত এ বিষয়ের স্রমাপ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষার অন্তর্গত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আত্মাহর একত্ব ও রসুলের রিসালতকে সত্য জ্ঞান। পছন্দকে বাহ্যিক কাজকর্মে আত্মাহ ও রসুলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তর্গত বিশ্বাস ততরূপ ধর্তব্য নয়, মতরূপ তাঁর প্রভাব অল্প-প্রত্যয়ের কাজকর্মে প্রতিকলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুশে কাম্বিনের স্বীকারোক্তি করা। এমনভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততরূপ ধর্তব্য নয়, মতরূপ অন্তর বিশ্বাস বৃত্তি না হয়। অন্তর বিশ্বাস না থাকলে সূর্য হবে 'মিফাক' তথা মুনাফিকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলাম ঈমান ব্যতীত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মু'মিন হবে না এবং মু'মিন হবে—মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলাম ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মু'মিন হবে না, যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের স্বরূপে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মু'মিন ছিল না

سورة ق

سُورَةُ الْقَاٰتِلَاتِ

মহান অযতীন, ৪৫, আনাত ৩ রকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ق وَالْقُرٰنِ الْمَجِیْدِ ۝ بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ  
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِیْبٌ ۝ وَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا  
۝ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِیْدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ  
وَءِندَنَا نَاكِتٌ حَفِیْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَوَهُمْ  
فِیْ اَمْرِ قَرِیْبٍ ۝ اَفَلَمْ یَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بَنٰیْنٰهَا  
وَزَیْنٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝ وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَالْقِیٰنٰتِیْنِیْهَا  
رَوٰسِیًّ وَ اَنْشَاْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَیْجٍ ۝ وَ تَبٰصِرَةٌ وَّ ذٰكِرَةٌ  
لِّكُلِّ عَیْنٍ حٰفِیْظٍ ۝ وَ تَزَلٰنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَاصْبٰنَا  
بِهٖ جَبْتٍ وَّ حَبَّ الْاَوْسِیْدِ ۝ وَ النَّخْلَ لَسَقَتْ لَهَا طَلْعٌ نَّضِیْدٌ ۝  
رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۝ وَ اَحْیٰنَا بِهٖ بَلَدًا مَّیْمِنًا ۝ كَذٰلِكَ اِلٰكُ الْاٰخِرُوْنَ ۝ كَذٰبَتْ  
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّیْسِ وَّ سُوْدٌ ۝ وَّ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنٌ وَّ اٰخِرَانِ  
لُوْطٍ ۝ وَ اَصْحٰبُ الْاٰیكَةِ وَّ قَوْمٌ تَبِعُوْا كُلَّ كَذٰبِ الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعَیْدُ ۝  
اَفَعِیْبِنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۝ بَلْ هُمْ فِیْ كِبٰیٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(৬) সম্মানিত কোরআনের শপথ, (২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন তার প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিশ্বাস বোধ করে। অতঃপর কাফিররা বলে : এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। (৩) আমরা মরে গেলে এবং সুভিকার পরিণত হয়ে গেলে কি পুনরুৎপন্ন হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) সুভিকা তাদের কতকগুলি প্রাস কল্পে, তা আমার জন্য আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত বিভাব। (৫) বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা করেছে। বলে তারা সংশয়ে পড়িত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না—আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন দ্বিগত নেই। (৭) আমি কৃত্রিমক বিভূত করেছি, তাতে পর্যবেক্ষণের বোঝা স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার মরনভিন্ন্যম উদ্ভিদ উৎপত্ত করেছি, (৮) প্রত্যেক অনুরাগী বাসীর জন্য জান ও শরীফিকাঙ্করণ। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তাহারা আমি বাগান ও শস্য উৎপত্ত করি, যেসবোর ফসল আহরণ করা হয় (১০) এবং লুহমান বহুতর বৃক্ষ, যাতে আছে উষ্ণ তরল বহুতর, (১১) বাসীদের জীবিকাঙ্করণ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি স্তম্ভ সৈন্যকে সজীবিত করি। এমনভাবে পুনরুৎপন্ন ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে মুহর সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায়, (১৩) জান, ফিরাতিন ও কুতর সম্প্রদায়, (১৪) বনবাসীরা এবং দুকা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূদগণকে মিথ্যা করেছে, অতঃপর আমার শাস্তির সোণা হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই সত্য হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।

**উসসীরের সার-সংক্ষেপ**

সার (-এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। সম্মানিত কোরআনের শপথ (অর্থাৎ অমান্য কিতাবের চাইতে প্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে কিয়ামতের জাতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছি, কিন্তু তারা মানে না, ) বরং তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে) একজন তার প্রদর্শনকারী (পরগছর) আগমন করেছে, (যিনি তাদেরকে কিয়ামতের তার প্রদর্শন করেন)। অতঃপর কাফিররা বলে : (প্রথমত) এটা এক বিশ্বাসের ব্যাপার (যে, মানুষ পরগছর হবে, দ্বিতীয়ত সে এক অকৃত্ত বিষয়ের দাবী করবে যে, আমরা পুনরায় জীবিত হব)। আমরা যখন মরে যাব এবং সুভিকার পরিণত হব, অতঃপরও কি পুনরুৎপন্ন হব? এই পুনরুৎপন্ন সুদূরপরাহত : (মোটকথা এই যে, প্রথমত সে আমাদের মতই মানুষ। পরগছরীর দাবী করার অধিকার তার নেই। দ্বিতীয়ত সে একটি অসম্ভব বিষয়ের দাবী করে অর্থাৎ আমরা মৃত্যুর পরও সত্যি হয়ে খাওয়ার পর পুনরুৎপন্ন হব। এর উত্তরাবে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত করে তাদের উচিত ভয়ন করছেন। এর সার-সংক্ষেপ এই যে, মৃত্যুর পর পুনরুৎপন্ন অসম্ভব মনে করার দৃষ্টি কারণ হতে পারে। এক যেসব বিষয়ের পুনরুৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসবোর পুনরুৎপন্ন সোণতাই না থাকে। এটা প্রত্যক্ষভাবে

দ্রাষ্ট। কেননা, সেগুলো বর্তমানে ভোম্বাদের সামনে জীবিত উপস্থিত আছে। জীবিত হওয়ার যোগ্যতাই না থাকলে বর্তমানে কিরূপে জীবিত আছে? দুই। আল্লাহ তা'আলার পুনরায় জীবিত করার শক্তি না থাকা, এ কারণে যে, মৃতের যেসব অংশ মৃত্যুকাল পরিণত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলো কোথায় কোথায় পড়ে আছে, তা জানা নেই। এর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার জানের অবস্থা এই যে, ) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করে, তা আমার জানা আছে এবং ( আজ থেকেই জানি না, বরং আমার জান চিরকালের। এমনকি, ঘটনার পূর্বেই সব বস্তুর সব অবস্থা আমি আমার চিরাগত জানের সাহায্যে এক কিতাবে অর্থাৎ 'লওহে মাহফুযে' লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম এবং এখন পর্যন্ত ) আমার কাছে ( সেই ) কিতাব ( অর্থাৎ লওহে মাহফুয ) সংরক্ষিত আছে। তাতে এসব বিক্ষিপ্ত অংশের স্থান, রকম, পরিমাণ ও গুণ সবকিছু আছে। চিরাগত জান কেউ বুঝতে না পারলে তার একপাশে বুঝে নেওয়া উচিত যে, যে দক্ষতরে সবকিছু আছে, তা আল্লাহর সামনে উপস্থিত। কিন্তু তারা এরপর অহেতুক বিস্ময় বোধ করে; শুধু বিস্ময়ই নয়) বরং সত্য কথা নবুওয়ত ও পরকালে পুনরুত্থান ও ) যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন তাকে মিথ্যা বলে। তারা এক দৌদলামান অবস্থায় পতিত আছে ( কখনও বিস্ময় বোধ করে, কখনও মিথ্যা বলে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। এরপর কুদরত বর্ণিত হচ্ছে : ) তারা কি ( আমার কুদরতের কথা জানে না এবং তারা কি ) উপস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না? আমি কিভাবে তা ( সধূসত ও রূহৎ ) নির্মাণ করেছি এবং ( তারকা দ্বারা ) সুশোভিত করেছি, তাতে ( মজবুতির কারণে ) ফাটলও নেই ( যেমন অধিকাংশ নির্মাণকাজে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ফাটল দেখা দেয়। আমার এই কুদরত আকাশে )। ডুমিকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি, এবং তাতে সবপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, যা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জান ও বোঝার উপায় ( অর্থাৎ এমন বান্দার জন্য, যে সৃষ্ট জগতকে এভাবে দেখে যে, এগুলো কে সৃষ্টি করেছে? এ থেকেও আমার কুদরত প্রকাশমান যে, ) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা আমি বাগান ও শস্যরাশি উদগত করি এবং লক্ষ্যমান খজুর রুক, যাতে আছে ওচ্চ ওচ্চ খজুর বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আমি বৃষ্টি দ্বারা মৃত দেশকে জীবিত করি। এমনভাবে ( বুঝে নাও যে, ) মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। ( কেননা, আল্লাহর সভাগত কুদরতের সামনে সব-কিছুই সুমান; বরং যে সত্য রূহৎ বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে যে ক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো সৃষ্টি করা একটি মৃতকে পুনরুজ্জীবন দান করার চাইতে অনেক বড় কঠোর আল্লাহ বলেন : **لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ** অতএব এসব বড় বড় কাজ করতে যিনি সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন না কেন? কাজেই জানা যেন মৃতকে জীবিত করা অসম্ভব নয়—সত্ত্বপন এবং জীবিতকারী আল্লাহর কুদরত অপার। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ অথবা প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে। অতঃপর দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে সত্য করার জন্য অভীত সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যেমন কিয়ামত অস্বীকার করে রমূলাকে মিথ্যারাদী

কলে, ত্রেমনি) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নুহের সম্প্রদায়, কূপবাসীর, সামূল ও আদ-  
সম্প্রদায়, কিরাউন, লুতের সম্প্রদায়, বনবাসীরা এবং তুকা সম্প্রদায়, (অর্থাৎ)  
প্রত্যেকেই পরগম্বরণগণকে (অর্থাৎ নিজ নিজ পরগম্বরণকে তওহীদ, রিসালত ও কিয়ামতের  
ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (তাদের সবার উপর  
আমাব এসেছে। এমনিভাবে এদের উপরও আমাব আসবে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে।  
সতর্ক করার পর আবার পূর্বের বিষয়বস্তু তিন্ন ভংগিতে বর্ণনা করা হচ্ছে : ) আমি কি প্রথম-  
বার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (যে পুনর্বার জীবিত করতে পারব না। অর্থাৎ একটা  
সাময়িক ব্যাধি এরূপও হতে পারত যে, কসী-ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে কাজ করতে সক্ষম  
নয়। আমাতে বলা হয়েছে যে, আজাহ্ তা'আলা এ ধরনের দোষ দু'টি থেকেও পবিত্র। তাঁর  
উপর কোন কিছুই প্রভাব পড়ে না এবং ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই কিয়ামতে  
পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে প্রমাণাদি-পূর্ণ হয়ে গেল। হাঁরা কিয়ামত অস্বীকার করেছে, তাদের কাছে  
কোন প্রমাণ নেই। বরং তাঁরা নতুন ভাষে সৃষ্টির ব্যাপারে (প্রমাণ ছাড়াই) সন্দেহ গোষণ  
করছে, (যা প্রমাণাদিগ্ন আলোকে প্রক্ষেপযোগ্য নয়)।

সূরা জাকের বিশিষ্টতা : সূরা জাকের অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, হুতদের  
পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নির্কাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও  
এমনি বিষয়বস্তু উল্লেখ ছিল, এটাই সূরাযয়ের যোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সূরা জাকের শুরু অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উল্লেখ হিশাম  
বিনতে হারিসা বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহের সম্মুখেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর  
পর্যন্ত আমাদের ও রসুলুল্লাহ্ (সা)-র রুটি পাকানোর টাঙ্গিও ছিল অভিন্ন। তিনি রুটি গুরু-  
বারে জুম'আর খোতবার সূরা জাক তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে  
যায়।—( মুসলিম-কুরতুবী )

হযরত উমর ইবনে-খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকের লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন :  
রসুলুল্লাহ্ (সা) দুই সূরের নামাযে কোন সূরা পাঠ করতেন ? তিনি বললেন : **اَثْرَبَتْ**

**وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ** এবং **السَّاعَةِ** হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে  
যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) কজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা জাক তিলাওয়াত করতেন।  
—( সূরাটি বেশ বড় ) কিন্তু এতদসঙ্গেও নামায হালকা মনে হত।—( কুরতুবী ) রসুলুল্লাহ্  
(সা) ও তাঁর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বহুতম এবং দীর্ঘতম নামাযও মুসল্লীদের  
কমবে হালকা মনে হত।

জাকের দৃষ্টিগোচর হয় কি ? **أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ** বাকা থেকে  
বাহ্যত জানা যায় যে, জাকের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভ



রক্ত-দৃষ্টিগোচর হক্কি তা শুনামওজের রক্ত । কিন্তু আকাশের রক্তও হে তাই হবে—একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই । এ ছাড়া আয়াতে نظر শব্দের অর্থ চর্মচক্রে দেখা না হলে অন্তর চক্রে দেখা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করাও হতে পারে । —( বয়ানুল-কোরআন )

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব :

مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতে মৃতদের পুন-

রুজীবন অস্বীকার করে । তাদের সর্বস্বত্বও প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে । পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয় । কিয়ামতে পুনরুজীবন দান করার জন্য এই বিকশিত কণাসমূহের অবস্থান স্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্র করার সাধ্য কার আছে ? কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সূর্যীয় জ্ঞানের মাপকাঠিতে আত্মাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় । আত্মাহ তা'আলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে । তিনি জানেন মৃতের কোন কোন অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে । মানবদেহের কিছু অংশ আত্মাহ তা'আলা এমন তেরী করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না । অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আত্মাহর দৃষ্টিতে থাকে । তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্র করবেন । সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান সমিবেশিত রয়েছে, কোনটি থাকেই থাকবে এবং কোনটি ওষধের আকারে সমিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে । এমতাবস্থায় পুনর্বীর এসব উপাদানকে বিধে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্র করা আত্মাহর পক্ষে কঠিন হবে কি ? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আত্মাহ তা'আলা মানবদেহের এসকল উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন; শুধু তাই নয়, করে মানব কৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আত্মাহ তা'আলার কাছে 'গুণ্‌হে-মাহকুমে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে ।

অতএব, এমন সর্বজনীন, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আত্মাহ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময়

প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে । **مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ** আয়াতের এই

তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা) ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে । —( বাহরে-মুহীত )

অতিশয় **قُلِ أَمْوَالُهُمْ** তাদের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার

বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। একস বস্তু সাময়িকত কাসিদ ও দৃষ্টি করে থাকে। এ কারণেই হযরত আবু হুরায়রা (রা) **فَرَجَ** শব্দের অনু-  
করণ করেছেন কাসিদ ও দৃষ্টি। হাছাফ, কাভাদাহ, হাসান বসরী (র) প্রমুখ এর অনুবাদ  
করেছেন মিত্র ও অটল। উদ্দেশ্য এই যে, কাসিদরা বস্তুরত অসীমতার করার স্বাভাবিক  
এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও হাদুকর, কখনও স্রবি, কখনও অতি-  
তিরবাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বরং মিত্র ও দৃষ্টি। অতএব;  
কোন কথার অওয়ার্থতা হার।

এরপর নতোমগুল, তুমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির  
মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নতোমগুল সম্পর্কে বলা

হয়েছে : **فُرُوجٍ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ** শব্দটি **فُرُوجٍ** এর বহুবচন। এর অর্থ

ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন।  
এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের স্রিক পরিদৃষ্ট হত।  
কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চোরে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও উল্লাংশ  
বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাঙ্গে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে  
ফাটল বলা হয় না।

**كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ**—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাসিদদের সিসাজত ও

পরকাল প্রত্যখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে রসূলজাহ (সা)-র জন্য মর্মপীড়ার  
কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য অতীত  
যুগের পরগম্বর ও তাঁদের উন্মত্তের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন : প্রত্যেক পরগম্বরের সাথেই  
কাসিদদের পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পরগম্বরের চিরন্তন অঙ্গ। এতে আপনি  
মনক্লান্ত হবেন না। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে ব্যস্ততার বর্ণিত হয়েছে।  
তিনি সাড়ে নয় শ বছর পর্যন্ত তাদের হিদায়তের জন্য প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে  
প্রত্যখ্যানই করলি, স্বরং মানান্তাবে উৎপীড়নও করেছে।

**أَصْحَابُ الرِّسِّ** কারা? **رِسِّ** শব্দটি আরবী ভাষার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত

হয়। প্রসিক অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি ছাড়া পাকা করা হয় না একস হাঁটা কৃপকে **رِسِّ**  
বলা হয়। **أَصْحَابُ الرِّسِّ** বলে আযাবের পর সামুদ পোড়ের অবশিষ্ট জোকসেরকে

বোঝানো হয়। হাছাফ (র) প্রমুখ তফসীরকারের ভাষা অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই  
যে, সাদ্কাহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নামিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার  
হাজার ইরাকের অধিক এই আযাব থেকে-নির্যাস থাকে। আযাবের পর তারা এই জন

তাদেরকে হযরত মুসাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ (আ) ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে কবরাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ (আ) মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম **حُضْرُ مَوْتٍ** (হায়রা-মাতুল-হাথাৎ মৃত্যু হৃদয় হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং কবরবতীকালে তাদের বংশধরদের মঞ্চে মূর্তিসূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন সন্নগর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করেন। ফলে আযাবে পতিত হন এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে লক্ষিত হয়। কবরআনের

নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লিখিত হয়েছে : **وَيَبْرُ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ** অর্থাৎ

তাদের অকেজো কূয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্সা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

**قَوْمٌ** — হযরত সালেহ (আ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কবরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

**عَيْنٌ** — বিশাল বসু এবং শক্তি ও বীরত্বে অদি-জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে স্বন্বার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

**أَخْوَانٌ لُّوطٌ** — হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কবরআনে বর্ণিত হয়েছে।

**أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ** — ঘন জঙ্গল ও বনকে **اَيْكَةٌ** বলা হয়। তারা এরূপ জায়-গায়েই বসবাস করত। হযরত শোয়ালেব (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হনো নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

**قَوْمِ نوحٍ** — ইরামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তুফা। সপ্তম খণ্ডের সূর্যাসোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

**وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ  
اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ اِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عِنَ الْيَمِينِ وَعِنَ  
الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝  
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۝ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝  
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۝ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا**

سَأْتِي وَتَهْوِي ۝ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ

غِطَاءَكَ يَوْمَ حَادِيْدٍ ۝ وَقَالَ قَرِيْبُهُ هَذَا مَا لَدَيْ

عَيْنِي ۝ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَمِيْدٍ ۝ مُّتَّئِئًا لِّلْخَيْرِ مَعَكُمْ

مُّؤَيَّبٍ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اَلْقِيَةٌ فِي الْعَذَابِ

الشَّدِيْدِ ۝ قَالَ قَرِيْبُهُ رَبَّنَا مَا اَظْفَيْتُمْ وَا لَكِنْ كَاْنَ فِيْ صُلٰبِ

بِعِيْدٍ ۝ قَالَ لَا تَخَفُوْا لَدَيْ وَا قَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۝

مَا يَبْدُلُ اَلْقَوْلُ لَدَيْ وَا اَنَا بِظُلْمٍ لِّلْعٰبِيْدِ ۝

(১৬) আমি আমার সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিজেই সে কৃতিতা করে, সে সমস্তও আমি প্রবলত আছি। আমি তার প্রীতিবাহিত ধমনী থেকেও অধিক নিরুৎসর্গ। (১৭) রক্তনসুইয়ের নদীতে ও মনে কসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করায় অন্য তার কাছে সমান্তরিত প্রেরণী করেছে। (১৯) কৃত্যবরণা প্রতিচিহ্নই আমলব। (২০) একেই দুমি উপস্থাপনা করিতে। (২১) এ এবং শিরসে পুষ্টি বহন করেও তা হক। (২২) হলে তার প্রদর্শনের দিন। (২৩) প্রত্যেক সৃষ্টি আমলক করায়, তার মনে প্রবলত আমল ও কর্মের সত্য। (২৪) তুমি যেভাবেই দিন মনস্কর্মে উপস্থাপনা হিহ। (২৫) তোমার কাছ থেকে মরনিকা সঞ্জিরে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার সৃষ্টি সূতীক। (২৬) তার সর্গী করেও তা বলবে : আমিই কীহি যে আমলনাথ হিহ, তা এই। (২৭) তোমরা উত্তরেই নিরুপ কর আহায়ে প্রত্যেক অকৃতত বিরুদ্ধবাদীকে, (২৮) যে বাধা দিত মনজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সর্পেহ পোষণকারীকে। (২৯) যে বাধি-আজ-হর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিরুপ কর। (৩০) তার সর্গী শরতান বলবে : যে আমায়ে পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধাচারে গিন্ত করিনি। বলত সে নিজেই ছিল সুদূর পথচাতিতে গিন্ত। (৩১) জাহায কয়েক : আমার সামনে বাকবিত্তা করে না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে অবাধে তারা অর মর্শন করেছি। (৩২) আমার কাছে কথা রসবদল হয় না এবং আমি বাপায়েই প্রতি মূল্যমকারী সূহী।

আমি আমার সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিজেই সে কৃতিতা করে, সে সমস্তও আমি প্রবলত আছি।

তৎসর্গীর সর্গ-সংক্রমণ

(উপরে কিরামতের দিন মৃতদের জীবিত হওয়ার সম্ভাবিতা প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণনা করা হচ্ছে। বাস্তবতা পূর্ণতান ও পূর্ণশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই

প্রথমে একথাই বলা হচ্ছে : ) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। - ( এটা শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ ) তার মনে যেসব সৃষ্টি জ্ঞাপনিত হয়, আমি তা- ( ও ) জানি। (অতএব যেসব ক্রিয়াকর্ম তার হস্ত, পদ ও জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত হয়, তা আরও উত্তমরূপে জানি, বরং আমি তার হাল অবস্থা এত জানি যে, যা সে নিজেও জানে না। সুতরাং জানার দিক দিয়ে) আমি তার প্রীতিবাহিত ধর্মনিষ্ঠ চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। ( এই ধর্মনিষ্ঠ কর্তন করা হলে মানুষ মারা যায়। মানুষের সাধারণ অভ্যাসে জানোয়ারের আখ্যা বেত্র করার জন্য প্রীতি, কর্তনেরই পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাই এভাবে ব্যস্ত করা হয়েছে। জরীয়াতে কলিজা থেকে উদ্ভূত এবং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত - উক্ত প্রকার ধর্মনিষ্ঠ বোঝানো স্মৃতি পায়। তবে হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধর্মনিষ্ঠ বোঝানোই অধিক সমস্ত। কেননা, এই প্রকার ধর্মনিষ্ঠ আখ্যা সন্তোষ ও রক্ত নিস্তেজ থাকে। কলিজা থেকে উদ্ভূত ধর্মনিষ্ঠ অবস্থা এর বিপরীত। যখন মধ্যে আখ্যার প্রভাব বেশী, এখানে সেই ধর্মনিষ্ঠ বোঝানোই উপযুক্ত। সূরা হায্বার হৃৎপিণ্ডের ধর্মনিষ্ঠ অর্থে **وَلطيف** শব্দের ব্যবহার এর সমর্থন করে। আলোচ্য আয়াতে **وَلطيف** শব্দ ব্যবহার করে এর আভিধানিক অর্থের মধ্যে উক্ত প্রকার ধর্মনিষ্ঠ দাখিল আছে। সুতরাং উদ্দেশ্য এই যে, আমি জানার দিক দিয়ে তার আখ্যা ও মনের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ মানুষ নিজের হাল-অবস্থা যেমন জানে, আমি তার হাল-অবস্থা তার চাইতেও বেশী জানি। সেমতে মানুষ তার অনেক অবস্থা জানে না। যা জানে, তা-ও অনেক সময় ভুলে যায়। আত্মাহুতা'আনার সম্ভার এর অবকাশ নেই। যে ক্রম সর্বাধিক হয়, তা এক অধিক তার চাইতে নিশ্চিতই বেশী হবে। সুতরাং আত্মাহুত জ্ঞান যে মানুষের সব অবস্থার সাথে সম্পর্কিত ও প্রমাণিত করে দেয়। কিন্তু পর একে আরও জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম ও অবস্থা থেকে আত্মাহুত জ্ঞানই সংরক্ষিত হয়। বরং বাহ্যিক প্রত্যক্ষ মুখে বলা করার জন্য সেইসব ক্রিয়াকর্ম ফেরেশতাদের মাধ্যমে নিশ্চিত ও সংরক্ষিত করা হয়েছে। ইয়াকাসহর্বে : ) কখন দুইজন প্রহরীকর্মী ফেরেশতাদের ডাকে ও কাকে মাকে ( মানুষের ক্রিয়াকর্ম ) প্রহরীকর্মী ( ফেরেশতাদের ) মাধ্যমে নিশ্চিত করে। তাই **وَلطيف** শব্দ ব্যবহার করে, যেমন আত্মাহুত বর্ণনায় **وَلطيف** শব্দ ব্যবহার করে।

**ما تذكرون** — মানুষের

সব কাজকর্মের মধ্যে কথাবার্তা সর্বাধিক হালকা। কিন্তু এর অবস্থা এই যে) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছেই সদা প্রস্তুত প্রহরী আছে। (নেক কথা হলে ডান দিকের ফেরেশতা এবং অসৎ কথা হলে বাম দিকের ফেরেশতা তা নিশ্চিত করে। মুখে উচ্চারিত এক একটি বাক্যই যখন সংরক্ষিত ও নিশ্চিত আছে, তখন অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সংরক্ষিত হবে না কেন? পরকালীন জীবন ও ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান ও শাস্তির ভূমিকা হচ্ছে মৃত্যু। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্য মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইয়াকাসহর্বে মৃত্যু থেকে উপাসনাতার ফলস্বরূপ কিয়ামত স্মরণীয় করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে - হাশিয়ার হয়ে যাও। মৃত্যু-যরণা নিশ্চিতই (নিকটে) এসে গেছে (অর্থাৎ প্রত্যেকের মৃত্যু নিশ্চিতবর্তী)।



সদাশয় হবে না ( বরং তেমিরা সবাই জাহাডামে নিক্রিশত হবে ) এবং আমি (এ ব্যাপারে )  
মাশ্বাদের প্রতি কুলমকারী নই। ( বরং বাশ্বারামিজেরাই এমন অপকর্ম করে আশ্বাত্তার শক্তি  
ভোগ করবে ) ।

**আলোচ্য আয়াতের বিশ্লেষণ**

যদি হাদিস ও নশর অধীকরণ করত এবং হৃদয়ের জীমিত হওয়ারকে অধিকার-হুজি  
বহিষ্কৃত করত, পূর্বকর্তী জাহাডসমূহে তাদের অপর্গে এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে,  
ভোমর জাহাড তা'আলার ভান্নক নিজেদের ভান্নক মাসকপঠিতে গল্পমাগ করে রেখে।  
তাই এই ঘটকা মেধাঃদিয়ছে যে, হুতের দেহ-উপাসান হুজি কার পরিপত্ত হয়ে বিধে হুজিয়ে  
সড়সড় একমোকৈ কিভাবে একর করা সম্ভব হবে? কিন্তু অজাহাড তা'আলার বনোহেন ;  
সুশ্চিৎসতের প্রতিটি অপূঃনরমাণু আমার ভান্নক প্রাওতার রয়েছে। এমোকৈ স্বধন-ইছা  
একর করে দেওয়া আমার জন খোটেই কঠিন নয়। আমোচ্য আয়াতসমূহেও প্রাঃনর  
ভান্নক বিহুজিও সর্মমাগকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : মানুষের বিক্রিশত দেহ-  
উপাসান সম্পর্কে ভান্নী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের  
মিত্তিতে আগরিত করনাসমূহকেও সর্মসা ও সর্মবহুর জানি। বিতীর আয়াতে এর কামল  
কর্না করা হয়েছে যে, আমি প্রীবাহিত ধমনী অপর্গেও মানুষের অধিক নিকটবর্তী।  
কে ধরনীক উপর মানুষের জীবনে নির্ভরনীক, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, এতটুকু আমি  
নিকটবর্তী। তাই তার হাক-স্বধা কর তার চাইতে আমি বেশী জানি।

আজাহ প্রীবাহিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী—একখার তাৎপর্ষ :

نحن أقرب اليه من حول الوريد — অধিকাংশ তরসীরবিশেষের মতে এই আয়াতে

জানসত নিকট্য বোঝানো হয়েছে, জানসত নিকট্য উদ্দেশ্য নয়।  
আরবী ভাষায় (د) নামের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সময় শিরা-উপশিরা  
প্রবাহের শিরা সারা দেহেরক সঞ্চারিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ আন্তীর শিরা-উপশিরাকে  
দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক যা কনিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে বর্ষিতক  
পৌছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই (د) বলা হয়। দুই আন্বপিত  
থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের  
এই সূক্ষ বাষ্পকে রূই বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং বিতীর প্রকার শিরা  
চিকন হয়ে থাকে।

আমোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী (د) নামটি কনিজা থেকে  
উদ্ভূত শিরার অর্থে নেওয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আতি-  
ধানিক দিক দিয়ে (د) বলা যায়। কেননা এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চারিত হয়।  
এ হলে অজাহাতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃৎপিণ্ডের ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সূক্ষ বাষ্পের ও তাই  
এ শরীরে সঞ্চারিত হওয়া চাইকরণ, উল্লিখিত দুই অর্কার মধ্যে যে কোন একটিই হওয়া





সত্তা বোঝানো হয়নি, বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে : **أَزْيَنْتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ**

**قَتَلْتِي** শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া। **تَلَقَى**—

**أَدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ** অর্থাৎ নিম্নে নিম্নে আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে

কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে **مُتَلَقِينَ** বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে।

**عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ** অর্থাৎ তাদের একজন ডানদিকে থাকে

এবং সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বামদিকে থাকে এবং অসৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে।

**قَاعِدٌ** শব্দটি (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

**قَاعِدٌ** এর অর্থ **قَاعِدٌ** হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, **قَاعِدٌ** শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু **قَعِيدٌ** শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সঙ্গে থাকে, তাকে

**قَعِيدٌ** বলা হয়—উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরারত হোক। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে—সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরারত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী-সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আত্মাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্নাফ ইবনে কায়স (র)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন : এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বামদিকের ফেরেশতারও দেখাশুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে : এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সম্মত দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।—(ইবনে আবী হাতেম)

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা : হযরত হাসান বসরী (র) **عَنِ الْيَمِينِ**

**وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ** আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন :

হে আদম সন্তানগণ ! তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গোনাহ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশী কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বন্ধ করে তোমার প্রীত্বয় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে হবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلزَّمِنَةُ طَائِرَةٌ نِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا - اِقْرَأْ نَا بَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন : আল্লাহর কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মের হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, আমলনামা কোন পাখির কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে ঠট্টকা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্তু যার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কঠোর হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اَللّٰدِيْهِ

رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা

রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ বলেন : এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিস্বোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন : আল্লাতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা)-র এক রেওয়াজে উদ্ধৃত করেছেন, যম্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সম্বন্ধ সাধিত হয়। এই রেওয়াজেতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপি-বদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের

হৃৎস্পতিবার দিনে ক্ষেত্রেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিস্বোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক

আয়াতে আছে : **وَيَمَحُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ** -এর অর্থ তাই।

ইমাম আহমদ (র) হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুশনী (রা) থেকে যে রিওয়ায়েত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

মানুষ মাঝে মাঝে কোন ভাল কথা বলে। এতে আল্লাহ তা'আলা সম্মত হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর সওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সম্মতি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর অসম্মতির কোন বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গোনাহ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসম্মতি লিখে দেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আলকামাহ (র) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন : এই হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। —(ইবনে কাসীর)

**وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ**

—এর অর্থ মৃত্যু-স্বপ্না এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবু বকর ইবনে আব্দারী (র) হযরত মসরুরক (র) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মধ্যে স্বপ্ন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় : **أَذَا حَشْرَجْتَ هُوَ مَا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ**—অর্থাৎ আচ্ছা একদিন অস্থির হবে এবং বন্ধ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবু বকর (রা) শুনে বললেন : তুমি বুঝাই এই কবিতা পাঠ করেছে। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ**

**الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ** —ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র

মাঝে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٌ**—অর্থাৎ কালিমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন : মৃত্যু-স্বপ্না বড় সাংঘাতিক।

**بِالْحَقِّ**—এখানে **بِ** অব্যয়টি **تَعْدِيَّةً** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই

যে, মৃত্যু-সজ্জা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ মৃত্যু-সজ্জা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। --(মাযহারী)

تَعْبُدُ—نِ لَكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعْبُدُ শব্দটি حُدُّ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে

মাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যত সাধারণ মানুষকে এই সঙ্কোচন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরো-পুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি মতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয় : وَجَاءَتْ كُلُّ

نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ— এই আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কালেম হওয়ার কথা

আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سَائِقٌ থাকবে।

سَائِقٌ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيدٌ-এর অর্থ সাক্ষী। سَائِقٌ যে ফেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সব রেওয়াজেই একমত। شَهِيدٌ-সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কারও কারও মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিয়ামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

شَهِيدٌ সম্পর্কে কেউ বলেন : সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ-কেই شَهِيدٌ বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন : ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রা) খোতবায় এই আয়াত তিলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়দ (রা) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেল না :

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ—অর্থাৎ আমি তোমাদের

সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইবনে জরীর (র), ইবনে কাসীর প্রমুখের মতে মু'মিন, কাফির, মুতাকী ও ফাসিক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন : **الناس نهام فاذا ماتوا اتقوا**—অর্থাৎ আজিকার পাখিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

**قَالَ قَرِينَةُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ**—এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা যে

ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাভয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দুইটি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই **سائق** তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে **شهيد** তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌঁছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরম্ভ করবে : **هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ** অর্থাৎ তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন : এখানে **قرين** শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

**الْقِيَامَةِ—الْقِيَامَةِ** শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে

কোন ফেরেশতাভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যত পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে-কাসীর)

**قَالَ قَرِينَةُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَا**—**قرين** শব্দের আসল অর্থ যে সঙ্গে থাকে

এবং মিলিত। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আসল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাভয়কে যেমন মানুষের সঙ্গী হয়ে

থাকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে আহ্বান করে। আলোচ্য আয়াতে **قَرِينٍ** বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বজন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হলে যাবে, তখন এই শয়তান বলবে : পরওয়ারদিগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যত বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎ কাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বাঙ্ক কথা বলবে। উত্তরের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন :

لَا تَخْتَمُوا لِي وَ قَدْ صَدَّقْتُكُمْ بِالْوَعْدِ — অর্থাৎ আমার সামনে

বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওস্বরের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশী প্রহের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدِي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ — আমার কথা রদবদল

হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইন-সাফের ফয়সালা করেছি।

يَوْمَ نَقُولُ لِحَبَّاهُمْ هَلْ اٰمَنَّا وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۝ وَاٰزَلَمْتَ  
 الْجَنَّةَ لِّلْمُتَّقِيْنَ غَيْرِ بَعِيْدٍ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوْ اٰبِ حَفِيْظٍ ۝  
 مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ الْغَيْْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۝ ادْخُلُوْهَا سٰلِمِيْنَ  
 ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝ لَهُمْ تَاْيِسٰءٌ وَّوْنَ فِيْهَا وَ لَدَيْنَا مَّزِيْدٌ ۝

(৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' সে বলবে, 'আরও আছে কি?' (৩১) জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামীদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল— (৩৩) যে না দেখে দয়াময় জাহান্নামকে ভয় করত এবং বিনীত ভঙ্গরে উপস্থিত হত—(৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের দিন। (৩৫) তারা তথ্য যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখান থেকে হাশয়ের অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে। মানুষকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) সেদিন আমি জাহান্নামকে (কাফিরদের প্রবেশ করার পর) জিজ্ঞাসা করব : তুমি ভুলে গেছ কি? সে বলবে : আরও আছে কি? [কাফিরদেরকে আরও ডয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা, যাতে জওয়াব শুনে তাদের অন্তরে দোষের আতংক আরও বেড়ে যায় যে, আমরা কিরূপ ডয়ংকর ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। সে তো সবাইকে গ্রাস করতে চায়। জাহান্নামের তরফ থেকে 'আরও আছে কি' বলে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, এটাও সম্ভবত আল্লাহর দূশমন কাফিরদের প্রতি জাহান্নামের প্রচণ্ড ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরা মুজকে এই ক্রোধ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَهِيَ تَفُورٌ لَّكَأَنَّهَا تَمُزُّ مِنَ الْغَيْظِ

জাহান্নাম জওয়াবে একথা বলেনি যে,

তার পেট ভরেনি। সে ক্রোধবশতই আরও চেয়েছে। কাজেই এটা

لَا مَلَأْنَ جَهَنَّمَ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আস্রাতের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানব

যারা জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব। আস্রাতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করে দেওয়ার সাবেক ওয়াদা অনুযায়ী জিন ও মানবকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর জাহান্নাম এ কথাই বলতে থাকবে যে, আরও আছে কি? (ইবনে কাসীর) আস্রাতের বর্ণনা এই যে] আস্রাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌ভীরুদের অদূরে (এবং আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে বলা হবে : ) এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তোমাদের প্রত্যেক (আল্লাহর প্রতি আন্তরিক) অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আল্লাহকে ডয় করত এবং বিনীত অন্তরে (আল্লাহর কাছে) উপস্থিত হত। (তাদেরকে আদেশ করা হবে : ) তোমরা এই জাহান্নামে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন। তারা তখন যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে (তাদের প্রার্থিত বস্তু অপেক্ষা) আরও বেশী (নিয়ামত) আছে (যা জাহান্নামীরা কল্পনাও করতে পারবে না)। জাহান্নামের নিয়ামত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : জাহান্নামের নিয়ামত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহর দীদার।

## আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিবরণ

كَأَنَّهَا تَمُزُّ مِنَ الْغَيْظِ — অর্থাৎ আস্রাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক

অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আল্লাহকে ডয় করত এবং বিনীত অন্তরে (আল্লাহর কাছে) উপস্থিত হত। (তাদেরকে আদেশ করা হবে : ) তোমরা এই জাহান্নামে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন। তারা তখন যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে (তাদের প্রার্থিত বস্তু অপেক্ষা) আরও বেশী (নিয়ামত) আছে (যা জাহান্নামীরা কল্পনাও করতে পারবে না)। জাহান্নামের নিয়ামত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : জাহান্নামের নিয়ামত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহর দীদার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, শাবী ও মুজাহিদ বলেন : যে ব্যক্তি নির্জনতার গোনাহ্ স্মরণ ও ক্বমা প্রার্থনা করে, সেই **أَوْأَب** হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন : **أَوْأَب** এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসার আজাহ্ৰ কাছে গোনাহের জন্য ক্বমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, **أَوْأَب** ও **حَفِظْ** এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَمَّهْتُ مِنْ مَّجْلِي هَذَا

আজাহ্ পবিত্র এবং তাঁরই প্রশংসা। হে আজাহ্, আমি এই মজলিসে যে গোনাহ্ করছি, তা থেকে তোমার কাছে ক্বমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আজাহ্ তা'আলা তাঁর এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাক্ফ করে দেন। দোয়া এই :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আজাহ্, তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্বমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : **حَفِظْ** এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্‌সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। তাঁর কাছ থেকে অন্য এক রিওয়াদেতে আছে **حَفِظْ** এমন ব্যক্তি, যে আজাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবু হুরায়রাহ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে, সে **حَفِظْ** ও **أَوْأَب**। —(কুরতুবী)

مِنْهُب (বিনীত) —وَجَاءَ بِقَلْبٍ مِّنْهُبٍ—আবু বকর ওয়াররাক বলেন :

এর আলামত এই যে, সে আজাহ্‌র আদবকে সর্বদা চিন্তায় উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্ন হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا—অর্থাৎ জালালীরা জালাতে যা চাবে, তা-ই পাবে।

অর্থাৎ চাওয়া মান্নাই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রিওয়াদেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জালাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কান্নিক হুজ্জি—এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে মিল্পন হয়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর)



وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ—অর্থাৎ আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কল্পনাও

মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। ইযরত আনাস ও জাবের (রা) বলেন : এই বাড়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত তথা সাক্ষাৎ, যা জামাতীরা লাভ করবে। لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ আয়াতের

তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, জামাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।—(কুরতুবী)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا

فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ

لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْحَا سَمَهُ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْ

أَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ

قَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়নস্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে প্রবেশ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে, তৎক্ষণাৎ আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সঙ্গ্রহংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাাত্রি কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং মাসাযের পশ্চাতেও।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে (কৃষ্ণের কারণে) ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল এবং (সাংসারিক সাজ-সরঞ্জাম বাড়ানোর জন্য) দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত (অর্থাৎ শক্তিশালী হওয়ার পর জীবনোপকরণের

ক্লান্তও যথেষ্ট উন্নত ছিল ; কিন্তু যখন আশাব আসল, তখন ) তাদের পলায়নের স্থানও ছিল না। এতে ( অর্থাৎ ধ্বংস করার ঘটনায় ) তার অন্য উপদেশ রয়েছে, যে ( সমঝদার ) অন্তঃকরণশীল অথবা ( সমঝদার না হলে কমপক্ষে ) যে নিবিষ্ট মনে প্রবণ করে। ( প্রবণ করার পর সংক্ষেপে সত্য-বিশ্বাসী হয়ে যায়। যদি আল্লাহর কুদরতকে অক্ষম মনে করে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার করে থাক, তবে তা বাতিল। কারণ, আমার কুদরত এমন যে, ) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে ( অর্থাৎ দিনের সমান সময়কালের মধ্যে ) সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শও করেনি। ( এমতা-

বহায় মানুষকে পুনর্বীর সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُمُ غَمٌّ مِنْ غَمِّهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِمْ شَرٌّ مِنْ نَفْسِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِمْ شَرٌّ مِنْ نَفْسِهِمْ

তারা অনবরত অস্বীকারই করে যাচ্ছে ) অতএব আপনি সবার করুন ( অর্থাৎ দুঃখ করবেন না। যেহেতু কোনদিকে মনকে নিবিষ্ট করা ব্যতীত দুঃখের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই ইরশাদ হচ্ছে : ) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ( অর্থাৎ সকালের নামাযে ) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ( অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামাযে ) আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রিতেও তাঁর পবিত্রতা ( ও প্রশংসা ) ঘোষণা করুন ( এতে মগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে ) এবং ( ফরয ) নামাযের পশ্চাতেও ( এতে নফল ও ওজিফা দাখিল হয়ে গেছে। মোটকথা এই যে, আল্লাহর ষিকির ও ফিকিরে মশগুল থাকুন, যাতে তাদের কুকরী কথা-বার্তার দিকে ধ্যানই না হয় )।

আনুযায়িক ভ্রাতব্য বিষয়

تَنْقِبُوا نَقَبًا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ থেকে উদ্ধৃত।

এর আসল অর্থ ছিল করা, বিদীর্ণ করা। বাকপদ্ধতিতে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَحِيصٍ-এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভ্রুখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

ভানাজনের দুই পক্ষ : لِمَنْ كَانَ لَأَقَلِّبُ - হযরত ইবনে আক্বাস (রা)

বলেন : এখানে 'কল্ব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কল্ব

তথা অন্তর্করণ। তাই একে কল্প বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে কল্প বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কল্পের উপরই হায়াত ভিত্তি-শীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মূঢ় ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

— لِقَاءِ سَمِعَ — أَوِ التَّقَى السَّمْعِ وَهُوَ شَهِيدٌ

লাগিয়ে শোনা এবং শহীদ এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াত-সমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। এক যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে। দুই. অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিন্ট মনে শ্রবণ করে; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে মামহারীতে বলা হয়েছে : কামিল বুয়ুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরীদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

সেই থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ তা'আলার তসবীহ ( পবিত্রতা বর্ণনা ) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ করার মানে আসরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ'র বাচনিক এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

ان استطعتم ان تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب -

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায। এর প্রমাণ হিসাবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।—( কুরতুবী )

সেইসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ বার করে 'সোবহানালাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—( মামহারী )

— وَأَنَّ بَارَ السُّجُودِ — হযরত মুজাহিদ বলেন : سَجُود বলে ফরয নামায

বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেসব তসবীহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযিলত

প্রত্যেক কর্নশ নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক কর্নশ নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানালাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আলাহ আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ-দাহ লা শাকীকানাহ লাহল মুলকু ওয়াল্লাহল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুলি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের চেউয়ের সমান হয়।—(বুখারী-মুসলিম) কর্নশ নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, **أَدْبَارَ الشُّجُورِ** বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)

وَأَسْمُمْ يَوْمَ يُبَادُ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْعَوْنَ الْعَيْبَةَ  
بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا  
الْمَصِيرُ ۝ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا  
يَسِيرٌ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ  
بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝

(৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত মহানাদ শুনেতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটোছুটি করে বেগে হয়ে আসবে। এটা এখন সমবেত করা, যা আমার জন্য জতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। জতএব যে আমার শক্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, মনোযোগ সহকারে) শুন, যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা (অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল শিংগার কূ'ক দিয়ে মৃতদেরকে কবর থেকে বেগে হয়ে আসার জন্য) নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ আওয়াজটি নির্ধরে সবার কানে পৌঁছেবে, যেন নিকটতম স্থান থেকেই কেউ আহ্বান করছে।—দূরের আওয়াজ সাধারণত কারও কানে পৌঁছে এবং কারও কানে পৌঁছে না—এরূপ হবে না)। যেদিন মানুষ এই চিৎকার নিশ্চিতরূপে শুনেতে পাবে, সেদিনই (কবর থেকে) পুনরুত্থান দিবস। আমিই (এখনও) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন

(এতেও মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করার শক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে)। যেদিন ভূমণ্ডল তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) থেকে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তারা (বের হয়ে কিয়ামতের দিকে) ছুটীছুটি করবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (মোটকথা, কিয়ামতের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও কেউ না মানলে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা) তারা (কিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে) যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। (আমি নিজেই বুঝে নেব)। আপনি তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জোরজবরকারী নয়; (বরং শুধু সতর্ককারী ও প্রচারকারী) অতএব কোর-আনের মাধ্যমে (সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে এমন ব্যক্তিকে) উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে। [এতে ইঙ্গিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যদিও সবাইকে উপদেশ দেন এবং সবার কাছে প্রচার করেন, তবুও গুটিকতক লোকই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। অতএব বোঝা গেল যে, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। অতএব ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বিধায় এর জন্য চিন্তা কিসের?]

### আনুমানিক আভ্য বিষয়

يَوْمَ يَنَادُ الْمَنَادُ مَن مَّكَانٍ قَرِيبٍ—অর্থাৎ যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা

নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে আসাকির জায়দ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন : হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ। শুন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মায়হারী)

আম্মাতে কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুৎকার বর্ণিত হয়েছে, যম্বারা বিশ্বজগতকে পুনরু-জ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াজটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা বলেন : আওয়াজটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন : নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا—অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব

মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটীছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বললেন :

من ههنا الى ههنا تكشرون ركبانا ومشاة وتجررون على وجوهكم  
يوم القيامة -

এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উল্লিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَمَهْدٌ — অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে

ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (র) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ يَخَافُ وَمَهْدٌ وَ يَرْجُوا مَوْعِدَكَ يَا بَارِيَا رَحِيمٌ

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওম্মাদার আশা করে। হে ওম্মাদা পূরণকারী, হে দয়াময়।

سورة الزمر  
সূরা জাম্বিলাত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّرِيْعِ ذُرُوًّا ۝ فَالْحَمِيْدِ وِقْرًا ۝ فَالْجَبْرِیْتِ یُسْرًا ۝ فَالْمَقِيْمِ  
 اَمْرًا ۝ اِنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝ وَاِنَّ الدِّیْنَ كَوَاقِعٌ ۝  
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبْكِ ۝ اِنَّا كُنْمُ لَفِیْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝ یُؤْفِكُ عَنْهُ  
 مَنْ اُفِكَ ۝ قُتِلَ الْمُتْرُصُوْنَ ۝ الدِّیْنَ هُمْ فِیْ عَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝  
 یَسْئَلُوْنَ اَیَّانَ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ یَوْمَ هُمْ عَلَ النَّارِ یُفْتَنُوْنَ ۝ ذُوْقُوا  
 فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْمَلُوْنَ ۝ اِنَّ السَّعِیْنَ فِیْ  
 جَنَّتِ وَعُیُوْنَ ۝ اِخِذِیْنَ مَا اَنْتُمْ بِرَبِّهْمُ ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ  
 مُّحْسِنِیْنَ ۝ كَانُوْا قَلِیْلًا مِّنَ الْیَلِیْ مَا یُهْجَمُوْنَ ۝ وِیَالْاَسْحَارِ هُمْ  
 یَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ وَفِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّابِیْلِ وَالْحُرُوْمِ ۝ وَفِی الْاَرْضِ  
 اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ ۝ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝ وَفِی السَّمٰوٰتِ  
 رِشْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ ۝ فَوَرَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلُ  
 مَا اَنْتُمْ تُنطِقُوْنَ ۝

পড়তে করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে

(১) কসম স্বপ্নাবাহক, (২) জতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) জতঃপর মৃদু  
 চলমান জলধারের, (৪) জতঃপর কর্ম কটমকারী ফেরেশতাপদের, (৫) তোমাদেরকে প্রদত্ত

ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাক অবশ্যজ্ঞাবী। (৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে সৃষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরাও, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ছাত্ত। (১২) তারা জিতাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা জন্মিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শান্তি আশ্বাদন কর। তোমরা একেই ঘরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) আলাহ্‌তীরুরা জায়াতে ও প্রহরণে থাকবে (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেখেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সংকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা ঘেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্রমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বকিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে (২১) এবং তোমাদের নিজেরদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিখিক ও প্রতিশ্রুতি সবকিছু। (২৩) নতামগুল ও কুমগুলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম অনুযায়ী, অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের (অর্থাৎ সৃষ্টি) অতঃপর মৃদু-চলমান জলযানের, অতঃপর ফেরেশতাদের, যারা (আদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে) বস্তুসমূহ বণ্টন করে (উদাহরণত যেখানে যে পরিমাণ রিখিকের মূল উপাদান সৃষ্টির আদেশ হয়, মেঘমালার সাহায্যে সেখানে সেই পরিমাণ সৃষ্টি পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে হাদীসে আছে, জননীর গর্ভাশয়ে আদেশানুযায়ী নর ও নারীর আকার তৈরী করে। অতঃপর কসমের জওয়াবে বর্ণনা করা হচ্ছে : ) তোমাদেরকে প্রদত্ত (কিয়ামতের) ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং (কর্মসমূহের) প্রতিদান (ও শান্তি) অবশ্যজ্ঞাবী (এসব কসমের মধ্যে প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ আলাহ্‌র কুদরতের বলে এসব আশ্চর্য কর্মকাণ্ড হওয়া সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রমাণ। অতঃপর, এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে কিয়ামত সংঘটিত করা মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বাক্যের কসম খাওয়া হয়েছে সেসবের তফসীর দুই-তিন মনসুরের এক হাদীস দ্বারা পরে বর্ণিত হবে। বিশেষভাবে এসব বস্তুর কসম খাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এতে সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেমতে ফেরেশতা উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট এবং বাতাস ও জলযান অধঃজগতের সৃষ্ট এবং মেঘমালা শূন্য জগতের সৃষ্ট। অধঃজগতের দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি চোখে দৃষ্টিগোচর হয় এবং অপরটি হয় না। এরাপ দুটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত সম্পর্কিত এক বিষয়বস্তুতে যোদ আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে, যেমন উপরে উর্ধ্বজগত সম্পর্কিত বস্তুসমূহের ছিল। অর্থাৎ কসম আকাশের, যাতে (ফেরেশতাদের চলার) পথ আছে, (যেমন আলাহ্‌ বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْكُمْ سَبْعَ طَرَأْتِنِ ۚ

(অতঃপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে : ) তোমরা



বলে। আল্লাহ বলেন : **مِنَ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ** — আকাশের

কসম দ্বারা সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জাহ্নাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে। কিন্তু যে সত্য বিষয়ে মতবিরোধ করবে, তার জন্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এসব মতবিরোধকারীদের মধ্যে) সে-ই (কিয়ামতের বাস্তবতা ও প্রতিদানের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরায়, যে (পুরোপুরিভাবে পূণ্য ও সৌভাগ্য থেকে) বঞ্চিত : (যেমন হাদীসে আছে,

**من حرمه فقد حرم الشهر كله** — অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে

সব পূণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। মতবিরোধকারীদের অপরপক্ষ অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে সত্য বলে, তাদের অবস্থা এরই মুকাবিলা থেকে জানা যায় যে, তারা পূণ্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। অতঃপর বঞ্চিতদের নিন্দা করে বলা হচ্ছে : ) যারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, তারা ধ্বংস হোক, ( অর্থাৎ যারা কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই কিয়ামতকে অস্বীকার করে ) যারা মুখতাবশত উদাসীন। ( তারা ঠাট্টা ও দ্বন্দ্বিত্বিত করার ভঙ্গিতে ) জিজ্ঞাসা করে : প্রতিফল দিবস কবে হবে ? ( জওয়াব এই যে, সেদিন হবে ) যেদিন তারা অগ্নিদগ্ধ হবে ( এবং বলা হবে : ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আন্দান কর। তোমরা একেই দ্বন্দ্বিত্বিত করতে চেয়েছিলে। ( এই জওয়াবটি এমন, যেমন ধরুন, একজন অপরাধীর জন্য ফাঁসিতে ঝুলানোর আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোকা ফাঁসির তারিখ না বলার কারণে আদেশ-টিকে কেবল মিথ্যাই মনে করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, ফাঁসি কবে হবে ? এই প্রশ্নটি যেহেতু হঠকারিতা প্রসূত, তাই জওয়াবে তারিখ বলার পরিবর্তে একথা বলাই সম্ভব হবে যে, সেদিন তখন আসবে, যখন তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর অপরপক্ষ অর্থাৎ মু'মিন ও সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের সওয়াব বর্ণিত হচ্ছে : ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা জাহ্নাতে প্রস্রবণে থাকবে এবং তারা ( সানন্দে ) গ্রহণ করবে, যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। ( কেননা ) তারা ইতিপূর্বে ( অর্থাৎ দুনিয়াতে ) সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

( সূত্রাৎ **هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ** এর ওয়াদা অনুযায়ী তাদের

সাথে এই ব্যবহার করা হবে। এরপর তাদের সৎকর্মপরায়ণতার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে : ) তারা ( ফরয ও ওয়াজিব পালন করার পর নফল ইবাদতে এতই লিপ্ত থাকত যে ) রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত ( অর্থাৎ বেশী ভাগ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ইবাদতকে তেমন কিছু মনে করত না ; বরং ) রাতের শেষ প্রহরে ( নিজেদেরকে ইবাদতে ঝুটিকারী মনে করে ) তারা ক্রমা প্রার্থনা করত। ( এ হচ্ছে দৈহিক ইবাদতের অবস্থা )। এবং ( আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে, ) তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের (সবার) হক ছিল [ অর্থাৎ এমন নিয়মিত দান করত, যেন তাদের কাছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের পাওনা আছে। এখানে আয়তের উদ্দেশ্য যাকাত নয় এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, জাহ্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং এখানে যাকাত নয় এমন দান বোঝানো হয়েছে। (দুররে-মনসুর) আয়তের উদ্দেশ্য একরূপ নয় যে, জাহ্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং জাহ্নাতের উচ্চস্তরের অধিকারীদের

কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাকিররা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই অতঃপর এর প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ] বিশ্বাসকারীদের ( অর্থাৎ বিশ্বাস করার চেষ্টাকারীদের ) জন্য ( কিয়ামতের সত্তাব্যতা বিষয়ে ) পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন ( ও প্রমাণ ) রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও ( রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থাও কিয়ামতের সত্তাব্যতার প্রমাণ। এসব প্রমাণ যেহেতু সুস্পষ্ট, তাই শাসানির ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে : ) তোমরা কি ( মতলব ) অনুধাবন করবে না ? ( কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কিয়ামতেই বিশ্বাসী নও। এসম্পর্কে কথা এই যে ) তোমাদের ঝিষিক এবং ( কিয়ামত সম্পর্কে ) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেসব ( অর্থাৎ সেসবের নিদিষ্ট সময় ) আকাশে ( লওহে মাহফুযে ) লিপিবদ্ধ আছে। ( এর নিশ্চিত জ্ঞান পৃথিবীতে কোন উপযোগিতার কারণে নাথিল করা হয়নি। সেমতে وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ) আয়াতেও নিদিষ্ট সময় বলা হয়নি। চাক্ষুষ

অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, বৃষ্টির নিদিষ্ট দিন কারও জ্ঞান থাকে না। কিন্তু নিদিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যখন ঝিষিক নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়, তখন নিদিষ্ট তারিখ জ্ঞান না থাকার কারণে কিয়ামত না হওয়া কিরূপে জরুরী হয়ে যায়? এরূপ প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করার কারণেই مَا تُوْعَدُونَ এর সাথে رُزُقِكُمْ-কে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অতএব যখন কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ নেই এবং হওয়ার প্রমাণ আছে, তখন ) নভো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, এটা ( অর্থাৎ কর্মফল দিবস ) সত্য ( এবং এমন নিশ্চিত ) যেমন তোমরা কথাবার্তা বলছ। ( এতে কখনও সন্দেহ হয় না, তেমনি কিয়ামতকেও নিশ্চিত জ্ঞান কর )।

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

সূরা যারিন্নাতেও পূর্বেকার সূরা কাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। এক. **الْمَقْسَمَاتِ وَقُرْأُ** দুই. **الذَّارِيَّاتِ ذُرُوْأُ** তিন.

—**الْمَقْسَمَاتِ أَمْرَأُ** এবং চার. **الْجَارِيَّاتِ يُمْسَرَأُ**

ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) ও আলী মোর্তাযা (রা)-র উক্তি এই বস্তু চতুষ্টয়ের তফসীর এরূপ বলিত হয়েছে :

حاملات وقرأ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট বনঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে।  
 -এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে।  
 جاريات  
 مقسمات أمرا বলে পানিতে সম্বল গতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে।  
 এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কল্ট ও সুখ বণ্টন করে।—( ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসুর )

حِبْكَ—شكّة حبي—وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ أَنْكُمْ لَغِيٌّ قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ

এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও  
 حبي বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ  
 পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং  
 তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফ-  
 সীরবিদ এখানে حبي-এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা  
 ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম  
 খাওয়া হয়েছে, তা এই : أَنْكُمْ لَغِيٌّ قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ—বাহ্যত এতে মুশরিকদেরকে  
 সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উক্তি করত  
 এবং কখনও উম্মাদ, কখনও হাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত।  
 মুসলিম ও কাফির নিবিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও  
 আছে, তখন 'বিভিন্ন রূপ উক্তির' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র  
 প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ  
 করে।—( মায়হারী )

انك—يؤنك عنك من انك—এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো।

عنك—এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। এক. এই সর্বনাম দ্বারা কোর-  
 আন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই  
 মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

দুই. এই সর্বনাম দ্বারা قول مختلف (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে।  
 অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোর-  
 আন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قَتَلَ الْغُرَّاءُ—قَتَلَ الْغُرَّاءُ صُونَ—এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক

উক্তিকারী। এখানে সেই কাফির ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—(মাহহারী) কাফিরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মু'মিন ও পরহিযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতে রাগ্নি জাগরণ ও তার বিবরণ : كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَمُونَ

— هَجَمُوا শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাগ্নিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মু'মিন পরহিযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আত্মাহ তা'আলার ইবাদতে রাগ্নি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহিযগারগণ রাগ্নিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : এখানে هَجَمُوا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাগ্নির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামায ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাগ্নির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা)-র মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (র) বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী (র)-র বর্ণনামতে আহ্নাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই : আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহ্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, উর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ, তারা রাগ্নিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশী করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহ্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আত্মাহ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। আত্মাহর রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জাহ্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে এবং না আত্মাহর রহমতে জাহ্নামবাসীদের সাথে খাপ খায়। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কোরআন পাক নিশ্চিন্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে :

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

—অর্থাৎ যারা ভালমন্দ ক্রিয়াকর্ম

মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আবদুর রহমান ইবনে মায়দে (রা) বলেন : বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল : হে আবু উসামা, আল্লাহ্ তা'আলা পরহিসগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ **كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ**), আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জওয়াবে বললেন :

طوبى لمن رقد اذا نعى واتقى الله اذا استيقظ

সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করে না।— (ইবনে কাসীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গোনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وانشوا السلام  
وصلوا بالليل والناس نهام تدخلوا الجنة بسلام -

লোক সকল! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামায পড়, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(ইবনে কাসীর)

রাত্রির শেষ প্রহরে কমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত : **وَبِالْآسَاءِ وَهُمْ**

**يَسْتَغْفِرُونَ** অর্থাৎ মু'মিন পরহিসগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে কমা প্রার্থনা করে। **سَعْرٌ** শব্দটি **سَعْرٌ** এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে কমা প্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে : **وَالْمُسْتَغْفِرِينَ**—

**بِالْآسَاءِ** সহীহ হাদীসের সব কয়টি কিভাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্

তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না)। তিনি ঘোষণা করেন : কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোন কমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি কমা করব?—(ইবনে কাসীর)

এখানে প্রাধান্যমোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্রমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহিযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাসুলিতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্রমা প্রার্থনা করার বাহ্যত কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্রমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাসুলি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন গোনাহের কারণে ক্রমা প্রার্থনা করে ?

জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার অধ্যাক্ষ জানে জানী এবং আল্লাহর মাহাম্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহর মাহাম্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ছুটি ও অবহেলার কারণে ক্রমা প্রার্থনা করেন। —(মাহহারী)

সদকা-খরচাকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ : **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ**

**سَائِلٌ—لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ** বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহায্য করে **م** বলে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মু'মিন-মুতাকীদে এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কেবল ডিক্কুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের ষোঁজখবর নেয়।

বলা বাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন-মুতাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামায ও রাসুলি জাগরণ করেছে ক্ষান্ত হয় না; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ডিক্কুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে

নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত **وَفِي**

**أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ** বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিষয়চর্চার ও ব্যক্তিসত্তা উত্তরের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে :

**وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْتِنِينَ**—অর্থাৎ বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে

কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে ( পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফিরদের অবস্থা ও অণ্ড পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে)। অতঃপর মু'মিন পরহিযগারদের অবস্থা, গণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফির ও কিয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোক্তে

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে

অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে একেও মু'মিন-মুতাকীদেই গণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং **سَوْتَيْنِ**—এর অর্থ আগের **مُتَقِينِ**—ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা

বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: **وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, ফল ও বাগবাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক-একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ায় হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্যুকাল জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ — এ স্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও

শূন্য জগতের সৃষ্ট বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে: ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক-একটি অঙ্গকে আল্লাহর কুদরতের এক-একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হাদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে এককোঁটা মানবীর বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিহমর হড়ানো সূর্য উপাদানের নির্ভাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো-বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুখী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইকির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আন করার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেহাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অধিতীয় ও অনুপম।

**فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—স্বয়ং তার অভিজ্ঞের মধ্যেই দিবারাজ প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অজ্ঞ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **أَفَلَا تَهْتَفُونَ**

অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জান-বুদ্ধির দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

**وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ**—অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিযিক

ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ ‘লওহে-মাহফুযে’ লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিযিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেষ্টা করে তবে রিযিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে সৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিযিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। —(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্য জগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। **وَمَا تُوعَدُونَ** বলে আয়াত ও তার নিয়ামতরাজি বোঝানো হয়েছে।



إِنَّ لِحَقِّ مَثَلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ — অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেরদের কথাবার্তা

বক্তার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আশ্বাদন করা, স্পর্শ করা ও স্মরণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাদি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিল্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِينَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ  
فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ فَرَأَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِجِلِّ  
سَمِينٍ ۖ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ۖ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۖ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ  
قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۖ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَ  
فَصَكَتَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۖ قَالُوا كَذَلِكِ ۖ قَالَ رَبِّكِ  
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ

ارْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ۖ لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةٌ مِّنْ  
طِينٍ ۖ مُّسَوَّمَةٌ ۖ عِنْدَ رَبِّكَ لِلنُّسْرِفِينَ ۖ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ  
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ  
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ وَفِي  
مُؤْتَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۖ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ  
وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۖ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَةً فَبَدَأْنَاهُمْ فِي آلِ  
يَمُوتِ

وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝ مَا  
 تَذَرُونَ شَيْءًا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالذَّرِيمِ ۝ وَفِي ثُودَادٍ قِيلَ  
 لَهُمْ تَسْبَعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصُّوقَةُ  
 وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَسَبِّحِينَ ۝  
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝

(২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : সালাম, তখন সে বলল : সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক! (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি মৃতপক্ষ মোটা গোবৎস নিয়ে হাশির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল : তোমরা আহ্বার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল : ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জানীভগ্নী পুস্তসন্ধানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী টিংকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল : আমি তো বৃদ্ধা বয়্যা। (৩০) তারা বলল : তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজাময়, সর্বভ। (৩১) ইবরাহীম বলল : হে প্রেরিত ক্ষেত্রেশতাপণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল : আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ভিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ইমানদার ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রপাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মুসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল : সে হয় শাদুকর, না হয় পাদল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল : তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামুদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে

পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার কাছে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? [ 'সম্মানিত' বলার এক কারণ এই যে, তারা ফেরেশতা ছিল। ফেরেশ-

তাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে  $\text{بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ}$  বলা হয়েছে। অথবা এর

কারণ ছিল এই যে, ইবরাহীম (আ) স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে সম্মান করেছিলেন। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে 'মেহমান' বলা হয়েছে। কারণ, তাঁরা মানুষের বেশে আগমন করেছিল। এই বৃত্তান্ত তখনকার ছিল, ] যখন তারা (মেহমানরা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করল, তখন ইবরাহীম (আ)-ও (জওয়াবে) বললেন : সালাম। ( আরও বললেন : ) অপরিচিত লোক (মনে হয়। বাহ্যত তিনি একথা মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। কারণ, এরপর ফেরেশতাদের কোন উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। একথা সরাসরি তাদেরকে বলে দেওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে যে, আপনাদেরকে তো চিনলাম না। আগন্তুক মেহমানরা এর কোন জওয়াব দেয়নি এবং ইবরাহীম (আ)-ও জওয়াবের অপেক্ষা করেন নি। মোটকথা এই সালাম ও কালামের পর ) তিনি গৃহে গেলেন এবং একটি মোটা গোবৎস ডাজ্জা (  $\text{لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ بَعْجَلْ حَنُودٌ}$  ) নিজে হাবির হলেন। তিনি গোবৎসটি তাদের সামনে

রাখলেন। [ তারা ফেরেশতা ছিল বিধায় আহার করল না। তখন ইবরাহীম (আ)-এর সন্দেহ হন এবং ) বললেন : তোমরা আহার করছ না কেন? ( এরপরও যখন আহার করল না, তখন ) তাদের সম্পর্কে তিনি শংকিত হলেন (যে এরা শত্রু কিনা, কে জানে, স্মরণ সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে)। তারা বলল : আপনি ভীত হবেন না। (আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা। একথা বলে) তারা তাঁকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল, যে জানীওণী (অর্থাৎ নবী) হবে। [ কেননা, মানবজাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জানী হন। এখানে হযরত ইসহাক (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এসব কথাবার্তা চলছিল, ইতিমধ্যে ] তাঁর

স্ত্রী (হযরত সারা, যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন,  $\text{لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ أَمْرٌ أُنْتُمْ قَائِمَةٌ}$ ,

সন্তানের সংবাদ শুনে) চিৎকার করতে করতে সামনে এলেন। অতঃপর ফেরেশতার

যখন তাঁকেও এই সংবাদ শোনাল  $\text{لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَبَشِّرْ نَاهَا بِمَا سَعَتْ}$ —তখন

আশ্চর্যান্বিতা হয়ে ) মুখ চাপড়িয়ে বললেন : ( প্রথমত ) আমি বৃদ্ধা ( এরপর ) বয়সী।

( এমতাবস্থায় সন্তান হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার বটে, ) ফেরেশতারা বলল : ( আশ্চর্য হবেন না

$\text{لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَتَعْجَبِينَ}$  ) আপনার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি

প্রভাময়, সর্বভ। ( অর্থাৎ বিশ্বরাটি বাস্তবে আশ্চর্যের হলেও আপনি নবী-পরিবারের লোক, জানে-ভূপে ধন্য। আল্লাহর উক্তি জেনে আশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়)। ইবরাহীম (আ) (নবীসুলভ দূরদর্শিতা দ্বারা জানতে পারলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া তাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য আছে। তাই) বললেন : হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? তারা বলল : আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের ( অর্থাৎ কওমে লুতের ) প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করি—যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনান্ন পালনকর্তার কাছে ( অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে ) চিহ্নিত আছে। ( সূরা হুদে তা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বললেন : যখন আযাবের সময় ঘনিয়ে এল, তখন ) সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। ( এতে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের আর কোন গৃহই ছিল না। কারণ, যার অস্তিত্ব আল্লাহ জানেন না, তা মওজুদ হতেই পারে না )। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেথায় ( চিরকালের জন্য ) একটি নিদর্শন রেখেছি এবং মুসা (আ)-র হৃদয়েও নিদর্শন রয়েছে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ( অর্থাৎ মো'জেযা )-সহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে পারিষদবর্গসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল : সে হয় যাদুকর, না হয় উম্মাদ। অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম ( অর্থাৎ নিমজ্জিত করলাম )। সে শাস্তিযোগ্য কাজই করেছিল এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর অন্তঃস্থ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। এই বায়ু যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল ( অর্থাৎ ধ্বংসের আদেশপ্রাপ্ত যেসব বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, ) তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। আরও নিদর্শন রয়েছে সামুদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল : [ অর্থাৎ সালেহ্ (আ) বলেছিলেন : ] কিছুকাল আরাম করে নাও। ( অর্থাৎ কুফর থেকে বিরত না হলে কিছুদিন পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে )। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। ( অর্থাৎ এই আযাব খোলাখুলিভাবে আগমন করল )। অতএব, তারা না দাঁড়াতে সক্ষম হল ( বরং উপুড়

হয়ে পড়ে রইল **لَقَوْلِهِ تَعَالَى جَاثِمُونَ** ) এবং না কোন প্রতিকার করতে পারল। ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও এ অবস্থা হয়েছিল। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

### আনুষ্ঠানিক আভ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলজাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবরাহীম **سَلَامًا** فَقَالُوا سَلَامًا—ফেরেশতাগণ বলেছিল **سَلَامًا** قَالَ سَلَامًا

(আ) জওসাবে বললেন **سَلَامًا** কেননা, এতে সার্বজনিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে।

কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قوم منكروں শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহকেও منكر বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তাই মনে মনে বললেন : এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

روغ راغ-راغ إِلَىٰ آهْلِهِ শব্দটি থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া।

উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি : ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহায্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই যবেহ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না; বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহায্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন

آلَاتَا كُلُون — অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না।

এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ — অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তাদের না খাওয়ার কারণে

তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহায্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহায্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

صِرَّةٌ — صِرَّةٌ — فَاقْبَلْتِ امْرَأَتَهُ فِي صِرَّةٍ এর অর্থ অসাধারণ আওয়ায। কলসের

শব্দকে صرير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর

গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত

হয়ে গেল। তিনি বললেন :

عَجُوزٌ عَقِيمٌ

অর্থাৎ প্রথমত আমি বৃদ্ধা,

এরপর বন্ধ্যা। মৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্থক্যে এটা

কিরাপে সম্ভব হবে? জওয়ারবে ফেরেশতাগণ বলল :

كَذَلِكَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর ছিল।—(কুরতুবী)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্র ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নামিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নিমিত্ত কংকর

দ্বারা হবে।

مَسْمُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ

অর্থাৎ কংকরগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে

বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাৎগমন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লূতের আযাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তর বর্ষণের পরিপন্থী নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ডুখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মুসা (আ)-র সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউনকে যখন মুসা (আ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে :

فَقَوْلِي بَرَكْنَةُ

অর্থাৎ ফিরাউন মুসা (আ)-র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনা-

বাহিনী ও পার্শ্বদবর্গের উপর ডরসা করে।

رُكْنٍ

এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত

লূত (আ)-এর বাক্য

أَوْأَوِيَ إِلَى رُكْنٍ مَّهِدِيدٍ

এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর 'আদ সম্প্রদায়, সামুদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَالسَّمَاءِ بَيْنَيْهَا بَايُودٍ وَإِنَّا لَكُوسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضِ قَرَشْنَهَا فَانِعَمَ

الْمَهْدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَخْلَقْنَا زُوجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾  
 فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ  
 إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝ اتَّوَصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ  
 قَوْمٌ طَآغُوتٌ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ۝ وَذَكَرْنَا لِلذَّكَرَةِ  
 تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

(৫৭) আমি খাঁর ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাসালী। (৫৮) আমি ভূমিকে বিছিরেছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (৫৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হাদয়ঙ্গম কর। (৬০) অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুন্দর সতর্ককারী। (৬১) তোমরা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুন্দর সতর্ককারী। (৬২) এমনভাবে, তাদের পূর্ব-বর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে : যাদুকর, না হয় উম্মাদ। (৬৩) তারা কি একে অপনকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে ? বস্তুত তারা দু'টি সম্প্রদায়। (৬৪) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৬৫) এবং বোঝাতে থাকুন ; কেননা, বোঝানো মু'মিনদের উপকারে আসবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (নিজ) ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতাসালী। আমি ভূমিকে বিছানা ( স্বরূপ ) করেছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। ( অর্থাৎ এতে কত চমৎকার উপকারিতা নিহিত রেখেছি। আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছি, এই প্রকারের অর্থ বিপরীত পক্ষ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কোন-না-কোন সত্যগত ও অসত্যগত গুণ এমন রয়েছে, যা অন্য বস্তুর গুণের বিপরীত। ফলে এক বস্তুকে অপন বস্তুর বিপরীত গণ্য করা হয়, যেমন আকাশ ও পাতাল, উদ্ভাগ ও শৈত্য, মিষ্ট ও তিক্ত, ছোট ও বড়, সূত্রী ও কুত্রী, সাদা ও কাল এবং আলো ও অন্ধকার )। যাতে তোমরা ( এসব সৃষ্টি বস্তুর মাধ্যমে তওহীদকে ) হাদয়ঙ্গম কর। ( হে পন্থগম্বর ! তাদেরকে বলে দিন, যখন এসব সৃষ্টি বস্তু প্রকৃতির একত্র বোঝায়, তখন ) তোমরা ( অর্থাৎ তোমাদের উচিত, এসব প্রমাণের ভিত্তিতে ) আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, ( তদুপরি ) আমি তোমাদের ( বোঝানোর ) জন্য আল্লাহর

পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী (যে, তওহীদের অমান্য করলে শাস্তি হবে। কাজেই তওহীদের বিশ্বাস আনতে জরুরী। আনতে স্পষ্ট করে বলাই : ) তোমরা আজাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য ছিন্ন করো না। ( তওহীদের বিশ্বাসবশত শকাবতের বর্ণনার কারণে সতর্ককরণের ভাবী-দার্থে বলা হচ্ছে : ) আমি তোমাদের ( বোঝানোর ) জন্য আজাহর তরফ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী। ( অতঃপর আজাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন : আপনি মিসঃসেপেহে স্পষ্ট সতর্ককারী কিন্তু আপনার বিরোধী পক্ষ এত মূর্খ যে, তারা আপনাকে কখনও হাদুকর, কখনও উম্মাদ বলে। অতঃপর আপনি সবার করুন। কেমনা, তারা যেমন আপনাকে বলেছে, ) এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা ( সবাই অথবা কতক ) বলেছে : হাদুকর, না হর উম্মাদ। ( অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মুখে একই কথা উচ্চারিত হওয়ার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে : ) তারা কি একে অপসাকে এ বিষয়ের ওসীরত করে এসেছে ? ( অর্থাৎ এই ঐকমত্য তো এখন, যেমন একে অপসকে বলে গেছে, দেখ যে রসূলই আগমন করে, তোমরা তাকে আমাদের মতই বলবে। অতঃপর বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, একে অপসকে এ বিষয়ে কোন ওসীরত করিনি। কেমনা, এক সম্প্রদায় অপস সম্প্রদায়ের সাথে দেখাও করেনি। বরং ঐকমত্যের কারণ এই যে ) তারা সবাই অবাধ্য সম্প্রদায় ( অর্থাৎ অবাধ্যতার যখন তারা অতিক্রম, তখন উক্তিও অতিক্রম হয়ে গেছে )। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন ( অর্থাৎ তাদের মিথ্যাবাদী বলার পরোয়া করবেন না )। এতে আপনি অপস্রাধী হবেন না। বোঝাতে থাকুন কেমনা, বোঝানো ( হাদেকের ভালো ঈমান নেই, তাদেরকে জন্দ করার কাজে আসবে এবং হাদেক ভালো ঈমান আছে, সেই ) ঈমানদারদেরকে ( এবং যারা পূর্ব থেকে মু'মিন, তাদেরকেও ) উপকার দেবে। (মোট কথা, উপদেশ দানের মধ্যে সবাইই উপকার আছে। আপনি উপদেশ দিয়ে যান এবং ঈমান না আনার কারণে দুঃখ করবেন না )।

### আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আজাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিবাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সঙ্গ্রাম করা হয়েছে এবং রিসাজতে বিশ্বাস স্থাপনের ভাবীদ রয়েছে।

بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

এ বলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তরসীরই করেছেন।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ



(রা) বলেন : উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ থেকে ছুটে পাল্লাও। আবু বকর ও সাররাক ও সুনায়দ বাগদাদী (র) বলেন : প্রকৃতি ও শরতান মানুষকে গোনাহর দিকে দাওয়াত ও প্রয়োচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।—(কুরতুবা)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۗ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ  
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝  
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ  
قَوْلِي لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

(৫৬) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহ্বাৰ্থ যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা, শক্তিশালী, পরাক্রমত। (৫৯) অতএব এই জাতিমদের প্রাণ্য ভাই, যা তাদের অতীত সহচরদের প্রাণ্য ছিল। কাজেই তারা যেন আমার কাছে তা ভাড়াভাড়া না চায়। (৬০) অতএব কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

### তরুসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রকৃতপক্ষে) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি (এখন আনুশঙ্গিকভাবে ও ইবাদতের পূর্ণতার খাতিরে জিন ও মানব সৃষ্টির ফলে অন্যান্য উপকারিতা অজিত হওয়া আল্লাতের পরিপন্থী নয়। এমনভাবে কতক জিন ও কতক মানব দ্বারা ইবাদত সংঘটিত না হওয়াও এই বিশ্ববস্তুর প্রতিকূলে নয়। কেননা, <sup>৯৩৮-</sup> لِيَعْبُدُونِ

—এর সারসর্ম্ম হচ্ছে তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা —ইবাদত করতে বাধ্য করা নয়। শুধু জিন ও মানবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে ইচ্ছাধীন ও স্বৈচ্ছা-প্রণোদিত ইবাদত বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের মধ্যে ইবাদত আছে বাটে; কিন্তু তা স্বৈচ্ছা-প্রণোদিত ও পরীকার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু তথা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির ইবাদত ইচ্ছাধীন নয়। মোট কথা এই যে, তাদের কাছে আইনগত দাবী হল ইবাদত। এছাড়া আমি তাদের কাছে (সৃষ্ট জীবের) জীবিকা দাবী করি না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহ্বাৰ্থ যোগাবে। আল্লাহ নিজেই সবার রিষিকদাতা (কাজেই সৃষ্ট জীবকে রিষিকদানের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই), শক্তিশালী,

পরাক্রান্ত। (অপারকতা, দুর্বলতা ও অভাব-অনটনের কোন যৌক্তিক সম্ভাবনাও নেই। কাজেই আহাৰ্শ চাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন জীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যখন ইবাদতের অপরিহার্শতা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং ইবাদতের প্রধান অঙ্গ ইমান, তখন এরা এখনও শিরক ও কুফরকে অঁকড়ে থাকলে শুনে রাখুক) এই জালিমদের প্রাপ্য শাস্তি আল্লাহর জানে ভাই (নির্ধারিত), যা তাদের (অতীত) সমমনাদের প্রাপ্য (নির্ধারিত) ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধী জালিমের জন্য আল্লাহর জানে বিশেষ বিশেষ সমস্ত নির্ধারিত আছে। প্রত্যেক অপরাধীকে পালান্ধবে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয় —কখনও ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে এবং কখনও শুধু পরকালে)। অতএব তারা যেন আমার কাছে তা (অর্থাৎ আযাব) তাড়াতাড়ি না চায়, (যেমন এটাই তাদের অভ্যাস। তারা সতর্কবাণী শুনে মিথ্যারোপ করার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি আযাব চাইতে থাকে)। অতএব (যখন পালার দিন আসবে, যার মধ্যে কঠোরতর দিন হচ্ছে প্রতিশ্রুত দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, তখন) কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (খোদ এই সূরাও এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা শুরু হয়েছিল : **أَنَّمَا تُوْعَدُونَ لِمَادِقٍ** এবং ইতিও এই প্রতিশ্রুতির উপর করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে সূরার অলংকারগত সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে)।

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য : **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্য দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক. যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কাজ করা অসম্ভব। দুই. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মু'মিন জিন ও মু'মিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। বলা বাহুল্য, যারা মু'মিন, তারা কমবেশী ইবাদত করে থাকে। সাহাহাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিত এই আয়াতের এক কিরা'আত **مُؤْمِنِينَ** শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ

করা হয়েছে **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

এই কিরা'আত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে

তফসীরের সান্ন-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তি মূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আল্লাহ্‌র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক আল্লাহ্‌গুদস্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসম্মত্বহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সন্ন তফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সম্মত প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃডকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্ররুতিতে বিনষ্ট করে দেয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

অর্থাৎ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه

প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলিমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব তফসীরের সান্ন-সংক্ষেপে এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ—অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে

সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহ্বার্থ যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড় লোকই হোক না কেন—কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাতে এবং রুযী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্ব। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذُنُوبًا—শব্দের আসল অর্থ কুস্মা থেকে পানি তোলার বড় বাজতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুরাণুলোতে পানি তোলার পাল্লা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাল্লা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذُنُوب শব্দের অর্থ করা হয়েছে পাল্লা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উল্লেখিতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পাল্লা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পাল্লায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পাল্লা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহর আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন দ্রুত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পাল্লা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পাল্লাও এল বলে। কাজেই তাড়াহড়া করো না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ۝ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ۝ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ۝ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝  
 وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝  
 مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ  
 سَيْرًا ۝ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ  
 يَلْعَبُونَ ۝ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۝ هُنَّ النَّارُ الَّتِي  
 كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ۝ أَفَصَعْرُ هَذَا أَزَنُّ لَمْ تَكُنْتُمْ لَهَا تَبصُّرُونَ ۝ أَصَلَوْهَا  
 فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ۝ فَلِهِنَّ جَمَّاتُهُمْ  
 رُءُوسُهُمْ وَوَقَّتَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّحْتُهُمْ بِخُورٍ  
 عَيْنٍ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ  
 ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۝ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝  
 وَامْدَدْنَاهُمْ بِقَاهِهِمْ وَلِجَمِّ مِمَّا يَشْتُونَ ۝ يَتَنَزَّلُونَ فِيهَا كَاسًا لَّا  
 لَعُوقُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ

مُكْتَنُونَ ۝ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا

كُنَّا قَبْلُ فِي أُمَّلِنَا مُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِنَا

عَذَابَ التَّمُورِ ۝ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۝ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু জালাহুর নামে।

(১) কসম তুর পর্বতের (২) এবং লিখিত কিতাবের (৩) প্রশস্ত পত্র, (৪) কসম বারতুল-মায়ুর তথা জাবাদ গৃহের (৫) এবং সম্মুখত হাদের (৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের (৭) আপনার পালনকর্তার শক্তি অবশ্যতাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেইদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভাগ হবে, (১২) যারা ক্বীড়াঙ্কলে মিছামিছি কথা বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবে : এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, (১৫) এটা কি ষাদু, না তোমরা চোখে দেখেই না? (১৬) এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উত্তরই তোমাদের জন্য সমাম। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই জাহান্নামের খাকবে জাহান্নামে ও নিয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আশাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা দুষ্ট হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে জাহান্নামের হারদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ইমানদার এবং তাদের সন্তানরা ইমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমালাও স্থাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরেরকে পানপাত্র দেবে, যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদশ কিশোররা তাদের সেবার ঘোরাকেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে : আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর জাহান্নাম আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শক্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও জাহান্নামকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যপূর্ণ, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম তুর (পর্বতের), এই সেই কিতাবের, যা উম্মুক্ত পত্র লিখিত আছে। (অর্থাৎ

আজিজমারী, যার সম্পর্কে অন্য জায়গাতে বলা হয়েছে : **كِتَابًا يُّلْقَاهُ مَنشُورًا**

এবং কসম বারতুল মামুরের (এটা সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতখানা)। এবং

কসম সমুরত হাদের (অর্থাৎ আকাশের; আজাহ্ বলেন : **وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ**

**أَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ وَاتَّ** এবং কসম উতাল-  
**سَقْفًا مَّوْفُورًا**—আজাহ্ বলেন

সমুরের। (অতঃপর কসমের আওয়ার বলা হচ্ছে : ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাহ্ অবশ্যস্বাধী, কেউ এক প্রতিরোধ করতে পারবে না। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আকাশ প্রকলিত হবে এবং পর্বতমালা (স্থান থেকে) সরে যাবে। [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকলিত হওয়া সাধারণ অর্থেও হতে পারে এবং বিদীর্ণ হওয়ার অর্থেও হতে পারে; যেমন অন্য জায়গাতে আছে **فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ** ক্লাহল-মা'আনীতে উত্তর তফসীর হযরত

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। উত্তরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অল্প-পন্থাতে উত্তরটি হতে পারে। এখানে পর্বতমালার সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অম্যান্য জায়গাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক জায়গাতে বলা হয়েছে : **يُنسِفُهَا**

**بَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً** এবং কসমের  
**وَرِيٍّ** অন্য জায়গাতে আছে

কারণ একটি উদ্দেশ্যকে চিত্তাধারার নিকটবর্তী করা। উদ্দেশ্য এই : কিয়ামত সংঘটনের আসল কারণ প্রতিদান ও শাস্তি। এটা শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তিতে হবে। অতএব, তুর পর্বতের কসম আওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজাহ্ তা'আলা বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদানের মালিক। এসব বিধান পালন অথবা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে প্রতিদান ও শাস্তি হবে। আজিজমারীর কসম আওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বিধানাবলী পালন ও প্রত্যাখ্যান সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদান ও শাস্তি এর উপর নির্ভরশীল, যাতে বিধানাবলী প্রতিপালন জরুরী হয়। বারতুল মামুরের কসমে ইঙ্গিত আছে যে, ইবাদত একটি জরুরী বিষয়। এমনকি, যে ফেরেশতাদের প্রতিদান ও শাস্তি নেই, তাদেরকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর জাহ্নাত ও দোষ এই দুটি বস্তু হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তির পরিপত্তি। আকাশের কসমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাহ্নাত আকাশের মতই সমুন্নত বস্তু। উতাল সমুরের কসমে ইশারা রয়েছে যে, দোষও উতাল সমুরের অনুরূপ উন্নত বস্তু। এরপর কিয়ামতের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের শাস্তি অবশ্যস্বাধী তখন ]যারা (কিয়ামত, তওহীদ, রিসালত ইত্যাদি সত্য বিষয়ে) মিথ্যা-রোপ করে (এবং) যারা ক্বীড়াম্বলে মিছামিছি কথা বানায়, (কলে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়)

সেদিন তাদের খুবই দুর্ভোগ হবে, যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে  
যেয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (যেমননা, একজন জাহান্নাম দিকে কেউ ছেঁছার ছেঁতে চাইবে না।

অতঃপর যিক্রপের সময় **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا لَا يَحْكُمُونَ** অর্থাৎ যাঁদের ও পারে ধরে

সোহখে যিক্রপ করা হবে। তাদেরকে সোহখ দেখিয়ে দাঙ্গিরে বলা হবে : ) এই সেই  
অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে ( অর্থাৎ এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতে ) এবং  
যাদু জাদু্যা দিতে। জাহান্নামতো তো তোমাদের মতে যাদু ছিলই। এখন এটা (-ও) কি  
যাদু, (সেখে বল) না (এখনও) তোমরা তোখে দেখছ না? (যেমন দুমিরাত্তে তোখে না  
সেখার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলে)। এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর  
অথবা না কর, উভরই তোমাদের জন্য সমান। (তোমাদের হা-হতাশের কারণে হুজি দান  
করা হবে না এবং মেমে মেওয়ার কলেও দরা করে সোহখ থেকে বের করা হবে না, বরং  
অনন্তকাল এতে থাকতে হবে)। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল  
দেওয়া হবে। (তোমরা কুরর করতে, যা সর্বত্রই অবাধা এবং জাহান্নাম হক ও অসীম  
ওপাখীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। সুতরাং প্রতিফলস্বরূপ অনন্তকাল সোহখ ভোগ করবে।  
অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে : ) মিশর জাহান্নামীরা (জাহা-  
তের) উল্যামসমূহে ও ছোপখিলাসের মধ্যে থাকবে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের  
পালনকর্তা তাদেরকে (ছোপখিলাস) দেখেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে  
রক্ষা করবেন। (এবং জাহান্নামে নাখিল করে বলবেন : ) তোমরা (দুমিরাত্তে) যা করতে  
তার প্রতিফলস্বরূপ খুব ছুস্ত হয়ে পামাহার কর। তারা স্লেণীবক সিংহাসমে হেজাম দিত্তে  
বসবে। আমি তাদেরকে জাহান্নামোচনা হরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।  
(এটা হবে সাধারণ মু'মিনদের অবস্থা। অতঃপর সেই মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের  
সভান-সভতিও ইমানের ওপে ওপাখিত। বলা হচ্ছে : ) যারা ইমানদার এবং তাদের  
সভানদারও ইমানে তাদের অনুগামী (অর্থাৎ তারাও ইমানদার যদিও তারা আমলে পিতাদের  
সীমা পর্যন্ত পৌঁছেন। আমলের কথা উল্লেখ না করার তা বোঝা যায়। এছাড়া হাদীসে

পরিভার উল্লেখ আছে, বলা হয়েছে : **كانوا دونة في العمل وكانوا منازل**  
**كانوا دونة في العمل وكانوا منازل** এমতাবস্থায় আমলে ছুটি থাকর  
কারণে তাদের মর্তবা কর হবে না বরং মু'মিন পিতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য) আমি সভান-  
দেরকেও (মর্তবার) তাদের সাথে মিলিত করে দেব। (মিলিত করার জন্য) আমি তাদের  
(অর্থাৎ জাহান্নামী পিতাদের) আমল বিন্দুমাও হ্রাস করব না (অর্থাৎ পিতাদের কিছু আমল  
হ্রাস করে সভানদেরকে দিয়ে সমান করা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তির কাছে হরশ টাকা  
এবং এক ব্যক্তির কাছে চারশ টাকা আছে। উভরকে সমান করার উদ্দেশ্যে হলে এক উপার  
হল এই যে, হরশ টাকা ওরাজার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে চারশ ওরাজারকে দেওয়া।  
কলে উভরের কাছে পাঁচশ পাঁচশ হয়ে বাবে। দ্বিতীয় উপার এই যে হরশ ওরাজার কাছ  
থেকে কিছুই না নেওয়া, বরং চারশ ওরাজারকে নিজের কাছ থেকে দু'শ টাকা দিয়ে দেওয়া



এবং উভয়কে সমান সমান করে দেওয়া। এটা দাতাদের পক্ষে অধিক উপযুক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে প্রথম উপায় অবলম্বিত হবে না। যার ফলে এই হত যে, পিতাদেরকে আমল কম হওয়ার কারণে নীচের স্তরে নামিয়ে আনা হত এবং সন্তানদেরকে কিছু উপরে তুলে দেওয়া হত। এটা হবে না, বরং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হবে। ফলে পিতাগণ তাদের উচ্চস্তরেই থেকে যাবে এবং সন্তানদেরকে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানদের মধ্যে ঈমানের শর্ত না থাকলে তারা মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। কেননা, কাফিরদের মধ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ (কুফরী) কৃতকর্মের জন্য দায়ী। ( **قَوْلُهُ تَعَالَى**

**كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَسْحَابَ الْهَمِيمِ** অর্থাৎ মুক্তির কোন

উপায় নেই। ফলে তাদের মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রবন্ধই উঠে না। তাই মিলিত হওয়ার জন্য সন্তানদের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। অতঃপর পুনরায় ঈমানদার ও আত্মাভীদদের কথা বলা হচ্ছে : ) আমি তাদেরকে দেব ফলমূল ও গোশত, যা তারা পছন্দ করবে। সেখানে তারা (আনন্দ-উল্লাসের ভগ্নিতে) একে অপরকে পানপান্ন দেবে। এতে (অর্থাৎ পানীয়তে) অসার বকাবকি নেই, (কেননা তা নেশামুক্ত হবে না) এবং পাপ কর্মও নেই। তাদের কাছে (ফলমূল আনার জন্য) এমন কিশোররা আসা-যাওয়া করবে (এই কিশোর কারা? সুন্না ওয়াকিয়ায় তা বর্ণনা করা হবে)। যারা (বিশেষভাবে) তাদেরই সেবায় নিয়োজিত থাকবে (এবং এমন সূত্রী হবে) যেন সুরক্ষিত 'মোতি'। (যা অত্যন্ত চমকদার ও ধূলাবালু মুক্ত হয়ে থাকে। তারা আধ্যাত্মিক আনন্দও লাভ করবে। তন্মধ্যে এক এই যে, তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিতাসাবাদ করবে (এবং একথাও) বলবে যে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে (অর্থাৎ দুনিয়াতে পরিণাম সম্পর্কে) ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তাঁর কাছে দোয়া করতাম (যে, আমাদেরকে দোষ থেকে রক্ষা করে আমানত দান করুন। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন)। তিনি বাস্তবিকই অনুগ্রহকারী, পরম দয়ালু। (এটা যে আনন্দের বিষয়বস্তু তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

### আনুযায়িক জাতব্য বিষয়

**والطرر**—হিফ ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্গত হয়। এখানে তুর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তুরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জামাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তুর একটি। —(কুরতুবী) তুরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো যেন চলা করত।

**رَقٌّ** — **وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ** শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্য

কাগজের স্বল্পে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ—আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামুর বলা

হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মিরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পাল্লা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামুর। এ কারণেই মিরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। —(ইবনে কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ—مسجور শব্দটি مسجور থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে

ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্জলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই : সমুদ্রের কসম, মাঝে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে :

وَأَزَا الْيَمِينِ وَالسُّجْرَةِ—অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে

একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সাদীদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আলী ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। —(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা)-কে জৈনিক ইহুদী প্রশ্ন করল : জাহান্নাম কোথায় ? তিনি বললেন : সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল।—(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ مسجور-এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

إِنَّا نَدْعَاكَ يَا رَبِّ لِنَلْقَاكَ مِنْ دَاخِلِهِ—আপনার পালনকর্তার আশ্রয়

অবশ্যস্বাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রা) সূরা তুর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'এম (রা) বলেন : মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে

আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন **إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَكُم مِّنْ دَافِعٍ**

পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন জন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলায় গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন, এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আমাকে প্রেরণার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

**مَوْرٌ** বলা হয়।—**يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا**

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

ইমান থাকলে বুর্গদের সাথে বংশভুক্ত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে :

**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ**

অর্থাৎ যারা ইমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ইমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও আয়াতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আয়াত তা'আলা সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তব্য পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তব্যের যোগ্য না হয়, যাতে বুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।—(মাযহারী)

সন্নীদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সত্ত্বত রসূলুল্লাহ্ (সা)—রই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জালালী ব্যক্তি জালাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেনি। তাই তারা জালাতে আলাদা আরগাম আছে। এই ব্যক্তি আরম্ব করবে : পরওয়ালদিগার, দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করে-ছিলাম। তখন আয়াত তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে : তাদেরকেও জালাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। —(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এসব রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করে বলেন : এসব রেওয়াজেতে থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সংকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ যারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তব্য কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তব্য পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরাধিকে সংকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি যারা তাদের পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রা)—র রেওয়াজেতে

রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনার অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে গ্রহণ করবে : পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে : তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য কক্ষা প্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই কল।

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاسْتَقِيمُوا سُبُلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ ﴿١﴾ وَمَا آتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِالشُّكْرِ مِنَكُمْ وَإِلَيْهِ أُنزِلَتْ الْبُحُرُ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ وَالشُّجُرُ وَالْأَنْهَارُ وَالرِّيَاحُ وَالْجِبَالُ سُبُكًا وَنَبْكًَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَخَفَوْا بِرُسُلِهِمْ وَخَسِفَ الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لِأَنَّكَ تَمُوتُ فَتَكُونُونَ ﴿٢﴾

হ্রাস করা।—(কুরতুবী) আল্লাহের অর্থ এই : সন্তান-সন্ততিকে তাদের বৃহৎ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বৃহৎদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপার তাদেরকে পিতাদের সমান করে দেবেন।

قُلْ أَشْرِكُ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٣﴾

দারী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎ কর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।—(ইবনে কাসীর)

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٥﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ  
مِنَ التَّرَاصِينِ ﴿٦﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ  
طَاغُونَ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ  
مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٩﴾ أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ لَهُمُ الْخَالِقُونَ ﴿١٠﴾  
أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿١١﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ  
رَبِّكَ أَمْ لَهُمُ الْمَصْطَبُونَ ﴿١٢﴾ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ لَيْسَ بِمَعُونٍ بِهِ ۚ فَلْيَأْتِ  
مُسْمِكُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ ﴿١٣﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤﴾ أَمْ  
كَسَلْتُمْ أَجْرًا كَسَلْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مُشْكِلُونَ ﴿١٥﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ۝ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝  
 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَإِنْ يَرَوْا  
 كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ  
 يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ  
 هُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ  
 ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَصْبِرْ ۚ بِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ  
 بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ  
 وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

(২১) অতএব আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিবাদী নন এবং উম্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় : সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যু-দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে : এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বলুন তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনাকে আপনিই সৃষ্টিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই প্রলটা? (৩৬) না তারা নতামশগুল ও কুমশগুল সৃষ্টি করেছে? বলুন তারা বিশ্বাস করেন না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারা এই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা প্রবেশ করে? থাকলে তাদের প্রোভা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পরিপ্রমিত চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসেছে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফির, তারা এই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আলাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আলাহ্ তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন স্বপ্নকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে : এটা তো পূজীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) পোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে,

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সত্বর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সন্তোষ পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি পালনকর্তার সামনে। (৪৯) এবং স্মিত্তির কিছু অংশে এবং তারকা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

### উফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আপনার প্রতি প্রচারযোগ্য বিষয়বস্তু সম্বলিত ওহী নামিল করা হয়, (যেমন উপরে জামাত ও আহাম্মাদের অধিকারীদের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তখন) আপনি (এসব বিষয়বস্তুর সাহায্যে মানুষকে) উপদেশ দান করুন। কেননা, আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উম্মাদও নন (যেমন মুশরিকদের এ উক্তি সূরা ওয়াহ-যোহান্ন শানে নুযুলে বর্ণিত আছে **تَد تَرَكَ شَيْطَانِي**—এর সারমর্ম এই যে, আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী হতে পারেন না। কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা শয়তানের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। শয়তানের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এক আয়াতে আছে:

**وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ**—এখানে বলা হয়েছে যে, আপনি উম্মাদ নন। উদ্দেশ্য

এই যে, আপনি নবী। নবীর কাজ সব সময় উপদেশ দান করা—মানুষ যাই বলুক। তারা কি (অতীন্দ্রিয়বাদী ও উম্মাদ বলা ছাড়াও একথা) বলতে চায় : সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি (দুরুরে মনসুরে আছে, কোরাইশরা পরামর্শগৃহে একত্রিত হয়ে প্রস্তাব পাস করল যে, মুহাম্মদও একজন কবি। অন্যান্য কবি যেমন মৃত্যুখে পতিত হয়ে খতম হয়ে গেছে, সেও তেমনি খতম হয়ে যাবে এবং ইসলামের ঝগড়া মিটে যাবে)। আপনি বলে দিন : (ভাল কথা,) তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। (অর্থাৎ তোমরা আমার পরিণতি দেখ, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আমার পরিণতি শুভ এবং তোমাদের পরিণতি অশুভ ও ব্যর্থতা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা মরবে, আমি মরব না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার ধর্ম অচল হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তা মিটে যাবে। এখানে তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সেমতে তাই হয়েছে। তারা যে এসব কথাবার্তা বলে) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়, না তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক? (তারা নিজেদেরকে প্রগাঢ় বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী বলে দাবী করে, যেমন সূরা আহ্কাফে বর্ণিত তাদের উক্তি থেকে বোঝা যায় **لَوْ اَنَّ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا**

**لَوْ اَنَّ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا** | স্মরণীয় কিভাবেও বর্ণিত আছে যে, কোরাইশ সরদারগণ মানুষের মধ্যে অত্যধিক

বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের বুদ্ধির অবস্থা দেখানো হয়েছে যে, বুদ্ধি সঠিক হলে এমন বিষয়ের শিক্ষা দিত না। এটা বুদ্ধির শিক্ষা না হলে নিছক দুষ্টুই

ও হঠকারিতাই হবে)। না তারা বলেন : এই কোরআন সে নিজের রচনা করেছে? (এরূপ নয়,) বরং (একথা বলার একমাত্র কারণ এই যে,) তারা (প্রতিহিংসাবশত) অবিবাসী। (নিয়ম এই যে, মানুষ যে বিষয়কে বিশ্বাস করে না, হাজার সত্য হলেও সে সম্পর্কে নেতিবাচক কথাই বলে। জন্ম করার উদ্দেশ্যে আরেক জগতাব এই যে, এটা যদি ভারই স্রষ্টিত হবে তবে) তারা (-ও তো আরবী ভাষাভাষী, ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান্ভাষী) এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক যদি তারা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাকে। (রিসালত সম্পর্কিত এসব বিষয়বস্তুর পর এখন তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে : তারা যে তওহীদ অস্বীকার করে,) তারা কি কোন দ্রষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনি সৃষ্টিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই নিজদের দ্রষ্টা? (না এই যে, তারা নিজদের দ্রষ্টাও নয় এবং দ্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টিতও হয়নি, কিন্তু) তারা নত্বোমগল ও জুমগল সৃষ্টি করেছে? (এবং আলাহ্ তা'আলার দ্রষ্টাওপের মধ্যে অংশীদার, সার্বকথা এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে, দ্রষ্টা একমাত্র আলাহ্ এবং সে নিজের দ্রষ্টার মুখোপেক্ষী তার জন্য তওহীদে বিশ্বাসী হওয়া এবং আলাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করাও অপরিহার্য। সে ব্যক্তিই তওহীদ অস্বীকার করতে পারে, যে একমাত্র আলাহ্‌কেই দ্রষ্টা মনে করে না অথবা সে সৃষ্টিত একথা অস্বীকার করে। চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে কাকিরুয়া জামত না যে, দ্রষ্টা যখন এক তখন উপাস্যও এক হবে। তাই অতঃপর তাদের এই মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাস্তবে এরূপ নয়) বরং তারা (মূর্খতার কারণে তওহীদে) বিশ্বাস করেন না। (মূর্খতা এটাই যে, দ্রষ্টা হলেই উপাস্য হতে হবে একথা চিন্তা-ভাবনা করেন না অতঃপর রিসালত সম্পর্কে তাদের অন্যান্য ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা আরও বলত যে, নব্বুরত দান করা যদি অপরিহার্যই ছিল, তবে মক্কা ও তাম্বুকের অমুক অমুক সরদারকে নব্বুরত দেওয়া হত না কেন? আলাহ্ তা'আলা জওয়াবে বলেন : ) তাদের কাছে কি আপনান্নর পালন-কর্তার (নব্বুরতসহ মিরামত ও রহমতের) ভাণ্ডার রয়েছে (যে যাকে ইচ্ছা নব্বুরত

দিয়ে দেবে, যেমন আলাহ্ বলেন : **أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ** ) না তারাই (এই

নব্বুরত বিভাসের) হর্তাকর্তা? (যে, যাকে ইচ্ছা, নব্বুরত দান করার আদেশ দেবে? অর্থাৎ নব্বুরত দান করার উপায় দুইটি : এক. ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে, দুই. যারা ভাণ্ডারের অধিকারী, তাদের উচ্ছ'তন কর্মকর্তা হয়ে নির্দেশের মাধ্যমে তা দান করবে। এখানে উক্তর সত্তাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সার্বমর্ম এই যে, তারা মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত অস্বীকার করে এবং মক্কা ও তাম্বুকের সরদারদেরকে রিসালতের হোঙ্গা মনে করে। তাদের কাছে এর কোন মূল্যসঙ্গত প্রমাণ নেই, বরং এর বিপরীতে প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই শুধু প্রস্তাবোধক 'না' বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এর পক্ষে কোন ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণও নেই) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে (আকাশের) কথাবার্তা ব্রহণ করে (অর্থাৎ তাদের কোন ব্যক্তির প্রতি ওহী মাখিল হয় না এবং তাদের কেউ আকাশে আরোহণ করে না। অতঃপর এ সম্পর্কে একটি মূল্যসঙ্গত সত্তাবনা বাতিল করা হচ্ছে যে, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা আকাশে আরোহণ করার ও সেখানকার কথাবার্তা শোনার দাবী করতে থাকবে) তবে তাদের শ্রুত (এই দাবীর পক্ষে) স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক (যে, সে ওহী লাভ করেছে, যেমন আমাদের মবী বীর

ওহীর পক্ষে নিশ্চিত অলৌকিক প্রমাণাদি রাখেন। অতঃপর আবার তওহীদের এক বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তওহীদ অবিরাসীরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করে শিরক করে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) আল্লাহর কি কন্যা সন্তান আছে, আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তোমাদের জানে উৎকৃষ্ট বস্তু পছন্দ কর আর আল্লাহর জন্য এমন বস্তু পছন্দ কর, যাকে তোমরা নিকৃষ্ট মনে কর। অতঃপর আবার রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আপনাদের সত্যতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের অনুসরণ তাদের পছন্দনীয় নয়। তবে) আপনি কি তাদের কাছে পারিত্রমিক চান যে, এই কর দেওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে গেছে? যেমন আল্লাহ বলেন,

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

অতঃপর কিরামত ও প্রতিদান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা

বলে : প্রথমত, কিরামত হবেই না, যদি হয় তবে সেখানেও আমরা ভাল অবস্থায় থাকব।

যেমন আল্লাহ বলেন : وَمَا أَظُنُّ السَّامَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي

إِن لِّمِ سَمِّعْتُمْ لَهُمْ جِجَارًا (এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা এই যে) তাদের কাছে কি অদৃশ্য

বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) নিগিবদ্ধ করে? না তারা (রসূ-

লের সাথে) চক্রান্ত করতে চান? (অন্য আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ

অতএব যারা কাফির, তারাই এই চক্রান্তের শিকার হবে। (সেমতে তারা চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে বদরে নিহত হয়েছে। অতঃপর তওহীদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে) আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? আল্লাহ তাদের আরোপিত শিরক থেকে পবিত্র। (কাফিররা রিসালতের বিপক্ষে এ কথাও বলত যে, আমরা তখন আপনাকে রসূলরূপে মেনে নেব, যখন আপনি আকাশের কোন খণ্ড ভূপাতিত করে দেন।

—أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا

জওয়াব এই যে, রিসালতের পক্ষে গুরু থেকেই প্রমাণ কান্নেম রয়েছে। কাজেই ফরমায়েশী প্রমাণ কান্নেম করার কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, প্রমাণপ্রার্থী সত্যাত্বেদী হলে ফরমায়েশী প্রমাণও কান্নেম করা যায়। কিন্তু কাফিরদের ফরমায়েশ সত্যের জন্য নয়, নিছক হঠকারিতাবশত। তারা তো এমন হঠকারী যে) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত

হতেও দেখে, তবুও বলবে : এটা তো পূজীভূত মেঘ। (যেমন আল্লাহ বলেন :



وَلَوْ أَنَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرُجُونَ

(সা)-কে সাম্বুনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা যখন এতই উদ্ধত ও অবাধ্য, তখন তাদের কাছে ঈমান প্রত্যাশা করে দুঃখিত হবেন না; বরং তাদেরকে ছেড়ে দিন সেই দিনের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যে দিন তাদের হাঁশ উড়ে যাবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর সেই দিনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে) যে দিন তাদের (ইসলামের বিরোধিতা ও নিজেদের সাফল্য সম্পর্কিত) চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা (কোথাও থেকে) সাহায্যপ্রাপ্তও হবেন না। (সেদিন তারা সত্যাসত্য জেনে নেবে। এর আগে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না)। প্লোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন দুর্ভিক্ষ, বদরে নিহত হওয়া ইত্যাদি)। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ('অধিকাংশ' বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের কতকের জন্য ঈমান অবধারিত ছিল। তাদের শাস্তির জন্য যখন আমি সময় নির্ধারিত রেখেছি, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবার করুন। (এই ধারণার বশবর্তী হলে তাদের প্রতিশোধ ত্বরান্বিত করতে চাইবেন না যে, তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করবে। এরূপ আশংকা করবেন না। কেননা) আপনি আমার হিফায়তে আছেন। (অতএব ভয় কিসের? তাদের কুফরের কারণে অন্তর ব্যথিত হলে এর প্রতিকার এই যে, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। উদাহরণত মজলিস থেকে অথবা নিদ্রা থেকে) গাত্তোপানের সময় (উদাহরণত তাহাজ্জুদে) আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রির কিছু অংশে (অর্থাৎ ইশার সময়) এবং তারকা অন্তমিত হওয়ার পশ্চাতে (অর্থাৎ ফজরে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (সারকথা এই যে, অন্তরকে এ কাজে মশগুল রাখুন, তাহলে চিন্তা-ভাবনা প্রবল হতে পারবে না)।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

فَا نَكَ بَا عَيْنُنَا — শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে

সাম্বুনা দেওয়ার জন্য সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হিফায়তে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিশ্চ থেকে বাঁচিয়ে

রাখব। আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে: **وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ**

مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনিশ্চ থেকে আপনার হিফায়ত

করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার

প্রতিকারও। বলা হয়েছে : **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ** অর্থাৎ আল্লাহর সপ্রশংস

পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাভ্রোথান করা। ইবনে জরীর (র) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যেদোয়াই করে, তা-ই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

এরপর যদি সে অম্ম করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে। —(ইবনে কাসীর)

মজলিসের কাফ্ফারা : মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : 'যখন দণ্ডায়মান হন'—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই

বাক্য পাঠ করবে : **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ**—এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে

আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) বলেন : তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ ও তাহমীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎ কাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালমন্দ কথাবার্তা হয়, সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা এই মজলিসে যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ  
 —(তিরমিযী—ইবনে কাসীর)।  
 وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ - অর্থাৎ রাতে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও ইশার

নামায এবং সাধারণ তসবীহ্ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। **وَإِذْ بَارَ النَّجُومِ** অর্থাৎ তারকা  
 অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ্ পাঠ বোঝানো হয়েছে—  
 (ইবনে কাসীর)

---

سورة النجم  
সূরা নজম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ  
الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ  
فَأَسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَدُنَّكَ فَكَانَ قَابَ  
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ  
مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ  
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَ مَا جَنَّتِ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَعْنَى السِّدْرَةَ مَا يَعْنَىٰ ۝  
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(১) নক্ষত্রের কসম, যখন অন্তর্মিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি (৩) এবং প্রহস্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) উর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে পেল। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আল্লাহ্ তারবাণ্ডার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসুলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিশ্বয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিদরাতুল-মুত্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জায়গাত। (১৬) যখন রুকুটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তাম্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১৭) তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে কোন) নফ্রের কসম, যখন অন্তমিত হয়। [এর জওয়াব হচ্ছে

مَا ضَلَّ

—এর সাথে এই কসমের বিশেষ মিল আছে। অর্থাৎ নফ্র যেমন

উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত আগাগোড়া পথে তার নিয়মিত গতি থেকে এদিক-সেদিক হয় না, তেমনি রসুলুল্লাহ (সা) সারা জীবন পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা থেকে মুক্ত রয়েছেন। এছাড়া আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফ্র দ্বারা যেমন পথ প্রদর্শন হয়, তেমনি পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামি-তার অনুপস্থিতির কারণে রসুলুল্লাহ (সা) দ্বারাও পথপ্রদর্শন হয়। নফ্র যখন মধ্যগগনে অবস্থান করে, তখন তার দ্বারা দিক নির্ণয় করা যায় না। তাই নফ্রের সাথে অন্তমিত হওয়ার সময় যোগ করা হয়েছে। উদয়ের সময়ও নফ্র দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। কিন্তু পথপ্রদর্শন প্রার্থীরা অন্তমিত হওয়ার সময়কেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা মনে করে যে, এ সময়ে পথপ্রদর্শনের উপকারিতা লাভ না করলে একটু পরেই নফ্র অন্তমিত হয়ে যাবে। উদয়ের সময় এই ব্যাকুলতা থাকে না। কারণ, তখন সময় প্রশস্ত থাকে। সূতরাং এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে হিদায়ত অর্জন করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং আগ্রহ সহকারে খাবিত হও। এরপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে : ] তোমাদের (এই সার্বজনিক) সংগী (অর্থাৎ পয়গম্বর, যার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম তোমাদের নফ্রদর্পণে এবং যার কাছ থেকে তোমরা সত্যতার প্রমাণ হাসিল করতে পার, তিনি) পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি। ( **ضَلَّ**-এর অর্থ পথ ভুলে দাঁড়িয়ে থাকা এবং যার **غَوَّاهِينَ**-এর অর্থ বিপথকে পথ মনে করে চলতে থাকা।—(খায়েন) অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি নবুয়ত ও দাওয়াতের ব্যাপারে বিপথগামী নন, বরং তিনি সত্য নবী। এবং তিনি প্রবৃত্তির ভাঙনায় কথা বলেন না। (যেমন তোমরা **اَفْتَرَا** বলে থাক, বরং) তাঁর কথা নিছক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [ অর্থ ও ভাষা উভয়ের ওহী, হলে তা কোরআন এবং শুধু অর্থের ওহী হলে তা সুন্নাহ নামে অভিহিত হয়। এই ওহী খুঁটিনাটি বিষয়েরও হতে পারে কিংবা কোন সামগ্রিক নীতিরও হতে পারে, যম্বারা ইজতিহাদ করা যায়। সূতরাং আয়াতে ইজতিহাদ অস্বীকার করা হয়নি। রসুলুল্লাহ (সা) আল্লাহর সাথে মিথ্যা কথা সম্পর্কযুক্ত করেন—কাফিরদের এবিধ ধারণা খণ্ডন করাই আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে ] তাঁকে মহাশক্তিশালী ক্ষেত্রশতা (আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ওহী) শিক্ষা দান করে। (সে স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা শক্তি-শালী হয়নি) সহজাত শক্তিসম্পন্ন। [ এক রেওয়াজেতে স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ) নিজের শক্তি বর্ণনা করেন : আমি কওমে লুতের গোটা জনপদকে সম্মুখে উৎপাচিত করে আকাশের নিকট নিয়ে যাই এবং নিচে ছেড়ে দিই। (দুররে-মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এই কালাম কোন শয়তানের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি যে, তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হবে; বরং ক্ষেত্রশতার মাধ্যমে পৌঁছেছে। ক্ষেত্রশতা ওহী নিয়ে আসার সমস্ত মাঝপথে শয়তান হস্তক্ষেপ

করেছে—এরূপ সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্ভবত ফেরেশতার সাথে মহাশক্তি-  
শালী বিশেষণটি যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, শয়তানের সাধ্য নেই যে, তার  
কাছে ঘেঁষে। অতঃপর ওহী সমাপ্ত হলে তা ছবছ জনসমক্ষে প্রমাণ করার ওয়াদা আল্লাহ

নিজেই করেছেন : **أَنۢ عَلَّمْنَا جَمَعَهُۥ وَقُرْآنَهُۥ** অতঃপর একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া

হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তি যে ফেরেশতা তা পূর্ব পরিচয়ের ভিত্তিতেই  
জানা যেতে পারে। পূর্ণ পরিচয় আসল আকার-আকৃতিতে দেখার উপর নির্ভরশীল।  
অতএব, রসুলুল্লাহ (সা) পূর্বে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন কি? জওয়াব  
এই যে, তিনি পূর্বেও দেখেছিলেন। কয়েকবার তো অন্য আকৃতিতে দেখেছেন। অতঃপর  
(একবার এমনও হয়েছে যে) সেই ফেরেশতা আসল আকৃতিতে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ  
করল, সে (তখন) উর্ধ্বদিগন্তে ছিল। [এক রেওয়াজেতে এর তফসীলে পূর্বদিগন্ত বলা  
হয়েছে। সম্ভবত মধ্যগগনে দেখা কন্টকর বিখ্যাত দিগন্ত দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।  
নিম্ন দিগন্তেও কোন কিছু পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই উর্ধ্ব দিগন্তে মনোনীত করা  
হয়েছে। এর ঘটনা এই যে, রসুলুল্লাহ (সা) একবার জিবরাঈলকে বললেন : আমি আপ-  
নাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। সেমতে জিবরাঈল (আ) তাঁকে হেরা গিরিগুহার  
নিকটে এবং তিরমিমীর রেওয়াজেত অনুযায়ী যিদ্দাদ মহল্লায় দেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি  
দিলেন। তিনি ওয়াদার স্থানে পৌঁছে জিবরাঈলকে পূর্ব দিগন্তে দেখতে পেলেন যে, তাঁর  
ছয়শ বাহ প্রসারিত হয়ে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। রসুলুল্লাহ  
(সা) অতঃপর বেহঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন জিবরাঈল (আ) মানবাকৃতি  
ধারণ করে তাঁকে সান্ধনা দেওয়ার জন্য আগমন করলেন। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা  
হয়েছে।—(জালালাইন) সান্নকথা এই যে, ফেরেশতা প্রথমে আসল আকৃতিতে উর্ধ্ব দিগন্তে  
আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা) যখন বেহঁশ হয়ে পড়লেন, তখন ] সে তাঁর  
নিকটে এল এবং আরও নিকটে এল, (নৈকট্যের কারণে তাদের মধ্যে) দুই ধনুক পরিমাণ  
ব্যবধান রয়ে গেল কিংবা আরও কম ব্যবধান রয়ে গেল। আরবদের অভ্যাস ছিল দুই ব্যক্তি  
পরস্পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে একতা ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে উভয়ই তাদের ধনুকের সূতা  
পরস্পরে সংযুক্ত করে দিত। এতেও কোন কোন অংশের দিক দিয়ে কিছু ব্যবধান অবশ্যই  
থেকে যায়। এই প্রচলিত পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে নৈকট্য ও ঐক্য বোঝানো হয়েছে।  
এটা ছিল নিছক দৃশ্যত ঐক্যের আলামত। যদি এর সাথে অন্তর্গত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যও

সংযুক্ত হয়, তবে **أَوَادُنِي** অর্থাৎ আরও কম ব্যবধান হতে পারে। সূতরাং **أَوَادُنِي**

কথাটি বাড়ানোর ফলে ইঙ্গিত হয়েছে যে, দৃশ্যত নৈকট্য ছাড়াও রসুলুল্লাহ (সা) ও জিবরাঈলের  
মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কও ছিল, যা পূর্ণ পরিচয়ের মহান ভিত্তি। মোটকথা জিবরাঈলের  
সান্ধনাদানের ফলে রসুলুল্লাহ (সা) শান্ত সুস্থির হলেন। স্বস্তি লাভ করার পর আল্লাহ  
তা'আলা (এই ফেরেশতার মাধ্যমে) তাঁর বাস্পার (রসুলের) প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা  
প্রত্যাদেশ করলেন [ যা নির্দিষ্টভাবে জানা নেই এবং জানার প্রয়োজনও নেই। তখন  
প্রত্যাদেশ করা আসল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখিয়ে তার

পূর্ণ পরিচয় দান করাই আসল লক্ষ্য ছিল। এতদসঙ্গেও পরিচয়ে অধিক সহায়ক হবে বিবেচনা করেই সম্ভবত তখন প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল। কেননা জিবরাঈল (আ) আসল আকৃতিতে থাকার কারণে এ সময়কার ওহী যে আলাহর পক্ষ থেকে, তা অকাটা ও সুনিশ্চিত। মানবাকৃতিতে থাকা অবস্থায় অন্য সময়ের ওহীকে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) একই রূপ দেখবেন, তখন তাঁর এই বিশ্বাস আরও জোরদার হবে যে, উভয় অবস্থায় ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা একই। উদাহরণত কোন ব্যক্তির কষ্টস্বর ও কথার ভঙ্গি জানা থাকলে যদি কোন সময় সে আকৃতি পরিবর্তন করেও কথা বলে, তবে পরিষ্কার চেনা যায়। অতঃপর এই দেখা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, আসল আকৃতিতে দেখা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে প্রাপ্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অনুভূতিতে এরূপ প্রাপ্তি হওয়া বিরল নয়। সঠিক অনুভূতির মালিক হওয়া সত্ত্বেও পাপল ব্যক্তি মাঝে মাঝে পরিচিত জনকেও চিনতে ভুল করে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই দেখা বিস্ময়কর ছিল কি না, তা-ই প্রশ্ন। জওয়াব এই যে, এই দেখা বিস্ময়কর ছিল। কেননা, এই দেখার সময় [রসূলের অন্তর দেখা বস্তুর ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি। (প্রমাণ এই যে, এ জাতীয় সম্ভাবনাকে আমল দিলে ইঙ্গিতগ্রাহ্য বিষয়সমূহের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। ফলে সমগ্র বিশ্বের কাজ-কান্নবার অচল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি অনুভবকারী ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি ত্রুটিশূণ্য হয়, তবে তার ক্ষেত্রে অন্তরগত প্রাপ্তির আশংকাকে আমল দেওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞান-বুদ্ধি যে ত্রুটিশূণ্য ছিল না এবং তিনি যে মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা সুবিদিত ও প্রত্যক্ষ। এই বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও বিপন্ন দল বিতর্ক ও বাদানুবাদে বিরত হত না। তাই অতঃপর বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন পরিচয় ও দেখার সন্তোষজনক প্রমাণ শুনে নিলে, তখন) তোমরা কি তাঁর (অর্থাৎ রসূলের) সাথে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে? (অর্থাৎ মানুষের জানা অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে ইঙ্গিতগ্রাহ্য বিষয়সমূহ সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে থাকে। সর্বনাশের কথা এই যে, তোমরা এসব বিষয়েও বিরোধ কর। এভাবে তো তোমাদের নিজেদের ইঙ্গিতগ্রাহ্য বিষয়সমূহেও হাজারো সন্দেহ থাকতে পারে। তোমরা যদি এই অমূলক ধারণা কর যে, একবার দেখেই কোন বস্তুর পরিচয় কিভাবে হতে পারে তবে এর জওয়াব এই যে, যদি যেনে নেওলা হয় যে, পরিচয়ের জন্য বারবার দেখাই জরুরী, তবে) তিনি (অর্থাৎ রসূল) তাকে আরেকবার ও (আসল আকৃতিতে) দেখেছিলেন। (সুতরাং তোমাদের সেই ধারণাও দূর হয়ে গেল। দুবার একই রূপ দেখার কারণে পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, সে-ই জিবরাঈল। অতঃপর আরেকবার দেখার স্থান বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মিস্রাজের রাত্রিতে দেখেছেন) সিদরাতুল-মুত্তাহার নিকটে। (বদরিকা বৃক্ষকে সিদরা বলা হয় এবং মুত্তাহার অর্থ শেষ প্রান্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটা বদরিকা বৃক্ষ। উর্ধ্বে জগৎ থেকে যেসব বিধি-বিধান ও রিযিক ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো প্রথমে সিদরাতুল-মুত্তাহার পৌঁছে, অতঃপর সেখান থেকে ফেরেশতারা পৃথিবীতে আনয়ন করে। এমনিভাবে পৃথিবী থেকে যেসব আমল ও কাজকর্ম উর্ধ্বে জগতে আরোহণ করে সেগুলোও প্রথমে সিদরাতুল-মুত্তাহার পৌঁছে। অতঃপর সেখান থেকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই সিদরাতুল-মুত্তাহা ডাকঘরের অনুরূপ, যেখান থেকে চিঠিপত্রের আগমন-নির্গমন

হয়ে থাকে। অতঃপর সিদরাতুল-মুত্তাহার প্রেষ্ঠ স্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে)—এর (অর্থাৎ সিদরাতুল-মুত্তাহার) নিকটে জালাতুল-মাওনা অবস্থিত। ('মাওনা' শব্দের অর্থ বসবাসের জায়গা। নেক বান্দাদের বসবাসের জায়গা বিধায় একে জালাতুল-মাওনা বলা হয়। মোটকথা, সিদরাতুল-মুত্তাহা একটি স্বতন্ত্র মহিমামণ্ডিত স্থানে অবস্থিত। এখন দেখার সময়কাল বর্ণনা করা হচ্ছে যে) যখন সিদরাতুল-মুত্তাহাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা আচ্ছন্ন করছিল। [ এক রেওয়াজেতে আছে যে, তারা দেখতে স্বর্গের প্রজাপতির ন্যায় ছিল। অন্য রেওয়াজেতে আছে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতা ছিল। আরেক রেওয়াজেতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক নজর দেখার বাসনা প্রকাশ করে ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে এবং এই বৃক্ষে একত্রিত হয়।—(দুররে-মনসুর) এতেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মানিত ছিলেন। এখানে আরও একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, বিস্ময়কর বস্তু দেখে স্বভাবতই দৃষ্টি মুরপাক খেয়ে যায় এবং পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শক্তি থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায় জিবরাঈলের আকৃতি কিরূপে উপলব্ধি করা যাবে? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) মোটেই হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হন নি। সেমতে যেসব বস্তু দেখার নির্দেশ ছিল, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষেত্রে] তাঁর দৃষ্টি বিপ্রম হয়নি (বরং সেগুলোকে যথাযথরূপে দেখেছেন) এবং (কোন কোন বস্তু দেখার নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর প্রতি) সীমালংঘনও করেনি। [ অর্থাৎ অনুমতির পূর্বে দেখেন নি। এটা তাঁর চূড়ান্ত দৃঢ়তার প্রমাণ। আশ্চর্য বস্তু দেখার বেলায় মানুষ সাধারণত এই দ্বিবিধ কাণ্ড করে থাকে—যেসব বস্তু দেখতে বলা হয়, সেগুলো দেখে না এবং যেগুলো দেখতে বলা হয় না, সেগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। ফলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)—র দৃঢ়তা শক্তি বর্ণনা করা হচ্ছে যে] নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার (কুদরতের) মহান অভ্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন। (কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টিবিপ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। মি'রানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখান পয়গম্বর-গণকে দেখেছেন, আন্বাসমূহকে দেখেছেন এবং জালাত-দোষখ ইত্যাদি অবলোকন করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তিনি চূড়ান্ত দৃঢ়চেতা। সুতরাং অভিজুত হয়ে যাওয়ার প্রয়ই উঠে না। মোট কথা, জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের পরিচয় সম্পর্কিত যেসব সন্দেহ ছিল, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত হয়ে রিসালত প্রমাণিত ও সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এ স্থলে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। ]

### জানুশরিক জাতব্য বিষয়

সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য : সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ঘোষণা করেন।—(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াতের সিজদা করেন। মুসলমান ও কাফির সবাই এই সিজদার শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফির ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সর্বাধি রসূলুল্লাহ্ (সা)—র সাথে সিজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার



নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সিদ্ধান্ত করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল : বাস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : আমি সেই ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখছি। —(ইবনে কাসীর)

এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

—نجوم—  
نجم—বলা হয় এবং এর বহুবচন —وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ—

কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তমিমগুলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নক্ষত্রের তফসীর 'সুরাইয়া' অর্থাৎ সপ্তমিমগুল দ্বারা করেছেন। ফাররা ও হযরত হাসান বসরী (র) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই অবলম্বন করা হয়েছে। هَوَىٰ শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আলাহ্ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আলাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারণেও জন্ম আলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাতে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমেও আলাহ্‌র পথের দিকে হিদায়ত অর্জিত হয়।

—مَا ضَلَّ مَا حَبَّكُمُ وَمَا غَوَىٰ— এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে।

এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন, তাই আলাহ্ তা'আলার সম্ভ্রুতি লাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যান নি এবং বিপথগামীও হন নি।

রসূলের পরিবর্তে তোমাদের সংগী বলার রহস্য : এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম অথবা 'নবী' শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সংগী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দেহ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বজনিক সংগী। তোমাদের দেশে জনগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দ কাজে জিন্ত দেখিনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সত্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কা-বাসী তাঁকে 'আল-আম্বীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবী করার তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেন নি, তিনি আলাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছে :

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ — অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)

নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বুখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। দুই. যার কেবল অর্থ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ্। এরপর হাদীসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সলা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলিম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কান্নেম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহর কাছে কেবল ক্ষমার্হই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হাদয়গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সব কথাই যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যশ্ধারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও আশংকা থাকে।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ۙ عِلْمَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ — এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত

آيَاتِ رَبِّ الْكَبْرِ

পর্ষন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির আশংকা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদ : এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। এক. আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তফসীরের

সান্নমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে।

মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, **أَسْتَوَى** এবং **دَنَى قَدَدَلَى** এগুলো সব

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মাযহারী এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। দুই. অন্য অনেক সাহাবী, তাবেরী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'মহাশক্তিশালী' ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব হাদীসের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের ভাষা এরূপ :

عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت الويس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين - ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إنما ذاك جبرائيل لم يره في صورته التي خلق عليها الا مرتين رآه منهبطا من السماء الى الارض سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض -

শা'বী হযরত মসরাক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্কে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরাক বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ - وَلَقَدْ رَأَاهُ

بِالْأَفْقِ الْمَبِينِ হযরত আয়েশা (রা) বলেন : মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন : আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আ)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্য-মণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।—( ইবনে কাসীর )

সহীহ মুসলিমেও এই রেওয়াজে প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (র) থেকে এই রেওয়াজে একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা)-র ভাষা এরূপ :

إِنَّا أُولَٰئِكَ نَاقِلَاتُ الْوَحْيِ وَالْحَدِيثِ وَرَسُولُ اللَّهِ حَبِيبٌ مِّمَّنْ نَّجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَكَانَ صِدْقًا عَنِ الْمَلَأِ أُولَٰئِكَ لِيُخَوِّفَ لِمُنَافِقٍ مَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْمَدِينَةِ بِمَا كَانَ كَانُفُوسًا كَافِرَةً ۖ هَٰؤُلَاءِ لَعَنَهُ اللَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَالصُّمَّرِ الْأَيْمَنِ وَالشَّامَةِ الْأَيْمَنِ ۚ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأْتَوْا بِالْحَمْرِ لِيُطْرَقَ الْمُشْرِكُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَاكَ بِالْحَقِّ لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفَعَلْتَ فَمَا أَصْبَرْتَهُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَاكَ بِأَنَّ تَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ ۚ وَإِنِّي لَأَشْفَقُ الْمُشْرِكِينَ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি ? তিনি বললেন, না, বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।—(ফতহুল-বারী, ৮ম খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ)

সহীহ বুখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

তিনি জওয়াবে বললেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈলকে ছয়শ বাহবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর

(র) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে আয়াতের

তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈলকে রফরকের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যম্বানের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের বক্তব্য : ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর বলেন : সূরা নজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে ‘দেখা’ ও ‘নিকটবর্তী হওয়া’ বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, আবু যর গিফারী, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন :

আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মিরাজের রাহিত সিদরাতুল-মুত্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্বরূন রসূলুল্লাহ (সা) নিদারূপ উৎকর্ষ ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আশ্চর্য্য করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল (আ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেন : হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি আল্লাহর সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আ) মক্কার উম্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শ বাহ ছিল এবং তিনি গোটা দিপঙ্ককে ঘিরে রেখেছিলেন।

এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিবরাঈলের মাহায্যা এবং আলাহ্‌র দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।—(ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল—কোন কোন রেওয়াজেতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) অজান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা      وَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ — আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে

মি'রাযের সাক্ষিতে এই দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রায়ী প্রমুখ এই তফসীরকেই অপ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী খানভী (র)-ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আলাহ্‌ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবভী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

مَرَّةً—نُزُومًا وَ مَرَّةً فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ শব্দের অর্থ শক্তি। জিবরাঈলের

অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্য এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

فَاسْتَوَىٰ এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম

দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে 'উর্ধ্ব' সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

تَدَلَّىٰ শব্দের অর্থ      نِي—ثُمَّ دَلَّىٰ فَتَدَلَّىٰ শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং

ধনুকের      فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ বলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সূতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَاب বলা হয়। এই ব্যবধান

আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। **قَابُ قَوْسَيْنِ** দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিক্ত ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এ সময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা এক গজ। এরপর **أَوْأَدَانِي** বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণ প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল না; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা প্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশংকাও বাতিল হয়ে যায়।

**أَوْحَىٰ** ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং **فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ**

আল্লাহ তা'আলা এবং **عَبْدِهِ** -এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-কে শিক্ষক হিসাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মুখে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাখিল করলেন।

একটি শিক্ষাগত ঘটনা ও তার জওয়াব : এখানে বাহ্যত একটি খটকা দেখা দেয় যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহে সব সর্বনাম দ্বারা অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে জিবরাঈল

(আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু **فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ** আয়াতে

সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো পূর্বাগ্ন বর্ণনার বিপরীত এবং **فَتَنَّا رُضْمًا** তথা সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততার কারণ।

মওলানা সাইয়্যদ আনওয়ার শাহ কাস্মীরী (র) এর জওয়াবে বলেন : এখানে পূর্বাগ্ন বর্ণনায় কোন ভুলটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততাও নেই; বরং সত্য এই

যে, সূরার শুরুতে **أَن هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ** বলে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা

হয়েছিল, তারই ধারাবাহিক বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে, ওহী প্রেরণকারী স্পষ্টত আল্লাহ ব্যতীত কেউ নয়। কিন্তু এই ওহী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ) ছিলেন মাধ্যম।

কয়েকটি আয়াতে এই মাধ্যমের পূর্ণ সত্যায়ন করার পর পুনরায় **أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ** বলা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথম বাক্যেরই পরিশিষ্ট। একে সর্বনামের বিক্ষিপ্ততা বলা

যায় না। কারণ, **أَوْحَى** এবং **عَهْدًا**—এসবের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো  
হাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই যে নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। **مَا أَوْحَى** অর্থাৎ যা ওহী

করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পষ্ট রেখে এর মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা  
হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা মুদাসসিরের শুরু  
ভাগের কতিপয় আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম।  
হাদীসবিদগণ যেমন হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি  
এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সনদ বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যাদেশকারী  
স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাঈল  
(আ)। আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর উচ্চমর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার হে বর্ণনা  
দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমের ন্যায্যনুগ সত্যায়ন।

**فَوَادٍ—مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى** শব্দের অর্থ অস্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই

যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অস্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। এই  
ভুল ও ভ্রুটিকেই আয়াতে **كَذَبَ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ দেখা বস্তুকে উপ-  
লব্ধি করার ব্যাপারে অস্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। **مَا رَأَى** শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে।  
কি দেখেছে, কোরআনে তা নিদিল্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবয়ী ও  
তফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছে এবং  
কারও কারও মতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী  
**رَأَى** শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে  
অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অস্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শ-  
নিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন  
পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অস্তঃকরণ। তাই কখনও  
বোধশক্তিকেও 'কল্ব' (অস্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন

**لَمِنَ**

**لَا قَلْبُ** আয়াতে কল্ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন

পাকের **لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا** ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এর অর্থ — نَزْلَةُ أُخْرَى — وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাসীল (আ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুত্তাহা' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রায়ের রাক্বিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ্' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। 'মুত্তাহা' শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়াজেতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়াজেতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে 'মুত্তাহা' বলা হয়। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুত্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে একথা বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

ما وى — عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিপ্রামস্থল। জাম্নাতকে

ما وى বলায় কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নীমানো হয় এবং এখানেই জাম্নাতীরা বসবাস করবে।

জাম্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান : এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জাম্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উশ্মতের বিশ্বাস তাই যে, জাম্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জাম্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জাম্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়াজেতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা

ত্বরের আয়াত وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার

করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিশ্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অগ্নি প্রান্তে



যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যত্নপাতি এ কাজের জন্য আবিষ্কার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

اِنَّ زَيْغَ السَّدْرِ مَا يَغْشَىٰ — অর্থাৎ যখন বদরিকা রুক্ককে আচ্ছন্ন করে

রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা রুক্কের উপর স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা রুক্ককে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ — শব্দটি زَاغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হওয়া,

বিপথগামী হওয়া। طَفَىٰ শব্দটি طَفِيَان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি। এতে এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টি বিভ্রম করে, বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—এক. দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবন্ধ হয়ে গেলে। مَا زَاغ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়, বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। দুই. দৃষ্টি উদ্ভিল্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে وَمَا طَفَىٰ বলা হয়েছে।

যাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলেন, তাঁদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) হলেন ওহীর

মাধ্যম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহ-মুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে স্বীরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তাঁরা এখানেও বলেন যে, আল্লাহর দীদারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মাচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে আরও একটি বক্তব্য : সূরা নজমের আয়াত-সমূহে সাহাবী, তাবয়ী, মুজতাহিদ ইমাম, হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি ও শিক্ষাগত খটকা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 'মুশকিলাতুল-কোরআন' গ্রন্থে মাওলানা আন-ওয়াল শাহ্ কাম্বীরা (র) এসব আয়াতের তফসীর এভাবে করেছেন যে, উপরোক্ত বিভিন্ন রূপ উক্তির মধ্যে সম্ভব সাধিত হয়ে যায়। এই তফসীর দেখার পূর্বে কতিপয় সর্ববাদীসম্মত বিষয় দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত।

এক. রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। এই উভয়বার দেখার কথা সূরা নজমের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়বার দেখার বিষয়টি আয়াত থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এই দেখা সপ্তম আকাশে 'সিদরাতুল-মুত্তাহার' নিকটে হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রামের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এভাবে দেখার স্থান ও সময়কাল উভয়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দেখার স্থান ও সময়কাল আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। কিন্তু সহীহ বুখারীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিশ্নোক্ত হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নির্দিষ্টরূপে জানা যায়।

قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا  
امشى اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى  
جاء نى بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه  
فرجعت فقلت زملونى فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر  
الى قوله والرجز فا هجر فحمى الوحي و تتابع -

রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : একদিন আমি যখন পথে চলমান ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি উপরের দিকে দৃষ্টি তুলতেই দেখি যে, ক্ষেত্রশতা হেরা গিরিগুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত একটি কুরসীতে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভীত হয়ে গৃহে ফিরে এলাম এবং বললাম : আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত

কর দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা মুদ্দাসিনের আয়াত

وَ الرَّجْزَ فَاهْجُرْ

পর্যন্ত নাখিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম

ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মক্কায় তখন সংঘটিত হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন। কাজেই প্রথম ঘটনা মি'রায়ের পূর্বে মক্কায় এবং দ্বিতীয় ঘটনা মি'রায়ের রাহিত্তে সপ্তম আকাশে ঘটে।

দুই. এ বিষয়টিও সর্ববাদীসম্মত যে, সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ (কমপক্ষে  
 وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۗ وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ

পর্যন্ত) মি'রায়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা সাইয়্যাদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তফসীর এভাবে করেছেন :

কোরআন পাক সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। এক. জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে তখন দেখা, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতিকালে মক্কায় কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মি'রায়ের পূর্ববর্তী ঘটনা। -

দুই. মি'রায়ের ঘটনা। এতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দেখার চাইতে আল্লাহর অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং মহান নিদর্শনাবলী দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর যিয়ারত ও দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে সন্দেহকারীদের জওয়াব দেওয়াই সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্কত্রের কসম খেয়ে আল্লাহ বলে-ছেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) উশ্মতকে যা কিছু বলেন, এতে কোন ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দ্রাস্তির আশংকা নেই। তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অতঃপর এই ওহী যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি গুরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌঁছান, তাই জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী ও মাহাত্ম্য কয়েক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফিররা ইসরাফীল ও মিকাসীল ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। মোট কথা, জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে : فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ

এ পর্যন্ত এগারটি আয়াতে ওহী ও রিসালত সপ্রমাণ করার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব গুণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন তফসীরবিদের অনুরূপ এগুলোকে যদি আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। উদাহরণত **شديد القوى** - **ذو مرة** - **فكان قاب قوسين أو أدنى** এবং **دنى فتدلى** -

আখিক হেরফেরসহ তো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই প্রয়োজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাঈল (আ)-কে দেখার সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিক সঙ্গত ও নিরাপদ মনে হয়।

তবে এরপর দ্বাদশতম আয়াত **لَقَدْ رَأَىٰ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ** থেকে **مِنَ آيَاتِ رَبِّ الْكَبِيرِ** পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-কে দ্বিতীয়বার আসল

আকৃতিতে দেখার বিষয় বণিত হলেও তা অন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনার দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নিদর্শনের মধ্যে আল্লাহ্র দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়।

সমর্থনে সহীহ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবয়ীগণের উক্তি রয়েছে। তাই **مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ** আয়াতের তফসীর এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) চর্মচক্ষে যা দেখেছেন,

তার অন্তঃকরণ তার সত্যায়ন করেছে যে, ঠিকই দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোন ভুল করেনি। এখানে 'যা কিছু দেখেছেন'—এই ব্যাপক ভাষার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখাও शामिल আছে এবং মি'রাযের রাগ্নিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার ও যিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ **أَفْتَمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ**—এতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, পয়গম্বর যা কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়—চাক্ষুস সত্য। আয়াতে **مَا يَرَىٰ**-এর পরিবর্তে **مَا قَدَرَىٰ** বলা হয়নি। এতে মি'রাজের রাগ্নিতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী দেখার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী

**وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ** আয়াতে এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও

জিবরাঈল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহ্কে দেখা—এই উভয় দেখা উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাঈল (আ)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। আল্লাহ্কে দেখার প্রতি এভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকটা স্বভাবতই জরুরী। হাদীসে বণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ রাগ্নিতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

—আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নৈকটোর স্থান 'সিদরাতুল-মুস্তাহার' কাছে ছিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আল্লাহ্র যিয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সাক্ষ্য দেয়ঃ

**وَأَنهت سدرَةَ الْمُنْتَهَىٰ فغَشِيَتْنِي ضبابَةٌ خَرَرْتُ لَهَا ساجداً وَهذِهِ الضبابَةُ فِي الظَّلَمِ مِنَ الْغَامِ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا اللَّهُ وَيَتَجَلَّى -**

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি 'সিদরাতুল-মুস্তাহার' নিকটে পৌঁছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বস্তু আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সিজদানত হয়ে গেলাম। কোরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে আশ্রয়প্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছায়ার ন্যায় এক প্রকার বস্তুতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করবেন।

এমনিভাবে পরবর্তী আয়াত **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ**—এর অর্থও উভয় দেখা

শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই দেখা জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্রে হয়েছে। সার কথা এই যে, মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাঈল (আ)—কে দেখা ও আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা—উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তফসীরে আল্লাহ্‌কে দেখার কথা বলেছেন এবং কোরআনের ভাষায় এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

**আল্লাহ্‌র দীদার :** সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জালাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলে : **نَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ**

—অর্থাৎ পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হবে। ইমাম মালিক (র) বলেন : দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (র) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা

এরূপ **وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ لَنْ تَرَوْا رُبَّمَا حَتَّى تَمُوتُوا** এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও

বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)—র দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্বারা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মি'রাজের রাক্বিতে যখন সপ্ত আকাশ, জাহ্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ্‌র বিশেষ মিদর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকে ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রায় থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না। এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়াজে বিভিন্ন রূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ যুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর

মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফতহুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যশ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন : কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালানা করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়, বরং এটা বিশ্বাসগত প্রম্ম। এতে অকাটা প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাটারূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রম্মের দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الْآخِرَةَ ۚ أَلَكُمُ الذَّكَرُ

وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ صَبْرَةٌ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ

سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِن

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ

رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۚ أَمْرٌ لِلْإِنسَانِ ۚ مَا تَمَنَّى ۚ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ

وَالْأُولَىٰ ۚ وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرِضُهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ۚ وَمَا

لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي

مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ

(১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাভ ও ওশ্বা সম্পর্কে, (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? (২১) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?

(২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (২৩) এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাখিল করেন নি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মনুষ্য যা চায়, তা-ই কি পায়? (২৫) জ্ঞতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহ্‌র হাতে। (২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতা-দেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশরিকগণ! প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রসূল ওহীর অনুসরণে কথাবার্তা বলেন এবং তিনি এই ওহীর আলোকে তওহীদের নির্দেশ দেন, যা যুক্তি প্রমাণেও সিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এর পরও প্রতিমা পূজা কর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে) তোমরা (কখনও এসব প্রতিমা উদাহরণত) লাভ ও ওশ্যা এবং তৃতীয় আরেক মানাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? (যাতে তোমরা জানতে পারতে যে, তারা পূজার যোগ্য কিনা? তওহীদ সম্পর্কে আরেকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, তোমরা ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করে উপাস্য বলে থাক। জিজ্ঞাস্য এই যে,) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? (অর্থাৎ যে কন্যাদেরকে তোমরা লজ্জা ও ঘৃণাযোগ্য মনে কর, তাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত কর)। এটা তো খুবই অসংগত বন্টন। (ভাল জিনিস তোমাদের ভাগে এবং মন্দ জিনিস আল্লাহ্‌র ভাগে! এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র সন্তান সাব্যস্ত করাও অসংগত)। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, (অর্থাৎ উপাস্যরূপে এগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বরং নামই সার) যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এদের (উপাস্য হওয়ার) সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোন (যুক্তিগত ও ইতিহাসগত) দলীল প্রেরণ করেন নি, (বরং) তারা (উপাস্য হওয়ার এই বিশ্বাসে) কেবল অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে (যে প্রবৃত্তি অনুমান থেকে উদ্ভূত হয়)। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (সত্যভাষী ও ওহীর অনুসারী রসূলের মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের) পথনির্দেশ এসে গেছে। (অর্থাৎ তাদের দাবীর সমর্থনে তো কোন দলীল নেই, কিন্তু রসূলের মাধ্যমে দলীল শুনেও তা মানে না। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের উপাস্য হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল প্রসঙ্গে এই আলোচনা হল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমরা প্রতিমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপাস্য মনে কর যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এই উদ্দেশ্যেও নিরেট ধোঁকা ও বাতিল। চিন্তা কর) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? না। কেননা, প্রত্যেক আশা আল্লাহ্‌র হাতে—পরকালেরও এবং ইহকালেরও। (সুতরাং তিনি যে আশাকে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। কোরআনের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের এই বাতিল আশা পূর্ণ করতে চাইবেন না। কাজেই প্রতিমারা দুনিয়াতে কাফিরদের অভাব-অনটনের ব্যাপারে

সুপারিশ করবে না এবং পরকালে আশাব থেকে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করবে না। তাই নিশ্চিতরাপেই তাদের আশা পূর্ণ হবে না। বেচারী প্রতিমা কি সুপারিশ করবে, তাদের মধ্যে তো সুপারিশের যোগ্যতাই নেই। যারা এই দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের সুপারিশও কার্যকর হবে না। (সেমতে) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, (এতে বোধ হয় উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু এই উচ্চমর্যাদা সত্ত্বেও) তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই করতে পারে না,) কিন্তু যখন আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং যার জন্য (সুপারিশ) পছন্দ করেন। (মানুষ চাপে পড়ে এবং উপযোগিতাবশত পছন্দ ছাড়াও অনুমতি দেয়, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই। তাই **أَوْ يُرَضَىٰ** বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে

যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা কুফর। (সেমতে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণে কাফির) তারাই ফেরেশতাগণকে (আল্লাহর কন্যা তথা) নারী-বাচক নাম দিয়ে থাকে। (তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'পরকালের অশ্রদ্ধা' উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, এসব পথভ্রষ্টতা পরকালের প্রতি উদাসীনতা থেকেই উদ্ভূত। নতুবা পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি স্বীয় মুক্তির ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা করে। ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সাথে শরীক করা যখন কুফর হল, তখন প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা যে কুফর তা আরও উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়। তাই এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা বাতিল) অথচ এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তারা কেবল ভিত্তিহীন ধারণার উপর চলে। নিশ্চয় সত্যের ব্যাপারে (অর্থাৎ সত্য প্রমাণে) ভিত্তিহীন ধারণা মোটেও ফলপ্রসূ নয়।

### আনুশঙ্গিক আত্মত্যাগ বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসুলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহর কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহর কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমালয়ের নাম ছিল লাভ, ওশ্বা ও মানাত। লাভ তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওশ্বা কোরায়েশ গোত্রের এবং মানাত বনী হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থান স্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ (সা) এসব গৃহ ভূমিসাগ করে দেন।—(কুরতুবী)



فُوزٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, শব্দটি فُوزٌ — قِسْمَةٌ مُهْزِيَةٌ

অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) قِسْمَةٌ مُهْزِيَةٌ এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বণ্টন।

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : إِنَّ الظَّنَّ لَا يَأْتِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমা পূজার কারণ ছিল। দুই. এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। 'একোন' তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাটা জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই, যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়্যাতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে 'যন' তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাটা নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে, যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে 'একনিয়্যাত' তথা দৃঢ় বিশ্বাসপ্রসূত বিধান-বলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যল্লীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব—এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন খটকা নেই।

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هَٰؤُلَاءِ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰٓءَ ۗ وَبِاللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

لَيَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَّ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۗ

الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَثِيْرَ الْاٰثِمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّغْمَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ وَاَسِعُ

الْمَغْفِرَةُ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجْتَهَتْ فِي

بُطُوْنٍ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اٰثَمَ ۗ

(২৯) অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পাখিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ ও অস্বীকার কার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যুক্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি নিশু ছিলে। অতএব, তোমরা আশ্বপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী ?

ওফসীরের সার-সংক্ষেপ

آٰمٰنَآءُ ۙ وَآٰمٰنَآءُ ۙ وَآٰمٰنَآءُ ۙ وَآٰمٰنَآءُ ۙ وَآٰمٰنَآءُ ۙ  
 ( أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) এবং رَبِّهِمُ الْهُدَى

থেকে জানা গেল যে, মুশরিকরা হঠকারী। কোরআন ও হিদায়ত নাশিলা হওয়া সত্ত্বেও তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। হঠকারীর কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা যায় না অতএব) যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পাখিব জীবনই কামনা করে, আপনি তার তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (কেবল পাখিব জীবন কামনা করে বলেই পরকালে

বিশ্বাস করে না, যা لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ থেকে উপরে জানা গেছে)। তাদের

জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই (অর্থাৎ পাখিব জীবন পর্যন্তই। অতএব, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করুন)। আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত। (এ থেকে তাঁর জ্ঞান প্রমাণিত হয়েছে। এখন কুদরত সপ্রমাণ করা হচ্ছে :) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। (যখন জ্ঞান ও কুদরতে আল্লাহ কামিল এবং তাঁর আইন ও বিধানাবলী পালনের দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার-পথপ্রাপ্ত ও সুপথপ্রাপ্ত, তখন) পরিণাম এই যে, তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের (মন্দ) কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন এবং সৎকর্মীদেরকে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন। (কাজেই তাদের ব্যাপার তাঁরই কাছে সোপর্দ করুন। অতঃপর সৎকর্মীদের পরিচয় দান করা হচ্ছে :) যারা বড় বড় গোনাহ এবং (বিশেষ করে) অস্বীকার কার্য থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাট গোনাহ করলেও (এখানে যে সৎ কর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ছোটখাট গোনাহ যারা ছুটিমুখ হন না। আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, আয়াতে যে সৎকর্মীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য বড় বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাতো শর্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে ছোটখাট গোনাহ হলে যাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তবে ছোটখাট গোনাহও কচিৎ হলে যাওয়া শর্ত

—অভ্যাস না হওয়া চাই এবং বারবার না করা চাই। বারবার করলে ছোটখাট গোনাহ্‌ও বড় গোনাহ্‌ হয়ে যায়। ব্যতিক্রমের অর্থ এরূপ নয় যে, ছোটখাট গোনাহ্‌ করার অনুমতি আছে। বড় বড় গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার যে শর্ত রয়েছে, এর অর্থ এরূপ নয় যে, বড় বড় গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার উপর সৎকর্মীদের সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান পাওয়া নির্ভরশীল। কেননা, যে বড় বড় গোনাহ্‌ করে, সেও কোন সৎ কর্ম করলে তার প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্‌ বলেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

সূত্রাৎ এই শর্ত প্রতিদান দেওয়ার দিক

দিয়ে নয়, বরং তাকে সৎকর্মী ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র উপাধি দান করার দিক দিয়ে। উপরে মন্দ কর্মীদেরকে শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে গোনাহ্‌গারদেরকে নিরাশ করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা ঈমান ও তওবা করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। এছাড়া সৎকর্মীদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদার কারণে তাদের আশ্চর্যিতায় লিপ্ত হওয়ার ধারণাও আশংকা রয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে উভয় প্রকার ধারণা খণ্ডন করে বলা হয়েছে : নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। অতএব, যারা গোনাহ্‌-গার তারা যেন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তিনি ইচ্ছা করলে কুফর ও শিরক ব্যতীত সব গোনাহ্‌ কৃপাবশতই মাফ করে দেন। অতএব, ক্ষতিপূরণ করলে কেন মাফ করবেন না। এমনিভাবে সৎকর্মীরা যেন আশ্চর্যী না হয়ে উঠে। কেননা, মাঝে মাঝে সৎ কর্মে অপ্রকাশ্য ত্রুটি মিলিত হয়ে যায়। ফলে সৎ কর্ম গ্রহণযোগ্য থাকে না। সৎ কর্ম যখন গ্রহণীয় হবে না, তখন সৎকর্মী আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হবে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তোমাদের কোন অবস্থা তোমরা নিজে জানবে না এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা জানবেন। শুরু থেকেই এরূপ হয়ে আসছে। সেমতে) তিনি তোমাদের সম্পর্কে (ও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে তখন থেকে) ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে তার মাধ্যমে তোমরাও মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছ এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। (এই উভয় অবস্থায় তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানতে না; কিন্তু আমি জানতাম। এমনিভাবে এখনও তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে অবহিত হওয়া এবং আমার অবহিত ও ওয়াকিফহাল হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়)। অতএব, তোমরা আশ্চর্যশংসা করো না। (কেননা) তিনি ভাল জানেন কে তাকওয়া অবলম্বনকারী! (অর্থাৎ তিনি জানেন যে, অমুক তাকওয়া অবলম্বনকারী নয়, যদিও দৃশ্যত উভয়েই তাকওয়া অবলম্বন করে)।

### আনুষ্ঠানিক জাভাবা বিষয়

فَاعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - ذٰلِكَ

مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

অর্থাৎ যারা আমার সম্বন্ধে বিমূখ এবং একমাত্র পাখিব জীবনই

কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জানের দৌড় পাখিব  
জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকাল ও কিস্যামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে।  
পরিভ্রাণের বিষয় ইংরেজী শিক্ষা এবং পাখিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা  
তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা  
কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির  
প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সা)-এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ  
আশা করি, কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, **اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْأَسَىٰ وَالْجُودِ وَالْمُنْهَانِ**  
সম্প্রদায়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। **نَاؤُذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْأَسَىٰ وَالْجُودِ وَالْمُنْهَانِ**।

**الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ** এই আয়াতে আল্লাহ্

তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয়  
এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ্ থেকে এবং  
বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে **لَمَم** শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম  
প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত  
হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

**لَمَم** শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি

বর্ণিত আছে। এক. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নিসার আয়াতে একে

**إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَرْنَا عَنْكُمْ سِيئَاتِكُمْ** বলা হয়েছে।

এই উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন।  
দুই. এর অর্থ সেসব গোনাহ্, যা কদাচিত্ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত  
চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে কাসীর প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে  
হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই  
যে, কোন সৎ লোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ্ হলে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও  
সৎকর্মী ও মুজাহিদদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আল-ইমরানের এক আয়াতে  
মুজাহিদদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই :

**وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذُكِرُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُمْ سَأَلُوا**

**لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَقِفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ**

**يَعْلَمُونَ** -

অর্থাৎ তারাও মুতাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোন অস্বীকৃত কার্য ও কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায় অথবা গোনাহ্ করে নিজের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করে ও গোনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারে? যা গোনাহ্ হয়ে যায়, তার উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাট গোনাহ্ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে **لَمْ** এর তফসীরে এমন গোনাহ্‌র কথা বলা হয়েছে, যা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার

إِن تَجْتَنِبُوا

كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ

আম্মাতের তফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

—এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত জ্ঞান। আম্মাতে আল্লাহ্ তা'আলা

বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার প্রপীকার রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার প্রপীকার বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিক্রমশতায় তাকে গড়ে তোলে। আম্মাতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সৎ কাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎ কাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুতাকী ও পরহিয়গারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালমন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আম্মাতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। প্রার্থনা আল্লাহ্‌ভীর উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নয়। আল্লাহ্‌ভীরিতাও তা-ই ধর্তব্য, যা মুতাকী পর্যন্ত কান্নাম থাকে।

হযরত হযরত বিনতে আবু সালমা (রা)-র পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা',

যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্ (স) আনোচা

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ

তিলোত্তম করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে ময়নব রাখা হয়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন : তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে কর : আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহ্‌ভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক-পবিত্র কিনা আমি জানি না।

أَفْرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَءَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۗ ۖ أَعِنْدَهُ عِلْمُ

الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۗ ۖ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَابْرَاهِيمَ

الَّذِي وَصَّى ۖ ۖ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ ۖ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ

إِلَّا مَا سَعَى ۗ ۖ وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يُرَى ۗ ۖ ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْاَوْفَى ۗ ۖ

وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ النُّتْقَى ۗ ۖ وَأَنْهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۗ ۖ وَأَنْهُ هُوَ مَاتَ

وَأَحْيَا ۗ ۖ وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۗ ۖ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا

تُمْنَى ۗ ۖ وَأَنْ عَلَيْهِ النُّشَاةُ الْاُخْرَى ۗ ۖ وَأَنْهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ۗ ۖ وَ

أَنْهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى ۗ ۖ وَأَنْهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۗ ۖ وَثَمُودًا فَمَا

أَبْقَى ۗ ۖ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ ۖ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۗ ۖ

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ۗ ۖ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۗ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۗ ۖ

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ ۗ ۖ أَزْفَتِ الْأَرْفَةُ ۗ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ

دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۗ ۖ أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۗ ۖ وَتَضْحَكُونَ

وَلَا تَتَّبِعُونَ ۗ ۖ وَ أَنْتُمْ سَمِدُونَ ۗ ۖ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۗ ۖ

الْمُتَكَبِّرِينَ

(৩৩) আগনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও

পাশাপ ফেরে যায়। (৩৫) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি

জানানো হয়নি যা আছে মুসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ্ নিজে বহন করবে না (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে (৪০) তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল—পুরুষ ও নারী (৪৬) একবিন্দু বীর্ষ থেকে যখন সঞ্চলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শিরা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। (৫১) এবং সামুদকেও অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসহ—ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব, আল্লাহ্কে সিজদা কর এবং তার ইবাদত কর।

শানে-নুযুল : দুব্বরে মনসুরে ইবনে জরীর (র)-এর এক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, জৈনক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল : আমি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল : তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্তত করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রূহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তির নাম 'ওলীদ ইবনে মুগীর' লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( সৎকর্মীদের পরিচয় শুনলেন, এখন ) আপনি কি তাকেও দেখেছেন, যে ( সত্যধর্ম থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সামান্যই দেয়, অতঃপর বন্ধ করে দেয়? ( অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে অর্থকড়ি দেওয়ার ওয়াদা নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য করে, তাকেও পুরোপুরি দেয় না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য কিছুই ব্যয় করবে না। এর-সারমর্ম এই যে, সে কুপন ) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে তা দেখে? সার মাধ্যমে সে জানতে পেরেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে। তার কাছে কি সেই বিষয়বস্তু পৌঁছেনি, যা আছে মুসা (আ)-র কিতাবসমূহে [ তওরাত ছাড়াও মুসা (আ)-র দশটি সহীফা ছিল ] এবং ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে, সে বিধানাবলী পূর্ণরূপে পালন করেছিল? ( সেই বিষয়বস্তু ) এই যে, কেউ কারও গোনাহ্

(এভাবে) বহন করবে না (যে, গোনাহ্‌কারী মুক্ত হলে যায়। কাজেই সে কিরাপে বুঝল যে, এই ব্যক্তি তার গোনাহ্‌ বহন করবে?) এবং মানুষ (ঈমানের ব্যাপারে) তাই পায়, যা সে করে (অর্থাৎ অন্যের ঈমান দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। সুতরাং তিরস্কারকারী ব্যক্তির ঈমান থাকলেও তা তার উপকারে আসত না। তার ঈমান না থাকলে তো কথাই নেই)। এবং মানুষের কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের সাফল্যের চেষ্টা থেকে কিভাবে গাফিল হলে গেল?) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে সবাইকে পৌঁছতে হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরাপে নিশ্চিত হলে গেল?) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল (গর্ভাশয়ে) স্থাপিত একবিন্দু বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ সব কাজকর্মের তিনিই মালিক—অন্য কেউ নয়। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরাপে বুঝে নিল যে, কিয়ামতের দিন তাকে আশ্রাব থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা অন্যের করায়ণে থাকবে?) এবং পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই। (অর্থাৎ কারও দায়িত্বের ন্যায় এটা অবশ্যই হবে। অতএব, কিয়ামত হবে না, এটা স্মেন এই ব্যক্তির নিশ্চিত হওয়ার কারণ না হয়)। এবং তিনিই খনবান করেন এবং সম্পদ দান করেন। এবং তিনিই শিরা-নক্ষত্রের মালিক। (মুখতা যুগে কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত কাজকর্মের এসব কাজকর্ম ও বিষয়সমূহের মালিকও তিনিই। পূর্বোক্ত কাজকর্ম মানুষের অন্তিমের অন্তর্ভুক্ত। এবং এসব কাজকর্ম মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। সম্পদ ও নক্ষত্র উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তোমরা যাকে সাহায্যকারী মনে কর, তার মালিকও আমিই। অতএব, কিয়ামতে অন্যরা এসব কাজকর্মের অধিকারী হবে কিরাপে?) এবং তিনিই আদি আদ সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছেন এবং সামুদকেও, অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। তাদের পূর্বে কওমে নূহকে (ধ্বংস করেছেন)। তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। কারণ, সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতের পরও তারা পথে আসেনি এবং (লুতের) জনপদকে শূন্য উত্তোলন করে তিনিই নিষ্ক্রেপ করেছেন, অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেন, যা আচ্ছন্ন করার। (অর্থাৎ উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকে। অতএব, এই ব্যক্তি যদি এসব ঘটনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করত, তবে কুফরের আশ্রাবকে ভয় করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ! তোমাকে এমন বিষয়বস্তু জানানো হল, যা হিদায়ত হওয়ার কারণে এক একটি নিয়ামত)। অতএব, তুমি তোমার পালনকর্তার কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (এবং এসব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে উপকৃত হবে না?) তিনিও (অর্থাৎ এই পয়গম্বরও) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে একজন সতর্ককারী। (তাঁকে মেনে নাও। কারণ) দ্রুত আগমনকারী বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত) নিকটে এসে গেছে। (যখন তা আসবে, তখন) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ একে হটাতে পারবে না। (সুতরাং কারও ভরসায় নিশ্চিত্তে বসে থাকার অবকাশ নেই। অতএব, এমন ভয়াবহ কথাবার্তা শুনেও) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং (পরিহাসহলে) হাসছ—(আশ্রাবের ভয়ে) ক্রন্দন করছ না? তোমরা অহংকার করছ। (এ থেকে বিরত হও এবং পয়গম্বরের



শিক্ষা অনুযায়ী) আল্লাহর আনুগত্য কর এবং (শিরকবিহীন) ইবাদত কর, (যাতে তোমরা মুক্তি পাবে)।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَوَلَّى—এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

كُدَيْتَ—শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কৃপ অথবা

ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে كُدَيْتَ—এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযুলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছু আকুল্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

أَعْنَدَ—শানে-নুযুলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য

এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আশ্রাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যম্হারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাহুল্য, এটা নিরৈট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে-নুযুলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যম্হারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। কেননা, কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا نَفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ—অর্থাৎ তোমরা যা

ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার বিকল্প দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিষিকদাতা।

চিন্তা করলে দেখা যায়, কোরআনের এই বাণীর সত্যতা কেবল টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোন শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহে তার বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নিমিত্ত হত, তবে ষাট-সত্তর বছর ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদুপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আগমন করতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সা) হম্বরত বিলাল (রা)-কে বলেন : **انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اطلاقا** বিলাল, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশংকা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তোমাকে নিঃশ্ব করে দেবেন।—(ইবনে কাসীর)

এই **— اَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَاِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى** আল্লাতে হম্বরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে **وفى** বলা হয়েছে। **وفى** শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। **وفى** শব্দের এই তফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য **وفى** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ড-সহ আল্লাহর বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আল্লাহর আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রিসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়েভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

**وَابْرَأَ** উদাহরণত আবু ওসামা (রা)-র রেওয়াজেতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)

**وَابْرَأَ** আল্লাত তিলাওয়াত করে তাঁকে বললেন : তুমি জান এর মতলব কি ?

আবু ওসামা (রা) আন্বয় করলেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা)-ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : **وفى عمل يومه با وبع وكعات فى اول النهار** অর্থাৎ তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে নেন।—(ইবনে কাসীর)

তিরমিযীতে আবু যর (রা) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়।  
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

ابن آدم اركع لي اربع ركعات من اول النهار ا كفى اخره -

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন : হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাক'আত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়ায ইবনে আনাস (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি তোমা-  
দেরকে বলছি, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে **الَّذِي وَفَى** খেতাব কেন দিলেন।  
কারণ এই-যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ - (ইবনে কাসীর) -

মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা : কোরআন পাক পূর্ব-  
বর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই হয় যে, এই উশ্মতের জন্যও  
সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন  
কথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মুসা  
ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কমুক্ত  
কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলীর  
সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই :

وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ لَأُنْسَانٍ إِلَّا مَاسَعَىٰ وَأَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

— **وَزْر** শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী  
নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা।  
উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং  
অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَنْ تَدْعُ مَثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهَا شَيْئًا

পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন  
কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না : এই আয়াতের শানে-নুযুলে বর্ণিত  
ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে

ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোন আশাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর দরবারে একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করার কোন সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আশাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয় অথবা শ্বে ওয়ারিসদেরকে ওসীয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর শ্বেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়।— (মাম্বহারী) এমতাবস্থায় তার আশাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে **وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى**—এর সারমর্ম এই

যে, অপরের আশাব শ্বেন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মু'মিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরে কোন আইনগত খটকা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও শাকাতের প্রশ্নে বেশীর বেশী এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের শাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরফ থেকে শাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

'ইসালে সওয়াব' তথা মৃতকে সওয়াব পৌঁছানো : উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফরয ঈমান, ফরয নামায ও ফরয রোযা আদায় করে তাকে ফরয থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরী হয় না যে, এক ব্যক্তির নফল ইবাদতের উপকারিতা ও সওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না, বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলিমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার।—(ইবনে কাসীর)

কেবল কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব অপরকে দান করা ও পৌঁছানো জায়েয কি না, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবু-হানীফা (র)-র মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব শ্বেন অপরকে পৌঁছানো যায়, তেমনি কোরআন তিলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের সওয়াব অপরকে পৌঁছানো

জায়েহ। এরূপ সওয়ার পৌঁছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলেন : অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মু'মিন ক্বি অপরের সৎ কর্মের সওয়াব পায়। তফসীরে মায-হারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মুখ্‌তাসূনুড প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَأَنْ سَعِيَةٌ سَوْفٍ يُرَىٰ — অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ

তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **فَمَا إِلَّا عَمَالٌ بِالْأَعْمَالِ** অর্থাৎ কেবল দৃশ্যত কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকাকারী।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ

তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অনুমতিও নেই; যেমন কোন কোন রেওয়াজে আছে, আল্লাহ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর, তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহর জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَأَنَّ لَهُ هُوَ أَضْعَافٌ وَأَبَىٰ — অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং

এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তাঁর কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন। কবি চমৎকার বলেছেন :

بِغُوشِ كُلِّ چِهَةٍ سَخْنِ كَفْتَةٍ عِ خُنْدَانِ سَت

بَعْدَ لَيْبٍ جَاءَ فَرْمُودَةَ كَيْ نَالَانَ سَت

اِغْنَاءُ — وَأَنْتَ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اقنى শক্তি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাব মুক্ত করেন এবং তিনিই স্বাক্ষর ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَأَنْتَ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ — একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন

কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই, যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালকর্তা তিনি।

وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادَانَ الْأُولَىٰ وَثَمُودَ إِنَّمَا أَتَىٰ

পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হসরত হূদ (আ)-কে রসুলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে বনঝা বায়ুর আশ্রাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আশ্রাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।—(মাহহারী) সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হসরত সালেহ্ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বঙ্গনিনাদের আশ্রাব আসে। ফলে তাদের ছাৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُرْتَفَكَةَ أَهْوَىٰ — এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি

জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হসরত লূত (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিরূপে জিবরাসীল (আ) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشَّاهَا مَا عَشَّىٰ — অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার

পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মুসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হল।

تَمْرٍ — فَبَيِّتِ الْأَرْبَابَ تَتَمَارَىٰ — শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা।

হসরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এখানে প্রত্যেক মানুষকে সঙ্ঘোষন করে বলা হয়েছে

যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিদ্‌মাত্রণও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আত্মাবের ঘটনাবলী শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদ-সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ الْأُولَىٰ— শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (স) অথবা কোর-

আমের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কোরআনও পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণ-কারীদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখান।

أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ— অর্থাৎ নিকটে আগমন-

কারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

هَذَا الْعَدِيثُ— أَمْ نَمِنُ هَذَا الْعَدِيثُ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন স্বয়ং একটি মো'জেয। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ্ ও ছুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

سَمُودَ— وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ— এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিততা।

এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدْ وَاعْبُدْ— অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা

ও উপদেশের সবক'দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ বুখারীতে হম্বরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ্ (স) সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হম্বরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স) সূরা নজম পাঠ করে তিলা-ওয়াতের সিজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মু'মিন ও মুশরিক সিজদা করল,

একজন কোরায়েশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুঠি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলেন : আমার জন্য এটাই ক্ষেত্রেট। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সিজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত শায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে সূরা নজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সিজদা করেন নি। এই হাদীসদুটো জরুরী হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সন্দেহনা আছে যে, তখন তাঁর ওষু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থী অন্য কোন ওমর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা যায়।



سورة القمر  
সূরা ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۝ وَانْتَشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا

سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكَلَّ أَمْرٌ مُّسْتَمَرٌّ ۝

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ

فَمَا تُغْنِ التَّذْرِرَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝

خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفْرُ وَنَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত যাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। (৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান তবে সতর্ককারিগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরি-নামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়তে থাকবে। কাফিররা বলবে : এটা কতদিন দিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( কাফিরদের জন্য উচ্চস্তরের সতর্ককারী বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে )  
কিয়ামত আসন্ন, ( যাতে মিথ্যারোপ করার কারণে বড় বিপদ হবে এবং কিয়ামত নিটবর্তী

হওয়ার আলামতও বাস্তব রূপ লাভ করেছে। (সমতে) চম্প বিদীর্ণ হয়েছে। ] এর মাধ্যমে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, চম্প বিদীর্ণ হওয়া রসুলুল্লাহ (স)-র একটি মো'জেযা। এতে তাঁর নব্বয়ত প্রমাণিত হয়। নবীর প্রত্যেকটি কথা সত্য। তাই তিনি যে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, সেটাও সত্য হওয়া জরুরী। এভাবে সত্যকাকারী বিদ্যমান হয়ে গেছে। এতে তাদের প্রভাবাশ্রিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে ] তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে : এটা যাদু, যা এক্ষণি খতম হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এটা বাতিল। কারণ, বাতিলের প্রভাব

বেশীকণ স্থায়ী হয় না, যেমন আল্লাহ বলেন : **وَمَا يُبَدِّعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ**

—উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের নৈকট্য থেকে উপদেশ লাভ করা নব্বয়তে বিশ্বাসী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তারা এর দলীলের প্রতিই লক্ষ্য করে না এবং একে বাতিল মনে করে। এমতাবস্থায় তাদের উপর এর কি প্রভাব পড়তে পারে? এ ব্যাপারে) তারা (বাতিলে দৃঢ়-বিশ্বাসী হয়ে সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। (অর্থাৎ তারা কোন বিশ্বস্ত দলীলের ভিত্তিতে নয়, বরং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি মিথ্যারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা মো'জেযাকে যাদু বলে, যার প্রভাব দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। অতএব নিয়ম এই যে) প্রত্যেক বিষয় (কিছুদিন পর আসল অবস্থায় এসে) স্থিরীকৃত হয়ে যায়। (অর্থাৎ কারণ, ও লক্ষণাদি দ্বারা সত্য যে সত্য এবং মিথ্যা যে মিথ্যা তা সাধারণত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে তো এখন সত্য নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধিদের এখন তা বুঝে না আসলে কিছুদিন পরও বুঝে আসতে পারে। চিন্তা-ভাবনা করলে কিছুদিন পর তোমরাও জানতে পারবে যে, এটা ধ্বংসশীল যাদু, না অক্ষয় সত্য? উল্লিখিত সত্যকাকারী ছাড়াও) তাদের কাছে (অতীত উল্লেখদের) এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে (মখেষ্ঠ) সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে (তাদের অবস্থা এই যে) সত্যকাকারীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (যখন কিয়ামত ও আযাবের সময় এসে যাবে, তখন আপনা-আপনি জানা যাবে। অর্থাৎ) যেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে আহ্বান করবে, তখন তাদের নেত্র (অপমান ও ভয়ের কারণে) অবনমিত হবে (এবং) কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পংগপালের ন্যায় বের হবে। তারা (বের হয়ে) আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে থাকবে। (সেখানকার কঠোরতা দেখে) কাফিররা বলবে : এই দিন বড় কঠোর।

আনুমানিক স্তোত্রব্য বিষয়

পূর্ববর্তী সূরা নজম **أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ** বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত

নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ

**اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ** বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার

একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা আলোচিত হয়েছে। কেননা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন : আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা : মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাঁর রিসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা প্রকাশ করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের

وَإِنشُرَ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস

সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দলের রেওয়াজেতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক (রা) প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাজী (র) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়াজেতকে 'মুতাওয়্যাতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সবাইকে বললেন : দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুস্থান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল : মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, মক্কার এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ রেওয়াজেতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। — (বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়াজেত ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন :

ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية  
فأراهم القمر شقين حتى رأوا حواء بينهما -

মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নবুয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।—( বুখারী, মুসলিম )

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন :

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى  
نظروا الهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জরীর (রা)-ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে :

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فاحذت  
فرقة خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমি মিনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়াজেতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন :

انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين فقال كفا ر قريش اهل مكة  
هذا سحر سحركم به ابن ابي كبشة انظروا السفار فان كانوا راوا  
ما را ينتم فقد صدق - وان كانوا لم يروا مثل ما رأينتم فهو سحر سحركم  
به فسئل السفار قال وقد موا من كل جهة فقالوا رأينا -

মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরায়েশ কাফিররা বলতে থাকে, এটা যাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা যাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে।—( ইবনে কাসীর )

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব : গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের

এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোন কোন দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসঙ্গে ও হাজারো লাক্ষে মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভাষাতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে-ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মালাবাবের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কায় মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

مستمر — وَأَنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত

অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে **سَمَرٌ - مستمر** চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী যাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। **مستمر** শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও হাফহাক (রা) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত যাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন যাদু ও শক্ত যাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

﴿سَتَقَرُّ﴾ -এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই যে,

প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিকার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

﴿سَهَّطِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ -এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আন্নাভের অর্থ এই

যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যের মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ﴾ ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ﴾

﴿مُنْهَرٍ﴾ ﴿وَوَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِرَ﴾ ﴿تَجْرِي بِهَا عَيْنُنَا بَجَرَاءٍ لَمَّا كَانَ كُفِرَ﴾

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ﴾

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾

(৯) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারূপ করেছিল। তারা মিথ্যারূপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল : এ তো উন্মাদ। তারা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল : আমি অক্ষম, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবার্শণের মাধ্যমে। (১২) এবং তুমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রলবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নূহকে আরোহণ করলাম এক কাঠ ও পেরেক নিমিত্ত জলখানে, (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল (অর্থাৎ তারা নূহের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং) বলেছিল : এ তো উম্মাদ! (তারা কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হইনি, বরং একটি অনর্থক কাজও করেছিল, অর্থাৎ) তারা নূহ (আ)-কে হুমকি প্রদর্শন করেছিল।

(সূরা শোয়ারায় এর উল্লেখ আছে : **لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْءِ**

**جَوِّمِينَ**)-অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল : আমি অপারক, (আমি এদের মুকাবিলা করতে পারি না) অতএব আপনিই (তাদের) প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিন, যেমন অন্য আয়াতে আছে : **وَبَلَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ**

**مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا**) অতঃপর আমি প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের

উপর আকাশের দ্বার খুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে জারি করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর (আকাশ ও সমূহের) সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের ধ্বংস সাধনে। উভয় পানি মিলিত হয়ে প্লাবন বৃদ্ধি করল এবং তাতে সবাই নিমজ্জিত হল)। আমি নূহ (আ)-কে (প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য) আরোহণ করলাম এক কাঠ ও পেরেক নিমিত্ত জলখানে, যা আমারই তত্ত্বাবধানে (পানির উপর) ভেসে চলত। (মু'মিনগণও তার সাথে ছিল)। এটাই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। [অর্থাৎ নূহ (আ)। রসূল ও আল্লাহর অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এতে কুফরও দাখিল আছে। অতএব কুফরের কারণে নিমজ্জিত করা হয়নি—এরূপ সন্দেহ করার অবকাশ রইল না]। আমি এই ঘটনাকে শিক্ষার জন্য (কাহিনী ও কিংবদন্তীতে) রেখে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (দেখ) আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কেমন কঠোর ছিল। আমি (এমন এমন কাহিনী সম্বলিত) কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। (সাধারণত সবার জন্য, কারণ এর বর্ণনাভঙ্গি সুস্পষ্ট এবং বিশেষত আরবদের জন্য, কারণ এটা আরবী ভাষায়)। অতএব (কোরআনে এসব উপদেশের বিষয়-বস্তু দেখে) কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (অর্থাৎ এসব কাহিনী দেখে বিশেষভাবে কাফিরদের সতর্ক হওয়া উচিত)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**وَأَزْدِجِرٍ—مَجْنُونٍ وَأَزْدِجِرٍ** এর শাস্তিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল।

উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আ)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আ)-কে

হমকি প্রদর্শন করে বলল : যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমিরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হমায়দ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, নূহ (আ)-র সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথেঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন : আল্লাহ্, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অস্ত। সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَاَلْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ — অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ

থেকে বহিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

ذَاتِ الْوَاحِ وَدُّ سِرِّ — الواح শব্দটি এর বহুবচন। অর্থ কাঠের

তক্তা সার শব্দটি এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

ذَكَرْ—وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هُمْ مِنْ مَدْكِرٍ — এর অর্থ বিবিধ :

এক. মুখস্থ করা এবং দুই. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন গ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজীকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক-বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের পার্থক্য হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে প্রতি সুরে প্রতি ডুখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেজের বৃকে আল্লাহর কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ ছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলিম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণমুখ্য ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চমকন করার জন্য কোরআনকে সহজ করা হয়নি : আলোচ্য আয়াতে يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক



আলিম ও জাহিল, ছোট ও বড়—সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত। যেসব প্রগাঢ় জানী আলিম এই শাস্তের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্তে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করলেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথপ্রস্টাভ।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذِرِي ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا  
صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسَمَّرٍ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝  
فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذِرِي ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ  
مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّا وَجَدْنَا نَبْعَةً ۝  
إِنَّا إِذَا لَقِىَ ضَلِيلًا وَسُعِيرًا ۝ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ  
كَذَّابٌ أَشْرٌ ۝ سَيَعْلَمُونَ عَدَابَ الْكَذَّابِ الْآشِرِ ۝ إِنَّا مُرْسِلُوا  
النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ  
بَيْنَهُمْ، كُلٌّ شَرْبٌ مُّحْتَضِرٌ ۝ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝ فَكَيْفَ  
كَانَ عَدَابِي وَنُذِرِي ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا  
كُوهِيمَ الْمُحْتَظِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ  
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۝  
نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝  
وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَهِيفَةٍ

فَطَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۝ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً  
عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ  
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝  
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ۝

(১৮) 'আমদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঋগ্বেদ-স্বাস্ত্র এক চির-চলিত অশুভ দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাতিত খজুর ফলের কাণ্ড। (২১) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (২৩) সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল: আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার-প্রসূরূপে পণ্য হব। (২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাখিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। (২৬) এখন আগামীকালই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উদ্ভূতী প্রেরণ করব, অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবার কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পাল্লা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সংসীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিবাদের প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল ওজ্ঞ শাখাপন্ন নিমিত্ত দগিত খৌন্সড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৩৩) লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনু-প্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই পুরজুত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতস্তা করেছিল। (৩৭) তারা লূত (আ)-এর কাছে তার মেহমানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু মৌপ করে দিলাম অতএব আত্মদান কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রহৃত্যে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল। (৩৯) অতএব আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আত্মদান কর। (৪০) আমি কোরআনকে বুঝবার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৪১) ফির-আউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল

নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাকৃতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায়ও ( তাদের পয়গম্বরের প্রতি ) মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। ( তাদের কাহিনী এই যে ) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রচণ্ড বাতাস, এক অরিরাম অশুভ দিনে। ( অর্থাৎ সেই সময়টি তাদের জন্য চিরতরে অশুভ হয়ে রয়েছে। সেদিন যে শাস্তি এসেছিল, সেটা কবরের আযাবের সাথে সংলগ্ন হয়ে গেছে। এরপর পরকালের আযাব এবং তার সাথে মিলিত হবে, যা কোন সময় ক্ষতম হবে না )। সেই বায়ু এভাবে মানুষকে ( তাদের জায়গা থেকে ) উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খজুর রুক্ষের কাণ্ড। ( এতে তাদের দীর্ঘাকৃতি হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত আছে )। অতএব ( দেখ ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সামুদ সম্প্রদায়ও পয়গম্বরণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ( কেননা, এক পয়গম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করা সকল পয়গম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করারই নামান্তর )। তারা বলেছিল : আমরা কি আমাদেরই একাকী একজনের অনুসরণ করব? ( অর্থাৎ ফেরেশতা হলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম অথবা সাজপাঙ্গ বিশিষ্ট হলে পার্থিব ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম। সে তো একাকী মানব। এমতাবস্থায় যদি আমরা অনুসরণ করি ) তবে তো আমরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব। আমাদের মধ্য থেকে ( মনোনীত হয়ে ) তার প্রতিই কি ওহী নাখিল হয়েছে? ( কখনই এরূপ নয় ) বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। [ নেতা হওয়ার জন্য দস্তভরে সে এমন কথাবার্তা বলে। আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ্ (আ)-কে বললেন : তুমি তাদের অর্থহীন কথাবার্তায় দুঃখ করো না ] সত্বরই ( অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই ) তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। ( অর্থাৎ নবয়ুগত অস্বীকার করার কারণে তারা ই মিথ্যাবাদী এবং দস্তের কারণে তারা ই নবীর অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা উষ্ট্রীর মো'আজ্জা চাইত। তাদের আবেদন অনুযায়ী প্রস্তরের ভিতর থেকে ) তাদের পরীক্ষার জন্য আমি এক উষ্ট্রী বের করব। অতএব তাদের ( কর্মকাণ্ডের ) প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবার কর। ( উষ্ট্রী আবির্ভূত হলে ) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে ( কূপের ) পানির পাল্লা নির্ধারিত হয়েছে। ( অর্থাৎ তোমাদের চতুর্দিক জন্তু ও উষ্ট্রীর পাল্লা নির্ধারিত হয়ে গেছে )। প্রত্যেককে পাল্লা-ক্রমে উপস্থিত হতে হবে। [ সেমতে উষ্ট্রী আবির্ভূত হল এবং সালেহ্ (আ) একথা জানিয়ে দিলেন ]। অতঃপর ( পাল্লা দেখে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল এবং ) তারা ( উষ্ট্রীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ) তাদের সংগী ( কুদার )-কে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর ( দেখ ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ( শাস্তি এই যে ) আমি তাদের প্রতি একটি মাত্র নিদা ( ফেরেশতার ) প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নিমিত্ত দলিত বেড়ার ন্যায়। ( অর্থাৎ ক্ষেত অথবা জন্তু-জানোয়ারের

হিফায়তের জন্য শুক্ক তূপ ইত্যাদি দ্বারা বেড়া অথবা খোঁস্কাড় বানানো হয়। কিছুদিন পর এগুলো দলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারাও এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আরবরা এই বেড়া ও খোঁস্কাড়ের সাথে দিবানাহ পরিচিত ছিল। তাই তারা এর অর্থ খুব বুঝত। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? লুত সম্প্রদায়ও পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তররুষ্টি বর্ষণ করেছি। কিন্তু লুত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে (বস্তির বাইরে নিয়ে যেনে) উদ্ধার করেছিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ-স্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে (অর্থাৎ ঈমান আনে), আমি তাদেরকে এইভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। [অর্থাৎ ক্রোধান্নি থেকে রক্ষা করি। লুত (আ) আমাব আসার পূর্বে] তাদের আমার প্রচণ্ড আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (অর্থাৎ বিশ্বাস করল না। যখন লুতের কাছে আমার ফেরেশতা মেহমানের বেশে আগমন করল এবং তারা সুন্দর বালকদের আগমন জানতে পারল, তখন সেখানে এসে) তারা লুতের কাছে তার মেহমানদেরকে কুমতলবে দাবী করল। [ফলে লুত (আ) প্রথমে বিব্রত হলেন। কিন্তু তারা ছিল ফেরেশতা। কাজেই ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়ে] আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। [অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা তাদের চোখের উপর রেখে দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল। তাদেরকে বলা হল : ] অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা আশ্বাদন কর। (অন্ধ করার পর) প্রত্যুষে তাদেরকে স্থায়ী আযাব আঘাত হেনেছিল। (বলা হল : ) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আশ্বাদন কর। (এই বাক্য প্রথমে অন্ধ হওয়ার আযাবের পর বলা হয়েছিল। এখানে ধ্বংস করার পর বলা হয়েছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নেই)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছেও অনেক সতর্কবাণী পৌঁছেছিল। [অর্থাৎ মুসা (আ)-র বাণী ও মো'জেযা]। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনের (অর্থাৎ নয়টি প্রসিদ্ধ নিদর্শনের) প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (অর্থাৎ সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ তওহীদ ও নবুয়তের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। নতুবা ঘটনাবলীকে মিথ্যা বলা সম্ভবপর নয়)। অতঃপর আমি প্রবল পরাক্রান্তের ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (অর্থাৎ আমার পাকড়াওকে কেউ প্রতিহত করতে পারল না। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত স্বয়ং আলাহ তা'আলা)।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যা :

سعر শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে

সামুদ পোলের আলোচনায় তাদেরই উদ্ভিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয়

سعر فی مالا বাক্যাংশে। এখানে سعر এর অর্থ জাহান্নামের অগ্নি। অস্তিত্বানে এই

শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

سراودة - رادوة من فهنة শব্দের অর্থ কামপ্রকৃতি চরিতার্থ করার

জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লুত বাবলকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সূত্রী বাবলকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য লুত (আ)-এর পুত্র উপস্থিত হয়। লুত (আ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লুত (আ) বিব্রত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন : আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত-এবং পরকাল-বিমুখ কাফিরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিখ্যাত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নূহ (আ)-র সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে-লুত ও কওমে ফিরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপমনের চিহ্ন অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে :

فَكَهَفْنَا نَ عَذَابِي وَنَذِيرِ — অর্থাৎ এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির

উপর যখন আল্লাহ্‌র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হলে গেল! এতদসঙ্গে মু'মিন ও কাফিরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ — অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এই মহা

শাস্তির কবল থেকে আশ্রয়কার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফিররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, সামূদ ও ফিরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

الْكَافِرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝ أَمْ يَقُولُونَ  
 نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّتَّبِعُونَ ۝ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝ السَّاعَةَ مَوْعَدُهُمْ  
 وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَآمْرٌ ۝ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝ يَوْمَ  
 يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝ إِنَّا كُلَّ  
 شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝ وَلَقَدْ  
 أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ قَبْلَ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝  
 وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝ إِنَّ السُّعْيِينَ فِي جَنَّتِمْ وَنَهْرٍ ۝ فِي  
 مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

(৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চাইতে প্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিভাবেসমূহে? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাধের দল? (৪৫) এ দল তো সঙ্ঘরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৪৬) -বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়িয়ে টেনে নেওয়া হবে আহ্বানামে, বলা হবে : অগ্নির খাদ্য আহ্বাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামার লিপিবদ্ধ আছে (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) আল্লাহ্‌তায়ালার থাকবে জামাতে ও নির্ধারণীতে; (৫৫) বোধ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সামিথে।

### তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের কাহিনী ও কুফরের কারণে তাদের শাস্তির ঘটনাবলী তোমরা শুনে। এখন তোমরাও যখন কুফরের অপরাধে অপরাধী, তখন তোমাদের শাস্তির কবল থেকে বেঁচে যাওয়ার কোন কারণ নেই)। তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত কাফিরদের) চাইতে প্রেষ্ঠ? (যে কারণে তোমরা অপরাধ করা সত্ত্বেও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না?) না তোমাদের জন্য (ঐশী) কিভাবেসমূহে মুক্তির সনদপত্র রয়েছে? না তারা

বলে যে, আমরা এক অপরাধের দল? (তাদের পরাজিত হওয়ার তো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং তারা নিজেরাও এতে বিশ্বাস করে। এরপরও একথা বলার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে শাস্তি প্রতিরোধকারী কোন শক্তি আছে। শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্য থেকে কোন্টি তোমাদের অর্জিত আছে? প্রথমোক্ত দুটি উপায় তো সুস্পষ্টরূপেই বাতিল। অভ্যস্ত কারণাদির দিক দিয়ে তৃতীয় উপায়টি সম্ভবপর হলেও তা ঘটবে না, বরং বিপরীতটা ঘটবে। এভাবে ঘটবে যে,) এ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। (এই ভবিষ্যদ্বাণী বদর, ঋক্ষক ইত্যাদি যুদ্ধে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। এই পাখিব শাস্তিই শেষ নয়।) বরং (বড় শাস্তির জন্য) কিয়ামত তাদের (আসল) প্রতিশ্রুত সময়। (কিয়ামতকে সামান্য মনে করো না বরং) কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একে অস্বীকার করার ব্যাপারে) এই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (তাদের এই জুল সেদিন ধরা পড়বে,) যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়িয়ে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে। (বলা হবে:) জাহান্নামের (অগ্নির) মজা আন্বাদন কর। (যদি তারা এ কারণে সন্দেহ করে যে, কিয়ামত এই মুহূর্তে কেন সংঘটিত হয় না, তবে এর কারণ এই যে,) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (সেই পরিমাণ আমার জানা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সময়কাল ইত্যাদি আমার জানে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আছে। এমনিভাবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ারও একটি সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই সময় না আসার কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে না। এর ফলে কিয়ামত সংঘটিতই হবে না বলে প্রতারণিত হওয়া উচিত নয়। সময় এলে সে সম্পর্কে) আমার কাজ মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে হয়ে যাবে। (তোমরা যদি মনে কর যে, তোমাদের চালচলন আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ও গর্হিত নয়। ফলে কিয়ামত হলেও তোমাদের কোন চিন্তা নেই, তবে শুনে রাখ) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। (এটাই তোমাদের চালচলন গর্হিত হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল)। অতএব (এই দলীল থেকে) উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহর জানের আওতা-বহির্ভূতও নয়, মন্দরূপ তাদের ক্রিয়াকর্ম গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও আযাব থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারত। বরং) তারা যা কিছু করে, সবই (আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং) আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (এরাপ নয় যে, কিছু লেখা হয়েছে এবং কিছু বাদ পড়েছে, বরং) প্রত্যেক ছোট ও বড় সবই (তাতে) লিপিবদ্ধ। (সুতরাং আযাব যে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহ্‌ভীরু পরহিসগার, তারা থাকবে (জান্নাতের) উদ্যানসমূহে ও নিব্ব্বলিগীতে, চমৎকার স্থানে, সর্বাধিপতি সত্ত্বাট আল্লাহর সান্নিধ্যে অর্থাৎ জান্নাতের সাথে আল্লাহর নৈকট্যও অর্জিত হবে।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা : **زبور** শব্দটি **زبور** এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবে **زبور** বলা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। **أدھی**—এর অর্থ অত্যধিক উয়াবহ এবং **امر** শব্দের

অর্থ তিওতর। এটা امر থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও امر বলা হয়। امر শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। شہية শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী, অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা। مقعد এর অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صدق এর অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

قد - اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ শব্দের আন্তিধানিক অর্থ পরিমাপ করা,

কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল প্রণীর বস্তু বিজুলভ পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অল্পসমূহ একই রূপ তৈরী করেন নি—দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরীরতের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহর তকদীর তথা বিধিগিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের উদ্ধৃতিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মসনদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়াজেতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফিররা একবার রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাপ, সময়কাল, স্থান-স্থানের পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টিলাভ করে, তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টিলাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সন্নাসরি অস্বীকার করে, সে কাফির। আর যারা ষা'খতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা কাফির। আহমদ, আবু দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফির) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মনে গেলে কাফির-দাকনে অংশগ্রহণ করো না —(ব্লাহন-মা'আনী)॥



سورة الرحمن  
সূরা আর-রহমান

মদীনায়ে অবতীর্ণ, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا  
وَوَضَعَهُ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَالِكِهَةُ وَ  
التَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالرِّيحَانُ ۝ فَيَأْتِي  
الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝  
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝ فَيَأْتِي الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝  
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَيَأْتِي الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝  
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ۝ يَنْهَمَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيانِ ۝ فَيَأْتِي الْأَءِ  
رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝ فَيَأْتِي الْأَءِ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبِينَ ۝ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَعْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَيَأْتِي  
الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু জালাইর নামে শুরু

(১) করুণাময় জালাই (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (৪) তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃণলতা

ও হুকুমাদি সিদ্ধান্ত জাছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুদ্রত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কামের কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টি জীবের জন্য। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট বর্জুর হুক। (১২) আন আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব তোমরা উত্তরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন গোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব তোমরা উত্তরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদরাতল ও দুই অস্ত্রাতলের মালিক। (১৮) অতএব তোমরা উত্তরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উত্তরের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব তোমরা উত্তরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে (২২) উত্তর দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব তোমরা উত্তরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ার বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব তোমরা উত্তরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

সূরার যোগসূত্র এবং **فَيَا أَيُّهَا** বাক্যটি বারবার উল্লেখ করার তাৎপর্যঃ পূর্ববর্তী সূরা কামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অবধা জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য **فَكَيْفَ كَانَ**

**عَذَابِي وَنُذْرِ** বাক্যটি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে সাথে ঈমান ও

আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য দ্বিতীয় বাক্য **وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ** কে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও গায়লৌকিক অবদানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে হুঁশিয়ার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্য

**فَيَا أَيُّهَا رِبْكُمْ** বাক্যটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এই বাক্য

একত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুসহ সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা অলংকার শব্দের পরিগহী নয়। আল্লামা সুন্নতী এ ধরনের পুনরাবৃত্তির

নাম রেখেছেন তন্নদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের পদ্য ও পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজনস্বীকৃত কবিতার কাব্যেও এর নযীর পাওয়া যায়। এসব নযীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তকসীর রুহুল-মা'আনীতে এ স্থলে কয়েকটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে।

### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

করণাময় আল্লাহ্ (তাঁর অসংখ্য অবদান আছে। তন্মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক অবদান এই যে, তিনি) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এবং ইলুম হাসিল করে আমল করার জন্য কোরআন নাখিল করেছেন, যাতে বান্দারা চিরস্থায়ী সুখ ও আরাম, হাসিল করে। আরেকটি শারীরিক অবদান এই যে, তিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (অতঃপর) তাকে শিখিয়েছেন বিবৃতি (এর উপকারিতা হাজারো। অন্যের মুখ থেকে কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া তন্মধ্যে একটি। আরেকটি বিশ্বজনীন দৈহিক অবদান এই যে, তাঁর আদেশে) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে এবং তুলনতা ও রুদ্ধাদি। (আল্লাহ্‌র) অনুগত। সূর্য ও চন্দ্রের গতি দ্বারা দিবা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম এবং মাস ও বছরের হিসাব জানা যায়। কাজেই তা অবদান। (আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য রুদ্ধাদির মধ্যে অসংখ্য উপকার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই রুদ্ধের আনুগত্যও এক অবদান। আরেক অবদান এই যে) তিনিই আকাশকে সমুদ্রত করেছেন। (নভোমণ্ডলীয় উপকারিতা ছাড়াও এর একটা বড় উপকার এই যে, একে দেখে প্রলতার অপরিসীম মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ্ বলেন :

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

আরেক অবদান এই

যে, তিনিই (দুনিয়াতে) দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী না কর। (এটা যখন লেনদেনের হক পূর্ণ করার একটি যন্ত্র, যন্ত্রা হাজারো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট দূর হয় তখন তোমরা বিশেষভাবে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং এটাও এক কৃতজ্ঞতা যে) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়ম কর এবং ওজনে কম দিয়ে না। (আরেক অবদান এই যে) তিনিই সৃষ্টি জীবের জন্য পৃথিবীকে (তাঁর স্থানে) স্থাপন করেছেন। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খজুর রুদ্ধ। আর আছে খোসা বিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধ ফুল অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অর্থাৎ অস্বীকার করা খুবই হঠকারিতা এবং জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আরেক অবদান এই যে) তিনিই মানুষকে (অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষ আদমকে) সৃষ্টি করেছেন গোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জিনকে (অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করেছেন খাঁটি অগ্নি থেকে (যাতে ধূম্ব ছিল না। অতঃপর প্রজননের মাধ্যমে উভয় জাতি বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ সূর্য ও চন্দ্রের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল। দিবা-রাত্রির গুরু ও শেষের উপকারিতা এর সাথে

সম্পূর্ণ। কাজেই এটাও একটা অবদান। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তিনি দুই দরিয়াকে (দূশ্যত) মিলিত করেছেন, ফলে (বাহ্যত) সংশ্লুত হয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক (প্রাকৃতিক) অন্তরাল, যা তারা (অর্থাৎ উভয় দরিয়া) অতিক্রম করতে পারে না। (সবশেষে পানি ও মিশ্র পানির উপকারিতা অজানা নয়। দুই দরিয়া সংশ্লুত হওয়ার মধ্যে প্রমাণগত অবদানও আছে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (দুই দরিয়া সম্পর্কিত এক অবদান এই যে) উভয় দরিয়া থেকে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। (এগুলোর উপকারিতা ও অবদান হওয়া বর্ণনা সাপেক্ষ নয়)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (ও মালিকানাধীন) সেই জাহাজসমূহ যেগুলো সমুদ্রে পর্বত সদৃশ ভাসমান (দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর উপকারিতাও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

### জানুয়ারি জাতীয় বিষয়

সূরা আর-রহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ আমি 'মাক্কাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার

فَبَيِّنِي الْآءَ رَبِّكُمْ  
আমরা তিলাওয়াত করতাম, তখনই তারা সম্বন্ধে বলে উঠতঃ

وَبِنَا لَا نَكْذِبُ بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ فَلِكِ الْحَمْدُ  
অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা!

আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ (সা) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য এই যে, মক্কায় কাকিরুয়া আজাহ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলমানদের মুখে 'রহমান' নাম শুনে

তারি বলাবলি করত : **وَمَا الرَّحْمٰنُ** রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পনের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওলাজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা রয়েছে। **عَلَّمَ الْقُرْآنَ** বলে সর্বস্থলে অবদান দ্বারা শুরু করা

হয়েছে। কোরআন সর্বস্থলে অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উত্তর প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবীয়ে কিরাম কোরআনকে কলমমনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি মথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। কলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্‌রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিম্নম অনুযায়ী **عَلَّمَ** ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে—এক. যা শিক্ষা

দেওয়া হয় এবং দুই. যাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতার সমগ্র সৃষ্ট জীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোরআন নাখিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎ কর্ম শিক্ষা দেওয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

**خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَالِمًا لِّبَيَانٍ**—মানব সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড়

অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাপেক্ষে। কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অপেক্ষে এবং মানব সৃষ্টি পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার

ইবাদত করার জন্য করেছি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র শিক্ষা বাতীল ইবাদত হতে পারে না।

কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রে স্থান লাভ করেছে।

মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হলে এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত; যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মানব ও জন্তু-জানোয়ার নিবিশেষে প্রাণীমাত্রই অংশীদার। কিন্তু যেসব অবদান বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিত্রপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন

অঙ্গ এবং এটা কার্যত  $\text{عَلَّمَ اِنَّمَا اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا}$  আয়াতের তফসীরও।

$\text{اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا}$  —আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও

নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে।

$\text{حِسَابٌ}$  শব্দটি কারও কারও মতে খাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা

$\text{حِسَاب}$  শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়।  $\text{حِسَابٌ}$  শব্দটিকে

$\text{حِسَاب}$ —এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয়নি।

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ বলা হয়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কার প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। কিন্তু মানবাবিকৃত বস্তু ও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। মানবাবিকৃত বস্তু মধ্য ডাঙ্গাগড়া এক অপরিহার্য বিষয়। মেশিন যতই মজবুত ও শক্ত হোক না কেন কিছুদিন পর তা মেরামত করা, কমপক্ষে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেরামত ও পরিচ্ছন্নকরণের সময়ে মেশিনটি অকেজো থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রবর্তিত এই বিশালকার্য গ্রহণলো কোন সময় মেরামতের মুখাপেক্ষী হয় না এবং এদের অব্যাহত গতিধারার কোন পার্থক্যও হয় না।

এবং نَجْمٌ — কাণ্ডবিহীন মতানো গাছকে وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شَجَرٌ বলা হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার মতাপাতা ও বৃক্ষ আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা করে। সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, মতাপাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সেই কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কা'র্য্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধাতা-মূলক আনুগত্যকেই আয়াতে 'সিজদা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী, মায়হারী)

দুটি বিপরীত শব্দ وَرَفَعَ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

رفع শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং وضع শব্দের অর্থ নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও প্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমস্ত কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আয়োচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর

বৈপরীতাই স্কটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুন্নতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যও ন্যায় ও ইনসাক প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে শান্তিও ন্যায় এবং ইনসাকের স্বাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই অনর্থ হবে।

হয়রত কাভাদিহি, মুজাহিদ, সুদী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তরুসীরে করেছেন নীচ-বিচার। কেননা, মীযান শুধা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোমি কোম তরুসীরে মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক জেদেমে ন্যায় ও ইনসাক কায়েম করা। এখানে মীযানের

অর্থে এমন মন্ত্র দাখিল আছে, যম্বারা কোন মন্ত্র পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তা দুই পাল্লা-বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপমন্ত্র হোক।

—**أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ**— এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও

লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে জোয়ার ও জনে কমবেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

—**وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ**— অর্থাৎ ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কামেম কর।

—**قِسْطٌ**— এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

**أَقِيمُوا الْوَزْنَ**—**وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ** বাক্যে যে বিষয়টি ধনাঙ্কক ভঙ্গিতে

ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ধনাঙ্কক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ওজনে কম দেওয়া হারাম।

—(কামুস) **إِذَا** বলা হয়। **وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ** ভূগর্ভের প্রত্যেক প্রাণীকে

বান্ধাঘাটী বলেন : যার আত্মা আছে, সেই —আয়াতে **إِنَّمَا** বলে বাহ্যত মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا** বলে তাদেরকে বারবার সম্বোধনও করা হয়েছে।

**فَاكُوهَا**—**فَاكُوهَا** এমন কলমুলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবত

মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়।

—**وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ** শব্দটি **كَم**—এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ,

যা খজুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

—**وَالعَصْفُ**—এর অর্থ শস্য, যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর

ইত্যাদি। **عَصْفٌ** সেই খোসাকে বলে, যার ভেতরে আল্লাহ্‌র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার



কল্পণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কণাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে কীট, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা নিরুপ সূকৌশলে সৃষ্টিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন। এত কিছুই পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সর্ববৃত্ত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুর্দিক জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

وَالرِّيحَانُ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে ময়েদ (র) আয়াতের এই

অর্থই বুঝিয়েছেন। আলাহ তা'আলা সৃষ্টিকা থেকে উৎপন্ন রূক্ষ থেকে নানা রকমের সুগন্ধি এবং সুগন্ধমুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। رِيحَانٌ শব্দটি কোন কোন সময় নির্মাস ও রিষিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خُرْجَتِ اَطْلَبُ وَرِيحَانُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আলাহর রিষিক অন্বেষণে বের হলাম। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতে رِيحَانٌ এর এ তফসীরই করেছেন।

الْاَعْرَابُ فَيَايَ الْاَعْرَابِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ—শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান।

আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

ذَلَّلْنَا النَّسْلَ الْمَعْتَدَ—এখানে اِنْسَانٌ বলে সরাসরি সৃষ্টিকা

থেকে সৃষ্ট আদম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। اِنْسَانٌ-এর অর্থ পানি মিশ্রিত গুচ্ছ মাটি।

رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ—এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় গুচ্ছ সৃষ্টিকা থেকে সৃষ্টি

করেছেন।

مَارِجٍ مِّنَ الْجَبَانِ—এর অর্থ জিন জাতি। مَارِجٍ—এর

অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান সৃষ্টিকা।

رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ—শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও

অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। শীতকালে مَشْرِقٍ অর্থাৎ উদয়াচল এবং مَغْرِبٍ অর্থাৎ অস্তাচল

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয়। আয়াতে সম্বৎসরের এই দুই উদয়চল ও দুই অস্তচলকে  
مغرِبُونِ وَ مَشْرِقِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مرج — مرج البحرین এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেওয়া

بِئْن বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হলে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে :

مرج البحرین یلتقیان بهنما برزخ لا یبغیان

পরস্পরে মিলিত হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না।

مرجان — یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان শব্দের অর্থ মোতি এবং

এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। এতে রক্তের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, মোতি ও মণিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়—মিঠা সমুদ্র নয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমুদ্র থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির সমুদ্র প্রবহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

عجاریة — جارية و لة الجوار المنشآت فی البحر كما لا علم

বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা, জাহাজ। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। منشآت শব্দটি নস্আ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল ও পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۗ وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِلَٰهِ

كَرَامَةٌ فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝  
 سَنَفَعُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ۝ فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ يَعْشَرُ  
 النُّجُومِ وَالْإِنشِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ  
 وَالأَرْضِ فَانفُذُوا وَآلَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطِينٍ ۝ فَيَأْتِي الآءِ  
 رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظُ مَرْتٍ تَارِدٌ وَنُحَاسٌ  
 فَلَا تَنْتَصِرُونَ ۝ فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ  
 فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۝ فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا  
 تُكذِّبِينَ ۝ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝  
 فَيَأْتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا  
 الْمُجْرِمُونَ ۝ يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِن ۝ فَيَأْتِي الآءِ  
 رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝

(২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধবংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোন-না-কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলের প্রাপ্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুণ্ড তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাম্ব, লাল চামড়ার ন্যায়। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতএব তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা স্বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা তোমরা শুনে, তোমাদের উচিত তওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে এগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং কুফর ও গোনাহের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতা না করা। কেননা, এ জগত ধ্বংস হওয়ার পর আরেকটি জগৎ আসবে। সেখানে ঈমান ও কুফরের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে তাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই (অর্থাৎ জিন ও মানব) ধ্বংস হয়ে যাবে এবং (একমাত্র) আপনার পালনকর্তার মহিমময় ও মহানুভব সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। (উদ্দেশ্য জিন ও মানবকে হুশিয়ার করা। তারা ভূপৃষ্ঠে বসবাস করে। তাই বিশেষভাবে ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংস হবে বলা হয়েছে। এতে জরুরী হয় না যে, অন্য কোন বস্তু ধ্বংস হবে না। এখানে আল্লাহ তা'আলার দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমময় ও মহানুভব। প্রথমটি সত্তাগত ও দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক। এর সারমর্ম এই যে, অনেক মর্হিমাম্বিত ব্যক্তি অপরের অবস্থার প্রতি দৃকপাত করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহামহিম হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও রূপা করেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া ও এরপর প্রতিদান ও শাস্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে ঈমানরূপ ধন দান করার নামাস্তর। তাই এটা একটা বড় অবদান। সেমতে বলা হয়েছে : ) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (তিনি এমন মহিমময় যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁরই কাছে (নিজ নিজ প্রয়োজন) প্রার্থনা করে। (ভূমণ্ডলে বসবাসকারীদের প্রয়োজন বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। নভোমণ্ডলে বসবাসকারীরা পানাহার না করলেও দয়া ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী। অতএব আল্লাহ তা'আলার মহানুভবতা প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হচ্ছে : ) তিনি সর্বদাই, কোন-না-কোন কাজে রত থাকেন। (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কাজ করা তাঁর সত্তার জন্য অপরিহার্য। বরং অর্থ এই যে, বিষয়চরারের যত কাজ হচ্ছে, সবই তাঁরই কাজ। তাঁর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অনুগ্রহ

ওকুপা করাও একটি মহান অবদান)। অতএব হে মানব ও জিন! তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর আবার পৃথিবী ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না যে, ধ্বংসের পর শাস্তি ও প্রতিদান হবে না; বরং আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করব এবং শাস্তি ও প্রতিদান দেব। বলা হচ্ছেঃ) হে মানব ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ হিসাব কিতাব নেব। রূপক ও আতিশয্যের অর্থে একেই কর্মমুক্ত হওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতিশয্য এভাবে বোঝা যায় যে, মানুষ সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কোন কাজে হাত দিলে একে পূর্ণ মনোনিবেশ বলে গণ্য করা হয়। মানুষের বুঝবার জন্য একথা বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার শাসন এই যে, তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাঁধা হয়ে যায় না। তিনি যে কাজে মনোনিবেশ করেন পূর্ণরূপেই মনোনিবেশ করেন। আল্লাহর কাজে অসম্পূর্ণ মনোনিবেশের সম্ভাবনা নেই। এই হিসাব নিকাশের সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান। তাই বলা হচ্ছেঃ) হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (হিসাব-নিকাশের সময় কারও পলায়ন করারও সম্ভাবনা নেই। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) হে জিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমা স্তম্ভিক্রম করে বাইরে চলে যাওয়া যদি তোমাদের সাথে কুলান্ন, তবে (আমিও দেখি,) তোমরা চলে যাও, (কিন্তু) শক্তি ব্যতীত তোমরা চলে যেতে পারবে না। (শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই চলে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। কিয়ামতেও তদ্রূপ হবে। বরং সেখানে অক্ষমতা আরও বেশী হবে। মোটকথা, পলায়ন করার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়টি বলে দেওয়াও হিদায়তের কারণ এবং একটি মহান অবদান।) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উপরে যেমন হিসাব-নিকাশের সময় তাদের অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অতঃপর আযাবের সময় তাদের অক্ষমতা উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ হে জিন ও মানব অপরাধীরা!) তোমাদের প্রতি (কিয়ামতের দিন) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূম্রকুঞ্জ ছাড়া হবে। অতঃপর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। একথা বলাও হিদায়তের উপায় হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (যখন হিসাব-নিকাশ নেওয়া ও এতদসঙ্গে তোমাদের অক্ষমতার কথা জানা গেল, তখন কিয়ামতের দিন প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং) যখন (কিয়ামত আসবে এবং) আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাত, লাল চামড়ার মত। (ক্রোধের সময় চেহারা রক্তিমাত হয়ে যায়। ক্রোধের আলামত হিসাবেই সম্ভবত এই রং হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, অপরাধী ও অপরাধের পরিচয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে, কিন্তু ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে কিভাবে চিনবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে। (কারণ তাদের

চোহরো কৃষ্ণবর্ণ ও চক্কু নীলাভ হবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে **تَهُودٌ وَجَوْوَةٌ** এবং

**نَعْتَشِرُ الْمَجْرَ مِنْ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا** অতঃপর তাদের কেশপ্র ও পা ধরে টেনে নেওয়া

হবে। এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অর্থাৎ আমল অনুযায়ী কারও কেশপ্র এবং কারও পা ধরা হবে অথবা কখনও কেশপ্র এবং কখনও পা ধরা হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলতো। তারা জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (অর্থাৎ কখনও অগ্নির আঘাব এবং কখনও ফুটন্ত পানির আঘাব হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে!

অনুষ্ঠিত জাতিব্য বিষয়

**كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**

এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে অস্বীকারী হইল না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে :

**كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ**

**وَجْهٌ رَبِّكَ**

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **وَجْهٌ** বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং শব্দের **رَبِّكَ** সম্বোধন সর্বনাম দ্বারা রসুলুল্লাহ (স)-কে বোঝানো হয়েছে। এটা সাইয়্যোদুল আম্মিয়া মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স)-র একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্বলে কোথাও তাঁকে **مُجِدُّ** এবং কোথাও **رَبِّكَ** বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ একরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ একরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ **وَجْهٌ رَبِّكَ** —এর তফসীর প্রাপ্য করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট

জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী, যা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আছে। এতে शामिल আছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের সৈসব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্র জন্য করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না। —(মাযহারী, কুরতুবী, রাহজ মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় :

**مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ** —অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ-সম্পদ,

শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কল্যাণ অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের সৈসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

**ذُ وَالْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ** —অর্থাৎ সেই পালনকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং

মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষত দক্ষিণের প্রতি ক্রোধও করবেন না, বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনে। পরবর্তী আয়াতে

এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। **ذُ وَالْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ** —বাক্যটি আল্লাহ্

তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয়। তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদের রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

**الظُّوُّ بِهَا ذُ الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ** —অর্থাৎ তোমরা “ইয়া হাল জালালি ওয়াল ইকরাম” বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক)। —মাযহারী

**يَسْتَلِمُونَ مِنَ نَبِيِّ السَّمَاءِ وَأَتِ الْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** —অর্থাৎ

আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তার কাছেই প্রয়োজনাদি যাচুকা করেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিমিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জামাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও রূপার তারাও মুখাপেক্ষী। **كُلُّ يَوْمٍ**

শব্দটি **سُئِلَ** বাক্যের **طَرَفٌ**—অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে তাদের এই যাত্রা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বরূপ পেশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্ট জীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই **كُلُّ يَوْمٍ**

এর সাথে **هُرَوْنِي شَانٍ** ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বরূপ আল্লাহ্ তা‘আলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। তিনি কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাঞ্চিত করেন কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জাম্বাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সম্মত ও ক্রমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাঞ্চিত করে দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্ তা‘আলার একটি বিশেষ শান থাকে।

**ثَقْلَانٍ** শব্দটি **ثَقْلٌ** এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর

ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে **ثَقْلٌ** বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **أَنْتِ تَارِي** **فَكَيْفَ الثَّقَلَيْنِ** অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় ছেড়ে যাবি। এগুলো তোমাদের জন্য সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়াজে **كُتِبَ اللَّهُ** বলে উল্লিখিত বিষয় দুটি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, **عَثْرَتِي** বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উত্তম প্রকার সন্তান-সন্ততি বোঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কিরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর দুটি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের কর্মপদ্ধতি। যে হাদীসে ‘সুম্মত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা, এই হাদীসে **ثَقْلَيْنِ** বলে দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিক্‌ই **ثَقْلَانٍ**



বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে মত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্থ। **فِرَاعٌ** শব্দটি **فِرَاعٌ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে **فِرَاعٌ** বিপরীত শব্দ হচ্ছে **شَغْلٌ** অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা **فِرَاعٌ** শব্দ থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়—এক. পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং দুই. এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে **سِنْفَرٌ** শব্দটি ক্লাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত

রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বলা হয় : আমি এই কাজের জন্য অবসর লাভ করেছি ; অর্থাৎ এখন এ কাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় : ভার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব আল্লাহর কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে ; অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও ইনসাক সহকারে ক্ষয়সাল্লা প্রদান।—( রূহুল মা'আনী )

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنۢ مِّنۢ أَمْطَارِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ فَأَنفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ -

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে **تَمْلُون** শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে ; অর্থাৎ সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শক্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধা কারও নেই। এই আয়াতে **تَمْلُون** এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জ্ঞাতিকে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে

উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই : হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

আয়াতে যদি মৃত্যু থেকে পলায়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়াই এর দৃষ্টান্ত। এখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত সীমা ডিগিয়ে বাইরে চলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। এসব সীমা ডিঙানোর উল্লেখও মানুষের ধারণা অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুবা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ আকাশের সীমানা ডিগিয়ে বাইরে চলে গেল, তবে তাও আল্লাহর কুদরতের সীমানার বাইরে হবে না। পক্ষান্তরে যদি আয়াতে একথা বোঝানো হয়ে থাকে যে, হাশরের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি থেকে পলায়ন অসম্ভব, তবে এর কার্যত উপায় কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কিয়ামতের দিনে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সব ফেরেশতা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এসে যাবে এবং মানব ও জিনকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে নেবে। কিয়ামতের ভয়াবহ কাণ্ড দেখে মানব ও জিন বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। অতঃপর চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অবরোধ দেখে তারা স্বস্থানে ফিরে আসবে।—(রাহুল মা'আনী)

ক্বসিম উপগ্রহ ও রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য যাত্রার কোন সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে নেই : বর্তমান যুগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার এবং রকেটে চড়ে মহাশূন্যে পৌঁছার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব পরীক্ষা আকাশের সীমানার বাইরে নয়; বরং আকাশের ছাদের অনেক নীচে হচ্ছে। এর সাথে আকাশের সীমানা অতিক্রম করার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা তো আকাশের সীমানার কাছেও পৌঁছতে পারে না—বাইরে যাওয়া দূরের কথা। কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষ মহাশূন্য যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বৈধতার পক্ষে এই আয়াতকেই পেশ করতে থাকে—এটা কোরআন সম্পর্কে অভূতাব্য প্রমাণ।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاٰظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ نُهَسٌ ؕ فَلَا تَنْتَمِرَانِ  
—হযরত ইবনে

আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : ধূম্বিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شَوْاٰظٌ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্বকুণ্ডকে نُهَسٌ বলা হয়। এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্বকুণ্ড ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর আহালামে অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেওয়া হবে। কোথাও ধূম্বিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্বকুণ্ড হবে। কোন কোন

তফসীরবিদ এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তবে যেদিকেই পাল্লাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিগ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে কাসীর)

—إِنَّا نَنْتَصِرَانِ—এটা **انصار** থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে

বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য জিন ও মানবের মধ্য থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

—ذَهُوْ مَمْدٌ لَا يُسْتَدُّ مِنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ—অর্থাৎ সেদিন কোন মানব

অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ তা'আলার আদি জানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করলে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীর করেছেন। মুজাহিদ বলেন : অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না। কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ

এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী **يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ**

আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালা পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা আলামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন : এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে থাকে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

—سِيمَا—يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ ذُهُوْ حُذُوبِ لِقَاؤِ صِيٍّ وَالْاَقْدَامِ

শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ঐ চক্কু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ণ হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

সূরা আন্ন-রহমান। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কান্নাও কেশাগ্র ধরে এবং কান্নাও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝  
 ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فِيهِمَا عَيْنِينَ  
 تَجْرِيَنِ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ  
 فَاكِهَةٍ زَوْجِينَ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ مُتَّكِلِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ  
 بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَّاتٍ جُنتَيْنِ دَانٍ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبِينَ ۝ فِيهِنَّ قُصُورَاتُ الْطَّرْفِ ۖ لَمْ يَطِشْتُهُنَّ ۖ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا  
 جَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ كَانَتْهُنَّ اِلْيَاقُوتٍ وَالْمَرْجَانُ ۖ  
 فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ ۖ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۖ  
 فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۖ  
 فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ مُدْهَامَتَيْنِ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ  
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّاحَتَيْنِ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبِينَ ۖ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَرُخْلٌ وَرُفْمَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبِينَ ۖ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ  
 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْاِحْيَامِ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ  
 لَمْ يَطِشْتُهُنَّ ۖ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۖ

مُتَكِينٍ عَلَى رَأْفِ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيَّةٍ حَسَانٍ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءِ  
رَبِّكَمَا تَكْذِبِينَ ۝ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

(৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহুমান দুই প্রভবণ। (৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে জানতনয়না রুমগিগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে মাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রুমগিগণ। (৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উন্মেলিত দুই প্রভবণ। (৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, স্বর্ূ ও আনার। (৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রুমগিগণ। (৭১) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হরগণ। (৭৩) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত গুণ্যময় আগনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে وَلِمَنْ خَافَ থেকে দুটি উদ্যানের এবং وَمِنْ

وَرَوْحَمًا থেকে দুটি উদ্যানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত উদ্যানটির বিশেষ নৈকট্য-

শীলদের জন্য এবং শেষোক্ত উদ্যানটির সাধারণ মু'মিনদের জন্য। এর প্রমাণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু তফসীর লেখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এখান থেকে সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে। জালা-তীপগ দুই ভাগে বিভক্ত-বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অতএব যে, ব্যক্তি (বিশেষ শ্রেণীর এবং) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার (সর্বদা) ভয় রাখে। (এবং ভয় রেখে কুপ্রবৃত্তি ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, এটা বিশেষ শ্রেণীরই অবস্থা। কারণ সাধারণ শ্রেণী মাঝে মাঝে ভয় রাখে এবং মাঝে মাঝে পাপকর্মও করে ফেলে, যদিও তওবা করে নেয়। মোটকথা যে ব্যক্তি এরূপ আল্লাহ্‌ভীরু) তার জন্য (আল্লাহে) দুটি উদ্যান রয়েছে। (অর্থাৎ প্রতিজনের জন্য দুটি উদ্যান। এই একাধিক উদ্যান থাকার রহস্য সত্ত্বেও তাদের সম্মান ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করা, যেমন দুনিয়াতে ধনীদের কাছে অধিকাংশ স্বাবর-অস্বাবর সম্পদ একাধিক হয়ে থাকে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট হবে। (এতে ছান্নার ঘনত্ব ও ফল-ফুলের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে প্রবহমান দুই প্রস্তরবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফলের দুই প্রকার হবে। (এতে অধিক স্বাদ গ্রহণের সুযোগ আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তারা তথায় রেশমের আন্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (নিয়ম এই যে, উপরের কাপড় আন্তরের তুলনায় উৎকৃষ্ট হয়। আন্তরই যখন রেশমের, তখন উপরের কাপড় কেমন হবে অনুমান করা যায়)। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (ফলে দণ্ডায়মান, উপবিশিষ্ট, শাস্তিত সর্বাধিক অনায়াজে ফল হাতে আসবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তথায় (অর্থাৎ উদ্যানের প্রাসাদসমূহে) আনতনয়না রহলিগণ (অর্থাৎ হরুগণ) থাকবে, যাদেরকে তাদের (অর্থাৎ এই জালাতীদের) পূর্বে কোন জিন ও মানব ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অব্যবহৃত হাবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (তাদের রূপলাবন্য এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে) যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য বলা হচ্ছেঃ) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (তারা চূড়ান্ত আনুগত্য করেছে, তাই পুরস্কারও চূড়ান্ত পেয়েছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (এ হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জাম্বাভীদের উদ্যানের অবস্থা। এখন সাধারণ মু'মিনদের উদ্যান বর্ণিত হচ্ছেঃ) এই দুটি উদ্যান ছাড়া নিশ্ন-স্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (প্রত্যেক সাধারণ মু'মিন দু দুটি করে পাবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উত্তম উদ্যান ঘন সবুজ হবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উত্তম উদ্যানে থাকবে উত্তাল দুই প্রস্তবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উত্তাল হওয়া প্রস্তবণের স্বভাব। উপরের প্রস্তবণেরও একই অবস্থা। সেখানে অতিরিক্ত **تجریان** বহমানও বলা হয়েছে। সুতরাং এটা ইঙ্গিত যে, এই প্রস্তবণ বহমান হওয়ার ব্যাপারে প্রথমোক্ত প্রস্তবণ-ঘরের চাইতে কম এবং এই উদ্যানঘর সেই উদ্যানঘরের চাইতে নিশ্নস্তরের)। উত্তম উদ্যানে আছে ফল-মূল খজুর ও আনার। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? সেখানে (অর্থাৎ সেখানকার প্রাসাদসমূহে) থাকবে সূশীলা, সুন্দরী রুমগিগণ। (অর্থাৎ হরগণ) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে সংরক্ষিতা লাবণ্যময়ী রুমগিগণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এই জাম্বাভীদের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহৃত হাবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (এই জাম্বাভীদের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহৃত হাবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (সেখানে রুমগিগণকে প্রবাল ও পদ্মরাগের সাথে তুলনা করা এবং এখানে শুধু **حسان** সুন্দরী বলা এ থেকেও বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত উদ্যানঘর শেষোক্ত উদ্যানঘরের চাইতে শ্রেষ্ঠ) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (ক্ষিত্য করলে বোঝা যায় যে, এই উদ্যানঘরের বিছানা প্রথমোক্ত উদ্যানঘরের তুলনায় নিশ্নস্তরের হবে। কেননা, সেখানে রেশমের ও আস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কথা আছে, এখানে নেই। অতঃপর পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণিত হয়েছে। এতে সূরা

আন্ন-রহমানে ঋশদভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহের সমর্থন ও তাব্বীদ আছে)। কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব। (নাম বলে শুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা সত্তা থেকে ভিন্ন নয়। কাজেই এই বাক্যের সারমর্ম হচ্ছে সত্তা ও শুণাবলী যারাই প্রশংসা)।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আন্নাতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আন্নাতসমূহে সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে আন্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্য, একথা **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ** আন্নাত

নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ঋশ্মামতের দিন আন্নাত তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আন্নাতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিশ্চিন্তদের হবে। **وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ** অর্থাৎ

পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিশ্চিন্তদের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মু'মিনগণ, যারা মর্খাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা দু'রুরে মনসুরের বরাতে দিল্লি বয়ানুল কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (স।)

**وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ** এবং **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ** আন্নাতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন :

**جَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ لِمَقْتَرِبِينَ وَجَنَّاتٍ مِنْ وُرُقٍ لَا يَمُوتُ فِيهَا شَيْءٌ**

অর্থাৎ স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের জন্য। এছাড়া 'দু'রুরে মনসুরে' হযরত বারী ইবনে আযেব থেকে



ক্বলিত আছে : **العيقان التي تجريان** অর্থাৎ প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে **تجريان** তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে **نفاختان** তথা উতাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্রবণ মাত্রই উতাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উতাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জামাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন :

**وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ** — অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **مَقَامَ رَبِّ** বলে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকবে যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়াকর্মের হিসাব দিতে হবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপকর্মের কাছ থেকে বাঁচবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ **مَقَامَ رَبِّ** এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ তা'আলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

**زَوَّجْنَا** — এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ উদ্যান-

দ্বয় ঘন শাখাপল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যস্বাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

**مِنْ كُلِّ ذِكَاةٍ** — প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে **مِنْ كُلِّ ذِكَاةٍ**

বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু **ذِكَاةٍ** বলা হয়েছে। **زَوَّجْنَا** — এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে—শুক ও আঁশ। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত।—(মায়হারী)

**لَمْ يَطْمِئِنُّ** শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত

হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে **طامث** বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও **طامث** বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। দুই. দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জাম্মাতে এরূপ কোন আশংকা নেই।

هل جزاء الاحسن الا الاحسان — নৈকট্যশীলদের উদ্যানখনের কিছু বিবরণ

পেশ করার পর ইরশাদ হয়েছে যে, সৎ কর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎ কর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল, যা দেওয়া হয়েছে।

مدها متان — ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে

**مدها** বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানখনের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানখনের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু **زوا تاذنان** — বিশেষণে এই বিশেষণও शामिल আছে।

خهرات — এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং

**خهرات حسن** — এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণিগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে।

منكهن على زفر خضرو عبقرى حسن — এর অর্থ সবুজ রঙের

রেশমী বস্ত্র। — (কামুস) এর দ্বারা বিছানা, বাগিশ ও অন্যান্য বিভ্রাসসামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ গ্রন্থে আছে, এর উপর রক্ত ও ফুলের কলরুকার্য করা হয়। **عبقرى** এর অর্থ সুন্দরী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تهار رب اسم ربك ذى الجلال والاکرام — সূরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ

আল্লাহ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসাবে বলা হয়েছে : আল্লাহর পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পূণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কাম্মে ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِقَوْمِهَا كَذِبَةٌ ۝ كَخَافِضَةٍ رَافِعَةٍ ۝  
 إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً  
 مُتَّبَعًا ۝ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ مَا  
 أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَأَصْحَبُ الشِّمَّةِ ۝ وَمَا أَصْحَبُ الشِّمَّةِ ۝  
 وَالسِّقُونَ الشِّقُونَ ۝ وَاللَّيْلُ الْقَدِرُونَ ۝ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝  
 ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝ عَلَى سُرٍّ مَوْضُوعَةٍ ۝  
 مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۝ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۝  
 بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ ۝ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا  
 وَلَا يُنزِفُونَ ۝ وَقَالِهَةٌ ۝ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا  
 يَشْتَهُونَ ۝ وَحُورٌ عِينٌ ۝ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءً  
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝ إِلَّا  
 قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ فِي  
 سِدْرٍ مَخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۝ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ۝ وَمَاءٍ  
 مَسْكُوبٍ ۝ وَ- قَالِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۝ لَا تَقْطَعُ وَلَا مَنُوعَةٌ ۝

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ۝ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝  
 عَرَبًا ثَرَابًا ۝ لَا صَعْبَ الِیْمِیْنِ ۝ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ ۝ وَثَلَاثَةٌ  
 مِّنَ الْآخِرِیْنَ ۝ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ مَا أَصْعَبُ الشِّمَالِ ۝  
 فِي سَوْمٍ وَحَمِیْمٍ ۝ وَظِلٌّ مِّنْ یَّحْمُومٍ ۝ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِیْمٌ ۝  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِیْنَ ۝ وَكَانُوا یُصِرُّونَ عَلَى  
 الْحِنْتِ الْعَظِیْمِ ۝ وَكَانُوا یَقُولُونَ ۝ آئِدًا مِّثْنَا وَكُنَّا ثَرَابًا  
 وَعِظَامًا ۝ إِنَّا كَتَبْنَاهُمْ ۝ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ إِن  
 الْأَوَّلِیْنَ وَالْآخِرِیْنَ ۝ كَتَبْنَاهُمْ ۝ إِلَىٰ مِیْقَاتِ یَوْمٍ  
 مَّعْلُومٍ ۝ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا إِلَیْهَا الضَّالِّیْنَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَا یَكْفُرُونَ  
 شَجِرَةً مِّنْ زُقُومٍ ۝ فَمَا لَتَوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ فَشَرِبُونَ  
 عَلَیْهِ مِنَ الْعَمِیْمِ ۝ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الِهْمِیْمِ ۝ هَذَا  
 نَزَّلْنَاهُمْ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে শুরু

- (১) যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতার কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচ করে দেবে, সমুদ্রত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকল্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎ-ক্রান্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগাবান তারা (৯) এবং যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা। (১০) অগ্রবর্তী-গণ তো অগ্রবর্তীই (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, (১৫) স্বর্কচিত সিংহাসনে (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (১৭) তাদের কাছে ঘোরাকোরা করবে চিরকিশোরেরা (১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়লা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২) তখন থাকবে আনন্দনয়না হরণ (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির নায় (২৪) তারা যা

কিন্তু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথ্যের জবাবের ও কোন খারাপ কথা শুনেবে না (২৬) কিন্তু শুনেবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা জান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাঁদি কাঁদি কানায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুদ্রত শস্যায়। (৩৫) আমি আয়াতী রমণিপন্থকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি তিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমুদ্ররক্ত (৩৮) ডান দিকের লোকদের জম্বা। (৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বাম পাশ'স্থ লোক, কত না হতভাগা তারা! (৪২) তারা থাকবে প্রখর বালেপ এবং উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) এবং ধূস্রকৃষ্ণের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আনামদায়কও নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা মোরতার পাগ-করম ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত : আমরা যখন মরে অছি ও সৃষ্টিকার পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুৎপাদিত হব? (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষস্বর্গও? (৪৯) বলুন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীস্বর্গ, (৫০) -সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথহ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারিগণ! (৫২) তোমরা অবশ্যই ভয়পন করবে স্বাক্ষম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। (৫৫) পান করবে সিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আগ্যায়ন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন কিয়ামত ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই; (বরং তা ঘটা সম্পূর্ণ সত্য)। এটা (কতককে) নীচ করে দেবে এবং (কতককে) সমুদ্রত করে দেবে। (অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের লাঞ্ছনা এবং মু'মিনদের ইজ্জত প্রকাশ পাবে)। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা। তোমরা সবাই (যারা তখন বিদ্যমান থাকবে অথবা পূর্বে মারা গেছে, অথবা ভবিষ্যতে জন্মলাভ করবে) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে [নৈকট্যশীল মু'মিন, সাধারণ মু'মিন ও কাফির। সূরা আর-রহমানেও এই তিন শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী আয়াত-সমূহে নৈকট্যশীলদেরকে **سَابِقِينَ** ও **مَقْرَبِينَ** এবং সাধারণ মু'মিনকে **أُمَّةَابِ الشَّمَالِ** (বাম পাশ'স্থ লোক) ও কাফিরদেরকে **أُمَّةَابِ الِشَّمَالِ** (বাম পাশ'স্থ লোক) বলা হয়েছে। আরও **أَزَارِ تَعْت** থেকে পর্বত কোন কোন

ঘটনা প্রথম পিতা ফু'কর সময়কার, যেমন **بَسْت** ও **وَجْت** এবং কোন কোন ঘটনা

দ্বিতীয় শিলা ক্বকার সময়কাল, যেমন **كَانَتْكُمْ أَرْوَاجًا** এবং **خَائِضَةً رَأْفَةً** অতঃপর

প্রকারভেদের বিধান আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে। উল্লেখ্য এক প্রকার এই যে ] যারা ডানপাশের লোক, তারা কত ভাগ্যবান। (যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'ডান পাশের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই গুণটি নৈকট্যশীলদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এখানে কেবল এই গুণটি উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ নৈকট্যের গুণ পাওয়া যায় না। ফলে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ে গেছে সাধারণ মু'মিনগণ। এতে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা ভাগ্য-

বান। অতঃপর **فِي سِدْرٍ مَّتَّضُونَ** আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়

প্রকার এই যে ) যারা বাম পাশের লোক, কত হতভাগা তারা। (যাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'বাম পাশের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ

সম্প্রদায়। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তারা হতভাগা। অতঃপর

**فِي سُبُوحٍ**

আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার এই যে ) যারা সর্বোচ্চ স্তরের, তারা তো সর্বোচ্চ স্তরেরই। তারাই (আজ্জাহর) নৈকট্যশীল। (এতে সব সর্বোচ্চ স্তরের স্বাম্বা দাখিল আছেন—নবী, ওলী, সিদ্দীক ও কামিল মু'মিন। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উচ্চ

মর্যাদাসম্পন্ন। অতঃপর **فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ** আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ তারা) আরামের উদ্যানে থাকবে। **وَأَعْلَىٰ سُرُرٍ** আয়াতে এর আরও বিবরণ

আসবে। মাঝখানে নৈকট্যশীলদের মধ্যে যে অনেক দল রয়েছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের (নৈকট্যশীলদের) একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। [পূর্ববর্তী বলে আদম (আ) থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত এবং পরবর্তী বলে রসূলুল্লাহ (সা)-র সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশী সংখ্যক এবং পরবর্তীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হওয়ার কারণ এই যে, বিশেষ লোকদের সংখ্যা প্রতি যুগেই কম থাকে। হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সময় সুদীর্ঘ। উম্মতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। কাজেই এ সময় কম। এমতাবস্থায় সুদীর্ঘ সময়ের বিশেষ লোকগণের তুলনায় কম সময়ের বিশেষ লোকগণের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম হবে। কেননা, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে লাখ, দু'লাখ তো পরগণারই ছিলেন। শেষ নবীর সময়ে বা তার পরে অন্য কোন নবী নেই। তাই নৈকট্যশীলদের বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে হবে কম সংখ্যক। অতঃপর নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহের বিধান-বিবরণ দেওয়া হচ্ছে : ) তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে যেমন দিলে কসবে পরস্পর সুখোমুখি হয়ে এবং

তাদের কাছে ঘোরাকিরা করবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালার  
নিয়ে। এটা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর  
তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তাদের জন্য থাকবে  
আনতনয়না হরগণ। (তাদের গায়ের রঙ হবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) আবরণে রক্ষিত মোতির  
মত। তারা যা কিছু করত, এটা তার পুরস্কারস্বরূপ। তারা তথায় কোন অর্থহীন বাজে  
কথা শুনবে না (অর্থাৎ সুরা পান করার কারণে অথবা এমনিতেও আনন্দ বিহীনকারী  
কোন কিছু থাকবে না)। শুধুমাত্র (চতুর্দিক থেকে) সালাম আর সালামের আওয়াজ আসবে।

وَأَمَّا كَلِمَاتُ الَّذِينَ يُبَدَّلُونَ لَهُمْ أَلْسِنَتَهُمُ الْغَيِّبَاتِ يُذَكَّرُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ  
(অন্য আয়াতে আছে :

এবং **تَحِيَّتُهُمْ مِنْهَا سَلَامٌ** এটা সম্মান ও সম্ভ্রমের দলীল! মোটকথা, আখিরিক ও দৈহিক  
সর্বস্বকার আনন্দ ও বিলাসিতা থাকবে। এ পর্যন্ত নৈকট্যশীলদের পুরস্কার বণিত হল।  
অতঃপর ডান পাশ্চ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে : ) যারা ডানদিকে থাকবে,  
তারা কত ভাগ্যবান! (মাঝখানে নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহ বণিত হওয়ার কারণে  
এ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি উল্লেখ করতে হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনদের প্রতিদানসমূহের  
বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে : ) তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে থাকবে কাঁটাবিহীন  
ঝড়ঝিকা রুক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, দীর্ঘ ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং প্রচুর ফলমূল, যা শেষ  
হবার নয় (যেমন দুনিয়াতে মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়)। এবং নিষিদ্ধও  
নয় (যেমন দুনিয়াতে বাগানের মালিকরা নিষেধাজ্ঞা জারি করে)। আর থাকবে সমুদ্রত  
শয্যা। (কেননা, এগুলো সমুদ্রত শুধু বিছানো থাকবে। এটা হবে বিলাস-ব্যসনের  
জায়গা। নারীর সঙ্গসুখ ব্যতীত বিলাস-ব্যসন পূর্ণ হয় না। এভাবে উপরোক্ত বিলাস-  
সামগ্রীর উল্লেখ দ্বারা নারীর উপস্থিতিও জানা গেল। কাজেই অতঃপর **أَنْشَأْنَا هُنَّ**

এর স্ত্রী-বাচক সর্বনাম দ্বারা জালাতী নারীদের আলোচনা করা হচ্ছে : ) আমি জালাতী  
রমণীগণকে (এতে জালাতের হর এবং দুনিয়ার স্ত্রীগণ সবই शामिल রয়েছে; যেমন  
তিরমিযীতে বণিত আছে যে, এই আয়াতে যেসব রমণীকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার কথা  
বলা হয়েছে, তারা সেসব রমণী, যারা দুনিয়াতে রুক্ষা অথবা কুৎসিত ছিল। তাদের  
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি; অর্থাৎ তাদেরকে  
করেছি চিরকুমারী, [ অর্থাৎ সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 'দুররে-  
মনসুরে' আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত আছে ] কামিনী, ( অর্থাৎ  
তাদের উঠাবসা, চলার ধরন এবং রূপ-লাবণ্য সবকিছুই কামোদ্দীপক এবং তারা জালাতী-  
দের) সমবয়স্কা। এগুলো ডান দিকের লোকদের জন্য। (অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ডান দিকের  
লোকও বিভিন্ন প্রকার হবে; অর্থাৎ) তাদের এক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে  
এবং এক দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে; (বরং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে।  
হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টি পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মু'মিনদের  
সমষ্টির চাইতে বেশী হবে। ডান দিকের লোকদের মর্যাদা যখন নৈকট্যশীলদের চাইতে

কম, তখন তাদের পুরস্কারও কম হবে। মৈকট্যশীলদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো শহরবাসীরা পছন্দ করে এবং ডান দিকের লোকদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো গ্রামবাসীরা পছন্দ করে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, উত্তর দলের মধ্যকার পার্থক্য শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ। অতঃপর কাফির সম্প্রদায় ও তাদের শাস্তি বর্ণনা করা হচ্ছে : ) যারা বাম দিকের লোক, কত না হতভাগা তারা! (এর বিবরণ এই যে) তারা থাকবে আওনে, উত্তমত পানিতে, ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (অর্থাৎ এই ছায়ায় কোন দৈহিক ও আত্মিক উপকার থাকবে না। সূরা আর-রহমানে **نحاس** বলে এই ধূম্রকুঞ্জই বোঝানো হয়েছিল। অতঃপর শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে : ) তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল, (এর ফলে) তারা ঘোরতর পাপ কর্মে (অর্থাৎ কুফর ও শিরকে) ডুবে থাকত (অর্থাৎ ঈমান আনত না। অতঃপর তাদের কুফর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তাদের সত্যত্বের স্বর্ণের পথে বড় বাধা ছিল)। তারা বলত : আমরা যখন মরে অছি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও ? [রসূলুল্লাহ (সা)-র আমলেও কতক কাফির কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে : ] আপনি বলে দিন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর (অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর) হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারগণ! তোমরা অবশ্যই উচ্চারণ করবে যাকুম বুকু থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। এর উপর পান করবে ফুটন্ত পানি। তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। (মোটকথা) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ওয়াহিকিয়ার বিশেষ প্রেত্ভ : অস্তিম রোগশয্যার আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন : ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ যখন অস্তিম রোগশয্যায় শাম্মিত ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

ওসমান গনী— **ما تشتهي** আপনার অসুখটা কি ?

ইবনে মসউদ— **ز نوبى** আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গনী— **ما تشتهي** আপনার বাসনা কি ?

ইবনে মসউদ— **رحمة ربي** আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গনী— **ألم** আপনার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকিব কি ?

ইবনে মসউদ— **أطبیب أ مرثنى** চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।



ওসমান গনী—আমি আপনার জন্য সরকারী বঙ্গতুলমাল থেকে কেমন উপচৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

ইবনে মসউদ—**لَا حَاجَةَ لِي فَهِيَ** এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গনী—উপচৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মসউদ—আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিফা পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

**مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاكِّفَةِ لَمْ تَصِبْهُ ذَا ذَةَ أَبَدٍ**

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিফা পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস করবে না।

ইবনে কাসীর এই রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

**إِذَا وَتَعْتِ الْوَاكِّفَةُ**—ইবনে কাসীর বলেন : ওয়াক্বিফা কিয়ামতের অন্যতম

নাম। কেননা, এর বাস্তবতা কখনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

**لَوْسَ لَوْ ذَعَمَهَا كَانَتْ بَةً**—এর ন্যায় একটি খাত। অর্থ

এই যে, কিয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

**خِائِفَةٌ وَرَأْفَةٌ**—হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই ব্যাক্যের তফসীর এই

যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত উন্নত হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।—(রূহুল মা'আনী)

হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে : **وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً**

ইবনে কাসীর বলেন : কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এ-দল আরশের ডান পাশে থাকবে। তারা আদম (আ)-এর ডান পাশ থেকে পয়সা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জামাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আ)-এর বাম পাশ

থেকে পরলোক হয়েছিল এবং তাদের আমরনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অপ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাখিপত্তির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসিমে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, নবীদ ও ওলীমগ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ—ইমাম আহমদ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)

থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রর করলেন : তোমরা জানকি, কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে কারা অপ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কিরাম আরব করলেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : তারাই অপ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাণ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাঁই ক্ষমসাজা করে। স্বা নিজেদের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন : **سَابِقُونَ** তথা অপ্রবর্তিগণ বলে পরগণরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে সিরীন (রা)-এর মতে যারা বাস্তুতুল মুকাদ্দাস ও বাস্তুতুল্লাহ—উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অপ্রবর্তিগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ (রা) বলেন : প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অপ্রবর্তী দল হবে। কারও কারও মতে যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অপ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর বলেন : এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশ্বক। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অগ্র, পরকালেও তারা অপ্রবর্তীরাপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ দল। যামাখশারীর

মতে বড় দল।—(রহুল মা'আনী)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা : আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জামগায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরা বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে—নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অপ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জামগায় **ثَلَاثَةٌ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মু'মিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ প্রশ্নে তফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। এক. হযরত আদম (আ)

থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (র) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ও তাই নেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সম্ভ্য দেয়।

হাদীসে বলা হয়েছে : যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত **ثَلَاثَةٌ مِّنَ**

**الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ** নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রা) বিস্ময়

সহকারে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা) ! পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্য-শীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়নি। এক বছর পরে ইখন **ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ**

**ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ** নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اسمع يا عمر ما قد انزل الله ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخريين  
الأوان من آدم إلى ثلثة وأمتي ثلثة -

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন—পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্যে থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আ) থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন

পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : **ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ**

**ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ** আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিয়াম বাখিত হন

যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কম সংখ্যক হব। তখন **ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ**

**وَالْآخِرِينَ** আয়াতখানি নাযিল হয়। তখন রসূলে করীম (সা) বললেন :

আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী) জানাতে সমগ্র উম্মতের

মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে—(ইবনে কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জামাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসসম্মত

প্রমাণ হিসাবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত **قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ**

অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত **ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ** তাদের বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে 'রাহুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে : প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত-ওমর (রা) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার, সাধারণ মু'মিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জামাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনা যখন **ثُلَّةٌ** ( বড় দল ) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জামাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই তাঁদের মুকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

দুই. তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মত-তেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুনে-উলা' তথা সাহাবী, তাবেরী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত জাগমনকারী মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রাহুল মা'আনী, মায়হারী ইত্যাদি তফসীর গ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অপ্রাথমিকের জ্ঞেওনা হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী প্রেষ্ঠতম উম্মত,

যেমন **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্য-

শীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই প্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে—এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের স্নানিষিগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্য-শীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে কাসীর হাসান বসরী (র)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন :

পূর্ববর্তিগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আলাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মু'মিন তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়াজেও অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তিগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন :

অর্থাৎ পূর্ববর্তিগণ হচ্ছে এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ। **من مفي من هذه الامم**

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন : আলিমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ হোক।—(ইবনে কাসীর)

রাহল মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবু বকর (রা) এর রেওয়াজে-ক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে :

**عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه  
ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخرين قال هم جميعا من هذه الأمة -**

একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে—আলাহ্ তা'আলার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন : তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে **وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً** এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারক্রমে উম্মতে মুহাম্মদী হবে।—(রাহল-মা'আনী)

তফসীরে মায়হারীতে খুজি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট-রূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে প্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোন উম্মতের প্রেষ্ঠ তার ভিতরকার উচ্চতরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই প্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে—এটা সন্দেহপরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই :

**لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** এবং **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ**  
**وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**

এক হাদীসে বলা হয়েছে :

**انتم تتمون سبعون أمة انتم ا خيرها و اكرمها على الله تعالى**  
—তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আলাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমরা

জালাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে—এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম: নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসুলুল্লাহ (স) বললেন: **والذی نفسی بیده ائنی** - যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জালাতের অর্ধেক হবে।—(বুখারী, মায়হারী)

**اهل الجنة مائة وعشرون صفا ثمانون منها من هذه الامم  
واربعون من سائر الامم -**

জালাতীগণ মোট একশ' বিংশ কাতারে থাকবে। তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়াজেতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জালাতীদের পরিমাণ কোথাও এক-চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়াজেতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রসুলুল্লাহ (স)-র অনুমান মাত্র। অনুমান-কিছির সময়ে বিভিন্ন-রূপ হয়েছে থাকে।

**على سرور موصوذة**—ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাজেম, বায়হাকী প্রমুখ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, **موصوذة**-এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

**ولدان متخذون**—অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের

মাঝে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। ছন্দদের ন্যায় এই কিশোরগণও জালাতেই পরদা হবে এবং তারা জালাতীদের খিদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জালাতীর কাছে হাজারো খাদিম থাকবে।—(মায়হারী)

**كوب الكواب**—শব্দটি **كوب** এর বহুবচন।

অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। **ابريق** শব্দটি **ابريق** এর বহুবচন।

এর অর্থ কুয়া। **كأس** এর অর্থ সুরা পানের পিত্তালা। **معهن** এর উদ্দেশ্য এই যে, এই একটি বয়সী থেকে আনা হবে।

**لا يمدحون**—এটা **مدح** থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা

অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথারোরা দেখা দেয়। জালাতের সুরা এই সুরার উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

**لا يفرنون**—এর আসল অর্থ কৃপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে

অর্থ ভানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ—অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখীর গোস্বত। হাদীসে আছে,

জাম্বাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর গোস্বত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।—(মাযহারী)

وَأَصْحَابُ الْاَلْوَانِ—মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই

প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডান পার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে—কেউ তো নিছক আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আয্যাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আয্যাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আয্যাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র।—(মাযহারী)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ—জাম্বাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অধিতীয় ও কল্পনাতীত।

তদ্ব্যতীত স্ক্রয়আন পাক মানুষের সোধগম্য ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্ত বিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তদ্ব্যতীত কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। سِدْر—এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مَخْضُودٍ এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জাম্বাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না, বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। طَلْحِ এর অর্থ কলা ظَل ممدود এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে—অন্য আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। ماء مسكوب—এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

فَاكُهَةٌ كَثِيرَةٌ—প্রচুর ফল, অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও

অনেক হবে। لَامَعَاتٍ وَّلَمْ يَكُن لَّهُنَّ آسَانُ—দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা

এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জাম্বাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে—কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জাম্বাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

فَرَاشٍ—ফরাশ শব্দটি فرأش এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ।

উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জাম্বাতের শয্যা সমুদ্রত হবে। দ্বিতীয়ত এই বিছানা

মাটিতে নয়, পালকের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিহানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিহানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিহানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে **الولد للفراش**—পরবর্তী আয়াতসমূহে জামাতী নারীদের আলোচনাও এয়েই ইঙ্গিত—(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী **مرفوعة** এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্প্রসৃত।

**هِنَّ** সর্বনাম দ্বারা **أَنْشَاءً** শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। **نَا أَنْشَاءً ذَا هُنَّ أَنْشَاءً**

জামাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বেক্ত আয়াতে **فراش**—এর অর্থ জামাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিহানা ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। জামাতের অর্থ এই যে, আমি জামাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জামাতী হরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জামাতেই প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জামাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কুফাসী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জামাতে তাদেরকে সুশ্রী-যুবতী ও লাভণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত রেওয়াজেতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, স্ত্রুত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : একদিন রসূলুল্লাহ (সা) গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরহ করলাম : সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) রসূলুল্লাহ বসলেন : **لا تدخل الجنة عجوز**—অর্থাৎ জামাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোনকোন রেওয়াজেতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ (সা) তাকে সাম্বন্ধনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জামাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না, বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।—(মাযহারী)

**أَبْكَارًا**—এটা **بكر**—এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিক্য। উদ্দেশ্য এই যে,

জামাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

**عَرَبًا**—এটা **عروبة**—এর বহুবচন। অর্থ স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা

নারী।

**أَثْرَابًا**—এটা **ثوب**—এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জামাতে পুরুষ ও নারী



সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেরিশ বছর হবে।—(মায়হারী)

ثَلَاثَةٌ—ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ এবং

أَخْرَجَ—এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি **أَوَّلِينَ** তথা পূর্ববর্তীগণ বলে হয়রত আদম (আ) থেকে রসূলুলাহ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং **آخِرِينَ** তথা পরবর্তি-গণ বলে রসূলুলাহ (সা) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মু'মিন-মুত্তাকিগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে, অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া **ثَلَاثَةٌ** শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তীগণ এই উম্মতের মধ্য থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না; যদিও শেষ যুগে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলী তো এই উম্মতের গুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোন যুগ 'আসহাবুল-ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়রত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রসূলুলাহ (সা) বলেন : আমার উম্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়ম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারও বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ

تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ

وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ۝ عَلَيَّ أَنْ تَبْدِيلَ أَمْثَالِكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝

لَوْ شَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاةً مَا فَطَرْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ﴿٦٠﴾  
 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦١﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٢﴾ ءَأَنْتُمْ  
 أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٣﴾ لَوْ شَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جُجَابًا  
 فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٤﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٦٥﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ  
 شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٦٦﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَاءً  
 لِلْمُقَوِّينَ ﴿٦٧﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٨﴾

(৫৭) আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্ষপাত সম্পর্কে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের যুত্বকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পন্নিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হলে যাবে তোমরা বিস্ময়বিষ্ট। (৬৬) বলবে : আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম ; (৬৭) বরং আমরা হাতসর্ব্বস্থ হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর রুক্ন সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই রুক্নকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুভাসীদের জন্য সামগ্রী। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার) সৃষ্টি করেছি (যা তোমরাও স্বীকার কর)। অতঃপর তোমরা (তওহীদকে ও কিয়ামতকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর না কেন? (অতঃপর সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে উপদেশ দান করা হচ্ছে : ) তোমরা যে (নারীদের গর্ভাশয়ে) বীর্ষপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (বলা-বাহলা, আমিই সৃষ্টি করি)। আমি তোমাদের যুত্বকাল (নির্দিষ্ট) কাল নির্ধারিত করেছি।

(উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে বিশেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আমারই কাজ। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের বর্তমান আকার-আকৃতি বাকী রাখাও আমারই কাজ এবং) আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দিই, যা তোমরা জান না। (উদাহরণত জন্তু জানোয়ারের আকৃতি দান করি, যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। অতঃপর এর দলীল বলা হচ্ছে : ) তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হলেছ (যে, তা আমারই কাজ)। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (অনুধাবন করে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তওহীদ স্বীকার কর এবং কিস্বামতে পুনরুজ্জীবনকে মেনে নাও)। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? (অর্থাৎ মাটিতে বীজ বপন করার মধ্যে তো তোমাদের কিছু হাত আছে, কিন্তু বীজকে অংকুরিত করা কার কাজ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করা যেমন আমার কাজ, তেমনি ফসল দ্বারা উপকার লাভ করাও আমার কুদরতের উপর নির্ভরশীল)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে (উৎপাদিত ফসলকে) খড়কুটা করে দিতে পারি (অর্থাৎ দানা মোটেই হবে না, গাছ শুকিয়ে খড়কুটা হয়ে যাবে)। অতঃপর তোমরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করবে যে, (এবার তো) আমরা ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা সম্পূর্ণ হাতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ সমগ্র সম্পদই গেল। অতঃপর আরও হ'শিয়ার করা হচ্ছে : তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? (এরপর এই পানিকে পানোপযোগী করা আমার অপর নিয়ামত)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন? (তওহীদ বিশ্বাস ও কুফর বর্জনই বড় কৃতজ্ঞতা। অতঃপর আরও হ'শিয়ার করা হচ্ছে : ) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তার রুদ্ধকে (যা থেকে অগ্নি নির্গত হয় এমনভাবে যেসব উপায়ে অগ্নি সৃষ্টি হয় সেসব উপায়কে) তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? আমি তাকে (জাহান্নামের অগ্নির অথবা আমার কুদরতের) স্মরণিকা এবং মুসাফিরদের জন্য সামগ্রী করেছি। (স্মরণিকা একটি পারলৌকিক উপকার এবং অগ্নি দ্বারা রন্ধন করা একটি জাগতিক উপকার। 'মুসাফিরের জন্য' বলার কারণ এই যে, সফরে অগ্নি দুর্লভ হওয়ার কারণে একটি দরকারী সামগ্রী হয়ে থাকে) অতএব (যার এমন শক্তি) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

### জানুহনিক ভাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথদ্রষ্ট মানুষকে হ'শিয়ার করা হচ্ছে, যারা মুহুত কিস্বামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিষয়চর্চায় যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে,

এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরাটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াডালালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে খোদ মানব সৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অভুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত

একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর

স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানব সৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর মৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতই নিবন্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন

করা হয়েছে : **أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ**

—অর্থাৎ হে মানব! একটু ভেবে দেখ, সম্ভান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তোমায়, তুমি এক ফোঁটা বীর্ষ বিশেষ স্থানে পৌছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্ষের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত-মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদে জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাশ্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন কখন, আত্মাদান ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোন বস্তু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বুঝে না যে, কোন প্রল্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সজ্জা আপন-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই প্রল্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ জগৎ ছেলে

না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ভাশয় ও জ্রণের উপরস্থ ঝিল্লি—এই তিন অক্ষকার প্রকোচে এমন সুন্দর-সুপ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি **تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ** (সুন্দরতম প্রপ্তা

আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার।

**مَا نَكُنْ بِمُسْبِرِينَ** এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে

না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, **أَنْ نُبَدِّلَ أُمَّتَكُمْ** অর্থাৎ

তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি **وَنُنَشِّئُكُمْ فِي**

**مَا لَا تَعْلَمُونَ** —এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পারি অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারি, যেমন বিগত উষ্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

**أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ**—খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব

সৃষ্টির গুড় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে : তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের

করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাছ, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হিফায়তে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রব্র দেখা দেয় যে, মগের মগ মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী রূক্ষকে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিশ্বর আল্লাহ তা'আলার অত্যশ্চর্য কান্নিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বাণা করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রয়োড়র উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে :

قَوَاهُ شَكْرًا مَّقْوِينَ - نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَنَاءً لِّلْمَقْوِينَ

এবং قَوَاهُ শব্দটিকে শাক্বা থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قَوَى শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়্যাতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমায়ই শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ - এর অবশ্যজ্ঞাবী ও সৃষ্টিভিত্তিক পরিপতি এই যে,

মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালন-কর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

فَلَا تُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ۗ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۙ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۗ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۙ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

الطَّهَرُونَ ۗ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۗ أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ

أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۗ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ شُكْرًا بُونَ ۗ فَلَوْلَا

إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۗ وَأَنْتُمْ حِينِيْدٌ تَنْظُرُونَ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۗ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرِ مَدِينِينَ ۗ

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝  
 قَرُوءٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ  
 الْيَمِينِ ۝ فَسَلِّمْ لَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ  
 الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ۝ فَأَنْزِلْ مِنْ حَيْمِهِمْ ۝ وَتَصْلِيَةٌ  
 جَعِيمٍ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُو حَقٌّ لِيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

(৭৫) অতএব আমি তারকারাজির অভ্যাসের কসম খাছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা কসম — যদি তোমরা জানতে, (৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিক্র-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের তুমিকার পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কঠামত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আশ্বাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম নিষিক এবং নিয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে: তোমার জন্য ডান পার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পঞ্চদশটি শিখ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আগ্যায়ন হবে উত্তম পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিষ্কিন্ত হবে জন্মিতে। (৯৫) এটা ধুব সত্য। (৯৬) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

### তফসীরের আর-সংক্ষেপ

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে; কিন্তু তোমরা কোরআন জান না। অতএব) আমি তারকারাজির অভ্যাসের শপথ করছি। তোমরা যদি চিন্তা কর, তবে এটা এক মহা শপথ। (এ বিষয়ে শপথ করছি যে) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা এক সংরক্ষিত কিতাবে (অর্থাৎ 'লওহে-মাহফুয' পূর্ব থেকে) আছে। (লওহে-মাহফুয এমন যে গোনাহ থেকে) পাক পবিত্র ফেরেশতাপণ ব্যতীত কেউ (অর্থাৎ কোন শয়তান ইত্যাদি) একে স্পর্শ করতে পারে না। (এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তো দুইয়ের কথা। সুতরাং কোরআন 'লওহে-মাহফুয' থেকে দুনিয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্যমেই আগমন করেছে। এটাই নবুওয়ত। শয়তান কোরআনকে জানতেই পারে না যে,

একে অতীন্দ্রিয়বাদ বলে সম্প্রদায় বলে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন : **نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ**

**وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ** এবং **الْأَمْثِينَ** এতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন)

বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ( **كَرِيم** শব্দের ইঙ্গিতার্থ এটাই ছিল। এখানে নক্কররাজির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শপথ করার অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নজমের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বর্ণিত সব শপথই সার্থকরূপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ফলে সবগুলো শপথই মহান। কিন্তু কোন কোন স্থানে উদ্দেশ্যকে গুরুত্বদানের জন্য মহান হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত উল্লেখও করা হয়েছে।) তবুও কি তোমরা এই কালামের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (অর্থাৎ একে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে জরুরী মনে করবে না?) তদুপরি একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (ফলে তোমরা তওহীদ এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করছ)। অতএব (এই অস্বীকৃত যদি সত্য হয়, তবে) যখন (মরণোশ্মুখ ব্যক্তির) প্রাণ কষ্টাগত হয় এবং তোমরা (বসে বসে অসহায়-ভাবে) তাকে থাক, তখন আমি তার (অর্থাৎ মরণোশ্মুখ ব্যক্তির) তোমাদের অপেক্ষা অধিক নিকটে থাকি (অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত থাকি। কেননা, তোমরা শুধু তার বাহ্যিক অবস্থা দেখ। আর আমি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকি। কিন্তু (আমার এই জ্ঞানগত নৈকট্যকে মূর্খতা ও কুফরের কারণে) তোমরা বুঝ না। অতএব যদি (বাস্তবে) তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (যেমন তোমরা মনে কর) তবে তোমরা এই আত্মাকে (দেহে) ফিরাও না কেন? (তোমরা তো তখন তা কামনাও কর) যদি তোমরা (কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও? (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যখন দেহে আত্মা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নও তখন কিয়ামতে আত্মার পুনরুজ্জীবনকে রোধ করতে কিরূপে সক্ষম হবে? সুতরাং তোমাদের অস্বীকৃতি অনর্থক। অতএব যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন অবশ্যজ্ঞাবী, তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়) যে ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হবে (যাদের কথা পূর্বে **وَالسَّابِقُونَ** আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) তার জন্য আছে সুখ (স্বাস্থ্য), খাদ্য

এবং আরামের জামাত। আর যে ব্যক্তি ডান পার্শ্বস্থদের একজন হবে, (যাদের কথা

**وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ** আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে বলা হবে: তোমার

জন্য (বিপদাপদ থেকে) শান্তি। কারণ, তুমি ডান পার্শ্বস্থদের একজন। (অনুকম্পা অথবা তওবার কারণে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রথমেই এ কথা বলা হবে। পক্ষান্তরে শান্তি-লাভের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে একথা শেষে বলা হবে)। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হবে, তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।



নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) ধ্রুব সত্য। অতএব (যিনি এগুলো করেন) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

### আনুষ্ঠানিক জাভব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও পৃথিবী সৃষ্টির মাধ্যমে কিস্বামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

قسَمُ—এর গুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার  
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

একটি সাধারণ বাক্যরূপ। যেমন বলা হয় لا وأبيك মূর্ততা যুগের কসমে সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مَوَاقِعِ শব্দটি مَوَاقِعِ এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়।

এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নজম <sup>٨٥</sup> وَالنَّجْمِ

أَزْأَهْوَى বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে

নক্ষত্রের কর্ম সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

أِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ—যে বিশ্বম্ভব বর্ণনা করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা

হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ!

كِتَابٌ مَّكْنُونٌ—অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহফুয বোঝানো

হয়েছে। لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ—এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ

এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এক. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে

পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে মাহফুযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং يَمَسُّهُ لَا

এর সর্বনাম দ্বারা লওহে মাহ্‌ফুযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহ্‌ফুযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় **مَطْهُرُونَ** অর্থাৎ ‘পাক-পবিত্র লোকগণ’—এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা ‘লওহে মাহ্‌ফুয পর্বত পৌঁছতে সক্ষম। এ ছাড়া **مَس** শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না, বরং **مَس** তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে অর্থাৎ লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে মাহ্‌ফুযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্ট জীবের কাজ নয়।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি **فَلَا تَقْرَأُ كَرِيمًا** বাক্যে অবস্থিত ‘সম্মা-নিত’ শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় **الْأَيْمَةَ** এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি, যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং **مَس** শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন : আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসা-র নিম্নোক্ত আয়াত-

সমূহের মর্ম : **فِي مَصْهَفٍ مَّكْرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مَّطْهُرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ**  
(কুরতুবী, রাহুল মা‘আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি **كِتَابٌ مَكْنُونٌ**—এর বিশেষণ নয়, বরং কোরআনের বিশেষণ।

দুই. দ্বিতীয় প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, **مَطْهُرُونَ** অর্থাৎ ‘পাক-পবিত্র’ কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেরী তফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতা-গণকে বোঝানো হয়েছে, যারা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা) এই উক্তি করেছেন।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইমাম মালেক (র)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন।—(কুরতুবী)

কিছু সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন : কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং **مَطْهُرُونَ** এর অর্থ এমন লোক, যারা ‘হদসে আসগর’ ও ‘হদসে আকবর’ থেকে পবিত্র। বে-ওযু অবস্থাকে ‘হদসে আসগর’ বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যশ্চলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েম ও নিকাসের অবস্থাকে ‘হদসে আকবর’ বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র) থেকে বর্ণিত আছে।—(রাহুল মা‘আনী)।

এমতাবছায় لا یمس لا এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-ওষু না হওয়া এবং বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ক্ষাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই :

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসুলুল্লাহ (সা)-র একখানি পত্র ইমাম-মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে : لا یمس القرآن الا طاهر — অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে। — (ইবনে কাসীর)

রাহুল মা'আনীতে এই রেওয়াজে মসনদে আবদুর রায়যাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনিয়ির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : لا یمس القرآن الا طاهر — (রাহুল মা'আনী)।

মাসআলা : উল্লিখিত রেওয়াজেতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উশ্মত এবং ইমাম চতুশ্চর এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। এর খিলাফ করা গোনাহ। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এতে দাখিল আছে। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াল্লাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখশ্বা, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেরী, আবু হানীফা সবারই এই মাযহাব। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লিখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা : কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওষু

ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওয়ু ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবু হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেরী ও মালেক (র)-এর মতে তাও না-জায়েয।—(মাযহারী)

মাসআলা : বে-ওয়ু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা : আলিমগণ বলেন : এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তিলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওয়ু অবস্থায়ও তিলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং মনসদে আহমদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বে-ওয়ু অবস্থায় তিলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফিকহবিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

أَدَّهَانَ مَدَّهَنُونَ — أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مَدَّهَنُونَ

থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ذَلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْعُلُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَأَنَّ كُنْتُمْ غَوْرًا مَدِينِينَ لَتَرَجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে শূক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নকুলরাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. কোরআন আল্লাহর কালাম। এতে কোন শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। দুই. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কষ্টাগত হয় তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে

তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত—এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সার্বকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হিফায়ত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে : যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আল্লাহর নাগালের বাইরে চলে গেছে, তবে এখানেই স্বীয় শক্তি মড়া ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহর নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নিবৃদ্ধিতার পরিচায়ক।

نَا مَا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে

তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্য-শীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আস-হাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মু'মিনদের একজন হয়, তবে সেও জাহান্নামের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবে শিমাল' তথা কাফির ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْوَعْدِ—অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধুব সত্য।

এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ—সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সা)-কে বলা

হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভেতরের ও বাইরের সব তসবীহ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ বলে ব্যাঙ করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

سورة الحديد  
সূরা হাদীদ

মদীনার অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْدُبُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিশ্বর, প্রজাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিত্রাত। (৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্তীর্ণ হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই

থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাগ্নিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাগ্নিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (সৃষ্ট বস্তু) আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে কিংবা অবস্থার মাধ্যমে)। তিনি শক্তিশ্বর ও প্রজাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও (তিনিই) মৃত্যু ঘটান। তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনিই (সব সৃষ্টির) আদি এবং তিনিই (সবার ধ্বংস হওয়ার পর) অন্ত। (অর্থাৎ তিনি পূর্বে কখনও অনস্তিত্বশীল ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কোনরূপে অনস্তিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সবার শেষেও তিনিই)। তিনিই (স্বীয় অস্তিত্বে প্রমাণাদির আলোকে প্রকটভাবে) প্রকাশমান এবং তিনিই (সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে) অপ্রকাশমান। (অর্থাৎ কেউ তাঁর সত্তা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। যদিও সৃজিতরা একদিক দিয়ে তাঁকে জানে এবং একদিক দিয়ে জানে না, কিন্তু তিনি সব সৃজিতকে সব দিক দিয়ে জানেন)। তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি (এমন সক্ষম যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমিত সময়ে) অতঃপর আরশে (যা সিংহাসন সদৃশ, এমনভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর পক্ষে শোভনীয়)। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে (যেমন রুগ্নি) ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় (যেমন উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বহিত হয় ও যা আকাশে উদ্ভিত হয় (যেমন ফেরেশতারা)। তাঁরা আকাশে উঠানামা করে ও বিধি-বিধান, যা অবতীর্ণ হয় এবং বান্দার আমল যা উদ্ভিত হয়। তিনি যেমন এসব বিষয় জানেন, তেমনি তোমাদের সব অবস্থাও তিনি জানেন। সেমতে) তিনি (জ্ঞাত হওয়ার দিক দিয়ে) তোমাদের সাথে থাকেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন? (অর্থাৎ তোমরা কোথাও তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকতে পার না)। তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা দেখেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে পেশ হবে। এভাবে তওহীদের সাথে কিয়ামতও প্রমাণিত হয়ে গেল)। তিনিই রাগ্নিকে (অর্থাৎ রাগ্নির অংশকে) দিনে প্রবিষ্ট করেন, (ফলে দিন বড় হয়ে যায় এবং) তিনিই দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) রাগ্নিতে প্রবিষ্ট করেন। (ফলে রাগ্নি বড় হয়ে যায়। এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তাঁর জ্ঞান এমন যে) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য : যে পাঁচটি সূরার শুরুতে **سُبْحٰنَ رَبِّنَا** অথবা **سُبْحٰنَ رَبِّنَا** আছে, সেগুলোকে হাদীসে **سُبْحٰنُ رَبِّنَا** তথা তসবীহযুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুম'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়াজেতে হযরত ইবরাহীম ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা

করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরার একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেন : সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত :

—هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও হূক্‌ **سَبِّحْ** অতীত

পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে **سَبِّحْ** উবিযাত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আয়াত তা'আলার তসবীহ্ ও যিকির অতীত, উবিযাত ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(মামহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : কোন সময় তোমার অন্তরে আয়াত তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে **هُوَ الْأَوَّلُ**

**وَالْآخِرُ** আয়াতখানি আন্তে পাঠ করে নাও।—(ইবনে কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাস্তেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই—সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট, অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টিজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃষ্টিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু

বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন : **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ**

আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। এক, যা কার্যত বিলীন হয়ে যায়, যেমন, কিয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। দুই, যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সভাপতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান জবছায় ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জালাত ও সোইখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ-মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না, কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র সভাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং উবিযাতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অস্তিত্ব।



ইমাম গাফালী (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলার মারেকত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেকতে ক্রমোন্নতি লাভে করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অজিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারেকত।—(রাহল-মা'আনী)

‘খাহের’ বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশ্য মান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর জ্ঞানপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রভা ও শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপায়মান।

যীন্ সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ‘বাতেন’ তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। কবি বলেন :

أے برتر از قهاس و گمان خیال و وهم -  
 وز هر چه دیده ایم و شنیده ایم و خواندند  
 آء برون از جمله قال و قیل من -  
 خاک بفرق من و تمثیل من ۰

—অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানে-  
 নেই থাকনা কেন। এই ‘সঙ্গের’ স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত।

কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের ঠিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাংশের ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

أٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاٰنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِيۡنَ فِيۡهِ ؕ قَالِذِيۡنَ

أٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ وَاٰنۡفِقُوۡا لَهُمۡ جُرۡكَبِيۡرًا ؕ وَمَا لَكُمۡ لَا تُوۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ

۝ وَالرَّسُوۡلُ يَدۡعُوۡكُمۡ لِتُوۡمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ وَقَدۡ اَخَذَ مِيۡثَاقَكُمۡ اِنۡ

كُنۡتُمْ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۝ هُوَ الَّذِيۡ يُنۡزِلُ عَلٰٓى عِبۡدِهٖ اٰیٰتٍ كٰتِبٰتٍ

لِيُخۡرِجَكُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمۡ لَءَوۡفٍ رَّحِيۡمٍ ۝

وَمَا لَكُمۡ اَلَّا تَتَّقُوۡا فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَرَبِّكُمۡ وَمِيۡرٰثِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيَّكَ أَكْثَمًا  
 دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا، وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ  
 الْحُسْنَىٰ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ مَنْ وَالَّذِي يُقْرَضُ اللَّهُ  
 قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِئْهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

(৭) তোমরা আজাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে হার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে হারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল, তোমরা আজাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিয়েছেন? আজাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অধীকার নিজেছেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্যে আজাহ্‌র জবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অজ্ঞকার থেকে আলোকে জানকন করেন। নিশ্চয় আজাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আজাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আজাহ্—ই নব্বোমণ্ডল ও ছুমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মহা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সম্মান নয়। এরূপ লোকদের মর্বাদা বড় তাদের অপেক্ষা, হারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আজাহ্ উত্তরকে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আজাহ্ সে সম্পর্কে সম্মান জ্ঞাত। (১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আজাহ্‌কে উত্তম ধার দেবে, এরূপ তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সন্মানিত পুরস্কার।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা আজাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং (বিশ্বাস করে) যে ধন-সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অপরের উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে (তাঁর পথে) ব্যয় কর। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই ধন-সম্পদ তোমাদের পূর্বে অন্যের হাতে ছিল এবং এমনিভাবে তোমাদের পর অপরকে হস্তান্তর করে দেবে। সুতরাং এটা যখন চিরস্থায়ী সম্পদ নয়, তখন একে প্রয়োজনীয় থাকেও ব্যয় না করে আগলে রাখা নিবৃদ্ধিতা নয় তো কি?) অতএব (এই আদেশ মুর্তাবিক) তোমাদের মধ্যে হারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (বিশ্বাস স্থাপন করে আজাহ্‌র পথে) ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (পক্ষান্তরে হারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, আসি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আজাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না (এর মধ্যেই রসূলের প্রতি বিশ্বাসও দাখিল আছে)। অথচ (বিশ্বাস স্থাপন করার মজবুত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে)

রসূল (যার রিসালত প্রমাণিত) তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি (তাঁরই শিক্ষা মুতাবিক) বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন এবং (দ্বিতীয় কারণ এই যে) যয়ং আলাহ্ তোমাদের কাছ থেকে (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) বলে বিশ্বাস স্থাপন করার অঙ্গী-

কার নিচ্ছেন (এর মোটাটাই প্রতিক্রিয়া তোমাদের স্বভাবেও বিদ্যমান রয়েছে এবং রসূলের আনীত মো'জেযা এবং প্রমাণাদিও তোমাদেরকে এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অতএব) যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চাও, (তবে এসব কারণ যথেষ্ট। নতুবা

এছাড়া আর কি কারণের অপেক্ষা করছ? যেমন আলাহ্ বলেন: **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ**

بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (অতঃপর এই বিষয়বস্তুর আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে)।

(বিশেষ) বান্দা মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি প্রকাশ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, (যা তিনিই তাঁর-প্রাজলতা ও বিশেষ অলৌকিকতার কারণে উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে বোঝায় যাতে (সেই বান্দা) তোমাদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অঙ্গকার থেকে (ঈমান ও জানের) আলোকে আনয়ন করেন। যেমন আলাহ্ বলেন: **لَتُخْرِجَنَّ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**

নিশ্চয় আলাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (তিনি এমন অঙ্গকার থেকে আলোকে আনয়নকারী তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল। এখন ব্যয় না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে:) তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, অথচ (এরও একটা মজবুত কারণ আছে। তা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিশেষে আল্লাহরই থেকে যাবে (অর্থাৎ যখন সব মালিক মরে যাবে এবং তিনিই থেকে যাবেন। সুতরাং সব ধন-সম্পদ যখন একদিন ছাড়তেই হবে, তখন স্থানীমনে দিলেই তো সওয়াবও হয়। কোন সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডলের মালিক নয়, তবুও নভোমণ্ডল উল্লেখ করে সম্ভবত এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি যেমন নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি, তেমনি ভূমণ্ডলও অবশেষে বাহ্যিকভাবে তাঁরই অধিকারে চলে

যাবে। প্রকৃতপক্ষে তো বর্তমানেও তাঁরই মালিকানাভুক্ত। **مُتَخَلِّفِينَ** শব্দের ব্যাখ্যা

হিসাবে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর ব্যয়কারীদের মর্ষাদার তাঁরতম্য বর্ণিত হচ্ছে। বিশ্বাস স্থাপন করে ব্যয় করা প্রত্যেকের জন্যই সওয়াবের কারণ, কিন্তু এর মধ্যেও তাঁরতম্য আছে। তা এই যে) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে (এবং যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে) তারা (উভয়ই) সম্মান নয়; (বরং) তারা মর্ষাদাস্ত তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের (অর্থাৎ সওয়াবের) ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সব পরিজাত

আছেন। (তাই উত্তম সময়ের কর্মের জন্য সওয়াব দেবেন। অতএব যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করার সুযোগ পাননি, আমি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলিঃ) কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতা সহকারে) ধার দেবে! এরপরও আল্লাহ একে (অর্থাৎ প্রদত্ত সওয়াবকে) তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং (বহুগুণে বৃদ্ধি করার পরও) তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। ('বহুগুণে' বলে পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং **كُرِّمًا** বলে এর মানগত উৎকর্ষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ—এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন

আল্লাহ তা'আলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথাই স্বীকৃতিতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ** বলে এই অঙ্গী-

কারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পঙ্গ-গছরগণও তাঁদের উশ্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে :

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ  
أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي - قَالُوا أَقْرَرْنَا - قَالَ نَا شَهِدُوا وَآرَأَيْتُمْ  
مَعَكُمْ مِنَ الشَّا هِدِينَ ۝

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ—অর্থাৎ যদি তোমরা মু'মিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে,

এ কথাটি সেই কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে **وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মু'মিন হও' বলা নিরাপে সঙ্গত হতে পারে ?

জওয়াব এই যে, কাফির ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী করত।

প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই : **مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ**

الله زلفی — অতএব আল্লাহের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ইমানের দাবী যদি

সত্য হয়, তবে তার বিপুল ও ধর্মব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসুলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

میراث — وَ لِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

ধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানা কে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক — মুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নাভামগুন ও ভূমগনের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানা কে میراث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে সে জিম্মিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশ্যেই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি রূপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বভোক্তাবে আল্লাহরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই সুস্থর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহর নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে গেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়াজেতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমরা একটি ছাগল হুঁবাই করে তার অধিকাংশ শোণিত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রসুলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আনুস্য করলাম : শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন : গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে ছাওয়ার জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। — (মামহারী)

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে সাক্ষি হলে কেমন সমস্ত ব্যয় করলে সওয়াবে পাওয়া যাবে, কিন্তু ইমান, আন্তরিকতা ও অপ্রথমিতার পর্থাৎবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে: لَا يَسْتَوِي

مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ

সন্দেদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে, দুই, যারা মক্কা বিজয়ের পর মু'মিন হয়ে আল্লাহর পথে

স্বাক্ষর করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আলাহর কাছে সমান নয়; কারণ মর্যাদায় এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও বায়করীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবাদের কিয়ামতের মর্যাদাভেদে মাপকাঠি করার রহস্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আলাহ তা'আলা সাহাবাদের কিয়ামতকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দুই, যারা মক্কা বিজয়ের পর এ কাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আলাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

মক্কা বিজয়কে উত্তর শ্রেণীর মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক-কড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হ'শিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোন দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চয় হয়ে যাওয়ার আশংকা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাক্ষ্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িৎঘড়ি ভাঙে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্ধাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে ভাঙে যোগদান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিপক্ষ মনে করলে জরুর ও শরায়র এবং দলের সংখ্যান্বতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি জ্বক্কেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যান্বতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্ধাতনের এক জটিলমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের সু'কি নেওয়া এবং বাস্তবিতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামাঙ্কিত ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবা এবং ইসলামের সেবার জীবন ও খন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি ?

আন্তে আন্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উত্তীর্ণ হয়। তখন কোরআন পাকের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে (  $\text{يَدْخُلُونَ فِي}$  )

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِكُمْ السُّفَهَاءَ وَالْجَاهِلِينَ وَالْبَغِيضَاتِ الَّتِي لَا يَدْرِيْنَ مَا تَقُولُنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ ﴾ কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান

প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কলুষণ তথা কন্ন ও কন্নকল্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সম্মান হতে পারে না। কারণ

তারা অসম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্ধাতন আশংকার উর্ধে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমুহূর্তে ইসলামের পালে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মহা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণী সমান হতে পারে মা।

সকল সাহাবীর জন্য মগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার পারস্পরিক

ভাবভঙ্গি উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে : **وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى** অর্থাৎ পারস্পরিক

ভাবভঙ্গি সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জাম্মাত ও মগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কিরামের সেই শ্রেণীভেদেই করা, যারা মহা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সমগ্র দলই शामिल আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে একরূপ ব্যক্তি দু'ই দুর্গত, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কিছুই ব্যয় করেন নি এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার অংশগ্রহণ করেন নি। তাই মগফিরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা স্বেচ্ছায় সাহাবীকে शामिल করেছে।

ইবনে হাবম (র) বলেন : এর সাথে সূরা আখিরার অপর একটি আয়াতকে নিলাও, যাতে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ مِنْهَا مُعَدَّدُونَ ۝  
لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَتَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَمَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। তারা পছন্দমত অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

আলোচ্য আয়াতে **وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى** বলা হয়েছে এবং সূরা আখিরার

এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কোরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয়—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোন গোনাহ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়ম থাকবেন না—তওবা করে নেবেন। নতুবা রসূলুল্লাহ (স)-র সংসর্গ, সাহাবা, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পুণ্যের ঋণিতের আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গোনাহ মাক হস্তে পৃষ্ঠ-পবিত্র

হওয়া অথবা পাখিব বিপদাপদ ও বেনীন্ন বেনী কোন কণ্ঠের মাধ্যমে গোনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোন কোন সাহাবীর মৃত্যুর পর আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আযাব পরকাল ও জাহান্নামের আযাব নয়, বরং বরষা তথা কবর-জগতের আযাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন সাহাবী কোন গোনাহ করে ঘটনাটকে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আযাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আযাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবীরা কিরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়—ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয়; সারকথা এই যে, সাহাবীরা কিরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নয়। তাঁরা রসুলুল্লাহ (স)-ও উম্মতের মাঝখানে আলাহর তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসুলুল্লাহ (স)-র শিক্ষা পৌঁছান কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়, বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্থলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তুম্বারী তাঁরা একটি সওয়ার পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসুলুল্লাহ (স)-ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মুকাবিলার শূন্যের কোণায় থাকে। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহ-ভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাশ্বা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অজিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাগফিরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফিরাতই নয়, **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** বলে তাঁর সম্ভ্রষ্টিকও নিশ্চিত আশ্বাস

দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মস্ক বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসুলুল্লাহ (স)-র উক্তি অনুযায়ী অডিশ্য হওয়ার কারণ এবং ইমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও প্রাচ্য-অপ্রাচ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবীরা কিরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করেছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব লিখছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোন পক্ষের ভ্রাতাদের



সেসব ঐতিহাসিক রেওয়াজকে বিস্মৃত মেনেও নেওক্সা যায়, তবে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোন মর্যাদা নেই। কেননা, কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম সবাই কুমায়োগ্য।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাসঃ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ডাঙ্গবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের পরম্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা এবং যে কোন এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরী। আকস্মিকের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহমদের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছেঃ

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مسا بهم ولا يظعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك وجب تاديبه -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের কোন দোষ বর্ণনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী প্রকৃষ্টিসাব্যস্ত করা করণীয় ও অন্য বৈধ নয়। কেউ এরূপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব।— (শরহুল আকিদাতিল ওয়াসেতিয়া, ৩৮৯ পৃঃ)

ইবনে তাইমিয়া 'শরহুল মসনুল' গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামের প্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বলেনঃ

وهذا مما لا تعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعين لهم باحسان وسائر أهل السنة والجماعة فإنهم جميعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والتبرحهم عليهم والتراضى عنهم واعتقاد محبتهم ومولاهم وعقوبة من أساء فيهم بالقول -

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলিম, ফিকহবিদ, সাহাবী, তাবেরী ও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁদের জন্য আত্মাহুঁর দরবারে কমা প্রার্থনা করা, আত্মাহুঁর রহমত ও সম্মতিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহস্বত ও সহাদততার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া 'শরহুল আকিদাতে ওয়াসেতিয়া' গ্রন্থে সমগ্র উম্মত তথা আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের পারম্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেনঃ

ويمسكون مما شجر بهن الصحابة ويقولون هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيها ونقص وغرر وجهه

وَالْمُصَدِّقِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْأَعْيُنِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ أَجْرًا كَثِيرًا  
 وَمَجْتَهِدُونَ مَخْطُوعُونَ - وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ  
 الْمُصَدِّقِينَ مَعْصُومٌ مِنْ كِبَائِرِ الْأَثْمِ وَمَعَا قِرَّةٍ بَلْ يَجْزُونَ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبَ فِي  
 الْجَمَلَةِ وَلَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِقِ مَا يُوْجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ حَتَّى  
 أَنْهُمْ يَغْفِرَ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يَغْفِرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ -

অর্থাৎ আহলে-সুন্নত ওরাল জামা'আত সাহাবায়ে কিরামের আনুসঙ্গিক বিরোধপূর্ণ  
 ব্যাপারাদিতে নিশ্চুপ থাকেন। তাঁরা বলেন : যেসব রেওয়াজেত থেকে তাঁদের মখ্যকার  
 ক্বায়মোও দোষ লেব্বা যার, সেগুলোর কতক সম্পূর্ণ মিথ্যা, কতক পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত এবং  
 যেগুলো সহীহ ও বিত্ত্ব, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ক্বমাহ। কেননা, তাঁরা যা  
 কিছু করেছেন, আল্লাহর ওলাস্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয়  
 তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন ( তাহলে দ্বিগুণ সওন্নাবের অধিকারী ছিলেন ) না হয় ভ্রান্ত ছিলেন।  
 ( এমতাবস্থায়ও ক্বমাহ ও এক সওন্নাবের অধিকারী ছিলেন )। এসব সম্বন্ধে আহলে-  
 সুন্নত ওরাল জামা'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত,  
 বরং তাঁদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গুণ-গরিমা ও ইসলামের  
 জন্য ত্যাগ ও তিতিকামূলক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ মাফ হয়ে যেতে  
 পারে, এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহও মাফ হতে পারে, যা উম্মতের পরবর্তী লোকদের  
 মাফ হবে না।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَمَّةٌ تَبْجُرُونَ مِنْ تَحْتِهَا لَا تَهْتَادُ خَلْدَيْنِ  
 فِيهَا، ذَلِكَ هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ  
 لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ، قِيلَ ارْجِعُوا  
 وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ  
 الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  
 قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّبْتُمْ  
 الْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ

مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ مَا أُنكِمُ النَّارُ ۗ هِيَ  
 مَوْلَاكُمْ ۗ وَيُسَّ الْمَصِيرُ ۝ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ  
 قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ  
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُبْصِرُ الْآرْضَ بَعْدَ  
 مَوْتِهَا ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ إِنْ  
 الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ  
 وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ  
 الصَّادِقُونَ ۗ وَالشَّهَادَةُ ۗ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

(১২) সেদিন আগ্নেয়গিরি দেখেছেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্পূর্ণ ভাগে ও ভানপাত্রে তাদের ক্ষেপিতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জালাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাক্ষ্য। (১৩) সেদিন কপট খ্রিস্টানী পুরুষ ও কপট খ্রিস্টানিনী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের ক্ষেপিতি থেকে। বলা হবে : তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর দ্বোজ কর। অন্তঃপর উত্তর দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে : হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিদগ্ধ করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ গোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে জালাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে জালাহ সম্পর্কে প্রত্যাহিত করেছে। (১৫) অন্তঃপর, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সন্নী। কতই না নিরুশ্চয়! এই প্রত্যাবর্তন স্থল! (১৬) যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি জালাহর স্মরণে এবং যে সত্য অনুভূত হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিদগ্ধিত হওয়ার

সময় আসেনি ? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাগাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহই সূতাপকে তার মুদূর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিকারভাবে তোমাদের জন্য জায়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা ই তাদের পালনকর্তার কাছে সিন্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন জ্বীকারকারী তারা ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সৈদিন ও স্মরণীয়) যে দিন আপনি মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখভাগে ও ডান পাশে ছুটোছুটি করবে। (পুলসিরাতে অতিক্রম করার জন্য এই জ্যোতি তাদের সাথে থাকবে। এক রেওয়াজে আছে, বাম পাশেও থাকবে। বিশেষভাবে ডান পাশ উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এদিককার জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল হবে এবং এটা আলামত হবে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার। সম্মুখভাগে জ্যোতি থাকা এরূপ স্থলে সাধারণ রীতি। তাদেরকে বলা হবে : ) আজ তোমাদের জন্য এমন জায়াতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য (বাহ্যত এই শেষোক্ত ব্যাক্যটিও তখনই বলা হবে। এখন সংবাদ হিসাবে বলা হয়েছে :

بَشْرَى لَكُمْ كَمَا فِي سَبْتِ

কোরশভাগে বলাবে, যেমন আল্লাহ বলেন :

تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ أَنْ لَا

أَوْ بَشْرًا (এটা সৈদিন )

যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে (পুলসিরাতে) বলাবে : তোমরা আমাদের জন্য (একটু) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের জ্যোতি থেকে একটু আলো নেব। (এটা তখন হবে, যখন মুসলমান ঈমান ও আমলের কর্যাণে অনেক অগ্রে চলে যাবে এবং মুনাফিকরা পুলসিরাতে উপর পেছনে অন্ধকারে থেকে যাবে। তাদের কাছে পূর্ব থেকেই জ্যোতি থাকবে না, কিংবা দুর্বল-মনস্কদের এক রেওয়াজে অনুযায়ী তাদের কাছেও কিছুটা জ্যোতি থাকবে, কিন্তু তা নির্বাণিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে বাহ্যিক কাজ-কর্মে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, এ কারণে তাদেরকে কিছুটা জ্যোতি দেওয়া হবে। কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে আলাদা থাকত, এ কারণে তাদের জ্যোতি বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের প্রত্যক্ষণীয় শান্তিও তাই যে, প্রথমে জ্যোতি পাবে ও পরে

তা খিলান হয়ে যাবে)। তাদেরকে জওয়ার দেওয়া হবে : (হয় ফেরেশতাগণ জওয়ার দেবে, না হয় মু'মিনগণ) তোমরা পেছনে ফিরে যাও ও (সেখানে) আলোর সজান কর। (পেছনে বলে সেই স্থান বোঝানো হয়েছে যেখানে জীষণ অন্ধকারের পর পুনসিদ্ধিতে আরোহণ করার সময় জ্যোতি বস্টন করা হয়েছিল। অর্থাৎ যেখানে জ্যোতি বস্টন করা হয় সেখানে চলে যাও। সেখানে তারা সেখানে যাবে এবং কিছু না পেয়ে আবার এখানে আসবে)। অতঃপর (মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে পারবে না বরং) উভয় দলের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা (৩) হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আত্মা। (দুপুরে মনসুরের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আ'রাকের প্রাচীর। অভ্যন্তর ভাগ মু'মিনদের দিকে এবং বহির্ভাগ কাফিরদের দিকে থাকবে। রহমতের অর্থ জান্নাত এবং আত্মার অর্থ জাহান্নাম। দরজাটি সম্ভবত কথাবর্তী বলার জন্য হবে অথবা এটাই হবে জান্নাতের পথ। মোটকথা, যখন তাদের ও মুসলমানদের মাঝখানে প্রাচীর স্থাপিত হবে এবং তারা অন্ধকারে থেকে যাবে, তখন) তারা মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (অর্থাৎ কাজেকর্মে ও ইবাদতে তোমাদের সাথে শরীক ছিলাম। অতএব আজও সঙ্গে থাকা উচিত)। তারা (মুসলমানরা) বলবে : হ্যাঁ (ছিলে) কিন্তু (এরূপ থাকা কোন কাজের? তোমরা কেবল দৃশ্যত আমাদের সাথে ছিলে। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল এই যে) তোমরা নিজেরাই নিজেরদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিলে (তোমরা পয়গম্বর ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে এবং তাদের উপর বিপদাপদ আসার) প্রতীক্ষা করেছিলে, (ইসলামের সত্যতায়) সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে প্রতারণিত করেছিল, অবশেষে তোমাদের উপর আত্মাহুঁর আদেশ পৌঁছে গেছে। (মিথ্যা আশা এই যে, ইসলাম মিটে যাবে, আমাদের ধর্ম সত্য ও মুক্তিদাতা ইত্যাদি। 'আত্মাহুঁর আদেশ' মানে মৃত্যু। অর্থাৎ সারাজীবন এসব কুফরীতেই লিপ্ত ছিলে, তওবাও করনি)। মহাপ্রভাবক (অর্থাৎ শরতান) তোমাদেরকে আত্মাহুঁ সম্পর্কে প্রতারণিত করেছিল। (একথা বলে যে, আত্মাহুঁ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সারকথা এই যে, এসব কুফরীর কারণে তোমাদের বাহ্যত সঙ্গে থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়)। অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। (প্রথমত মুক্তিপণ দেওয়ার মত বস্তু তোমাদের কাছে নেই, যদি থাকত তবুও গ্রহণ করা হত না। কেননা এটা প্রতিদান জঙ্গৎ—কর্মজঙ্গৎ নয়)। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের (চির) সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

(**فَالْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِ** কথটি হয় মু'মিনদের না হয় আত্মাহুঁ তা'আলার। এই পুরোপুরি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ইমানে প্লেস্টোজেনীয় ইবাদতের আভাব আছে, তা পূর্ণ নয়। তাই পরবর্তী আয়তে ইমান পূর্ণ করার জন্য শাসনোত্তর ভঙ্গিতে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছে : ) যারা মু'মিন, তাদের (যেথা যারা প্লেস্টোজেনীয় ইবাদতে ভ্রষ্ট করে, যেমন সোনহুগার মুসলমান তাদের) জন্য কি (এখনও) আত্মাহুঁর উপদেশের এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার সামনে হাদিস-বিগলিত হওয়ার সম্ভাবনা আসেনি? (অর্থাৎ তাদের

মনেপ্রাণে অকরী ইবাদত পালনে এবং গোনাহ্ বর্জনে কৃতসংকল্প হওয়ার উচিত)। তারা তাদের মত যেন না হয়, তাদেরকে পূর্বে (ঐশী) কিতাব দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের মত)। তারাও তাদের কিতাবের দাবীর বিপক্ষে খোয়াল-খুশী ও সোনাহে গিল্পত হয়েছিল)। অতঃপর তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অভিল্লাত হয় (এবং তওবা করেনি)। ফলে তাদের অতঃকরণ কঠিন হয়ে যায়। (মূলক্রমেও তারা অনু-ভাব করত না। অন্তরের এই কর্তারতার কারণে আজ) তাদের অধিকংশই কাফির (স্বাধীন, সদাসর্বভা গোনাহে মেগে থাকি, সোনাহকে ভাল মনে করা, সত্য-নবীর প্রতি নস্তুতা পোষণ করা, এসব বিষয় গ্রায়ই কুফরের কারণ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের শীঘ্রই তওবা করা উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে পড়ে তওবা করার তওফীক হয় না এবং মাঝে মাঝে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে-দেয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের অঙ্করে গোনাহের কারণে কোন অনিশ্চিত স্থিতি হয়ে থাকলে এই ধারণাযত তওবা থেকে বিরত থেকে না যে, এখন তওবা করলে কি ফায়দা হবে? বরং তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার পর সবুজ-সতেজ করেন।) (এমনিভাবে তওবা করলে স্বীয় অনুগ্রহে যুক্ত অন্তরকে তিনি জীবিত করে দেন। অতএব নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা) আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে:) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী যারা আল্লাহকে আন্তরিকতা সহকারে ধার দেন, তাদের দান তাদের জন্য (সওয়ারের দিক দিয়ে) বহুগুণে বাড়ানো হবে এবং (এরপরও) তাদের জন্য রয়েছে পছন্দনীয় পুরস্কার। (অতঃপর উল্লিখিত ইমানের ফযীলত বলা হচ্ছে) : যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূজগণের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ। (অর্থাৎ পূর্ণত্বের এসব স্তর পূর্ণ ইমান দ্বারাই অর্জিত হয়। শহীদ তাকে বলা হয়, যে নিজের প্রাণকে আল্লাহর পথে পেশ করে দেয় যদিও নিহত না হয়। কারণ, নিহত হওয়া ইচ্ছা বহির্ভূত কাজ। তাদের জন্য জান্নাতে) রয়েছে তাদের (উপযুক্ত বিশেষ) পুরস্কার এবং (পুলসিরাতে রয়েছে বিশেষ) জ্যোতি। আর যারা কাফির ও আশাক আল্লাহ্ অস্বীকারকারী, তারাই জাহান্নামী।

আনুসঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত বিষয় :

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুজ-সিরাতের চক্রান্ত কিছ পূর্বে ঘটবে। হযরত আবু উমামা রাসূলেসী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাস্তিদির্। প্রতে আছে হয. আবু উমামা (রা) একদিন দামেশুকে এক জানামায় শরীক হন। জানামা লেগে উপস্থিত লোকদেরকে

মৃত্যু ও পন্নকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হল :

অন্তঃপন্ন তোমরা কবর থেকে হাশরের মরুদানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনখিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনখিলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনখিলে সমবেত সব মু'মিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মু'মিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। কালে কারও নূর পর্বতসম, কারও খজুর রুকুসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল হৃদয়স্থলিতে নূর থাকবে, তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে।  
—(ইবনে কাসীর)

অন্তঃপন্ন হযরত আবু উমামা (রা) বলেন : মুনাফিক ও কাফিরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কোরআন পাক এই ঘটমা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে :

أَوْظَلَمَاتٍ فِي بَهْرٍ نَجْوَى يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقَ مَوْجٍ مِنْ فَوْقَ  
سَعَابِ ظَلَمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا - وَمَنْ لَمْ  
يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ -

তিনি আরও বলেন, মু'মিনদেরকে কে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মত হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্কুয়ান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মু'মিনের নূর দ্বারা কোন কাফির ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না।—(ইবনে কাসীর)  
হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা)-র এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মনখিলে গভীর অন্ধকারের পন্ন নূর বন্টন করা হবে, সেই মনখিল থেকেই কাফির মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

পুলসিরাতে মিকটে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিমিয়ে দেওয়া হবে।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুল-সিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মু'মিনগণকে অনুরোধ করবে—একটু আস, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামায, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জওয়াব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কোরআন পাক বলে :

يُخَادِعُونَ

اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে

এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী বলেন : এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে। তাই তারা শেষ-পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। নিশ্চিন্ত আয়াতে এর উল্লেখ আছে :

يَوْمَ لَا يَحْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا .

মুসলিম, আহমদ ও দারে-কুতনীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে : প্রথমে মু'মিন ও মুনাফিক—উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌঁছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ামতে মধ্য সম্ভব সাধনের উদ্দেশ্যে তফসীলে মাস-হারীতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফিরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইত্তিকালের পরও এই উশ্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে ‘মুনাফিক’ নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উশ্মতের কারণে নেই। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা জানেন কার অন্তরে ঈমাম আছে এবং কার অন্তরে নেই। অতএব আল্লাহর জানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।



এই উল্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে।—( নাউযুবিল্লাহি মিনহ )

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে : তফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল :

১. আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুয়ান্দা (রা)-র রেওয়াজেতে এবং ইবনে মাজা বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিবে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়াজেতে হযরত সাহল ইবনে সাদ, যায়দ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবু উমামা, আব্দুদারদা, আবু সাঈদ, আবু মুসা, আবু হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২. মসনদে আহমদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

من حافظ على الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم  
القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة  
وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাজেগানা নামায যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়াম-  
তের দিন এই নামায তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে  
ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামায আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ  
কিছুই হবে না। সে কারণ, হামান ও ফিরায়ূনের সাথে থাকবে।

৩. তিবরানী বর্ণিত আবু সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :  
যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মোকাররমা পর্যন্ত  
বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে—যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহ্ফ  
পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে  
ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত  
তার জন্য নূর হবে।—( মসনদে আহমদ )

৫. দায়লামী বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত অপর এক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ  
(সা) বলেন : আমার প্রতি দরুদ পাঠ পূনসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)  
একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন : হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম খোলার জন্য যে  
মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে।—( তিবরানী )

৭. হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে।—( মসনদে-বায়হার )

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে।—( তিরমিহী )

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে।—( বাযহার )

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহর যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে।—( বায়হাকী )

১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পুনসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তন্দ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে।—( তিবরানী )

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে, মুসলিম হযরত জাবের (রা) থেকে, হাকেম হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং তিবরানী ইবনে যিনাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, أَيَاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلْمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে।

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الظُّلْمَاتِ وَنَسْأَلُهُ النُّورَ التَّامَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا وَنَا نَقْتَبِسُ

—অর্থাৎ যেদিন মূনাক্ফিক পুরুষ ও মূনাক্ফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে :

আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই।

قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا — অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে :

যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মু'মিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে।

فَضْرِبَ بِهِمْ بِسُورَةٍ بَابٌ بَابٌ بِأَنَّ فِيهَا الرَّحْمَةَ وَظَاهِرٌ هُوَ مِنْ قَبْلَهُ

الْعَذَابُ—অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকরা সে স্থানে

ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মু'মিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মু'মিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগে মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আযাব।

রাহল-মা'আনীতে ইবনে যাক্বদ (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মু'মিন ও কাফিরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জন্য, না হয় মু'মিনগণ এই দরজা দিয়ে জাম্মাতে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নূরের ব্যাপারে কোরআনে কাফিরদের কোন উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়াজেও বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুলসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মু'মিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, শুধু মু'মিনগণই পুলসিরাতে দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করবে। কাফির ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহান্নামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মু'মিনগণ পুলসিরাতে পথ অতিক্রম করবে। পাপী মু'মিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাতে থেকে নিশ্চয় পতিত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছবে। অন্যান্য মু'মিন নিরাপদে পুলসিরাতে অতিক্রম করে জাম্মাতে প্রবেশ করবে।—(শাহ্ আঃ কাদের দেহলভী)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ

الْحَقِّ—অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আত্মাহ্বল

যিকির এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خَشَوْعَ قُلُوبِ—এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা।—

(ইবনে কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।—(রাহল-মা'আনী)

এটা মু'মিনদের জন্য হ'শিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আত্মাহ্বল তা'আলা কোন কোন মু'মিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ

করে এই আয়াত নাখিল করেন।—(ইবনে কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন : মদীনায পৌছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রাহল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত রেওয়াজেতে আরও বলা হয়েছে, এই হ'শিয়্যারি সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাখিল হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হ'শিয়্যার করা হয়।

মোটকথা, এই হ'শিয়্যারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নব্বতা ও সৎ-কর্মের জন্য তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নব্বতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নব্বতা উঠিলে নেওয়া হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ  
প্রত্যেক মু'মিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ?

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবনে মায়মুন (রা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারী ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :  
مؤمنوا متي شهداء  
অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মু'মিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(ইবনে জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : كلکم صدیق وشهید অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন : আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেন : আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ—

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মু'মিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়, বরং মু'মিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই :

أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ وَالْمَأْمُورِينَ

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মু'মিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা—সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। বাহ্যত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিনকেও কোন-না-কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রাহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মু'মিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুনা যেসব মু'মিন অনবধান ও খেলালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা স্বাভাবিক না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : اللعانون الأثامون لا يكونون شهداء অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারুক (রা) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন : তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইশ্বতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরম্ভ করল : আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইশ্বতের উপর হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা) বললেন : যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মুকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে।— (রাহুল-মা'আনী)

তরুসীরে মাযহানীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-র আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে কিরামই

সিদ্দীক, অন্য কোন মু'মিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন : সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মু'মিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

إِغْلَبُوا أَنْتَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عِبٌ وَنَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ  
وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ

نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّئُ فِتْرَتَهُ مُصَفَّرَاتٍ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۝ وَمَا الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ سَابِقُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  
 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
 بِاللهِ وَرُسُلِهِ ۝ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ  
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(২০) তোমরা জেনে রাখ, পৃথিবী জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক রুটিটির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আলাহর ক্রমা ও সন্তুষ্টি। পৃথিবী জীবন প্রতারণার সম্পদ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অশ্রদ্ধে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্রমা ও সেই জামাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আলাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আলাহর রূপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আলাহ মহান রূপার অধিকারী।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

জেনে রাখ, ( পরকালের মুকাবিলায় ) পৃথিবী জীবন ( কিছুতেই কামা হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক ) ক্রীড়া-কৌতুক, ( বাহ্যিক ) সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা ( অর্থাৎ শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে ) এবং ধনে ও জনে পারস্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। ( অর্থাৎ পৃথিবী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইঃ শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা বিশ্বাস মাত্র। এর দৃষ্টান্ত এরূপ ) যেমন বৃষ্টি ( বর্ষিত হয় ), যার বদৌলতে উৎপন্ন ফসল কৃষককে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুক হয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। ( এমনভাবে দুনিয়া রূপস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পরকালের ) পরকালে আছে ( দুটি বিষয়, একটি কাফিরদের জন্য ) কঠিন শাস্তি এবং ( অপরটি মু'মিনদের জন্য ) আলাহর পক্ষ থেকে ক্রমা ও সন্তুষ্টি। ( এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী। সুতরাং পরকাল চিরস্থায়ী এবং )

পাখিব জীবন নিছক ( ধ্বংসশীল, যেমন মনে করে ) প্রতারণার সামগ্রী। ( সুতরাং পাখিব সম্পদ যখন ধ্বংসশীল এবং পরকালের ধন চিরস্থায়ী, তখন তোমাদের উচিত ) তোমাদের পালনকর্তার দিকে এবং এমন জালাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান ( অর্থাৎ এর চাইতে কম নয়, বেশী হতে পারে ) এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটা অর্থাৎ ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। ( এতে ইঙ্গিত আছে যে, কেউ যেন নিজ আমলের কারণে গবিত না হয় এবং জালাত দাবী না করে বসে। জালাত নিছক আমার অনুগ্রহ, যা লাভ করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমি নিজ কুপায় যারা এসব আমল করে, তাদের সাথে আমার ইচ্ছাকে জড়িত করেছি। ইচ্ছা না করাও আমার ক্ষমতামূলক )।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞানব্যবস্থা বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জালাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে প্রেফতার হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পাখিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পাখিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পাখিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই : প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لهو এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন বড় বাচ্চাদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদে অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদে অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهو শুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপ্ত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সম্ভৃষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বাচ্চক-বালিকারা খেলাধুলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্ববৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে

তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্বক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্বক্যে পৌছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্বক্য হলে জীবনের সর্বশেষ মনষিল। এ মনষিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরষখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে :

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ وَنَبَأٌ تَوَالٍ ثُمَّ يَهُوجُ فَتُرَاةٌ مُّصَفًّراً ثُمَّ يَكُونُ حُطًا مَّا

— **غَيْثٍ** শব্দের অর্থ বৃষ্টি। **كُفَّار** শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর

অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উজ্জ্বল উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীর-বিদ **كُفَّار** শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফিররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রায় হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফিররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফিরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহর কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মু'মিন কাফিরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফির আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উজ্জ্বল যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফিররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্বক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য—পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে :



وَفِي لَآخِرَةِ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

অর্থঃ পরকালে  
মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফিরদের অবস্থা  
অর্থঃ তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মু'মিনদের অবস্থা অর্থঃ তাদের  
জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া  
নিম্নে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আযাব। কঠোর আযাবের বিপরীতে  
দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি  
নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই  
হয় না; বরং আযাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জাহাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত  
হয়। এটা রিয়ওয়ান তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে হলে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

الْأَمْتَاعُ الْغُرُورُ — অর্থঃ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান

ও চক্ষুমান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল।  
এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহুর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর  
পরকালের আযাব ও সওয়ার এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি এরূপ  
হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে।  
পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জাহাতে দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ  
আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা  
নেই, অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ  
অথবা ওয়র তোমার সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে  
পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎ কাজের  
পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জাহাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা  
কর। হযরত আলী (রা) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী  
এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন : জিহাদে

সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা) বলেন : জামা'আতের নামাযে প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।—(রাহুল-মা'আনী)

জামা'আতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে **سَمَوَاتٍ** বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে

বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জামা'আতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী—**عَرْضٍ** শব্দটি কোন সমস্ত কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জামা'আতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

—**ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** পূর্বের

আয়াতে জামাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জামাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জামাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জামাত অবশ্যস্বাভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎ কর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জামাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও রূপার বদৌলতেই মানুষ জামাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম আরম্ব করলেন : আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জামাত লাভ করতে পারি না—আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি।—(মাযহারী)

**مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا**

**فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ؕ إِنَّ ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝**

**لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ؕ**

**وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ**

**وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ**

## الفَيْءُ الْحَمِيدُ ٥

(২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্য বলা হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা রূপগতা করে এবং মানুষকে রূপগতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা (সবই) এক কিতাবে (অর্থাৎ জওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ থাকে প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করার পূর্বেই (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিপদ পূর্ব-অবধারিত)। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ কাজ। (সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি লিপিবদ্ধ করে দেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। এটা এজন্য বলা হল) যাতে তোমরা যা হারাও (স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি অথবা ধনসম্পদ), তজ্জন্য (অতটুকু) দুঃখিত না হও, (যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে ও পরকালের কাজে মশগুল হওয়ার পথে বাধা হয়ে যায়। নতুবা স্বাভাবিক দুঃখ করলে কোন ক্ষতি নেই) এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা নিজ রূপায় দিয়েছেন মনে করে) তজ্জন্য উল্লসিত না হও (কারণ, যার ব্যক্তি অধিকার আছে, সে-ই উল্লসিত হতে পারে। এখানে তো আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় ও নির্দেশে দিয়েছেন। কাজেই উল্লসিত হওয়ার কোন অধিকার নেই)। আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কারণে অহংকার অর্থে

**اختيال** শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ, পদ ইত্যাদির কারণের অহংকার অর্থে প্রায়ই

**فخر** শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর রূপগতার নিন্দা করা হচ্ছে : ) যারা (দুনিয়ার মোহে) নিজেরাও (আল্লাহর পছন্দনীয় খাতে ব্যয় করতে) রূপগতা করে (যদিও খেয়াল-খুশী ও পাপ কাজে ব্যয় করতে মুক্তহস্ত থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে রূপগতার আদেশ দেয়। ( **الذِينَ** — ব্যাকরণিক কায়দায় **بدل**, কিন্তু এর উদ্দেশ্য

এরূপ নয় যে, শাস্তির আদেশ সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বরং প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাবের জন্য শাস্তির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে, এর সাথে অধিকাংশ মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটেই যায়—অহংকার, গর্ব, রূপগতা ইত্যাদি) যে ব্যক্তি (সত্য ধর্ম থেকে, যার এক শাখা আল্লাহর পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করে না। কারণ, তিনি (সকলের ইবাদত ও ধন-সম্পদ থেকে) অভাবমুক্ত, (এবং স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে) প্রশংসাহঁ।

## আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিশ্বয়

দু'টি পাখিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাস্থ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আশ্চর্যকার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে :

مَا آتَابَ مَنْ مَّيْبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ

مَا آتَابَ مَنْ مَّيْبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ  
— অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে

বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ  
— আয়াতের উদ্দেশ্য

এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাস্থ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবার করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে :  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ — অর্থাৎ আল্লাহ উদ্ধত ও অহং-

কারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘূর্ণা। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও

পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ  
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ  
بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়েনীতি, যাতে মানুষ ইনসাক প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাখিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (এই পুরকাল সংশোধনের জন্য) আমার রসূলগণকে স্পষ্ট বিধানাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (এতে বিশেষভাবে ন্যায়েনীতি যা বাস্তব হকের ব্যাপারে) ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (এতে স্বত্তা ও বাহ্যতা বর্জিত সমগ্র শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত আছে)। আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি (যাতে এর ভয়ে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হয়ে যায়) এবং (এছাড়া) মানুষের বহুবিধ উপকার। (সেমতে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি লৌহনির্মিত হয়ে থাকে। আরও এজন্য লৌহ সৃষ্টি করা হয়েছে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন কে (তাঁকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) সাহায্য করে। (কেননা, লৌহ জিহাদেও কাজে আসে। এটা লৌহার পারলৌকিক উপকার। জিহাদের নির্দেশ এজন্য নয় যে, তিনি এর মুখাপেক্ষী। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজে) শক্তিধর পরাক্রমশালী (বরং তোমাদের সওয়ালের জন্য এই নির্দেশ)।

#### জানুয়ারিক আতব্য বিষয়

এশী কিতাব ও পঙ্গবহর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ-

ইহাদের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে, যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য মো'জেযা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে।—(ইবনে কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাখিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ **بِهِنَان** বলে মো'জেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্য কিতাব নাখিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাখিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিকৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও 'মীযান'-এর অর্থে शामिल আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাখিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাখিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাখিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রাহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাখিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাখিল করা। কুরতুবী বলেন: প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাখিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাক-পদ্ধতিতে এর নমীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ: **أَنْزَلْنَا**

الْكِتَابَ وَوَضَعْنَا الْمِيزَانَ

আয়াত থেকেও **وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ** সূরা আর-রহমানের

এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে **مِيزَانَ** শব্দের সাথে **وَضَعَ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, নূহ (আ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাখিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাখিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাখিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুর্দশ জন্মদের বেলায়ও নাখিল

করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুর্দ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না—পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ—(রাহল মা'আনী)।

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আঙ্গাহর বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। দুই. এতে আঙ্গাহ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ** অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান' ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সন্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপর্যায়ত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীযানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-রুজির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَأَوْ لِيُوعِلَمَ اللَّهُ مِنْ بُنُورِهِ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহা বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ لِيُوعِلَمَ اللَّهُ—আল্লাহের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমজনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ

وَ الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ۝ ثُمَّ قَفَّيْنَا

عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ

۝ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً ۝

إِبْتِغَاءَ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

رِعَايَتِهَا، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ

فُسِقُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ

كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ۝

وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لِأَعْلَىٰ يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(২৬) আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সং পথ প্রাপ্ত হয়েছে



এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম-তনয় ইসাকে ও তাকে দিয়েছি ইজীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নক্ষত্রা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের পাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্রমা করবেন। আল্লাহ্ ক্রমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহর সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্রমতা নেই, দয়া আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (মানুষের এই পরকাল সংশোধনের জন্যই) নূহ ও ইবরাহীম (আ)-কে রসূল-রূপে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (অর্থাৎ তাদের বংশধরগণের মধ্যেও কতককে পয়গম্বর এবং কতককে কিতাবধারী করেছি)। অতঃপর (যাদের কাছে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন) তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [উপরোক্ত পয়গম্বরগণ স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিতাবধারীও ছিলেন; যেমন নূহ ও ইবরাহীম (আ) উভয়ের বংশধরের মধ্যে মুসা (আ) কেউ কেউ কিতাবধারী ছিলেন না, কিন্তু তাদের শরীয়ত স্বতন্ত্র ছিল; যেমন হূদ ও সালেহ (আ) মোটকথা, স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছি]। অতঃপর তাদের পশ্চাতে আরও রসূলগণকে (যারা স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন না) একের পর এক প্রেরণ করেছি [যেমন মুসা (আ)-র পর তওরাতে বিধানাবলী প্রয়োগ করার জন্য অনেক পয়গম্বর আগমন করেন] এবং তাদের অনুগামী করেছি (একজন স্বতন্ত্র শরীয়তধারী পয়গম্বরকে; অর্থাৎ) মরিয়ম-তনয় ইসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইজীল। (তার উশ্মতে দুই প্রকার লোক ছিল—তার অনুগামী ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী)। যারা অনুসরণ করেছিল (অর্থাৎ প্রথম প্রকার আমি তাদের অন্তরে (পারস্পরিক) স্নেহ ও মমতা (যা প্রশংসনীয় গুণ) সৃষ্টি করে দিয়েছি (যেমন সাহাবান্নে কিরাম সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে <sup>وَوَدَّعَيْنَا</sup> رَحْمَةً عَلَيْهِمْ <sup>وَعَلْمًا</sup> وَرَحْمَةً عَلَيْهِمْ) কিন্তু তাদের

শরীয়তে জিহাদ ছিল না বলে এর বিপরীতে <sup>وَأَقْبَلَتِ</sup> أَسَدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ <sup>وَأَقْبَلَتِ</sup> উল্লেখ করা হয়নি।

মোটকথা স্নেহ-মমতাই তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আমি তাদেরকে কেবল বিধানাবলী

পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু অনুসারীদের কেউ কেউ এমন ছিল যে) তারা নিজেরাই সম্মাসবাদ উদ্ভাবন করেছে। [বিবাহ এবং বৈধ ভোগ-বিলাস ও মেলামেশা ত্যাগ করা ই ছিল তাদের সম্মাসবাদের সারমর্ম। এটা উদ্ভাবনের কারণ ছিল এই যে, ইসা (আ)-র পর যখন খৃস্টানরা আঞ্জাহর বিধানাবলী পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে, তখন কিছুসংখ্যক সত্যপরায়ণ লোক নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করত। এটা প্রকৃতিপূজারীদের সহ্য করার কথা ছিল না। তাই তারা বাদশাহর কাছে অনুরোধ করল যে, এদেরকে আমাদের মতাবলম্বী হতে বাধ্য করা হোক। অতঃপর সত্যপরায়ণ লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা সম্মাসবাদ অবলম্বন করতে বাধ্য হন এবং সবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন প্রকাঠে বসে অথবা ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।—(দুররে-মনসুর) এখানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সম্মাসবাদ উদ্ভাবন করে।] আমি তাদের উপর এটা ক্রমশ করিনি, কিন্তু তারা আঞ্জাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য (ধর্মের হিকায়তের জন্য) এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা (অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই)। তা (অর্থাৎ সম্মাসবাদ) যথাযথভাবে পালন করেনি। [অর্থাৎ আঞ্জাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা এটা অবলম্বন করেছিল কিন্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি ভেমন যত্নবান হয়নি এবং বিধানাবলী পালন করেনি— কেবল দৃশ্যত সম্মাসবাদ প্রকাশ করেছে। এভাবে সম্মাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধানাবলী যথাযথ পালনকারী ও বিধানাবলীতে শৈথিল্যকারী। তাদের মধ্যে যারা রসুলুল্লাহ (সা)-র সমসাময়িক ছিল, তাদের জন্য রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বিধানাবলী পালনের একটি শর্ত ছিল। তার বিধানাবলী পালন করেছে। আর যারা এই শর্ত পালন করেনি, তারা যথাযথভাবে বিধানাবলী পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাদের মধ্যে যারা [রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি] বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) পুরস্কার দিয়েছি (কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম) এবং তাদের অধিকাংশ ছিল পাগাচারী। [তারা রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যেহেতু অধিকাংশই অবিবাসী ছিল।

তাই **فَمَا وَرَوَاهَا** বাক্যে যথাযথ পালন না করার বিষয়টি সবার সাথে সম্পর্কশূন্য করা হয়েছে। **فَمَا الَّذِينَ** তাদের কথা আদ্যাতের শেষে

**أَمْثَلُوا مِنْهُمْ** বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খৃস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিবাসী

দুই শ্রেণীরই উল্লেখ করা হয়। অতঃপর বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে : ) হে [ইসা (আ)-এ বিশ্বাসী] মু'মিনগণ, তোমরা আঞ্জাহকে ভয় কর এবং (এই ভয়ের দাবী অনুযায়ী) তাঁর রসুল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন (যেমন সূরা কাসাসে আছে **أَوْ لَأَنَّكَ يَكْفُرُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ** এবং)

তোমাদেরকে এমন জ্যোতি দেবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলাকারী করবে। (অর্থাৎ এমন ঈমান দেবেন যা এখান থেকে পূজসিরাতে পর্যন্ত সাথে থাকবে)। এবং তোমাদেরকে কমা

করবেন। (কারণ, ইসলাম গ্রহণ করলে কাফির থাকাকালীন সব গোনাহ মার্ফ হয়ে যায়) আল্লাহ্ ক্রমাশীল, দয়াময়। (এসব ধন তোমাদেরকে এজন্য দেবেন) যাতে (কিয়ামতের দিন) কিতাবধারীরা জেনে নেন যে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপর ও (রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত) তাদের কোন ক্রমতা নেই, (এবং আরও জেনে নেন যে) দয়া আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন (সেমতে তিনি মুসলমানদেরকে দান করেছেন)। আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অহমিকা যেন চূর্ণ হয়ে যায়। তারা বর্তমান অবস্থাতেও নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র ক্রমা ও দয়ার পাশ্চ মনে করে।

### আনুসঙ্গিক ভাষ্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পাখিব হিদায়ত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের অধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-র এবং পরে পয়গম্বরগণের প্রজ্ঞাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ)-র সেই শাখাকে এই পৌরব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছে এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا** অর্থাৎ এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-র উল্লেখ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **وَجَعَلْنَا**

**فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آيَةً وَرَحْمَةً** — অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ) অথবা ইজীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্মেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। **رَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ** শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে তিনমুখী করে উল্লেখ করার কেউ কেউ বলেন : **رَأْفَتِكَ** এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : কারণ প্রতি দয়া করার দৃষ্টি অভ্যাগত

কারণ থাকে। এক-সে কল্‌ট পতিত থাকলে তার কল্‌ট দূর করে দেওয়া। একে **رَأْفٌ** বলা হয়। দুই-কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে **رَحْمَةٌ** বলা হয়। মোটকথা **رَأْفٌ** এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং **رَحْمَةٌ** এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অপ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে **رَأْفَةٌ**-কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ)-র সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ **رَأْفَةٌ** ও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন রসুলুল্লাহ (সা)-র সাহাবায়ের কিরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্‌হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে **رَحِيمًا وَرَأْفَةً**

কিন্তু এর আগে সাহাবায়ের কিরামের আরও একটি বিশেষ গুণ **وَأَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ** বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কাফিরদের প্রতি বক্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আ)-র শরীয়তে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফিরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

**رَهْبَانِيَّةٌ—وَرَهْبَانِيَّةً نِ ابْتَدَعُوهَا :** জরুরী ব্যাখ্যা :

শব্দটি **رَهْبَان** এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। **رَهْبَان** এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ)-র পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইজ্রীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক শা'ঈ আলাম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হল। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা দেখলেন যে, মুকারিলার শক্তি তাদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দেবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাবাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তাঁরা **رَاهِب** অথবা **رَهْبَان** তথা সম্মাসী নামে অভিহিত হত এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ **رَهْبَانِيَّة** তথা সম্মাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হিফায়তের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আলাহর জন্য নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণত মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সম্মাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে মায় এরং হাদিয়া ও নযর-নিয়াম আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াগণা ও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেলাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আলাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও তিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-র হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বলিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (রা) বলেন : বনী ইসরাঈল বাহাউর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ইসা (আ)-র পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে কাছে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দশায়মান হয়। তাদের মুকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত ঘারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আলাহর সমস্তিট লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের আকদাম আসে। তাদের মধ্যে মুকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেহে নেন এবং সম্মাসী হয়ে যায়। আলাহ তা'আলা **وَرَهَبًا نُوءِنَ اٰبَدًا**

عَوَّاهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ

আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সম্মাসবাদ অবলম্বন করে তা স্বাধিকভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সম্মাসবাদ প্রথমে

তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিজে কোরআন গোটা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সম্মাস্বাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল তা যথাযথ পালন করেনি—**فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا**

এ থেকে আরও জানা গেল যে, **بَدَعُوا** শব্দটি থেকে উদ্ভূত হলোও

এ স্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে **كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ** অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন :

—**وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً**

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন : আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সম্মাস্বাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সম্মাস্বাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সম্মাস্বাদকে সর্বাবস্থায় দৃশ্যময় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে

**رَهْبَانِيَّةً** শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিজে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে **رَهْبَانِيَّةً** শব্দের আগে **بَدَعُوا** বাক্যটি উহা আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সম্মাস্বাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও **بَدَعُوا** শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিজেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপ সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ'আতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর পুর্বেক্ত হাদীসেও সম্মাস্বাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ'আতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সম্মতবাদ সর্বাধিকারই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ : বিতর্ক কথা এই যে, **رَهْبَانِيَّة** শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। এক. কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সম্মতবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কোরআন পাকের

**مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ** আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা

ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে **لَا تَكْفُرُوا** শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

দুই. অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন পাখিব কিংবা ধার্মিক প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পাখিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাদির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভরুপে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত খিঠা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সুফী ব্যুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সম্মতবাদ নয়; বরং তাকওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেরী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

তিন. কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা-রসুলুল্লাহ (স)-র অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে **لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ** অর্থাৎ ইসলামে সম্মতবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাইলের মধ্যে প্রথমে যে সম্মতবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হিফাযতের প্রয়োজনে হলে তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাঁখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ  
 رَحْمَتِهِ—এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মু'মিনগণকে

সম্বোধন করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন

করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বেলায় 'আহলে-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মুসা (আ) ও ঈসা (আ)-র প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ

রীতির বিপরীতে খৃষ্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্ভবত এর কারণ এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিগত বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে বিশুণ পুরস্কার ও সওয়ারি দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়ারি হযরত মুসা (আ) অথবা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়ারি শেষ নবী (সা)-র প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফির ছিল এবং কাফিরদের কোন ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই কেবল যাক্বিল যে, বিগত শরীফতানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফির মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফির অবস্থায় কৃত সব সৎ কর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়ারির অধিকারী হয়।

لَا الَّذِينَ يَلْمِزُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

উল্লিখিত বিধানাবলী এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহর কৃপা লাভে সমর্থ হবে।



سورة المجادلة

मज्जा मुक़ादामा

मदीनान्न अवतारनः २२ आयत, ७ रुकू

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِكَ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ

مَنْ نَسَأَ بِهِمْ مَا لَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا إِلَىٰ وِلْدَانِهِمْ ۚ وَإِنَّهُمْ

لَيَقُولُونَ مُضْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ

يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْمِزُ رَبَّةٌ مِنْ

قَبْلِ أَنْ يُنْكَأَ شَاءَ ذَلِكَ ۚ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْكَأَ شَاءَ فَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَطْعَامُ سِتِّينَ وَسِكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتَلَا

حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

كَبِتُوا كَمَا كَبَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ

عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ

أَخْصَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর

কাছে অভিযোগ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উত্তরের কথা-  
বার্তা শুনে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনে, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে  
যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা  
কেবল তারাষ্ট, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই  
বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, রুমানীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে  
ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার কর, তাদের কাঙ্ক্ষারা এইঃ একে অপরকে  
স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ  
ধবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার  
পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে  
আহার করাবে। এটা এজনা, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন  
কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক  
শাস্তি। (৫) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন  
অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আল্লাতসমূহ নাখিল করেছি। আর  
কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ  
তাদের সকলকে পুনরুদ্ভূত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত।  
আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত আছে  
সব বস্তু।

অবতরণের হেতু : একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত  
অবতরণের হেতু। হযরত আউস ইবনে সামিত (রা) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে  
দিলেন : **أنت على ظهراً** অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের  
ন্যায়, মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম করার জন্য স্ত্রীকে  
বলা হত, যা চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা)  
শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত  
এই বিষয় সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে  
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন : **ما أراي إلا قد حرمت علوة**

অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে  
বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন : আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃসংশয় করেছি।  
এখন স্বার্থকে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও  
আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়াজেতে খাওলায় এ উক্তি স্বপিত  
আছে : **ما زكراً قاً** অর্থাৎ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতা-  
বস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়াজেতে আছে, খাওলা আল্লাহ তাঁ'আলার  
কাছে ফরিয়াদ করলেন : **اللهم انى أشكوا الوك** অর্থাৎ আল্লাহ! আমি তোমার  
কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়াজেতে আছে রসুলুল্লাহ (সা) খাওলাকে একথা বললেন :

ما امرت في شأنك بشئى حتى الان অর্থাৎ তোমার মাস'আলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়াজে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(দুরনে-মনসুর, ইবনে কাসীর) ফিকহর পরিভাষায় এই বিশেষ মাস'আলাটিকে 'জিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে জিহারের শরীয়াতসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাওলা (রা)-র ফরিয়াদ শুনে তার জন্য তার সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল : আপনি এই যুদ্ধের খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন : জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকালের উপরে শুনেছেন। অতএব আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্ কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রান্নি পর্যন্ত তাঁর সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।—(ইবনে কাসীর)

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে নারী তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল (এবং বলছিল :

ما نكحنا

অর্থাৎ সে তো তাজাক উচ্চারণ করেনি। অতএব আমি কিরাণে হারাম হয়ে গেলাম?) এবং (নিজের দুঃখ ও কষ্টের জন্য) আল্লাহ্ কাছে ফরিয়াদ করছিল (এবং বলছিল : اللهم انى اشكوا اليك) আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনে, সবকিছু দেখেন। (অতএব তার কথা শুনেবেন না কেন? 'আল্লাহ্ শুনেছেন' কথার উদ্দেশ্য এই নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং তার অক্ষমতা মেনে নেওয়া আল্লাহ্ জন্য প্রবণ সপ্রমাণ করা নয়)। তে'মাদের মধ্যে যারা তাদের স্বীগণের সাথে জিহার করে (এবং أنت

علي

বলে দেয়) সেই স্বীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তাঁরাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। (তাই এই কথা বলার কারণে এই মহিলারা তাদের মাতা হয়ে যাননি যে, চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। চিরতরে হারাম হওয়ার অন্য কোন দলীলভিত্তিক কারণও নেই। অতএব তারা চিরতরে হারাম হবে না)। তারা (অর্থাৎ যারা স্বীগণকে মাতা বলে দেয়) নিঃসন্দেহে অসম্মত ও মিথ্যা কথাই বলে। (তাই পাপ অবশ্যই হবে। এই পাপের ক্ষতিপূরণ করে দিলে তা মাফও হয়ে যাবে। কেননা) আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (অতঃপর এই ক্ষতিপূরণের কতক উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে :) যারা তাদের স্বীগণের সাথে জিহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে (অর্থাৎ স্বী হারাম হোক এটা ঠিক না) তাদের কাফ্কারা এই : (স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে) একে অপরের

স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। এটা (অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান) তোমাদের জন্য উপদেশ হবে; (কাফ্ফারা যারা গোনাহ্ মার্জনা ছাড়া এই উপকারও হস্ত হযে, ডবিষ্যতের জন্য তোমরা সতর্ক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সব ক্রিয়াকর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কাফ্ফারা সম্পর্কিত আদেশ তোমরা পুনোপুরি পালন কর কিনা, তা তিনি জানেন।

সূতরাং কাফ্ফারার রহস্য দুটি। এক. পাপ মার্জনা, যার প্রতি عَفْوٌ غُفُورٌ এ

ইঙ্গিত আছে, দুই. সতর্ককরণ, যা تُرُصُّونَ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। তিন প্রকার কাফ্ফারার মধ্যেই এই দ্বিতীয় রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু দাস মুক্ত করাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণে একে এর সাথে বলে দেওয়া হয়েছে। যার এ সামর্থ্য নেই (অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয়) সে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পরস্পরে মেলামেশা করার পূর্বে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম সে ষাউজন মিসকীনকে আহার করাবে। (অতঃপর এই বিধান যে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখতা যুগের প্রাচীন প্রথাকে উচ্ছেদ করা। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) এটা এজন্য (বর্ণিত হয়েছে), যাতে (এই বিধান সম্পর্কিত উপযোগিতাসমূহ অর্জন করা ছাড়াও) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (অর্থাৎ এই বিধানের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যবাদী মনে কর। অতঃপর আরও তাকীদ করার জন্য ইরশাদ হচ্ছেঃ) এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি)। কাফিরদের জন্য (যারা এসব বিধান মানে না) মজ্জাদাতক শাস্তি রয়েছে। (যারা আদেশ পালনে ছুটি করে, তাদের জন্যও সাধারণ শাস্তি হতে পারে। শুধু এই বিধানেরই বিশেষত্ব নেই, বরং) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে যে কোন বিধানে করুক, যেমন মজ্জার কাফির সম্প্রদায়) তারা (দুনিয়াতেও) লাঞ্চিত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা লাঞ্চিত হয়েছে। (সেমতে একাধিক যুক্তি এটা হয়েছে। শাস্তি কেন হবে না? কারণ) আমি সুস্পষ্ট বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি। (অতএব এগুলো না মানা অবশ্যই শাস্তির কারণ। এ শাস্তি দুনিয়াতে হবে) আর কাফিরদের জন্য (পরকালেও) অপমানজনক শাস্তি আছে (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুস্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (প্রকৃতই কিংবা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ সব বস্তু সম্পর্কে অবগত। (তাদের ক্রিয়াকর্ম হোক কিংবা অন্য কিছু)।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ—পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন

হযরত আউস ইবনে সামেত (রা)-র স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে জিহাদ করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূল করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাখিল করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল জিহাদের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেন নি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য গুরুত্বই বলে দিলেন : যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা বারবার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই **مَعْرُورَةٌ** বলা হয়েছে। কতক রেওয়াজে আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে খাওয়াকে বললেন : তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান নাখিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হল : আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাখিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এরপর খাওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কর্নিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাখিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের আওয়াজ শুনলেন; খাওয়াকে বিনতে সা'লাবা যখন রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনেতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন : **قَدْ سَمِعَ اللَّهُ**—(বুখারী, ইবনে কাসীর)

থেকে **ظَهَرَ** শব্দটি **الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ**—**الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ**

উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে **ظَهَرَ** বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই : স্বামী স্ত্রীকে বলে দেবে—

**انت على كظهر امي** অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভাষিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

জিহাদের সংজ্ঞা ও বিধান : শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের সংজ্ঞা এই : আপন স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যা দেখা তার জন্য নাজায়েয। মাতার পৃষ্ঠদেশও এক দৃষ্টান্ত। মূর্খতা যুগে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত এবং তাল্লাক শব্দ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করা হত। কারণ তাল্লাকের পর প্রত্যাহার অথবা পুনবিবাহের মাধ্যমে আবার স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জিহাদ করলে মূর্খতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তাদের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রকার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে, প্রথমত স্বয়ং জিহাদের প্রত্যেকেই অবৈধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পস্থা হচ্ছে তাল্লাক। সেটা অবলম্বন করা

দরকার। জিহাদের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, স্ত্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَّهُمْ

অর্থঃ তাদের এই অসার উক্তি কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই, যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে : এরপর বলেছে : **وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** অর্থঃ তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলাছে।

বিতর্কিত সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মুর্থ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না। বরং তাকে জর্দি-মানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রাশ-শিচত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

অর্থ তাই। এখানে **عَمَّا قَالُوا** শব্দটি **لِمَا قَالُوا** শব্দের অর্থে ব্যাহত হয়েছে। অর্থঃ

তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) **يَعُودُونَ** শব্দের অর্থ করেন **يُنْهَوْنَ**—অর্থঃ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়।—(মাহহারী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ জিহাদের কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং জিহাদের করা এমন গোনাহ, যার কাফ্ফারা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে

**إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ** বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি

জিহাদের পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা না-জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদায়তে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

**فَتَحَرَّ يَوْمَ تَوُودَ**—অর্থঃ জিহাদের কাফ্ফারা এই স্ত্রী, একজন দাস অথবা

দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশত অতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে আহার कराবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে জন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দুসের গম।

জিহানের বিস্তারিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহর কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আয়াতসমূহে জিহানের বিধান অবতীর্ণ হল তখন রসূলুলাহ (সা) তার স্বামীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন রুজলোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিতে বললেন : একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বলল : একজন দাস ক্রয় করে মুক্ত করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেন : তা হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখ। সে বলল : সেই আলাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন—আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দুতিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেন : তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরম্ভ করল : আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সামর্থ্যও আমার নেই। অগত্যা রসূলুলাহ (সা) তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকীনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো।—(ইবনে কাসীর)

ذٰلِكَ لَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْتُمْ كٰفِرِيْنَ وَاَنْتُمْ كٰفِرِيْنَ  
عٰذَا بِلّٰهِم

—এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়াত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো

হয়েছে। বলা হয়েছে : কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আলাহর নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ভিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, জিহাদ ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্ততা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুমম ও বিস্কপ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফির, তাদের জন্য স্বপ্নাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُعٰدُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ كُفِرُوْا كَمَا كُفِرَتِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

—পূর্ববর্তী আয়াতে আলাহর সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার

তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পাখিব ল্লাহুনা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْمَاةُ اللّٰهِ وَنَسُوَةٌ

—এতে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে

পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আত্মাহুঁর কাছে লিখিত আছে। আত্মাহুঁ তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন্য আশাব হবে।

الْمُرْتَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى  
 ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ  
 وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ الْمُرْتَانِ الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ  
 يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ  
 وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحِبِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ  
 لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا، فَيَسَّ الْمَصِيدُ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ نَجْوَىٰكُمْ  
 صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ



رَحِيمٌ ۝ اَسْفَقْتُمْ اَنْ تَقْرَبُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ وَاِذْ لَمْ  
تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا اللّٰهَ  
وَرَسُوْلَهُ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেন নি, যাদেরকে কানাঘুসা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাগাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুসা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যন্ত্রণা আলাহ আপনাকে সালাম করেন নি। তারা মনে মনে বলে : আমরা যা বলি, তখন আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই জায়গা! (৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাগাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ'তীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহকে ডয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুসা তো শয়তানের কাজ; মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ'র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মু'মিনদের উচিত আল্লাহ'র উপর ভরসা করা। (১১) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় : মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। যখন বলা হয় : উঠে যাও তখন উঠে যেকো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্খাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদ্কা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য প্রেম ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদ্কা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কামেম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

শানে-নুযুল : উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। এক ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শাস্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে

দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিকল্পিত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসুলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরাপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ الْخِ অস্বাভাবিক হয়।

দুই. মুনাফিকরাও এমনভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে  
إِذَا تَنَّا جَهْتُمْ فَلَا تَنَّا جَوًا অস্বাভাবিক হয়। তিন. ইহুদীরা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র

কাছে উপস্থিত হলে দুশ্চিন্তামির হলে <sup>أَسْلَمَ</sup> <sup>عَلَيْكُمْ</sup> বলার পরিবর্তে <sup>أَسْلَمَ</sup> <sup>عَلَيْكُمْ</sup> বলত। <sup>أَسْلَمَ</sup> শব্দের অর্থ মুত্যা। চার. মুনাফিকরাও এমনভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে <sup>وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ الْخِ</sup> অস্বাভাবিক হয়। ইবনে কাসীর ইমাম আহমদ (র) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত :

لَوْلَا يَعِدُّ بِنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ—অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ

আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? পাঁচ. একবার রসুলুল্লাহ্ (সা) সুফফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রসুলুল্লাহ্ (সা) এই নিবিচার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসুলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন : আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে <sup>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْخِ</sup> অস্বাভাবিক হয়।

—(ইবনে কাসীর) রেওয়াজেতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপূত হয়নি। ছয়. কোন কোন বিতর্কালী লোক রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছেও ধনীদের দীর্ঘকাল বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে <sup>إِذَا فَآ جَهْتُمْ الرَّسُولَ الْخِ</sup>

আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে : ইহদী ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা

إِذَا نَا جَهْتُمْ<sup>١</sup>  
نَهَوْنَا عَنْهُ<sup>٢</sup> বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হন না, তখন

الرَّسُولِ الْخَيْخِ<sup>٣</sup> আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।

সাত. যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে أَأَشْفَقْتُمُ الْخَيْخِ<sup>٤</sup> আয়াত নামিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (র) বলেন : সদকা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَان لَمْ تَجِدُوا<sup>٥</sup> আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিভ্রাটও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবত তাদের জন্যই সদকা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা-বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তারা কানকথা বলা বন্ধ করেছিল।—(সবগুলো রেওয়াজেই দূররে-মনসুরে বর্ণিত আছে)। অবতরণের এসব ছেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তকসীর বোঝা সহজ হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

### তকসীরের সান্ন-সংক্ষেপ

আপনি কি এ বিষয়ে ভেবে দেখেন নি (নিষিদ্ধ কানাঘুসা থেকে যারা বিরত হত না, এখানে তাদেরকে শোনানোই উদ্দেশ্য) যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন। (তাদের কানাকানিও এই 'সবকিছু'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)। তিন ব্যক্তির এমন কোন কানাকানি হয় না, যাতে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম (যেমন দুই অথবা চারজন) হোক বা বেশী (যেমন ছয় অথবা সাতজন) হোক, তিনি (সর্বাবস্থায়) তাদের সাথে থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে বলে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এই আয়াতের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে পরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর ভূমিকা। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা মিথ্যা কানাকানি করে তারা আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহ্ সব খবর রাখেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে :) আপনি কি তাদের বিষয় ভেবে দেখেন নি এবং তাদেরকে কানাঘুসা করতে নিষেধ করা

হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাকানি করে। (অর্থাৎ তাদের কানাকানি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে গোনাহ্ এবং মুসলমানদেরকে দুঃখিত করার উদ্দেশ্য থাকার কারণে জুলুম এবং রসূলের নিষেধ করার কারণে রসূলের অবাধ্যতাও; যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। তারা যখন আপনাদের কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে যশ্ভারা আলাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। (অর্থাৎ আলাহ্ তা'আলার ভাষা তো এরূপঃ

এবং **سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ اصْطَفَى**

অর্থঃ আপনার **السَّلَامُ عَلَيْكَ** আর তারা বলে : **صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**

মৃত্যু হোক) তারা মনে মনে (অথবা পরস্পরে) বলে : (সে পয়গম্বর হলে) আমরা যা বলি (যাতে তার প্রতি পরিষ্কার খুঁটতী প্রদর্শন করা হয়) তজ্জন্য আলাহ্ আমাদেরকে (তাৎ-কালিক) শাস্তি দেন না কেন? (তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনায় এর বর্ণনা আছে। অতঃপর তাদের এই দুঃখের জন্য শাস্তিবাদী এবং এই উজির জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে তাৎকালিক শাস্তি না হলে সর্বাবস্থায় শাস্তি না হওয়া জরুরী হয় না)। জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট (শাস্তি)। তারা তাতে (অবশ্যই) প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা! (অতঃপর মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এতে মুনাফিকদের অনুরূপ কাজ করতে তাদেরকেও নিষেধ করা হয়েছে এবং মুনাফিকদেরকেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা মুখে ঈমান দাবী কর, অতএব ঈমান অনুযায়ী কাজ করা তোমাদের উচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমরা (কোন প্রয়োজনে) কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আলাহুতীতির বিষয়ে কানাকানি কর। ( **عدوان** শব্দটি এর বিপরীত। এর অর্থ অনুগ্রহ, যার উপকার অন্যো পায়। **معصية الرسول** অর্থাৎ রসূলের অবাধ্যতার বিপরীত)। আলাহুকে ভয় কর যার কাছে তোমরা সমবেত হও এই কানাকানি তো কেবল শয়তানের (প্ররোচনামূলক) কাজ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য (যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে)। তবে আলাহুর ইচ্ছা ব্যতীত যে তাদের (মুসলমানদের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (এটা মুসলমানদের জন্য সাস্থনা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি শয়তানের প্ররোচনায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেও তবুও আলাহুর ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব চিন্তা কিসের?) মু'মিনদের উচিত (প্রত্যেক কর্মে) আলাহুর উপরই ভরসা করা। (অতঃপর পঞ্চম ঘটনা অর্থাৎ মজলিসে কিছু লোক পরে আগমন করলে তাদের জন্য জায়গা খালি করে দেওয়ার আদেশ বর্ণিত হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ [ অর্থাৎ রসূলুজ্জাহ্ (সাঁ) বলেন অথবা পদস্থ ও গণ্যমান্য লোকগণ বলেন ] মজলিসে জায়গা করে দাও (যাতে পরে আগমনকারীও জায়গা পায়), তখন তোমরা জায়গা করে দিও; আলাহ্ তোমাদেরকে (জায়গাতে) প্রশস্ত জায়গা দেবেন।

যখন (কোন প্রয়োজনে) বলা হয় : (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেনো (তা আগমনকারীকে জায়গা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হোক কিংবা সভাপতির কোন বিশেষ পরামর্শ, আরাম কিংবা ইবাদত ইত্যাদির কারণে নির্জনতার প্রয়োজনে বলা হোক, যা নির্জনতা ব্যতীত অজিত হতে পারে না বা পূর্ণ হতে পারে না। মোটকথা, সভাপতির আদেশ হলে উঠে যাওয়া উচিত। রসূল নয়—এমন ব্যক্তির বেলায়ও এই নির্দেশ ব্যাপক। সুতরাং প্রয়োজনের সময় কাউকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ জারি করার অধিকার সভাপতির আছে। তবে যে ব্যক্তি পরে মজলিসে আসে, তার এরূপ অধিকার নেই যে, কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসে যাবে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মোট কথা, আয়াতে সভাপতির আদেশে উঠে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। আলাহ তা'আলা (এই বিধান পালনের কারণে) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং (তাদের মধ্যে যারা ধর্মের) জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের (পারলৌকিক) মর্যাদা (আরও অধিক) উচ্চ করে দেবেন। (অর্থাৎ এই বিধান পালনকারীগণ তিন প্রকার। এক. কাফির—যারা পাথিব উপকারার্থে মেনে নেবে, যেমন মুনাফিকরাও তাই করবে। **مفكم** শব্দের কারণে তারা এই ওয়াদার আওতা থেকে বের হয়ে গেছে। দুই. জ্ঞানপ্রাপ্ত নয়, এমন মু'মিনগণ। তাদের মর্যাদাই কেবল উচ্চ করা হবে। তিন. জ্ঞানপ্রাপ্ত মু'মিনগণ, তাদের মর্যাদা আরও অধিক উচ্চ করা হবে। কেননা, জ্ঞানের কারণে তাদের কর্ম অধিক ভীতিপূর্ণ ও অধিক আন্তরিক। এর ফলে কর্মের সওয়াব বেড়ে যায়।) আলাহ তা'আলা তোমাদের সব কর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কার কর্ম ঈমানসহ এবং কার কর্ম ঈমান ব্যতীত, কার কর্মে আন্তরিকতা কম এবং কার কর্মে আন্তরিকতা বেশী, তা সবই তিনি জানেন। তাই প্রত্যেকের প্রতিদানে পার্থক্য রেখেছেন। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সংযুক্ত ষষ্ঠ ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছে : ) মু'মিনগণ, তোমরা যখন রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাও, তখন কানকথা বলার পূর্বে কিছু সদকা (ফকীর-মিসকীনকে) প্রদান করবে। (এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখ নেই। হাদীসে বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত পরিমাণ অনির্দিষ্ট হলেও তা উল্লেখযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।) এটা তোমাদের জন্য (সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) শ্রেয়ঃ এবং (গোনাহ থেকে) পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। (কেননা, ইবাদত গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।) বিত্তশালী মু'মিনদের বেলায় এই উপকারিতা। নিঃস্ব মু'মিনদের বেলায় উপযোগিতা এই যে, তারা আর্থিক উপকার লাভ করবে। 'সদকা' শব্দ থেকে তা জানা যায়। কেননা, সদকা নিঃস্বদের খাতেই ব্যয়িত হয়। রসূলুল্লাহ (স)-র বেলায় উপযোগিতা এই যে, এতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি আছে এবং মুনাফিকদের কানাকানির ফলে তিনি যে কষ্ট অনুভব করতেন, তা থেকে মুক্তি আছে। কেননা, কানাকানির প্রয়োজন তাদের ছিল না, অতএব বিনা-প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। সম্ভবত প্রকাশ্যে সদকা করার আদেশ ছিল, যাতে সদকা প্রদান না করে কেউ ধোঁকা দিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এই আদেশ সামর্থ্যবানদের জন্য : ) অতঃপর যদি তোমরা সদকা প্রদান করতে সক্ষম না হও, (এবং কানাকানির প্রয়োজন থাকে) তবে আলাহ ক্রমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আদেশটি ওয়াজিব ছিল, কিন্তু অক্ষমতার অবস্থা ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল। অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনার সাথে সংযুক্ত সপ্তম ঘটনা

সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে : ) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে ? তোমরা যখন তা পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, (আদেশটি সম্পূর্ণ রহিত করে মাফ করে দিলেন। কারণ, যে উপযোগিতার কারণে আদেশটি ওয়াজিব হয়েছিল, তা অর্জিত হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ যখন মাফ করে দিলেন) তখন তোমরা (অন্যান্য ইবাদত পালন কর, অর্থাৎ) নামায ক্বায়ম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য কর। (উদ্দেশ্য এই যে, এই আদেশ রহিত হওয়ার পর তোমাদের নৈকট্য লাভ ও মুজিব জন্য অন্যান্য বিধান পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শনই মথেষ্ট)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের (এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন।

### আনুযায়িক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুমুলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আক্বায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক জেনদেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : গোপন পরামর্শ সাধারণত বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, প্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনে, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিনজনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে নাও যে, চতুর্থ জন আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচজনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহর কাছে বেজোড় সংখ্যা গহমণীয়া। مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا**

عَنِ النَّجْوَى — শানে মুশ্বলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহদী ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে

শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক খারগা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্ভিন্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন।

نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যম্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَا جَارِجَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ  
فَإِنْ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ -

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত হও, সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুব্ধ হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাবে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।—(মাহহারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَا جَهْتُمْ فَلَا تَتَنَا جَوًّا بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَمَعْمِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَا جَوًّا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল। আনোচা আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানাকানির মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়তবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে, বরং সংকাজের জন্যই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফিররা দুশ্চিন্তি করলেও নব্ব ও উন্নতসুলত প্রতিরোধের নির্দেশ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

ইহাদী ও মুনাফিকদের এই দুষ্টুমি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে **السَّامِ عَلَيْهِمُ** বলার পরিবর্তে **السَّلَامُ عَلَيْهِمُ** বলত। **السَّامِ** শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র উপস্থিতিতে যখন তারা **السَّامِ عَلَيْهِمُ** বলল, তখন হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন : **السَّامِ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمُ**

অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশপ্ত ও আচ্ছাদিত গমবে পতিত হও। রসুলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে এরূপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বললেন : আচ্ছাদিত তা'আলা অস্বীকার কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কিছুকথা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা) আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি কি শুনে ননি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছি : **عَلَيْكُمْ** অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং আমার দোয়া কবুল হবে। কাজেই তাদের দুষ্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে।—(মাযহারী)

মজলিসের কতিপয় শিল্পাচার : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا**

**فِي الْمَجَالِسِ فَانْفِسُوا** মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দেবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আচ্ছাদিত তা'আলা তাদের জন্য প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিল্পাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই : **إِذَا قِيلَ**

**لَكُمْ أَنْ تَفَسَّحُوا فَانْفِسُوا**—অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে

বলা হয়, তখন উঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্য জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **لَا يَقُومُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلَسَةٍ فَيَجْلِسُ فِيهَا وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا**



অর্থাৎ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগম্বকদের জন্য জায়গা করে দাও।—(বুখারী, মুসল্লিম, মসনদে আহমদ, ইবনে কাসীর)

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগম্বকের জন্য জায়েয নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই : যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের নিষ্টাচার। কারণ, মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোন প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায়, কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায়, কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরাপ থাকতে পারে যে, কিছু জানাশোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগম্বকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরকে উঠানো হবে, তারা হয়ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা এই : রসূলুল্লাহ (স) সুফ্বা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রসূলুল্লাহ (স) প্রথমে সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোন-কোন সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হামির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্লতিকর ছিল না। অথবা রসূলুল্লাহ (স) যখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি নিষ্টা-চার জানা গেল। এক. মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপস্থিত লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে যাবে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগম্বকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জায়গা না পেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর প্রশংসা করেন।

মাস'আলা : মজলিসের অন্যতম নিষ্টাচার এই যে, দুই উপস্থিত ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা, তাদের একত্রে বসার মধ্যে কোন বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত ওসামা ইবনে হায়েদ (রা) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (স) বলেন :

لا يحل لرجل أن يفرق

بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بَأْزَ نَهْمَا অর্থাৎ একত্রে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।—(ইবনে কাসীর)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ

জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সম্মত দিতেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কল্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুশ্টুমিও शामिल হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূলুল্লাহ (সা)-র এই বোঝা হালকা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলী (রা) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি : আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা) প্রায়ই বলতেন : কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—(ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু এর ঈঙ্গিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহক্বতের তাকীদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফিকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

الْمُرْتَابِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْكُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ إِتَّخَذُوا آيْمَانَهُمْ جُنَّةً  
 فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ لَنْ تَغْنِي  
 عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا  
 يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝  
 اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ  
 حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
 فِي الْأَذَلِّينَ ۝ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝  
 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ  
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ  
 اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যারা আল্লাহর গণ্যে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেওনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে চাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে, অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরাবিষ্কার করবেন, অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সংগে গণ্য হয়েছিল। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শরতান তাদেরকে বন্দীকৃত করে

নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ডুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই মাহ্দিতদের দলভুক্ত। (২১) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন—আমি এবং আমার রসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌তে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথ্য চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি (অর্থাৎ মুনাফিকদের প্রতি) যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত (অর্থাৎ ইহদী ও কাফির) সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? (মুনাফিকরা ইহদী ছিল, তাই তাদের বন্ধুত্ব ইহদীদের সাথে এবং কাফিরদের সাথেও সুবিদিত ছিল)। তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা পুরোপুরি) মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং (পুরোপুরি) তাদের (অর্থাৎ ইহদীদেরও) দলভুক্ত নয়। (বরং তারা বাহ্যত তোমাদের সাথে আছে এবং বিশ্বাসগতভাবে কাফিরদের সাথে আছে)। তারা মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (অর্থাৎ শপথ

করে বলে যে, তারা মুসলমান; যেমন অন্য আয়াতে আছে : **وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ**

**أَنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ**

এবং নিজেরাও জানে (যে, তারা মিথ্যাবাদী। অতঃপর তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (কারণ) নিশ্চিতই তারা যা করে, খুবই মন্দ। (কুফর ও নিকাক থেকে মন্দ কাজ আর কি হবে? এসব মন্দ কাজের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এই যে) তারা তাদের (এসব মিথ্যা) শপথকে (আম্বরকার জন্য) চাল করে রেখেছে, (যাতে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান মনে করে এবং জান ও মালের ক্ষতি না করে) অতঃপর তারা (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ ধর্ম) থেকে নিরত্ত রাখে (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করে), অতএব (এ কারণে) তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (অর্থাৎ শাস্তি যেমন কঠোর হবে, তেমনি অপমানজনকও হবে। যখন এই শাস্তি শুরু হবে, তখন) আল্লাহ্‌র কবল (অর্থাৎ আশ্রয়) থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেই কঠোর ও অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম)। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে (অন্যান্য সৃষ্ট জীবসহ) পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনেও

(মিথ্যা) শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে (মুশরিকদের মিথ্যা শপথ

কোরআনের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : **وَ اللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ** এবং তারা

মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। (কাজেই মিথ্যা শপথের বদৌলতে বেঁচে থাকে)। সাবধান, ওরাই তো মিথ্যাবাদী। (কারণ, ওরা আল্লাহর সামনেও মিথ্যা বলতে বিধা করেনি। ওদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কারণ এই যে) শয়তান তাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে (ফলে তারা এখন শয়তানের কথামতই কাজ করছে) অতঃপর আল্লাহর সমরণ জুলিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ তারা তাঁর বিধি-বিধান ত্যাগ করে বসেছে। বাস্তবিকই) তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই বরবাদ হবে; (পরকালে তো অবশ্যই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও। তাদের এই অবস্থা কেন হবে না, তারা তো আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী। নীতি এই যে) যারা আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই (আল্লাহর কাছে) লাজ্জিতদের দলভুক্ত। (আল্লাহর কাছে যখন তারা লাজ্জিত, তখন উপ-রোক্ত পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যেমন লাজ্জনা অবধারিত করে রেখেছেন, তেমনই অনুগতদের জন্য সম্মান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসুলগণের অনুসারী)। আল্লাহ তা'আলা (আদি নির্দেশনামায়) লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসুলগণ বিজয়ী হব। (এটাই সম্মানের স্বরূপ। এখানে রসুলগণের বিজয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য; কিন্তু রসুলগণের সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা নিজেকেও জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং রসুলগণ যখন সম্মানিত, তখন তাঁদের অনুসারীগণও সম্মানিত। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সূরা মায়দা ও সূরা মু'মিনে বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শক্তিশ্বর, পরাক্রমশালী। (তাই তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। অতঃপর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে মুনাফিকদের বিপরীতে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে : ) যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে (পুরোপুরি) বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ভাতি গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের (অন্তরকে) শক্তিশালী করেছেন স্বীয় ফরমান দ্বারা ('ফয়য' বলে নূর বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হিদায়ত

অনুযায়ী বাহ্যিক কর্ম এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি। **فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رُّبِّي** আয়াতে এই

নূরই উল্লিখিত হয়েছে। এই নূর অর্থগত জীবনের কারণ। তাই একে রূহ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মু'মিনগণ এই সম্পদ দুনিয়াতে লাভ করবে এবং পরকালে) তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। তারা শুধায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেন্নে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে, (যেমন অন্য আয়াতে **أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى**

**أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** এরপর **مِّن رَّبِّهِمْ** বলা হয়েছে)।

আনুশঙ্গিক ভ্রাতব্য বিশ্বয়

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا تَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ

তা'আলা সেসব লোকের পুনরহা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আলাহর শত্রু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহদী, খৃস্টান অথবা অন্য যে-কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিপূর্ণভাবে সম্ভব-পরও নয়। কেননা, মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আলাহর মহক্বত। কাফির আলাহর দূশমন। যার অন্তরে কাল ও প্রতি সত্যিকার মহক্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহক্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফিরদের সাথে সন্ধ্যাবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফিরদের সাথেও করা জায়েয। রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কান্নবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্য ক্রটিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যও ক্রটিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِّبِ — কোন কোন রেওয়াজে আছে, এই আয়াত

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইহ ও আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসুলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন : এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিচুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ, দেহাবয়ব বেঁটে, গোশুম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা মশরুফমণ্ডিত। রসুলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন ? সে শপথ করে বলল : আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আলাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

لَا تَجِدُ قَوْمًا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ

প্রথম আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আলাহর গম্ব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের

অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আলাহর শত্রু অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফির তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবারই এই অবস্থা ছিল। এ স্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসুলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী আবদুল্লাহ (রা)-র সামনে তাঁর মূনাফিক পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। তিনি উৎকণ্ঠাৎ রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবু বকর (রা)-এর সামনে তাঁর পিতা আবু কোহাফা রসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কিছু ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবু বকর (রা) ক্রোধাক্রমে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবু কোহাফা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর শুনে রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : উবিষ্যতে এরূপ করো না। হযরত আবু ওবায়দা (রা)-র পিতা জাররাহ ওহদ যুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বারবার হযরত আবু ওবায়দা (রা)-র সামনে আসত কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হল না এবং পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবু ওবায়দা (রা) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম কতক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

মাস'আলা : পাপাসক্ত ফাসিক-ফাজির ও কার্যত ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফিকহবিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাপাসক্তির বীজাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসিক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসুলুল্লাহ (সা) তাঁর দোয়াম বলতেন : **لَا تَجْعَلْ لِفَا جِرِ عَلٰى يَدَا** অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সক্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসিকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহক্বতের সের। রসুলুল্লাহ (সা) এই সেরু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।—(কুরতুবী)

**وَإِيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ** — এখানে কেউ কেউ রাহ-এর তফসীর করেছেন নূর,

যা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরীতি শক্তি। আবার কেউ কেউ রাহ-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মু'মিনের আসল শক্তি।—(কুরতুবী)

سورة العشر  
সূরা ছাশর

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ

الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ

فَأْتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

يُخْرِبُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْنَا فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ

وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً

عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, ভাদে-রকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অন্তঃপর আল্লাহর শক্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে দ্বাস সঞ্চার করে দিলেন।



তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব যে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৬) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আশাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য উচিত যে, আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খজুর রুক কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই আদেশে এবং যাতে তিনি জ্বাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

ষোণসূত্র ও শানে-নুযুলঃ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের রুডান্ত এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনু নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া স্বমরীর হাতে দু'টি হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনু নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাত ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাজ হয়ে যায়। কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে? রসুলুল্লাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেনঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছে। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনু নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বললঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না। রূহল মা'আনীতে আছে এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালিক, মুসান্নিদ এবং রায়েস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনু নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সদর্পে বলে পাঠালঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে বনু নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে

রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খজুর বৃক্ষে আশ্রয় ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেমতে বনু নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসংধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ ও দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।—(যাদুল মা'আদ)

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (তাঁর মহত্ত্ব, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাফির কিতাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনু নুযায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করে বহিষ্কার করেছেন। [যুহরী বলেনঃ তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুর্কর্মের ফলশ্রুতি। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার উবিষ্যদ্বাণীর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। সেমতে হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বাসভিটা থেকে বহিষ্কার করা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলমানগণ, তাদের সাজসরঞ্জাম ও জাঁকজমক দেখে] তোমরা ধারণা করতে পারনি যে, তারা (কখনও তাদের বাসভিটা থেকে) বের হবে এবং (খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সমস্ত অদৃশ্য প্রতিশোধের আশংকাও জাগত না। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে বহিষ্কৃত হল, যাদের নিরস্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, এই নিরস্ত্র লোকেরা সশস্ত্রদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে।) তাদের অন্তরে (আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের) ভ্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। (এই ভ্রাসের কারণে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। (অর্থাৎ কড়িকাঠ, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানরাও তাদের অন্তর ব্যথিত করার জন্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল।) অতএব হে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে) শিক্ষা গ্রহণ কর। (আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও শোচনীয় হয়ে থাকে)। আল্লাহ্ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শাস্তি দিতেন (সেমন তাদের পরে বনী কোরায়শ যার

কল্পে তাই হয়েছে। দুনিয়াতে যদিও তারা শান্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু) পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য উচিত যে, আল্লাহ কর্তার শাস্তিদাতা (তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ দ্বিবিধ প্রকারে হয়েছে। এক. চুক্তি ভঙ্গ করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। এটা পরকালীন আযাবের কারণ। ইহদীরা বলেছিল : রুক্ক কর্তন করা ও রুক্ক অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শামিল। অনর্থ নিন্দনীয়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেছিল যে, এসব রুক্ক বিষয়াতে মুসলমানদেরই হস্তে যাবে। কাজেই এগুলো কর্তন না করাই উত্তম। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহদীদের অন্তর ব্যথিত করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতঃপর এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : তোমরা যে কতক খর্জুর রুক্ক কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কতক না কেটে কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আল্লাহর আদেশ (-ও সন্তুষ্টি) অনুযায়ীই, তাতে তিনি কাফিরদেরকে লাঞ্চিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। কারণ, এগুলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়া এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনু নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস : সমগ্র সূরা হাশর ইহদী বনু নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে ইসহাক) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) এই সূরার নামই সূরা বনু নুযায়ের বলাতেন।—(ইবনে কাসীর) বনু নুযায়ের হযরত হারান (আ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আখিরা মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ, হালিমা ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লিখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (সা)-র সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হযরত হারান (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাইলের পরিবারে বনী ইসমাইলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিশ্বয়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল,

কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টকটকমান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূর-দর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্ব্বতী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্র-সমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররুত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনু নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।

ওহদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যত এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহদ যুদ্ধ ফেরত কোরাযশী কাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশজন কোরাযশী নেতাসহ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গিলাফ স্পর্শ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ (সা)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনু নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তদ্ব্যতীত একটি উপরে শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ (সা)-কে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে জাহ্‌হাশ। "আল্লাহ তা'আলার হিফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থভাৱে পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা : আশচর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনু নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতোঁ

নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে আব্বাস, দ্বিতীয় জন তাঁর পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।—(ইবনে কা'সীর)

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা : শানে-নুফলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বন্ নুযায়েরের চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কা'সীর লিখেন : মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী নাতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির ভ্রাতাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্ত্বরজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিহক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফিররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী (রা) কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই মাত্র কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁর মনোরঞ্জি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফিরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান্তি চুক্তি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে যাকিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহর নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বন্ নুযায়ের গোত্রও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাগ্রস্ত ব্যাপার : আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্বে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বন্ নুযায়েরের উপশু-পরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসূলে করীম (সা)-এর গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীভূত হত তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা গ্রহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল তেলে ময়দান পরিকার করে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণ্ডা, দুর্জতকারী

সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোসার লীলাখেলা এর চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্র আক্রমণ ও তাঁর রসূল (সা)-এর বনু নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি—(১) সব আস-বাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনু নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই (৩) কিছু খর্জুর রুক্ষ কাটা হয় এবং কিছু রুক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামগ্রিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রসূলুল্লাহ (সা) যে সময় শত্রুর কাছ থেকে মোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনু নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নমুনা, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لَا وَاللَّحْشِرِ—বনু নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক ‘আউয়ালে হাশর’

তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল।\* এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফাল্লাকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু নুযায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَا تَأْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا—এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ

তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলা বাহুল্য, আল্লাহর আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ—গৃহের দরজা, কপাট

ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

مَا تَقَعْتُمْ مِنْ لَيْئَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُمُومِهَا نَبَأٌ لِلَّهِ

لَيْئَةٍ—وَلِيُخْزِيَ الْإِثْمَانِ শব্দের অর্থ খজুর বৃক্ষ। বনু নুযায়েরের খজুর

বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উদ্বিজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিছু খজুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নি সংযোগ করে খতম করে দিল। অপর কিছুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিহ্নিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হ'নি-রারি : এই আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়ার উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আয়াতে এতদু-ভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশীর বেশী তারা হয় তো রসূলুল্লাহ (স)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কোরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহরই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কোরআনের আয়াত পালন করার মত ফরয।

ইজতিহাদী মতভেদে কোন পক্ষকে পোনাহ্ বলা হবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোন ব্যাপারে

তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয ও অন্যদলে নাজায়েয বললে আলাহর কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহ্ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুশ্চেষ্টার দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের

মধ্যে কোন এক পক্ষও শরীয়তানুযায়ী অশিল্পিত নয়। **وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ** বাক্যে বৃক্ষ

কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

মাস'আলা : যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আযিম আবু হানীফা (র) বলেন : যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েয। কিন্তু শায়খ ইবনে হমাম (র) বলেন : এটা তখন জায়েয, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয হবে।—( মাযহারী )

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا  
رِكَابٍ وَلَا كِنٍ اللَّهُ يَسِيطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ۝ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَمَا لَا يَكُونُ ذُوهُنَّ بَيْنَ  
الْأَعْيُنِ ۖ وَمِمَّا أَنْتُمْ لِلرَّسُولِ فُخْدُوهُ ۗ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأْتُوهُ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ  
أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
وَيُنصَرُونَ ۗ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَىٰ بِكُمُ الضَّالِّينَ ۗ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا  
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ  
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ



خَصَاصَةٌ تَمُنُّ يُووقُ شَرَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ  
 جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ  
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا  
 إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(৬) আল্লাহ্ বনু নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনগদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অন্ডাবপ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিশ্ণালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশভাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সম্ভৃষ্টি লাভের অন্মেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তৃষ্টি ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা ই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অন্তাবপ্রস্ত হলেও তাদেরকে অপ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারা ই সফলকাম। (১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখে না। হে আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বনু নুযায়েরের জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মাল সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে : ) আল্লাহ্ বনু নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, ( তাতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি ) তোমরা তজ্জন্য ( অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্য ) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [ উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য।— ( রূহুল-মা'আনী ) তাই এই মালে তোমাদের বন্টন ও মালিকানার অধিকার নেই—

গনীমতের মাল্যে যেরূপ হয়ে থাকে ]। কিন্তু (আল্লাহর রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শত্রুদের মধ্য থেকে) যার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শত্রুকে দ্বারের মাধ্যমে পরাস্ত করে দেন, যাতে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বনু নুযায়েরের ধনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই, বরং একে মালিকসুলভ ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রসূলেরই আছে)। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শত্রুদেরকে পরাস্ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনু নুযায়েরের ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ তা'আলা (এই পন্থায়) অন্যান্য জনপদের (কাফির) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খায়বরের অংশ বিশেষ এই পন্থায়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন মালিকানার অধিকার নেই, বরং) তা আল্লাহর হুক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা ব্যয় করার আদেশ দেবেন) রসূলের (হুক, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন) এবং (তাঁর) আশ্বায়-রজনের (হুক) এবং ইয়াতীমদের (হুক) এবং নিঃস্বদের (হুক) এবং মুনাফিকদের [হুক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল ব্যয় করার পাত্র। শুধু তারা'ই নয় রসূলুল্লাহ (সা) নিজের মতে যাকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মাল্যে কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মাল্যে কোন অধিকার থাকবে না—এই সম্মত নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ গুণসহ তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব গুণের কারণে, রসূলুল্লাহ (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল্য পেতে পারে। জিহাদে যোগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ (সা)-র আশ্বায়-রজন হওয়াও উপরোক্ত গুণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল্য দেওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা সবাই রসূলুল্লাহ (সা)-র সাহায্যকারী ছিলেন এবং বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগতেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে যায়। সূরা আনফালের আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই ধনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়, (যেমন মুখতা যুগে গনীমতের মাল ও মুছলশ্ব সম্পদ সব বিত্তবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবগ্রস্তরা বঞ্চিত থাকত। তাই আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি রসূলের মতামতের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং ব্যয় করার খাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্যে এবং উপযোগিতার মূল্যে ব্যয় করবেন। যখন জানা গেল যে, রসূলের ইচ্ছিত্যারে থাকাই মজলজনক, তখন) রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা (নিত্যে) নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও তাই বিধান এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ (বিরুদ্ধাচরণের কারণে) কঠোর শাস্তিদাতা। (উপরোক্ত ধনসম্পদে এমনিতে সব অভাবগ্রস্তরই হুক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবগ্রস্তদের (বিশেষভাবে) এতে হুক আছে, যাদেরকে তাদের বাস্তবতা ও

ধনসম্পদ থেকে ( জোরজবরে অন্যান্যভাবে ) বহিষ্কার করা হয়েছে, ( অর্থাৎ কাফিরদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত দ্বারা ) তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ( অর্থাৎ জামাত ) ও সমৃদ্ধি অন্বেষণ করে, ( কোন পাখিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি ) এবং তারা আল্লাহ ও রসুলের ( খর্মের ) সাহায্য করে। তালাই ( ঈমানে ) সত্যবাদী ( এই সম্পদ তাদের জন্যও ) যারা দারুল-ইসলামে ( অর্থাৎ মদীনায় ) ও ঈমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে স্থিতিশীল ছিল। ( এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তাই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় স্থিতিশীল ছিলেন। ঈমানের পূর্বে স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব আনসারের ঈমান সব মুহাজিরের ঈমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন )। তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে ( গনীমতের মাল ইত্যাদি ) যা দেওয়া তজ্জন্য তাঁরা ( আনসাররা ) অন্তরে কোন ঈর্ষাপোষণ করেনা। ( বরং আরও বেশী ভালবাসে ) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও ( পানাহার ইত্যাদিতে ) তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। ( অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মুহাজির ভাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই ) যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত ( যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে লোভ-লালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন ), তালাই সফলকাম। ( আর এই সম্পদ তাদের জন্যও ) যারা ( দারুল ইসলাম অথবা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে ) তাদের ( অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের ) পরে আগমন করেছে, ( কিংবা আগমন করবে )। তালাই দোয়া করে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর ( শুধু ঈমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিল ঈমানে অগ্রণী যাই হোক না কেন )। এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। ( এই দোয়ায় সমসাময়িকগণও शामिल রয়েছে )। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

### আনুশঙ্গিক ভাষ্য বিষয়

শব্দটি **فِي** থেকে উদ্ভূত। এর

অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও **فِي** বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে মুক্তলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফিররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে **أَفَاء**

শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধনসম্পদকেই **فِي** বলা হত। কিন্তু মুক্ত ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ—কিন্তু যে খনসম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জিহাদের

প্রয়োজন পড়ে না, তাকে **فِي** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে খনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাতিরোধে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

بَلَىٰ أَهْلَ الْقُرَىٰ—এখানে **مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ** বলে

বনু নুযায়ের এবং তাদের মত বনু কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের খনসম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার খনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে পার্থক্য, তা সম্পর্কিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে যে খনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিররা যে খনসম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিৎ বিবরণ মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَآلِهَا وَمِصْطَبِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ—

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহ্, রসুল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই খনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পুত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য তাই।—(মাযহারী)

আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনীমতের মাল কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রথমে দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হল? এ স্থলে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিমিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড়ান করে, তাদের মুকাবিলার জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জ্ঞান ও মাল সম্প্রদায় নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়—বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে, তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল—রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। গনীমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তাঁরাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনীমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ের রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইচ্ছতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে ব্যয়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।—(কুরতুবী)

খোলাফায়ের রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ের কিরামের কর্মধারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা)—র আমলে তো ফায়-এর মাল তাঁর ইচ্ছতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভাল বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইচ্ছতিয়ারে ছিল।

এই মালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রসূল (সা)-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন।—( হিদায়ত )

كَيْفَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ—যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান

হয়, তাকে دَوْلَةً বলা হয়।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধনসম্পদের হকদার নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মুখতা যুগের একটি কু-প্রথা মুসলিম-পাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণামাত : আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও শ্রেণীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রায়ই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, রুষ্টি—এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো বাতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো স্বহস্তে রেখে এভাবে বণ্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের খরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াক্ফে আম। কোন রহস্তর সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্ট জীব সর্বই এই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহাৰ্য বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ফ নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা-কারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোন রহস্তর পুঞ্জিগতি

ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পূঁজিপতিরা অপরূপ দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাজুস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোন মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কাপার্পণ ও লাগসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পূঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পূঁজিপতি ও বিভ্রালাীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়ায় আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অমৌজিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহর সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বাধা করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুঁদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ-সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও যাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরয কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজাতিভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার সম্পদ অস্বাভাবিক করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হত। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অজিত ধনসম্পদ সুচু বন্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিয়দংশ সূরা আনফালে এবং

কিয়দংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন উনিপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়া-  
নুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির  
পায়ে কুঠারাম্বাত করছে।

إِهْمَا أَنَا كُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوا رَمَاهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانْتَقُوا اللَّهَ

আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায়-  
এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক; কিন্তু তাদের  
মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ (সা)-র সুবিবেচনার উপর  
রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে  
যে পরিমাণ দেন, তা সম্বল্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না।

অতঃপর **انْتَقُوا اللَّهَ** বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে  
শ্রান্ত হুলাচাতুরির মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ তা'আলা সব খবর রাখেন।  
তিনি এজন্য শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় : কিন্তু আয়াতের  
ভাষা ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও  
এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা  
ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনু-  
যায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পঙ্কান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে  
বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলুল্লাহ  
(সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করে-  
ছেন। কুরতুবী বলেন : আয়াতে **أَنِّي** শব্দের বিপরীতে **نَهَى** শব্দ ব্যবহার করায়  
বোঝা যায় যে, এখানে **أَنِّي** শব্দের অর্থ **أَمَرَ** অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই  
**نَهَى** এর বিপক্ষ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে **أَنِّي** শব্দ এজন্য  
ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে शामिल থাকে। কারণ,  
এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা  
কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল : আপনি  
এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি, যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান  
করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে; অতঃপর তিনি

وَمَا أَنَا كُمُ الرُّسُولُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার



উপস্থিত লোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রম্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরম্ভ করল : এক ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেরী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ — কুর শেখ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র

মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উচ্চত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাক-  
রণিক দিক দিয়ে لَذَى الْقُرْبَى لِلْفُقَرَاءِ থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের  
আয়াতে আছে।—(মাহহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইয়াতীম,  
মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা  
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল  
দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ  
অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধি-  
কার দেওয়া উচিত : এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায়-এর মাল  
সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ,  
ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তালিবে-ইলম ও আলিম, তাদেরকে অন্যদের  
চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জন-  
সংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলিম, মুফতী ও বিচারকগণকে ফায়-এর মাল থেকে খোর-  
পোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে  
দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুহাজির, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রসুলুল্লাহ  
(সা)-র জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ  
হাসিমুখে বরণ করেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে  
মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যারা রসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী  
মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন  
এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।  
এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে  
কিরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগ-  
মনবন্ধী সব মুসলমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু  
শ্রেষ্ঠত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব : الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ

نَفْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِثَةً نَا وَيُنْفِرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْ لَا تَبِ لَهُمُ الصَّادِقُونَ

এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী, শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বাসভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আশ্রয় রক্ষা করতেন।—(মায়হারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান : আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নিসাব পরিমাণ কোন কিছু না থাকে। মক্কার তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃস্ব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) বলেন : যদি মুসলমান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ না করুন কোন দারুল-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তফসীরে মায়হারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **يُهَيِّتُونَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ**

**وَرِضْوَانًا** অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি

এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। **فُضْلٌ** শব্দটি প্রায়শ পাখিব নিয়ামতের জন্য এবং **رِضْوَانٌ** শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বলিত হয়েছে : **وَيُنْمِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**

অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ভ্যাগ ও তিতিক্ষিত বিশ্বাস কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمَادِقُونَ** অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও

কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউশ্বিবিল্লাহ! রাফেহী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসূলে করীম (সা) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হযরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।— (মায়হারী)

**وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ**

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব : **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। **دَار** বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।— (কুরতুবী)

আয়াতে **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** ক্রিয়াপদের পর **دَار** এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন : এখানে **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** অথবা **تَمَكَّنُوا** ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। **مِنْ قَبْلِهِمْ** অর্থাৎ মুহাজির-

গণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহর কাছে 'দারুল-হিজরত' ও 'দারুল-ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ-বর্ণনা

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ** অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ভালবাসেন

যারা হিজরত করে তাঁদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রবল উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেন নি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইশ্বত ও সন্ত্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জামগা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমেও এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।—( মাযহারী )

وَلَا يَجِدُونَ فِي مَدُونِهِمْ حَاجَةً  
 তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا أَوْتُوا  
 এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

বনু নুযায়েরের ধনসম্পদ বন্টনের ঘটনা : যে সময় বনু নুযায়ের গোত্রের ফায়-এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের ইচ্ছাতির রসুলুল্লাহ (স)-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফায়-এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (স) আনসারগণের সর্দার সাবেত ইবনে কায়স (রা)-কে ডেকে বললেন : তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমার নিজের গোত্র খায়রাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব ? রসুলুল্লাহ (স) বললেন : না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন : আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা বনু নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আল্লাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ (স) ! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাযের এই উক্তি

শুনে উপস্থিত আনসারগণ সম্মুখে বলে উঠলেন : আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত । তখন রসুলুল্লাহ্ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন । আনসারগণের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন । গোছনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)-কে ইবনে আবী হাকীকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল ।—( মাযহারী )

উল্লিখিত আয়াতে **مِمَّا أُوتُوا** বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং **حَاجَةً** এর সর্বনাম

দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ এই যে, এই বস্টনে যা কিছু মুজা-হিরগণকে দেওয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন, যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না । মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সন্তাবনাই ছিল না । এর মুকাবিলায় যখন বাহ-রাইন বিজিত হল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাপ্ত ধনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলিবন্টন করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন : আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয় ।—( বুখারী, ইবনে কাসীর )

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ**

**خِمَاةٍ—أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِمَاةٌ** শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস ।

**إِيتَار**—এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা ।

আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন । নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন, যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রসীড়িত ছিলেন ।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা : আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে । তাই তফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন । এখানে তফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল ।

তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাশ্রিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল । তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন । তিনি স্ত্রীকে বললেন : বাচ্চাদেরকে কোনরূপে শুইয়ে দাও । অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি; কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

আন্নাতখানি নাখিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল : আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রসুলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন : কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাত অতিথি করে নেবে? জনৈক আনসারী আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হল : আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন : বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করো, তা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাথে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়াজেতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আন্নাত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনিভাবে তৃতীয় জনের কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আন্নাত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেন : এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বলল : এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে—যখন সন্ধ্যা হল, তখন উপঢৌকন

প্রেরণে অভ্যস্ত নয়—এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আন্ত ভাজা করা বকরী উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর মমদার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন : খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর অসুস্থ অবস্থায় আঙুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আঙুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন : আঙুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ডিক্কুকাটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ডিক্কুকের পেছনে পেছনে যেনে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ডিক্কুকাটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারুক (রা) একটি খলিয়ায় চার শ' দীনার ভরে খলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল : খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া কবুল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন : হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে যে, আবু ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী খলিয়াটি হযরত আবু ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবু ওবায়দা (রা) খলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন : নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত উমর (রা) এমনিভাবে আরও চার শ' দীনার অপর একটি খলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি মুয়ায ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জবল খলিয়া হাতে নিয়ে হযরত উমর (রা)-র জন্য দোয়া করলেন। তিনিও খলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বললেন : আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন খলিয়াতে মাত্র দু'টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন : ওয়া সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হযরত ফা আদভী বলেন : আমি ইয়ান্নমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পানি করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম : আপনাকে পানি পান করার কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ আহ শব্দ কানে এল। আমার ভাই বললেন : এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এল। সে-ও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি যখন সপ্তম শহীদদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন : সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত আশ্রয়ত্যাগের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রসূলে করীম (সা) মুসল-মানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : তোমাদের কেউ কেউ তার যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ডিম্বার হাত পাতে।

এসব রেওয়াজে থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবার করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আকসোস করে অথবা মানুষের কাছে ডিম্বার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে গেরেগান হয় না, বরং সাহসিকতার সাথে সবার করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েয। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর যথা-সর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী এরই নমুনা। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেও সবার ও দৃঢ়তায় অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত।—(কুরতুবী)



মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময় : দুনিয়াতে কোন সৎ-বদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কান্নেম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (স) যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপচৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপচৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপচৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাচীনের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা উভ্রতা ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থী।

মুহাজিরগণের ব্যাগারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শক্ষাক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সম্বলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিজ্জহস্ত ছিলেন এবং মদীনায় আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কয়েকটি খজুর রুক্ক রসূলুল্লাহ্ (স)-কে দিয়েছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মনকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী বলেন : আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) যখন ঋণবর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (স) আমার জননীর খজুর রুক্ক উম্মে আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে রুক্ক দিলেন।

— وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا نَفْسَهُ فَأُؤْتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ত্যাগ ও আল্লাহ্র পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্র কাছে সফলকাম। **شَيْئًا** শব্দটির প্রায় সমার্থবোধক। তবে **شَيْئًا** শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্র ওয়াজিব হক আদায়ে অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ে কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হান্নাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান শয়রাতের ক্ষয়ীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরূহ ও নিষ্পনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিশেষ থেকে পবিত্র হওয়ার জালাতী হওয়ার আলামত : ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

আমরা একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন : এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জালাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে ওয়ূর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রসূলুল্লাহ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জালাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন : পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাছোখান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু আত্মাহুঁর যিকির করেন। এরপর ফজরের নামাযের জন্য উঠেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ডাব বন্ধমূল হওয়ার উপক্রম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম : আমার গৃহে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সা)-র মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জালাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফযীলত অর্জন করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন : আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারণও প্রতি হিংসা-বিশেষ পোষণ করি না, যাকে আত্মাহুঁ তা'আলা কোন কল্যাণ দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন : বাস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়াজে উদ্ধৃত করে বলেন : ইমাম নাসায়ীও 'আমলুল ইয়াওমি ওয়ালাইলাহ্' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্ ।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান : **وَالَّذِينَ جَاءُوا**

مِّن بَعْدِهِمْ এই আয়াতের অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে

কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে ফায়-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত উমর ফারাক (রা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেন নি, বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রস্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন রসুলুলাহ্ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে? —( মালিক, কুরতুবী )

সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যগম্ভী হওয়ার পরিচায়ক : এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যও এরূপ দোয়া করে : আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখে না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা) বলেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহক্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী

রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হসাইন (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে ( তাঁর সাহাবীদের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাশ্চাত্য প্রবন্ধকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল : না। হযরত হসাইন

(রা) বললেন : এখন তৃতীয় আয়াত **الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ** বাকী রয়েছে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ফায়-এর মালে তাঁর কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তাঁর ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : আব্বাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিফকার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আব্বাহ জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুখারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি— এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন : তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল : যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ তাঁর উপর আব্বাহর জানত হোক। বলা বাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন : এই উম্মতের পূর্ববর্তিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠ ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উৎসাহ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন : সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না, করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে।

—(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا  
 أَبَدًا ۚ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝  
 لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ  
 نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً  
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَا  
 يِقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَّةٍ مُّحْضَنَةٍ ۚ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ  
 بَيْنَهُمْ شَدِيدًا ۚ تَخَسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ  
 لَا يَعْقِلُونَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وِبَالٍ أَهْرِهِمْ ۚ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا  
 كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ فَكَانَ عَا  
 قِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ۝

(১১) আগনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবখারী কাফির ভাইদেরকে বলে : তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আজাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই গুঁঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আজাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। এটা এ কারণে যে, তারা এক নিবোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড

হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিভিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে চেষ্টা করে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। (১৭) অতঃপর উত্তরের পরিণতি হবে এই যে, তারা আল্লাহর কাছে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই আলিমদের শাস্তি।

### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি মুনাফিকদেরকে ( অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখকে ) দেখেন নি ? ওরা তাদের (সহধর্মী) কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে : ( অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সূরা বনু নুযায়েরের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে )। আল্লাহর কসম, ( আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি )। যদি তোমরা ( তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জোর জবরে বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও ) তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আসার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। ( এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে : ) আল্লাহর কসম, যদি কিতাবধারী কাফিররা বহিষ্কৃত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি ( অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ) তাদেরকে সাহায্যও করে ( এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ) তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর ( তাদের পলায়নের পর ) কিতাবধারী কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। ( অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা তো পলায়ন করেছে। অন্য কোন সাহায্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মোটকথা, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধর্মী ভাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বতোভাবে ব্যর্থ মনোরথ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেষে যখন বনু নুযায়ের বহিষ্কৃত হয়, তখন মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগী হয়নি এবং প্রথম যখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, যাতে যুদ্ধের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায্য করেনি। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'যদি বহিষ্কৃত হয়' ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করার এক কারণ অতীত ঘটনাকে উপস্থিত বিদ্যমান ধরে নেওয়া, যাতে অস্বীকার ভঙ্গ করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া দৃষ্টির সামনে ভাসমান হয়ে যায়। বিভিন্ন কারণ ভবিষ্যৎ সাহায্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে : ) নিশ্চয় তোমরা তাদের ( অর্থাৎ মুনাফিকদের ) অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়বাহ। ( অর্থাৎ ইমান দাবী করে তারা আল্লাহর ভয় করে বলে প্রকাশ করে, এটা মিথ্যা। নতুবা তারা কুফরী

হেঁড়ে দিত। আর তোমাদেরকে ওরা বাস্তবিকই ভয় করে। এই ভয়ের কারণে তারা বনু নুযায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না)। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভয় করা এবং আল্লাহকে ভয় না করা)এ কারণে যে, তারা (কুফরের কারণে আল্লাহর মাহাত্ম্য হাদয়নাম করান ব্যাপারে) এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (ইহদী ও মুনাফিকরা আল্লাদা আল্লাদা-ভাবে তো তোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না) তারা সম্ভবত্বভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিষ্কার দ্বারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি দ্বারা। এতে অক্ষয়ী হয় না যে, কখনও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং মুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহদী কিংবা মুনাফিকরা আল্লাদা আল্লাদা অথবা সম্ভবত্বভাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেও, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সমতে বনী কুরায়যা ও খায়বরের ইহদীরা এমনিভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে কখনও সাহস করেনি। এতে মুসলমানদের মনোবলও রুজি করা হয়েছে যে, তারা যেন ওদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশংকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোত্র যেমন আউস ও খায়রাজের পারস্পরিক যুদ্ধ দেখে আশংকা করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের মুকাবিলায় এমনিভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যেই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। (মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে—এরূপ আশংকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকে (বাহ্যত) ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের শত্রুতায় অভিন্ন ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিশ্বাসগত বিরোধের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা রয়েছে। সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْحَسَدُ ۗ

এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনৈক্য) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের ব্যাপারে) এক কাণ্ডজনহীন সম্প্রদায়। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্যত্বাবী হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঐক্য হতে পারে। অতঃপর বনু নুযায়ের ও মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সাহায্যের ও সান্নাদা করে ধোঁকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমষ্টির দৃষ্টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে—একটি বনু নুযায়েরের ও অপরটি মুনাফিকদের। বনু নুযায়েরের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা সেই লোকদের মত, যারা (দুনিয়াতে ও) তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং (পরকালেও) তাদের জন্য রয়েছে স্বত্বপাদায়ক শাস্তি। [এখানে বনু কায়নুকার ইহদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘটনা এই : বদর যুদ্ধের পর তারা দ্বিতীয় হিজরীতে চুক্তিগত করে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। রসুলুল্লাহ (সা)-র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এলে তাদেরকে আশ্বেপুষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়েনের কাকুতি-মিনতির কারণে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আমরুল্লাতে চলে যায় এবং তাদের ধনসম্পত্তি মুহাম্মদ স্পন্দ হিসাবে বন্টন করা হয়।—(যাদুল-মা'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এই যে } তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাফির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাফির হয়ে যায়, (এবং দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কুফরের শাস্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দেয় এবং) বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। (দুনিয়াতে এরূপ সম্পর্কহেদের কাহিনী সূরা আন-ফালে এবং পরকালে সম্পর্কহেদের কথা একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর উভয়ের (অর্থাৎ বনু নুযায়ের ও মুনাফিকদের) শেষ পরিশ্রুতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সূতরাং শয়তান যেমন প্রথমে মানুষকে বিপ্রান্ত করে, এরপর বিপদমূহূর্তে চম্পট দেয়, ফলে উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি মুনাফিকরা প্রথমে বনু নুযায়েরকে কুপরামর্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনু নুযায়ের বিপদের সম্মুখীন হল, তখন মুনাফিকদের পাড়া পাওয়া গেল না। ফলে বনু নুযায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকরা অকৃতকার্ণতার অপমানে পতিত হল)।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

أَلَّذِينَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا إِلَى

من قبلهم কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র) বলেন : এরা হচ্ছে বদরের কাফির

যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এরা ইহদী বনু কায়নুকা। উভয়েরই অস্তিত্ব পরিশ্রুতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্চিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনু নুযায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনু কায়নুকায় ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তরজন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্চিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

অতএব, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র উক্তি অনুযায়ী فَذَا قُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ

বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণত যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্রয়ন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত মুজাহিদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহদী বনু কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাগ্রদ।

বনু কায়নুকায় নির্বাসন : রসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমন করার পর মদীনায় পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই



যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনু কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি উত্তোলন করে দিতে পারেন। বনু কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা)-র হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবু লুবা'বা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জিহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আলাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন—তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল : আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তাতেই সন্মত আছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাক্কি বাদ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্কার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন : তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনু কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুন্নাহ্ এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি বন্টন করে এক ভাগ রায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম রায়তুলমালে গনী-মত্তের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫-ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا

যা'না বনু নুযায়েরকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেন, তখন কোন মুনাক্কি সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানা রকম ওয়াদা-জব্বীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আলাহ্ জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে :

وَأَذَيْنَ لَهُمُ الشُّوْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ  
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ اتَّ الْفِتْيَانَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِرِئِّكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের মুকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মুকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অবস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যত কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মুকাবিলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ (স)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলায়ই অনুরূপ।

তফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কয়েকজন সম্মাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথছায়া করে কুফরী পর্ষত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সম্মাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনার রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোযা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে আভি-বাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধৃত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সম্মাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সম্মাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সম্মাসী আসল সম্মাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যন্ত্রা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সম্মাসীর কাছে পাঠিয়ে দিল। যখন সম্মাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘ-কাল পর্ষত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সম্মাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্ষত সে বালিকাটিকে সম্মাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়ার হয়ে পেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যাভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সম্মাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সম্মাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সম্মাসীর কাছে যেয়ে বলল : এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিদ্ধ

কর, তবে আমি তোমাকে ব্যাচাতে পারব। সম্রাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সিঁজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল : আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না।

তফসীরে কুরতুবী ও মামহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا  
 اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝ لَا يَسْتَوِي  
 أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰلٰقِينَ ۝ لَوْ  
 أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ  
 خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلِيمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ  
 الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ  
 سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
 السَّمٰوٰتُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আপামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই জ্বাধা। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর

অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপাশ্রিত, মাহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্, প্রভু, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজাময়।

### তক্ষসীরের সান্ন-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! (অবাধ্যদের পরিণাম তোমরা গুনলে, অতএব) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে ব্রতী হওয়া যা পরকালের সম্পদ। সৎ কর্ম অর্জনে যেমন আল্লাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ ও গোনাহ্ থেকে আত্ম-রক্ষার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শাস্তির আশংকা

আছে। প্রথমে **قَدِّمَتْ لِقَدِّ** সৎ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে **اَللّٰهُ تَقْوًا**

এবং বিতীয় **خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** পাপ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে **اَللّٰهُ تَقْوًا**

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তাঁর বিধি বিধান পালন করে না—আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বুদ্ধি-বিবেকের এমন শব্দ হয়ে গেছে যে, নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ বুঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তাঁরাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শাস্তি ভোগ করবে। উপরোক্তিত আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনকারী ও বিধানাবলী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জাহাভের অধিবাসী এবং এক দল জাহান্নামের অধিবাসী) জাহান্নামের অধিবাসী ও জাহাভের অধিবাসী সমান নয়; (বরং) যারা জাহাভের অধিবাসী তাঁরাই সফলকাম। (পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা অকৃতকার্য; যেমন **اُولٰٓئِكَ**

**هُمُ الْغٰفِقُونَ** যারা জানা যায়। অতএব তোমাদের জাহাভের অধিবাসী হওয়া

উচিত—জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়, তা এমন যে) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের

উপর অবতীর্ণ করতাম (এবং তাতে বোধশক্তি রাখতাম এবং খেলাল-খুশি অনুসরণের শক্তি না রাখতাম) তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমনি প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব সৎ কর্ম অর্জন ও পাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত, যাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং বিধানাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জিত হয়)। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওহীদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তাকীদার্থে পুনশ্চ বলা হচ্ছেঃ) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই; তিনি বাদশাহ, (সকল দোষ থেকে) পবিত্র, মুক্ত, (অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা নেই। বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) নিরাপত্তাদাতা, (বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ বিপদও আসতে দেন না এবং আগত বিপদও দূর করেন) পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। মানুষ যে শিরক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই (সত্য) আল্লাহ, স্রষ্টা, সঠিক উত্তাবক, (অর্থাৎ সবকিছু রহস্য অনুযায়ী তৈরী করেন) রূপ (আকৃতি)-দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। (এসব নাম উত্তম গুণাবলীর পরিচায়ক)। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই (কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রভাময়। (সুতরাং এমন মহান সত্তার নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়)।

### জানুয়ারি কাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সূরার শেষ পর্যন্ত মু'মিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সৎ কর্মপরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বর্ণিত ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্ঞনা প্রস্তুতি গ্রহণের

নির্দেশ আছে। বল হয়েছে: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ:**

مَا قَدِّمْتُمْ لَدُنَّ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত

পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক আয়াতে কিয়ামত বোঝাতে গিয়ে **عُدَّ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথম. সমগ্র ইহকাল পরকালের মুকাবিলায় স্বল্প ও সংক্লিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব-বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে **الدنيا يوم ولنا فية صوم**—সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহু নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত, যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে : **من مات فقد مات قلبها ميتة** অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কান্নেম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হলে যায় এবং আযাব ও সওয়ালের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপরাধ নাম বরষা, এটা দুনিয়ার ‘ওয়েটিং রুম’ (বিশ্রামাগার) সদৃশ। ‘ওয়েটিং রুম’ ফাস্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হলে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধী-ধীর রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবদ্দশায় অভিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুপে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সার্বকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী, এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা‘আলা এতে মানুষকে

চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করবে, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাববপত্র, খন্দৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহর পথে ও আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানী সরকারের ব্যাংকে ( স্টেট ব্যাংক ) জমা হয়ে যায়। এরপর সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدَّ مَتْنُ لَدَ—বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে

ব্যক্তি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর **اَتَّقُوا اللَّهَ** বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথমে **اَتَّقُوا اللَّهَ** বলে আল্লাহর নির্দেশাবলী

পালন করে পরকালের জন্য সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার **اَتَّقُوا اللَّهَ** বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল

কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যত সৎ কর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহর সম্বলিত্তির জন্য করা হয় না; বরং নাম-শশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যত ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব দ্বিতীয় **اَتَّقُوا اللَّهَ** বাক্যের সারমর্ম এই যে,

পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত ? সম্বল যথেষ্ট নয়, বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَاَنفُسَهُمْ—অর্থাৎ তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই

আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ—এটা একটা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যদি কোর-  
আন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানু-  
ষের ন্যায় জানবুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে  
নত—বরং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতার লিপ্ত হয়ে  
তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব  
এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ  
বলেন : পাহাড়, হুক্ক, ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই  
এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—( মাযহারী )

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আলাহ্  
তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ—অর্থাৎ আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য

ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। أَلْقُدُّوسُ—এমনি সজা, যিনি

প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। أَلْمُؤْمِنِ—এই শব্দটি

মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আলাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আলাহ্‌র জন্য ব্যবহার  
করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধানক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ  
থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

أَلْمُهَيَّمِ—এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও  
কাভাদাহ্ (র) তাই বলেছেন।—( মাযহারী , কামুস )

أَلْجَبَّارِ—প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جَبَر থেকেও উদ্ভূত হতে পারে,  
যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে  
পাশি বাঁধা হয়, তাকে جَبْر বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও  
অকেজো বস্তুর সংস্কারক।—( মাযহারী )

أَلْمُكْتَبِرِ—এটা كِبَرِيَاءُ ও كِبَرِيَاءُ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব  
প্রকৃতপক্ষে আলাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে  
মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আলাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ  
ও পোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আলাহ্‌র বিশেষ গুণে  
শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আলাহ্‌র জন্য পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্য মিথ্যা দাবী।



الْمُؤْمِرُ—অর্থাৎ রূপ দানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্

তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্বন্ধন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্ট বস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্ট বস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি। মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অপার শক্তির কারুসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্ হাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্য বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَا إِلَهَ إِلَّا سَمَاءُ الْحُسْنَى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে।

কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ হাদীসসমূহে ৯৯-টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ—এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়, কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কান্নিগনি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহনিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ পাঠও হতে পারে। কেননা, সূচিবৃত্ত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চিনা ও তাঁর কৃতত্ত্ব হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। এ কারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ—অর্থাৎ তোমরা তাদের তসবীহ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ : তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়্যাসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার **أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করার পর সূরা হাশরের **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। —(মামহারী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ  
 إِلَيْهِم بِالْحُدُودِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ  
 الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا  
 فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْحُدُودِ وَأَنَا أَعْلَمُ  
 بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
 السَّبِيلِ ۝ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ  
 أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝ لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ  
 وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝  
 قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا  
 لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا  
 بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا  
 بِاللَّهِ وَحَدِيثَ آيَاتِهِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لِأَسْتَفْقِرَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ  
 لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ  
 الْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সম্বলিষ্ট লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পন্থাগাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবেনা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন: আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ বেপরোয়া, প্রশংসার মালিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্ব না হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারও করো না)। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তা অস্বীকার করে।

(এতে বোঝা যায় যে, তারা আল্লাহর শত্রু)। তারা রাসূল (স)-কে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। (এতে বোঝা যায় যে, তারা কেবল আল্লাহরই শত্রু নয়—তোমাদেরও শত্রু। মোটকথা, এদের সাথে বন্ধুত্ব করো না)। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে) বের হয়ে থাক, তবে (কাফিরদের বন্ধুত্বের জন্য যার সারমর্ম কাফিরদের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর উপশুক্ত কাজকর্মের পরিপন্থী) কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের কথাবার্তা বলছ? (অর্থাৎ প্রথমত বন্ধুত্বই মন্দ, এরপর গোপন বার্তা প্রেরণ করা যা বিশেষ সম্পর্কের পরিচায়ক, তা আরও মন্দ)। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। (অর্থাৎ উপরোক্ত বাধা-সমূহের অনুরূপ ‘আমি সব জানি’ এটাও তাদের বন্ধুত্বের পথে বাধা হওয়া উচিত। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছেঃ) তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে, সে সন্ন্যাসপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (আর বিচ্যুতদের পরিণাম তো জানাই আছে। তারা তো তোমাদের এমন শত্রু যে) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা (তৎক্ষণাৎ) শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে এবং (সেই শত্রুতা প্রকাশ এই যে, মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও রসনা প্রসারিত করে (এটা পাখির ক্ষতি) এবং (ধর্মীয় ক্ষতি এই যে,) এরা চান যে, তোমরা কাফিরই হয়ে যাও। (সুতরাং এরূপ লোক বন্ধুত্বের যোগ্য নয়। বন্ধুত্বের ব্যাপারে যদি তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা কর, তবে খুব বুঝে নাও,) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সম্ভান-সন্তুষ্টি কিয়ামতের দিন তোমাদের (কোন) উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের মধ্যে কলসাল্লা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। [সুতরাং প্রত্যেক কর্মের সঠিক কলসাল্লা করবেন। তোমাদের কর্ম শাস্তির কারণ হলে সম্ভান-সন্তুষ্টি ও আত্মীয়-স্বজন এই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তাদের খাতিরে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা খুবই গণিত কাজ। এ থেকে আরও স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ধনসম্পদ খাতির করার যোগ্য নয়। অতঃপর উল্লিখিত আদেশ পালনে উৎসুক করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছেঃ] তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আ) ও তাঁর (ঈমান ও অনুগতো) সমমনাদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। [অর্থাৎ এ ব্যাপারে কাফিরদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, যেহেতু ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ করেছেন]। তারা (বিভিন্ন সময়ে) তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। [‘বিভিন্ন সময়ে’ বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন প্রথমবার সম্প্রদায়কে একথা বলেছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এরপর যে-ই তাঁর অনুসরণ করেছে, সে-ই কাফিরদের সাথে কথায় ও কাজে সম্পর্কহীন করেছে। অতঃপর এই সম্পর্কহীনতার রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কাফির ও তাদের উপাস্যদেরকে) মানি না (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাস্যদের ইবাদত মানি না। এরপর লেনদেন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে সম্পর্কহীন এই যে) আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে (কেননা, শত্রুতার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাসগত বিরোধ। এখন এটা বেশী ফুটে উঠার কারণে শত্রুতাও ফুটে উঠেছে। এই শত্রুতা চিরকাল থাকবে) যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।

[ মোটকথা; ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীগণ কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন করলেন ]। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে, (এই আদেশের ব্যতিক্রম। এতে বাহ্যত কাফিরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বোঝা যাচ্ছিল)। তিনি বলেছিলেন : আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার বেশী) আল্লাহর কাছে আমার কিছু করার নেই। [ অর্থাৎ দোয়া কবুল করতে পারি না অথবা বিশ্বাস স্থাপন না করা সত্ত্বেও তোমাকে আশাব থেকে রক্ষা করব, তা পারি না। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) এর এতটুকু কথার অর্থ কেউ কেউ এরূপ বুঝে নিয়েছে যে, এটা ক্ষমা প্রার্থনাই। অথচ এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ পিতার জন্ম এরূপ দোয়া করা যে, সে বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষমার যোগ্য হয়ে থাকে। সবাই এরূপ করতে পারে। বাস্তবে এটা সম্পর্কহীদের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দৃশ্যত এতে সম্পর্ক স্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ থাকায় একে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের সাথে হম্মরত ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা বর্ণিত হল। অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়ার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সম্পর্কহীন করে তিনি এ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আরম্ভ করলেন : ] হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ( কাফিরদের সাথে সম্পর্কহীন ও শত্রুতা ঘোষণা করার ব্যাপারে ) আপনার উপর ভরসা করেছি এবং ( আপনিই আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে ) আপনার দিকেই মুখ করেছি। ( আমাদের বিশ্বাস এই যে ) আপনাকেই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। সূতরাং এই বিশ্বাসের কারণে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাফিরদের সাথে সম্পর্কহীন করেছি। এতে কোন পাখিব স্বার্থ নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাল্ল করবেন না। ( অর্থাৎ এই সম্পর্কহীদের কারণে কাফিররা যেন আমাদের উপর জুলুম করতে না পারে )। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ মার্জনা করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রভাময়। তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আল্লাহর ( অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যাওয়ার ) এবং কিয়ামতের ( আগমনের ) বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাঁদের মধ্যে [ অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ] উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে ব্যক্তি ( এই আদেশ থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, ( সে তার নিজের ক্ষতি করে, কেননা ) আল্লাহ্ বেপরোয়া ( এবং পূর্ণতাগুণে গুণাবিত হওয়ার কারণে ) প্রশংসাহঁ।

### জানুয়ারিক স্রাব্য বিষয়

এই সূরার শুরুভাগে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযুল : তফসীর কুরত্বীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাশনী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল : না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল : তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তা হলে কি উদ্দেশ্যে

আগমন করেছে? সে বলল : আপনারা মক্কার সম্রাজ্ঞ পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি মোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই শুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার কুণ্ডলি বর্ষণ করে? সে বলল : বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফিররা হদায়নবিষ্কার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাঙ্কে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতাম্মা (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কার তাঁর স্বগোষ্ঠ বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উদ্ভাঙ করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরাকোন-রূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দিই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলেপেলেদের হিফায়ত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওয়ান্নে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও শুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন : অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলায় গণচাক্ষুবন কর। তোমরা তাকে রওয়ান্নে থাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের

নামে হাতেব ইবনে আবী বালভায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা) বলেন : আমরা নির্দেশমত শ্রুতগতিতে তার পশ্চাচ্ছাবন করলাম। রসুলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল : আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তাল্লাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ শ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম : হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দেব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভেতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে এলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরম্ভ করলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

রসুলুল্লাহ্ (সা) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোষ্ঠের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোষ্ঠীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিফায়ত করে।

রসুলুল্লাহ্ (সা) হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেন : সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত উমর (রা) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরম্ভ করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে কাসীর) কোন কোন রেওয়াজে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুম্‌তাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরোক্ত ঘটনার জন্য হুঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ — অর্থাৎ মূ'মিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের

শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পন্থা কাফিরদের কাছে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে ‘কাফির’ শব্দ বাদ দিয়ে ‘আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু’ বলে প্রথমত এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আলাহর শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আশ্বপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফির যে পর্যন্ত কাফির থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আলাহর দূশমন। অতএব যে মুসলমান আলাহর মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাফিরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ

تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ—এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো

হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসুলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। এই বহিষ্কারের কারণ কোন পাখিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মু'মিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হিফায়ত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আলাহ্ না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْئَاتِي

রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আলাহর জন্য ও তাঁর সম্ভৃতি অর্জনের জন্য ছিল, তবে আলাহর শত্রু কাফিরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের ঋতিশ্র করবে?

نَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ

এতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফিরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা স্বেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আলাহ্ তা‘আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসুলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত খরিয়ে দিয়েছেন।



أَنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءَ

—অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে,

তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুর্ভাষা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহ ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَدَّأَوْ لَوْ تَتَّقُونَ—এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের

হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সম্ভ্রুত হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْضَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ—

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতামাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওয়র খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি এ কাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পন্নবতী আন্নাতসমূহে কাকিরদের সাথে সম্পর্কহেদের সমর্থনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সরার সাথে শুধু সম্পর্কহেদই নয়—শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন : যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

حَتَّى تَرْؤُوا بِاللهِ وَحْدَهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব : উপরের আন্নাতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তম আদর্শ ও সূন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর

উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্য সব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের

জন্য জায়েয নয়। **لَا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ لَعْنَةً لَّيْسَ بِهَا تَسْفَهَانُ لَهُمْ** আয়াতের মর্ম তাই।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওয়র সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দূশমন, **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ** তখন এ বিষয় থেকে নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন।

**لِلَّهِ تَهَرُّمَاتٌ** আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

কোন কোন তফসীরবিদ **لَا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ** কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত

করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আ) যে পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কহেদের কথা ঘোষণা করেন। এরাপ করা এখনও জায়েয। কোন কাকির সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী) তফসীরের সারসংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বিত হয়েছে।

**عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُبُلًا مَّا كَانَ لَهُمْ فِيهَا مِن شَيْءٍ وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يَتْلُونَ فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَسْمَعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسَبِهِمْ غَافِقُونَ ۖ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُعْلَمُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسَبِهِمْ غَافِقُونَ ۖ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُعْلَمُونَ ۗ**

**عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُبُلًا مَّا كَانَ لَهُمْ فِيهَا مِن شَيْءٍ وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يَتْلُونَ فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَسْمَعُونَ ۗ**

**وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسَبِهِمْ غَافِقُونَ ۖ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُعْلَمُونَ ۗ**

**عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُبُلًا مَّا كَانَ لَهُمْ فِيهَا مِن شَيْءٍ وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يَتْلُونَ فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَسْمَعُونَ ۗ**

ظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

(৭) যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাক করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাককারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্ধে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা ই জালিম।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের শত্রুতার কথা শুনে মুসলমানরা চিন্তাশ্রিত হতে পারত এবং সম্পর্কহেদের কারণে স্বভাবত তাদের মনে দুঃখ লাগতে পারত, তাই সুসংবাদের ভঙ্গিতে অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে) যারা তোমাদের শত্রু, সম্ভবত (অর্থাৎ ওয়াদা এই যে) আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন (যদিও কিছু সংখ্যাকের সাথে অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান করে দেবেন। ফলে শত্রুতা বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়ে যাবে)। এবং (একে অসম্ভব মনে করো না। কেননা) আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সেমতে মন্না বিজয়ের দিন অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্কহেদ চিরকালের জন্য হলেও তা আদিষ্ট বিষয় হওয়ার কারণে অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু যখন তা স্বল্পকালের জন্য এবং মুসলমান হওয়ার ফলে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন চিন্তাশ্রিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত কেউ যদি এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং পরে তওবা করে থাকে তবে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (এ পর্যন্ত সম্পর্কহেদের আদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতঃপর অনুগ্রহমূলক সম্পর্ক রাখার বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাক করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি। (এখানে যিশ্মী অথবা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ জায়েয। অবশ্য ন্যায় ও সুবিচারের জন্য যিশ্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া শর্ত নয়। এটা প্রত্যেক কাফির এমনকি জন্তু-জানোয়ারের সাথেও ওয়াজিব। কিন্তু অস্মাতে ন্যায় ও ইনসাক বলে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। তাই বিশেষভাবে যিশ্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাককারীদেরকে ভালবাসেন। (অবশ্য)

আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব (ও অনুগ্রহ) করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, (কার্যক্ষেত্রে অথবা ইচ্ছার মাধ্যমে) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং (বহিষ্কৃত না করলেও) বহিষ্কার-কার্যে (বহিষ্কারকারীদেরকে) সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের সাথে শরীক রয়েছে, কার্যত কিংবা বহিষ্কার করার ইচ্ছার মাধ্যমে। যেসব কাফিরের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি অথবা বশ্যতা স্বীকারের বন্ধন ছিল না, তারা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে অনুগ্রহ-মূলক কাজ-কারণার জায়গা নয়, (বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কাম্য)। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব (অর্থাৎ অনুগ্রহমূলক ব্যবহার) করবে, তারা ই পাপিষ্ঠ।

### আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেই কাফির আত্মীয়তার খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহা-বারে কিরাম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসুলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের ঋহেশ ও আত্মীয়-স্বজনের পরোক্ষা করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কহীন হয়েছিল। বলা বাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্য এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াত-সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংকটকে অতিসহন দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

কোন কোন হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের কোন প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেয়, তখন প্রায়ই আল্লাহ্ তা'আলা সেই বস্তুকেই হালাল করে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং অনেক সময় এর চাইতেও উত্তম বস্তু প্রদান করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফির, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্তরই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দেবেন অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পার-স্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা বিজয়ের সময় বাস্তব রূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফির মুসলমান হয়ে যায়।—(মায়হারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে : **يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** অর্থাৎ তারা দলে দলে আল্লাহ্‌র

দীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে, বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বুখারী ও মসনদে আহমদের রেওয়াজেতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্ত্রী কবীলা হদারবিয়া সজির পর কাফির অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রা) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,

কিন্তু তিনি কাকির। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : জননী'র সাথে সদ্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

কোন কোন স্নেহস্নায়ুতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী কবীলাকে হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

যেসব কাকির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্যবহার করার ও ইনসাক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাকিরের সাথেও জরুরী। এতে শিম্মী কাকির, চুক্তিতে আবদ্ধ কাকির এবং শত্রু কাকির সবই সমান বলং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধোর বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিপ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মাস'আলা : এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল দান-খয়রাত শিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাকিরকেও দেওয়া যায়। কেবল শত্রুদেশের কাকিরকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ

সব কাকিরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আয়াত তা'আলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ-কায়বার করতে নিষেধ করা হয়নি, বলং শুধু আত্মরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়, বলং শিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাকিরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তুফসীরে-মাযহারীতে মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাকিরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই, নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্য শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাধিক জরুরী ও ওয়াজিব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ تَمْتَحِنُوهُنَّ  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى

الْكُفَّارِ لَاهُنَّ جُلُودُهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ دَوَاتُهُمْ مِمَّا انْفَقُوا  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا  
 تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مِمَّا انْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا انْفَقُوا  
 ذِكْرٌ حُكْمُ اللَّهِ دِيْعَكُمْ بَيْنَكُمْ دَوَالَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ فَاتَكُمْ  
 شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبِلْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَ  
 جُهُمْ مِمَّا انْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا  
 النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيْعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ  
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ  
 بِهَتَّانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ  
 فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ  
 الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

(১০) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে শ্রাণ্য মোহরনা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছে, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফরসালো করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজাময়। (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাবে, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যা

প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনাদের কাছে এসে জানুগত্যের শপথ করে যে, তারা আত্মাহূর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যক্তিতার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আগম পর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনাদের জবাব্দায়তা করবে না, তখন তাদের জানুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আত্মাহূর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আত্মাহূর ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনগণ! আত্মাহূর যে জাতির প্রতি কলুষ, তোমরা তাদের সাথে যত্ন করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে।

শানে-নুকুলের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হদায়-বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাত্হ-এর শুরুতে এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির শেষব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। পরন্তু কাফিরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফির আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হদায়বিয়ার অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাত্মক ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের সাথে বিবাহিতা ছিল, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

### তরুসীয়ের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা ( দারুল-হরব থেকে ) হিজরত করে আগমন করে, [ দারুল-ইসলাম মদীনায়ে আসূক কিংবা দারুল-ইসলামের পর্যায়ভুক্ত হদায়বিয়ার সেনা ছাউনিতে আসূক—( হিদায় ) ] তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (যে, সত্যিই মুসলমান কিনা। পরবর্তী **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** আয়াতে এই পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাহ্যিক পরীক্ষাকেই যথেষ্ট মনে কর। কেননা ) তাদের ( সত্যিকার ) ঈমান সম্পর্কে আত্মাহূর সম্যক অবগত আছেন। ( তোমরা প্রকৃত অবস্থা জানতেই পার না )। যদি তোমরা ( এই পরীক্ষার আলোকে ) জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। ( কেননা ) তারা কাফিরদের জন্য হাজাজ নয় এবং কাফিররা তাদের জন্য হাজাজ নয়। ( কারণ, মুসলমান নারীর বিবাহ কাফির

পুরুষের সাথে কোন অবস্থাতেই বজায় থাকে না। এমতাবস্থায়) কাফিররা (মোহরানা বাবদ তাদের পেছনে) যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। (মুসলমানগণ) তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না। (অর্থাৎ তোমাদের যেসব স্ত্রী শরীকদেশে কাফির অবস্থায় রয়ে গেছে, তোমাদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের কোন চিহ্ন বাকী আছে বলে মনে করো না। এমতাবস্থায়) তোমরা (সেই নারীদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছে, তা (কাফিরদের কাছ থেকে) চেয়ে নাও এবং (এমনিভাবে) কাফিররাও চেয়ে নেবে যা (মোহরানা বাবদ) তারা ব্যয় করেছে। এটা (অর্থাৎ যা বজা হল) আল্লাহর বিধান। (এর অনুকরণ কর)। তিনি তোমাদের মধ্যে (এমনি উপযুক্ত) ফয়সালার করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রভাময়। (তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুমায়ী উপযুক্ত বিধান নির্ধারণ করেন)। যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফিরদের মধ্যে থেকে যাওয়ার কারণে (সম্পূর্ণই) তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় (অর্থাৎ তাকেও পাওয়া না যায়। এরপর কাফিরদেরকে) তোমাদের (পক্ষ থেকে মোহরানা দেওয়ার) সুযোগ হয় অর্থাৎ (কোন কাফিরের মোহরানা তোমাদের উপর পরিশোধযোগ্য হয়) তবে (তোমরা সেই মোহরানা কাফিরকে দিও না, বরং) যেসব মুসলমানের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের (স্ত্রীদের উপর) ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ (সেই পরিশোধযোগ্য মোহরানা থেকে) দিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (জরুরী বিধি-বিধানে ছুটি করো না। অতঃপর বিশেষ সম্বোধনে ঈমান পন্থীকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে : ) হে পয়গম্বর (সা) ! মুসলমান নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না (যুর্থতা যুগে) কোন কোন নারী অপরের সন্তান এনে নিজ স্বামীর সন্তান বলে চাকিয়ে দিত অথবা জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলে দিত। এতে ব্যভিচারের গোনাহ তো আছেই; পরন্তু অপরের সন্তানকে স্বামীর সন্তান দাবী করার পাপও আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)। এবং ভাল কাজে আপনার অব্যাহতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন এসব বিধানকে সত্য এবং অবশ্য পালনীয় মনে করার বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করুন। স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অতীত সব গোনাহ মাক্ফ হয়ে যায়, তবুও এখানে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ মাগফিরাতের লক্ষণ হাসিল করার জন্য অথবা এটা ঈমান কবুলের দোয়া, মশ্বারা মাগফিরাত হাসিল হয়)। মু'মিনগণ, আল্লাহ যাদের প্রতি রুশ্ট, তোমরা তাদের সাথে (-ও) বন্ধুত্ব করো না। (এখানে ইহুদী জাতিকে

বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা মাদিয়ায় বলা হয়েছে : **مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ** )



তার্না পরকালের (কল্যাণ ও সওয়াবের) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরস্থ কাফিররা (পরকালের সওয়াব ও কল্যাণ থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে। [যে কাফির মারা যায়, সে পরকাল প্রত্যক্ষ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতরূপে জেনে নেয়। সে বুঝতে পারে যে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। ইহদীরা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নবুয়ত-বিরোধীদের কাফির হওয়ার বিষয়টি খুব জানত, কিন্তু লজ্জা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর অনুসরণ করত না। কাজেই তারাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, তারা পরকালে মুক্তি পাবে না। অতএব তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মোটেই জরুরী নয়। মদীনায় ইহদীদের সংখ্যা বেশী ছিল এবং তারা দৃষ্টও ছিল খুব বেশী। তাই এখানে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে]।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

হদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ : সূরা ফাত্হ-তে হদায়বিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে মক্কার কাফির ও রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে একটি দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কতিপয় শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফিরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নত করা ও বাহ্যিক পরাজয়মেনে নেওয়ার ভাব পরিস্ফুট ছিল। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসন্তোষ ও ক্রোধের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয় অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এই শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদীনায় চলে গেলে রসুলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে চলে গেলে রসুলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন হদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন, তখন মুসলমানদের জন্য অগ্নিপরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রা)-এর। কোরাইশরা তাঁকে কারাকুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত, কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে জালিমদের হাতে পুনরায় তুলে দেব—এটা কিরূপে সম্ভব ?

কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হিফায়ত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও মেনে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রা)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দৃঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে-গুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রা) কাফির সান্নকী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে সান্নকীর নাম মুসাফির মখসুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পাঠিয়ে হদান-বিন্নার রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হামির। সে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফিরদের হাতে ফেরত দেওয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক, যেমন উল্লিখিত সাঈদা অথবা হিজরতের সময় তার মুসলমানিত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোট কথা, উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটি ব্যাপক, কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রহণীয়—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফির স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পেছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসুলুল্লাহ (সা) চুক্তিপত্রে উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রা)-কে কাফিরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে ওতবা মক্কা থেকে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরত দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাখিল হয়। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে, উম্মে কুলসুম আমার ইবনে আস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসুলুল্লাহ (সা) শর্ত অনুযায়ী আশ্মারা ও ওম্মীদ দ্রাতৃদলকে ফেরত পাঠিয়ে দেন, কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেন নি। তিনি বললেন : এই শর্ত পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (সা)-র সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি উল্লেখের শামিল নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মাত্র : কুরতুবীর উল্লিখিত রেওয়াজেত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হাদিসবিদ্বাভেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই কাফিরদেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোন নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, এটা চুক্তির বরখোলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না; বরং একটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মাত্র। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি শর্তটিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতেই রাস্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বের রাজন্যবর্গের নামে পত্র লিখেন। এরই সুবাদে আবু সুফিয়ানের কাফিলা নিশ্চিত্তে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন।

সায়কথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এই ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণরূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِمَّا جَرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ

—আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মু'মিন হওয়াই

সজ্জির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মহা থেকে মদীনায় আগমন-কারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনামাত্র ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে স্বগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আত্মাহর কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রম-ভুক্ত নয়; বরং সজ্জির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমান-গণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান

পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে : **اللَّهُ أَعْلَمُ بِأِيمَانِنَهُنَّ** এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদি দৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন : মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পাখিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিলাভের জন্য আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মদীনার বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়াজেতক্রমে বলা হয়েছে : নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ **إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعَنَّكَ** মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা) -এর রেওয়াজেতে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

**فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ** অর্থাৎ

পরীক্ষার পর যদি তারা মু'মিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছ ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

**لَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ** অর্থাৎ এই নারীরা কাফির পুরুষদের

জন্য হালাল নয় এবং কাফির পুরুষরা তাদের জন্য হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্য হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

**وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا** অর্থাৎ মুহাজির মুসলমান নারীর কাফির স্বামী বিবাহে

মোহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভূক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধনসম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধনসম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধনসম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার আশংকাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে।— (কুরতুবী)

—وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ الَّذِينَ آذَنُوا بِغَيْرِكُمْ إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাকির স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে, যদিও প্রাক্তন কাকির স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

কাকির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন জায়েয হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন : আসল বিধি এই যে, যে কাকির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামী বিচারক তাকে ডেকে বলবে : যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহুল্য, ইসলামী রাষ্ট্রেই ইসলামী বিচারক কাকির স্বামীকে আদালতে হাযির করতে পারে। কাকির দেশে কিংবা শত্রুদেশে এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা সম্ভবপর নয়। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সলা হতে পারবে না। তাই এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে দারুল ইসলামের আসা মদীনায়ে পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হদায়বিনায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ, তখন হদায়-বিনায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ফিকাহ বিদগণের পরিভাষায় একে 'ইখতিলাফে-দারাইন' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাকির পুরুষ ও তার মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যায়—একজন কাকির দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে নারী অপরকে বিবাহ করার জন্য মুক্ত হয়ে যায়। —(হিদায়)

আলোচ্য আয়াতে إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লিখিত

হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা-কাফির স্বামীকে ফেরত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেওয়ার আশ্রয় আবশ্যিকতা নেই। এই প্রাপ্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ; কাজেই এর জন্য নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

عَمَّةٌ شَبَابَةٌ—এর বহুবচন। এর আসল  
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَا فِرِ

অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণ যোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كَافِرَةٌ—এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে।

কেননা, কিতাবী কাফির রমণীকে বিবাহ করা কোরআনে সিন্ধু রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেওয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখন কোন মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাখিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর বিবাহে কোন মুশরিক নারী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত উমর ফারাক (রা)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় থেকে গিয়েছিল। এই আয়াত নাখিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।—(মায়হারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কহীন করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াতবলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا

নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মভাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফিরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিলে, তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ, কোরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরয। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফির স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্কার

কাফিররা কোরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পবরতী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

عاقبتكم—وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَأَقِبْتُمْ الْآيَةَ

শব্দটি **عاقبتكم** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুসলমানদের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফিরদের জন্য জরুরী ছিল, যেমন, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফির স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফিরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক

কর, তবে এর বিধান এই যে, **فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَفْتَقُوا**

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফিরদের হাতে রয়ে গেছে।

**عاقبتكم**—এর অপর অর্থ মুছে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফিররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।—(কুরতুবী)

কিন্তু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মাক্ক একটাই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কোরাযশীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মক্কায় কাফিরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। কোরআনের এই আয়াত নাথিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফির নারীর বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হননি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফিরদের কাছে মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য ছিল। কাফিররা যখন এই প্রাপ্য পরিশোধ করল না, তখন রসুলুল্লাহ (সা) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কার চলে যাওয়ার ঘটনা মাত্র একটিই ছিল। অবশিষ্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফির ছিল এবং কাফির থাকার কারণে আয়তাতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কার চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।—(কুরতুবী) বগড়ী (র) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পাঁচজনও পরে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।—(মায়হারী)

নারীদের আনুগত্যের শপথ : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ**

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ**—এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকরিদমহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত সূদেই যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (স)-র কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ বুখারীর রেওয়াজেতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন : আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসুলুল্লাহ (স)-র কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান **فَمَا اسْتَطَعْتِي وَأَطَقْتِي** অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনের অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাথে কুলান্ন। ওমায়মা এরপর বলেন : এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসুলুল্লাহ (স)-র রজহ মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়ে-ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অগারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শাসিত হবে না।—(মায়হারী)

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) এই শপথ সম্পর্কে বলেন : মহিলাদের এই শপথ কেবল কথার্বার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হতনি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুত রসুলুল্লাহ (স)-র হাত কখনও কোন গায়ের মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মায়হারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনও রসুলুল্লাহ (স) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ সমাপ্ত করে সফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা) রসুলুল্লাহ (স)-র বাক্যাবলী নিজে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।



শপথনামারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুরিযানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশত নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসাকর নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।—(মামহারী)

পুরুষদের শপথ সংক্ষেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে : পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।—(কুরতুবী) এ ছাড়া নারীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অস্বীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিচুতির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يَا يَعْزُبُ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ

এতে প্রথম বিষয় হচ্ছে ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও থাকে। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধনসম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় বাড়িচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকস্বেপাঙ্ক হলে পুরুষদের জন্যও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মৃৎসী মুসে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রেথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধ-

তার সাথে এ কথাও আছে যে, **بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأُخْرَاهُمْ** — অর্থাৎ নিজের হাত ও

পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কিয়ামতের দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপ কর্ম করার সময় লজ্জা রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিরের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবস্থায় স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বেশী কঠোর পোনাহ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপের এক প্রকার এই যে, স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সন্তানকে স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, নাউযুবিল্লাহ, বাড়িচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

যষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে **وَلَا يَعْزُبُ عَنْكَ فِي مَعْرُوفٍ**

অর্থাৎ তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ (সা) যে কোন কাজের আদেশ দেবেন, তা ভাল না হলে পাল্বে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভাল করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়, এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ (সা)-র কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরাপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শরতান কারও মনে পথ-প্রস্তুতকার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারিত। এই পথ বন্ধ করার জন্য শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

سورة الصفا

সূরা সাফা

মদীনায়ে অবতীর্ণ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ  
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانُ مَرْصُوصٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  
يَقَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا  
أَزْوَاعًا اللَّهُ قَلْبَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ وَإِذْ  
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِنَتِيِّ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي  
اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَمَنْ  
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ۖ وَاللَّهُ  
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ يُرِيدُونَ لِيُطْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ  
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নতামগলে ও ভূমগলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

তিনি পরাক্রান্ত প্রজাবাম। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সান্নিধ্যভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর। (৫) স্মরণ কর, যখন মুসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কলঙ্ক দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ইসা (আ) বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতে আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাকিররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে), তিনি পরাক্রান্ত প্রজাময়। (অতএব, তাঁর প্রত্যেক আদেশ মেনে নেওয়া জরুরী। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের আদেশ, যা এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই সূরা অবতরণের কারণ এই যে, একবার কয়েকজন মুসলমান পরস্পরে আলোচনা করল যে, আমরা যদি এমন কোন আমল জানতে পারি, যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, তবে আমরা তা বাস্তবায়িত করব। ইতিপূর্বে ওহদ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান পলায়ন করেছিল। এ ছাড়া জিহাদের আদেশ নাযিল হওয়ার সময় কেউ কেউ একে দূরাহ মনে করেছিল। সূরা নিসায় এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ইরশাদ নাযিল হলঃ) মু'মিন-গণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তা'আলা তো তাদেরকে (বিশেষভাবে) পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে সান্নিধ্যভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর (অর্থাৎ সীসা গালানো প্রাচীর যেমন মজবুত, অপরাঙ্কের হয়ে থাকে, তেমনি তারা শত্রুর মুকাবিলায় পশ্চাদপদ হয় না। উদ্দেশ্য এই যে, বল, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি যদি আমরা জানতাম। শুনে নাও, সেই আমল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ নাযিল হওয়ার সময় তোমরা কেন একে দূরাহ মনে করেছিলে এবং ওহদ যুদ্ধে কেন পলায়ন করেছিলে? এসব বিষয় সত্ত্বেও বড় বড় দাবী করা আল্লাহর কাছে খুবই অশোভনীয় ও অপছন্দনীয়। অতএব,

আয়াতে বৃথা আক্ষয়ান ও মিথ্যা দাবীর কারণে শাসনো হয়েছে। আমলবিহীন উপদেশ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর কাফিররা যে হত্যা ও লড়াইয়ের যোগ্য পাত্র, এর কারণ অর্থাৎ রসুলকে কষ্টদান, মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মিল রেখে হযরত মুসা ও ইসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে : স্মরণ কর) যখন মুসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। (তাঁর সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে : অবাধ্যতা ও বিরোধিতাই সব ঘটনার সারমর্ম)। অতঃপর (একথা বলার পরও) যখন তারা বক্রতাই অবলম্বন করল (এবং সুপথে এল না) তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে (আরও বেশী) বক্র করে দিলেন। (অর্থাৎ নাকরমানী ও বিরোধিতা আরও বেড়ে গেল। সদাসর্বদা পাপ করলে আল্লাহর প্রতি অন্তরের ঝোঁক ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা ছাড়া পাওয়াই নিয়ম)। আল্লাহ তা'আলা এমন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (এটাই তাঁর রীতি। তাঁরাও আল্লাহর রসুলকে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা করে কষ্ট প্রদান করে। তাই তাদের বক্রতা ও পাপাচার আরও বেড়ে যায়। এখন সংশোধনের আশা নেই। অতএব, তাদের অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য জিহাদের আদেশ উপস্থাপ্ত হয়েছে। এমনভাবে সে সমষ্টিও স্মরণীয়) যখন মরিয়ম-তনয় ইসা (আ) বলল : হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসুলের সূসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। এই সূসংবাদ যে ইসা (আ) থেকে বর্ণিত আছে, তা স্বয়ং খৃষ্টানদের বর্ণনা দ্বারা হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সেমতে খায়েনে আবু দাউদের রেওয়াজক্রমে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, বাস্তবিকই হযরত ইসা (আ) এই পয়গম্বরেরই সূসংবাদ দিয়েছিলেন। নাজ্জাশী খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিতও ছিলেন। খায়েনেই তিরমিযী থেকে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তওরাতে রসুলুল্লাহ (সা)-র গণাবলী উল্লিখিত আছে এবং একথাও আছে যে, ইসা (আ) তাঁর সাথে সমাধিস্থ হবেন। ইসা (আ) তওরাতের প্রচরক ছিলেন, তাই এটা যেন ইসা (আ) থেকেই বর্ণিত আছে। মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব 'এযহরকুল হকে' তওরাতের বর্তমান রূপি থেকে একাধিক সূসংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৪ পৃ. কনস্টান্টিনোপলে মুদ্রিত) বর্তমান ইজীলে এসব বিষয়বস্তু না থাকা মোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ সুলতানী পণ্ডিতদের মতে বর্তমান ইজীল অবিকৃত নয়। এতদসত্ত্বেও যা আছে, তাতেও এ ধরনের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে ইউহয়্যার ইজীলের (যার আরবী অনুবাদ ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়,) চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে : আমরা চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, আমি না গেলে 'ফারকিলিত' তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি গেলেই তাকে তোমাদের কাছে পঠিয়ে দেব। 'ফারকিলিত' শব্দটি 'আহমদেরই' অনুবাদ। কিতাবীরা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত। ইসা (আ) হিব্রু ভাষায় আহমদ বলেছিলেন। এরপর যখন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন 'বিরকনুতুস' লিখে দেওয়া হল। এর অর্থ আহমদ অর্থাৎ বহল প্রথংসিত, খুব

প্রশংসাকারী। এরপর গ্রীক ভাষা থেকে হিব্রুতে অনুবাদ করতে গিয়ে একেই ‘কারকিলিত’ করে দেওয়া হল। হিব্রু ভাষার কোন কোন কপিতে এখন পর্যন্ত ‘আহমদ’ বাহর বিদ্যামান রয়েছে। এই ‘কারকিলিত’ সম্পর্কে ইউহান্নার ইজীমে বলা হয়েছে : তিনি তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন। এই জাহানের নেতা আসবেন। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের কারণে এবং সত্যতা ও ন্যায়বিচারের খেলাফ করার কারণে শাস্তি দেবেন। এসব বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র পয়গম্বর হবেন।—(তফসীরে-হাক্কানী) মোটেকথা, ইসা (আ) তাদেরকে উপরোক্ত কথা বললেন। অতঃপর যখন (এসব বিষয়বস্তু বলে নিজের নবুয়ত সুপ্রমাণ করার জন্য) সে অর্থাৎ ইসা (আ) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা (এসব প্রমাণ ও মো’জেযা সম্পর্কে) বলল : এ তো এক প্রকাশ্য বাদু। [ তারা বাদু বলে নবুয়ত অস্বীকার করল। এমনিভাবে ইসা (আ)-এর পর আবার বর্তমান ফাকিররা রসুলুলাহ (সা)-র নবুয়ত অস্বীকার করল। এটা মহা অন্যায় ও জুলুম। এই জুলুমের সংক্রমণ রোধ করার জন্য জিহাদের আদেশ সমীচীন হয়েছে। বাস্তবিকই ] যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এই যে, তারা নবুয়ত অবিশ্বাস করেছে। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা এবং যা বাস্তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে,

তা অস্বীকার করা—উভয়ই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার শামিল। <sup>و هو يدعى</sup> বলায় কাজটি আরও বেশী মন্দ হওয়া বোঝা যায়। অর্থাৎ সত্যক করার পরও সে নিজে সত্যক হয়নি। <sup>والله لا يهدي</sup> বলায় বোঝা যায় যে, তাদের অবস্থা সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে

গেছে। তাই যুদ্ধের শাস্তিই উপযুক্ত হয়েছে। সে মতে যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অস্বীকৃতি বাহ্যত নৈরাশ্যের আলামত। এখন তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা সিদ্ধ। অতঃপর জিহাদে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্য, সত্যের প্রাধান্য ও মিথ্যার পরাজয় সম্পর্কিত ওয়াদা বর্ণনা করা হচ্ছে :) তারই যুদ্ধের ফুৎকারে আল্লাহর আলো (অর্থাৎ ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে চায় (অর্থাৎ কর্মগত কৌশলের সাপেক্ষে সাথে মুখ থেকেও আপত্তিজনক কথাবার্তা এই উদ্দেশ্যে বলে, যাতে সত্য ধর্ম প্রসার লাভ কল্পিত না পারে। যদিও মাঝে মৌখিক প্রোগাণ্ডাও কার্যকর হয়ে যায়। অথবা এটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফুৎকারে আল্লাহকে আলো নিভিয়ে দিতে চায়)। অথচ আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করে ছাড়বেন, যদিও কাকিররা তা অপছন্দ করে। (সেমতে) তিনিই তাঁর রসুলকে (আলো পূর্ণ করার জন্য) পথ নির্দেশ (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য ধর্ম দিয়ে (দুনিয়াতে) প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (আলোরূপে ইসলামকে অবশিষ্ট) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন (এটাই পূর্ণতা দান করা) যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-মুখুল : তিরমিহী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

একদল সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি, আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগতী (র) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্য জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—( মাযহারী )

ইবনে কাসীর মসনদে আহমদের বরাত দিলে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [ ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন ]। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা সাক্ক পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মু'মিনের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কিনা, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাসীম নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কক্ষায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে :

— لا تَقُولُنَّ لَنْ نَحْمِلَ ذَلِكَ غَدًا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ

কিরামের নিম্নত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহর কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাঁদের ছ'লিয়ার করার জন্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাভা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও শব্দ অর্জনের খাতিরে

হতে পারে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমত তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা-বশত বলার দরকার হলেও ইনশাআল্লাহ্‌সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবী করা কবীরা গোনাহ্ এবং আলাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের লক্ষ্য ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মকরাহ্।

দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য : উপরোক্ত তফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবীর সাথে এসব আয়াত সম্পৃক্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না, তা করার দাবী করা আলাহ্ তা'আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কোরআন বলে :

أَتَا مَرُوءِنَ النَّاسِ بِالْبُرِّ وَتَتَسَوْنَ أَنفُسِكُمْ

তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াত সৎ কাজের আদেশ ও ওয়ায উপদেশ দাতাদেরকে লজ্জা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা লজ্জার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলা না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উপদেশ দিতে ছুটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোন সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তওফীক হয়ে যাবে। বিস্তার অভিভূতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুন্নতে-মোম্বাহাদাহ্ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতাপ ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোম্বাহাব পরামর্শের হলে অনুতাপ করাও মোম্বাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ আলাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَعًا كَانَهُمْ بِيْهَانٍ مَّرْصُومٍ

অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আলাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আলাহ্‌র শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁর



বাণী সমুন্নত করার জন্য কামেম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা গলানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মুসা ও ইসা (আ)-র আলাহুর পথে জিহাদ এবং শত্রুদের নির্ধাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জিহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মুসা ও ইসা (আ)-র ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক-নির্দেশ রয়েছে। হযরত ইসা (আ)-র কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী ইসরাঈলকে তাঁর নবুয়ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার দাওরান্ত্র দেন, তখন বিশেষভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন। এক. তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেন নি; বরং এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লিখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিক-নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব এটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসা (আ)-র শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মুসা (আ)-র শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ইসা (আ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমনকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক-নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সত্যতার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নাম্তিকানাও ইজীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে।

مَبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ — বাক্যে তাই বর্ণিত হবে।

হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেষ নবী (সা)-র মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইজীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ নাম ছিল।

ইজীলে রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ : একথা সুবিদিত এবং স্বয়ং ইহুদী ও খৃষ্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তওরাত ও ইজীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্বয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন প্রকৃত কালাম চিনাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইজীলের ডিক্টিতে আজকালকার খৃষ্টানরা কোরআনের

এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইজীলে কোথাও রসুলুজাহ্ (সা)-র নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমতুল্লাহ্' কেরানভীর কিতাব 'এশ-হারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খৃষ্টধর্মের স্বরূপ, ইজীলে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রসুলুজাহ্ (সা)-র সুসংবাদ ইজীলে বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও একটা নবীরবিহীন কিতাব। বড় বড় খৃষ্টাম পণ্ডিতদের এই উক্তিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবি ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলূম করাচী থেকে এর উর্দু অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجَيِّبُكُمْ مِنْ عَذَابِ  
 الْيَوْمِ ۖ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَعْقِدُ  
 لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 مَسْكِنًا طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَأُخْرَىٰ  
 يُحِبُّونَهَا ۖ نَضْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
 يَا حَوَارِيَّةَ إِنَّهُ قَالَ أَلَا أُوَدِّعُ إِلَيَّ الْوَارِثِينَ ۖ فَمَنْ أُنصَارَ اللَّهُ  
 فَاٰمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَآئِفَةٌ ۚ فَأَيُّدَانَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا عَلٰٓىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظٰهِرِينَ ۝

(১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সম্ভান দেখব; যা তোমাদেরকে যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পক্ষে নিরাজদের ধনসম্পদ ও জীবনগণ

করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জায়গাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জায়গাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাক্ষ্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আলাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আলাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আলাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল: আমরা আলাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাকির হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তি যোগানাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে জিহাদের পরকালীন ফলাফল ও পরে ইহকালীন ফলাফলের ওয়াদা করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে:) মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যত্নপাদায়ক শক্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই যে) তোমরা আলাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আলাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (এরূপ করলে) আলাহ তাঁ'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে (জায়গাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যা চিরকাল বসবাসের উদ্যানে (নিমিত্ত) হবে। এটা মহাসাক্ষ্য। (এই সত্যিকার পরকালীন ফলাফল ছাড়াও) আরও একটি (ইহকালীন) ফলাফল আছে, যা তোমরা (বিশেষভাবে) পছন্দ কর (অর্থাৎ) আলাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (এটা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ স্বভাব-গতভাবে দ্রুত ফলাফল কামনা করে। হে পয়গম্বর, অঙ্গপনি) মু'মিনগণকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সাহায্য ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গের কাহিনী বর্ণনা করে ধর্মের সাহায্যের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে:] মু'মিনগণ তোমরা আলাহর (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও (অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে)। যেমন [ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গ দীনের সাহায্যকারী হয়েছিল। তখন বহু সংখ্যক লোক ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল।] ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেছিলেন: আলাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী? শিষ্যবর্গ বলেছিল: আমরা আলাহর (দীনের) সাহায্যকারী। সে মতে তারা দীন প্রচারে চেষ্টা করে দীনের সাহায্য করেছিল। অতঃপর (এই চেষ্টার পর) বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাকির হয়ে গেল। (এরপর তাদের মধ্যে শত্রুতা ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে অথবা ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে) অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। (তোমরাও এমনভাবে দীনে মুহাম্মদীর জন্য চেষ্টা ও জিহাদ কর। উপরোক্ত গৃহযুদ্ধের

সূচনা যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে এতে খৃষ্টধর্মে জিহাদের অস্তিত্ব জরুরী হয় না)।

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَا هِدُ وَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধনসম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সম্বলিত ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আনাম ও বিলাস বাসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে :

نِعْمَتٍ أُخْرَى—وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَضْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই, ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয়-বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদেশ বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيبٌ শব্দটি পরকালের খিপরাতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খায়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়।

تَعْمِيرُهَا অর্থাৎ তোমরা

এই নগদ নিয়ামত খুব গছন্দ কর। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে।

কোরআনে বলা হয়েছে : وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ

করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

حَوَارِي শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حَوَارِي বলা হত। সূরা আক-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যাছিল বারজন। এই আয়াতে ঈসা (আ)-র আমলেক একটি ঘটনা

উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহর দীনের সাহায্যের জন্য তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন :

اللَّهُ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব, মুসলমানদেরকেও আল্লাহর দীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

সাহায্যে কিরাম এই আদেশ পালনে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নযীর স্থাপন করেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সা) ও দীনের খাতিরে সারা বিশ্বের শত্রুতা বরণ করে নেন, অকথা নির্যাতন সহ্য করেন এবং নিজেদের খনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় ও সাহায্য দ্বারা ভূষিত করেন এবং শত্রুদের মুকাবিলায় প্রাধান্য দান করেন। বহু শত্রুদেশ তাঁদের করতলগত হয় এবং তাঁরা রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও অর্জন করেন।

فَأَمْنٌ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَائِفَةٌ ۚ فَأَيُّ الْوَالِدِينَ

أَمْنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوا طَائِفَتَيْنِ

খৃস্টানদের তিন দল : বগভী (র) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে স্বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) আসমানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর খৃস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল : তিনি আল্লাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল : তিনি আল্লাহ ছিলেন না বরং আল্লাহর পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশ্বাস ও সত্য কথা বলল। তারা বলল : তিনি আল্লাহও ছিলেন না; আল্লাহর পুত্রও ছিলেন না বরং আল্লাহর দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হিফাযত ও উচ্চ মর্তবাদান করার জন্য আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাঁরাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফির দল মু'মিনদের মুকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মু'মিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পল্লিগামে মু'মিন দল যুক্তিপ্রমাণের নিরিখে বিজয়ী হয়ে যায়। —(মায়হারী)

এই তফসীর অনুযায়ী **الَّذِينَ آمَنُوا** বলে ঈসা (আ)-র উল্লেখের মু'মিন-

গণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়-গৌরব অর্জন করবে।—(মায়হারী) কেউ কেউ বলেন : ঈসা (আ)-র আসমানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর

খৃস্টানদের মধ্যে দুই দল হয়ে যায়। একদল ইসা (আ)-কে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপর দল বিগ্ৰহ ও খাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ইসা (আ)-কে আল্লাহর দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মু'মিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তাঁ'আলা মু'মিনদেরকে কাফির দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ইসা (আ)-র ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মু'মিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবাস্তব মনে হয়। —(রাহুল-মা'আনী) উপরে তফসীলের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবত যুদ্ধের সূচনা কাফির খৃস্টানদের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মু'মিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

سورة الجمعة

সূরা জুমু'আ

মদীনায়ে অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْمَقْدُوسِينَ الْعَزِيزِ

الْحَكِيمِ ۝ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَقْبَامِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَعَنَى ضَالِّي

مِثْلِينَ ۝ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْتِيَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَهِيَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ ذَلِكَ

فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مَنِ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَثَلُ

الَّذِينَ حُبِّلُوا الْتَوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

يُسَّ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ

مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَمْتُونَهُ

أَبْدَانًا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ بِالظَّالِمِينَ ۝ قُلْ إِنْ الْمَوْتَ

الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও ব্রতাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। (২) তিনিই নিরঙ্করদের মধ্য

থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল যোয় পথভ্রষ্ট-ভায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (৪) এটা আলাহর রূপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আলাহ মহাক্রপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই পাখা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আলাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আলাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন—হে ইহদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আলাহর বন্ধু—অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আলাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে গলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী আলাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সব কর্ম, যা তোমরা করত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

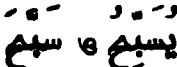
রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজাময় আলাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) যা কিছু আছে নডোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। তিনিই (আরবের) নিরঙ্করদের মধ্যে তাদেরই (সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে (ব্রাহ্ম বিশ্বাস ও কুচরিত্র থেকে) পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন (সব ধর্মীয় জরুরী জান এর অন্তর্ভুক্ত)। ইতিপূর্বে (অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে) তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল। (অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। মানে অধিকাংশ লোক লিপ্ত ছিল। কেননা, মূর্ততা যুগেও কিছুসংখ্যক একত্ববাদী বিদ্যমান ছিল)। এই রসূল অন্য আরও লোকদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যারা (মুসলমান হয়ে) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে অথবা তারা এখনও জন্মগ্রহণই করেনি। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব সব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমান সব ইসলামের সম্পর্কে এক ও অভিন্ন, তাই তাদেরকে **مؤمن** বলা হয়েছে।—(খায়েন) তিনি পরাক্রমশালী প্রজাময়। (তাই এমন নবী প্রেরণ করেছেন)। এটা (অর্থাৎ রসূলের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিতাব ও হিদায়তের দিকে আসা) আলাহ তা'আলার রূপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আলাহ মহাক্রপাশীল। (সবাইকে দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রজাবলে যাকে ইচ্ছা দেন এবং বঞ্চিত রাখেন। উপরে নিরঙ্করদের মু'মিন হওয়া এবং ইহদী জালিমদের মু'মিন না হওয়া থেকে এ কথা সুস্পষ্ট। অতঃপর নিসালত অমান্যকারীদের নিন্দায় বলা হচ্ছে : ) যাদেরকে তওরাত মেনে চলতে বলা



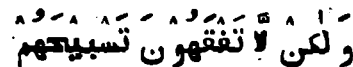
হয়েছিল, অতঃপর তারা তা মেনে চলেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে (কিন্তু পুস্তকের উপকার পায় না। তেমনিভাবে জানের আসল উদ্দেশ্য ও উপকার হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা। এটা না হলে জানার্জন পশুশ্রম মাত্র। জন্তুদের মধ্যে গাধা প্রসিদ্ধ বেওকুফ। তাই বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে)। যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট (যেমন এই ইহুদীরা)। আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ] কারণ তারা জেনে-বুঝে হঠকারিতা করে। হঠকারিতা ত্যাগ করলেই তাদের পথপ্রদর্শন হবে। তওরাত মেনে চলার জন্য রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন না করা তওরাত অমান্য করার নামান্তর। যদি তারা বলে যে, তারা এতদসত্ত্বেও আল্লাহর প্রিয়, তবে ] আপনি বলুন : হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু—অন্য মানুষ নয়, তবে (এর সত্যায়নের জন্য) তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (আমি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিচ্ছি যে) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে (অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে) কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (বিচারের দিন আসলে অপরাধের বিবরণ শুনিয়ে শাস্তির আদেশ দেবেন। শাস্তির এই প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করার জন্য আপনি একথাও) বলুন : তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, (এবং বন্ধুছ দাবী করা সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে যা কামনা কর না) সেই মৃত্যু (একদিন) অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী আল্লাহর কাছে নীত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন (এবং শাস্তি দেবেন)।

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

يَسْمِعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ —কোরআন পাকে যেসব

সূরা  **يَسْمِعُ** ও **سَمِعَ** শব্দ দ্বারা গুরু হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়।

এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্য আল্লাহর পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্ট জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রভাময় প্রস্টার প্রভা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিত্রতা পাঠ। নিতুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ প্রবণ

করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে :  —অধিকাংশ

সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে **سَبَّحَ** বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমু'আ ও সূরা তাগা-  
বুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে **يَسْبِحُ** ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে,  
অতীত পদবাচ্যে নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে।  
ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্য দুই জায়গায় এই পদ  
ব্যবহার করা হয়েছে।

এর বহ-  
شَقِيحِينَ—هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا

বচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার  
প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার  
মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আরবদের জন্য এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে  
এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই  
এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন,  
তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন  
শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন  
নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সা)-এর অলৌকিক  
ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই  
নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধি  
ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পন্নগছর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য : يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُم

—এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূল-  
—الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

জাহ (সা)-র তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে : এক. কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত,  
দুই. উশ্মতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, তিন.  
কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উশ্মতের জন্য যেমন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত, তেমনি রসূল-  
জাহ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

—تِلَاوَتِهِ— يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

আল্লাহর কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। **آيَات** বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো  
হয়েছে। **عَلَيْهِمْ** শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলজাহ (সা)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে,  
তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য **يُرِيهِمْ**—এটা **نَزْلَةً** থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা।

অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য **يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ**—‘কিতাব’ বলে কোরআন পাক

এবং ‘হিকমত’ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকার এখানে হিকমতের তফসীর করেছেন সুম্মাহ্।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যিক সম্ভব ছিল। কেননা, এই বিষয়-সম্বন্ধে স্বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তিলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সত্তার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরগতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পাল্লা আসে। কোরআন পাকে এই আয়াত কয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তিলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রাহল-মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হত, তবে এই বিষয়সমূহ মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হত, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমাপ্তিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়সমূহে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তফসীর অনেক জাতব্য বিষয়সহ বণিত হয়েছে।

**أَخْرَيْنَ—وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

এর শাব্দিক অর্থ অন্য লোক। **لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ**—এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরঙ্করদের সাথে মিলিত হননি। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মু'মিন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ—(রাহল-মা'আনী)

কেউ কেউ **أَخْرَيْنَ** শব্দটিকে **عُطِفَ**—এর উপর করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে নিরঙ্করদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরঙ্করদের সাথে মিলিত হননি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই

করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্য প্রেরণ করা **فِي** শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ **عطف** শব্দের **أَخْرَيْنَ** -এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা দেন নিরকরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—( মাযহারী )

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুম'আ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি **وَ أَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ** পাঠ করলে আমরা আরম্ভ করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এরা কারা? তিনি নিরকর রইলেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রস্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারসী (রা)-র গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন : যদি ঈমান সুরাইয়া নক্করের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—( মাযহারী )

এই রেওয়াজেতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও **أَخْرَيْنَ** অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ক্ষয়ীলত ব্যক্ত হয়েছে।—( মাযহারী )

**مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْعِمَارِ بِحَمْلِ آسْفَارٍ**

—এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরকর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের উচিত ছিল। কিন্তু পাখিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মুগ্ধ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল অর্থাৎ অযাচিতভাবে আন্না-হু'র এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একে বহন করেনি অর্থাৎ তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরোয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জান-বিজ্ঞানের রহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকারও হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পাখিব সূখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায় কিন্তু এর দিক-নির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেন : যে আলিম তার ইল্ম অনুযায়ী আমল করেন না, তার দৃষ্টান্তও ইহদীদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

نَهْ مَحْقُوقٌ بُوْد نَهْ دَا نَشْمَد  
چَار پَائے بَر و کتَابے چَلَد

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনটাই নয়—সে কয়েকটি কিতাব বহন-কারী চতুর্দশ জন্তু মাত্র।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ  
النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ مَا دَقِيْن ۝

ইহদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, نحن اِِبْنَاءُ

اللَّهِ وَ اَحِبَّاءُهُ অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহর সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের

ব্যতীত অন্য কাউকে জাম্মাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না বরং তাদের বক্তব্য ছিল :

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا

দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জাম্মাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জাম্মাতীয় মনে করত। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনেপ্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্র আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদে পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : আপনি ইহদী-দেরকে বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহ-র বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত থাক।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَ اَبْدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ اِيْدِيْهِمْ :

অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্য কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার ঘে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্য তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে যে, ইহদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যদি একুণে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রাহল-মা'আনী)

মৃত্যু কামনা জাম্য়েয কি না : সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জাহান্নাতে যাবে এবং কোন প্রকার শাস্তির আশংকা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করারই নামান্তর।

—قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَأَ قُلُوبَكُمْ

উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন : যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান : যেসব বিষয় স্বভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন ভান-বুদ্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী নয়। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরীয়ত উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু আল্লাতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিষ্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোন মারাত্মক বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোন জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জাম্য়েয কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাস'আলা। ফিকহ্ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তফসীরে রাহল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرَ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا  
 قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
 اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا  
 إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ  
 التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

(৯) হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে ছুঁড়া কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন: আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন ( জুমু'আর ) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের ( অর্থাৎ নামায ও খোতবার ) পানে ছুঁড়া করে চল এবং বেচাকেনা ( এমনিভাবে প্রতিবন্ধক কর্মব্যস্ততা ) বন্ধ কর। ( অধিক গুরুত্বদানের জন্য বিশেষভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বেচাকেনা বর্জন করাকে উপকার বর্জন করা মনে করা হয় )। এটা ( অর্থাৎ বেচাকেনা ও কর্মব্যস্ততা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ছুঁড়া করা ) তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। ( কেননা, এর উপকারিতা চিরস্থায়ী এবং বেচাকেনা ইত্যাদির উপকারিতা ক্ষণস্থায়ী )। অতঃপর ( জুমু'আর ) নামায সমাপ্ত হয়ে গেলে ( ইস-লামের প্রথমদিকে খোতবা পরে পাঠ করা হত। এমতাবস্থায় নামায সমাপ্ত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নামায ও খোতবা উভয়ই সমাপ্ত হওয়া, তখন তোমাদের জন্য অনুমতি আছে যে ) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ( অর্থাৎ তখন পাথিব কাজকর্মের জন্য হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি আছে ) এবং ( এ সময়ও ) আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর ( অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পাথিব কাজকর্মে মশগুল হয়ে না ) যাতে তোমরা সফলকাম হও। ( কারও কারও অবস্থা এই যে ) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যায়। বলুন: আল্লাহ্র কাছে যা ( অর্থাৎ

সওয়াব ও নৈকট্য) আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (যদি তা থেকে রিযিক বৃদ্ধির মালসা থাকে, তবে বুঝে নাও যে) আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (তাঁর জরুরী ইবাদতে মশগুল থাকলে তিনি নির্ধারিত রিযিক দান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর আদেশ কেন বর্জন করা হবে ?)

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের

দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষ দিন ছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জাম্মাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জাম্মাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কিয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্য এই দিন রেখে-  
ছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহদীরা 'ইয়াওমুল সাবাত'  
তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খৃস্টানরা রবিবারকে।  
আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে।  
—(ইবনে কাসীর) মূর্খতা যুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরাবা' বলা হত। আরবে কা'ব  
ইবনে লুই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। এই দিনে কোরায়েশদের সমাবেশ  
হত এবং কা'ব ইবনে লুই ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পাঁচশ  
ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্খতা  
যুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের তওফীক দান করেন। তিনি  
রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরায়েশ গোত্র তাঁকে  
একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়্যত লাভের পাঁচশ  
ষাট বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরায়েশরা তাদের বছর গণনা শুরু  
করে। শুরুতে কা'ব গৃহের ডিঙি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত।  
কা'ব ইবনে লুই-এর মৃত্যুর পর তার মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়।  
এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন  
থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে



লুই-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমু'আর দিন রেখেছিলেন।—(মাসহারী)

কোন কোন রেওয়াজে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমু'আর নামায করায় হওয়ার পূর্বেই স্বকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমু'আর দিনে সমাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত।—(মাসহারী)

فِدَاءُ مَلُوَّةٍ—فُؤْدِي لِلْمَلُوَّةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ বলে আযান বোঝানো

হয়েছে। سعی শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্য দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: শান্তি ও গাভীর সহকারে নামাযের জন্য গমন কর। আযাতের অর্থ এই যে, জুমু'আর দিনে জুমু'আর আযান দেওয়া হলে আলাহ্‌র রিষিকের দিকে ত্বরা করা। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্য মসজিদে যেতে যত্ববান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোয়রাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে কাসীর) زُكِرَ اللهُ বলে জুমু'আর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাসহারী)

وَذَرَوْا الْبَيْعَ—অর্থাৎ বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে বোঝা যায় যে,

জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলা বাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

ভাষ্য : জুমু'আর আযানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্ম-ব্যস্ততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমু'আর নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমু'আ হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আযাতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামাযে গমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব আযানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

শুরুতে জুমু'আর আযান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুর্পাশে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আযান দু'র পর্যন্ত গুনা যেত না। তখন হযরত ওসমান

(রা) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওয়ার আরও একটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এই আযান সমগ্র মদীনা শহরে শুনা যেত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আযান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আযানের পর বোচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আযানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আযানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তফসীর ও ফিকহের কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোন প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন মোহররের পরিবর্তে জুমু'আর নামায ফরয। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমু'আর নামায সাধারণত পাঁজের নামাযের মত নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাঁজের নামায একাকী জামা'আত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমু'আর নামায জামা'আত ব্যতীত আদান্ন হয় না। জামা'আতের সংখ্যায় ফিকহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। এমনিভাবে পাঁজের নামায নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্র আদান্ন হয়, কিন্তু জুমু'আর নামায এসব জায়গায় কান্নও মতে আদান্ন হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয়। তারা জুমু'আর পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমু'আ ফরয, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। ইমাম শাফেরী (র)-র মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুক্ত, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জুমু'আ হতে পারে। এর কম হলে জুমু'আ হবে না। ইমাম মালেক (র)-এর মতে জুমু'আর জন্য এমন জনপদ জরুরী, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আহমদ আবু হানীফা (র)-র মতে জুমু'আর জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোন বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলিম একমত যে, সর্বাধিক প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমু'আ ফরয নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরয, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকীদ সহকারেই ফরয। তাদের মধ্যে কেউ শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতিরেকে জুমু'আ ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ হাদীসসমূহে কঠোর শাস্তিবাদী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমু'আর নামায আদান্ন করে, তাদের জন্য বিশেষ ক্ষমীলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

پُورِئَ فَارَا قُضِيَتِ الْمَلُوَّةُ فَاتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

আয়াতসমূহে জুমু'আর আযানের পর বোচাকেনা ইত্যাদি পাখিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমু'আর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

জুমু'আর পরে ব্যবসায়ের স্বরকত : হযরত এরফ ইবনে মালেক (র) যখন জুমু'আর নামাযান্তে বাইরে আসতেন তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিশেনাজ দোয়া পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا  
أَمَرْتَنِي فَأَرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরয নামায পড়েছি এবং তোমার আদেশ মত নামাযান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্বীয় কৃপায় আমাকে রিযিক দান কর। তুমি উত্তম রিযিকদাতা।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমু'আর পরে ব্যবসায়িক কাজ-কান্নবান্ন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাখিল করেন।—(ইবনে কাসীর)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَبْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا  
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٥

এই আয়াতে তাদেরকে হ'শিয়ায় করা হয়েছে, যারা জুমু'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কান্নবান্নে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে কাসীর বলেন : এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামাযের পর জুমু'আর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমু'আর দিনে রসূলুল্লাহ (সা) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাক্ফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং চোল ইত্যাদি পিঠিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ (সা) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বারজন বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়াজে আছে, রসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন : যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আম্রাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত—(ইবনে কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাক্ফেলাটি ছিল দেহ'ইয়া ইবনে খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সত্তার নিয়ে এসেছিল। তার কাক্ফেলায় সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাক্ফেলার কাছে যেত। দেহ'ইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবু মাজেক (র) বলেন : এই কাক্ফেলার আগমনের সময় মদীনার নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবাদি দুপ্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—(মায়হারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবানে কিরাম বাণিজ্যিক কাক্ফেলার আওলায় শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। খোতবা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল না যে, এটাও ফরয। দ্বিতীয়ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেবীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কিরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হুঁশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমু'আর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাই সুন্নত।—(ইবনে কাসীর)

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)—কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উভয়। এটাও অবাস্তব নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাশিল হবে, যেমন পূর্বে এমনি এক রেওয়াজে বর্ণিত হয়েছে।

سورة المنافقون

सूरा मुनाफिकून

मदीनाह अवतीर्ण, ११ आयात, २ रूकू'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ  
لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ  
جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ وَإِذَا  
رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ  
خَشَبٌ مُسْتَدَدٌ ۖ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَادُوا فَاحْذَرُهُمْ ۖ  
قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّهُ يُؤْفِكُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ  
رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَدَارُكُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَآيَاتُهُمْ يُصَدِّقُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝  
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ كُنْ يُغْفَرُ  
اللَّهُ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ  
لَا تُنْفِقُوا عَالِيَّ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۖ وَاللَّهُ خَزَائِنُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لِنَبِ  
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۖ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ  
الْقُدْرَةُ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে চালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনে। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা এস, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্রমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে : আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে যারা আছি, তাদের জন্য ব্যয় করো না; পরিণামে তারা আপনা আপনি সেরে যাবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ডাণ্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে : আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে : আমরা (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (স)। আল্লাহ তো জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উজ্জ্বল মিথ্যা বলা যায় না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশ্যই মিথ্যাবাদী (যে, তারা মনেপ্রাণে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ, তাদের এই সাক্ষ্য নিছক মৌখিক—আন্তরিক নয়)। তারা তাদের শপথসমূহকে (জান ও মাল বাঁচানোর জন্য) চালরূপে ব্যবহার করে। (কেমনা, কুফর প্রকাশ করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাফিরের মত হত—তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত ও লুণ্ঠিত হত)। অতঃপর (এই অনিশ্চয়ের সাথে এ কটি সংক্রামক অনিশ্চয় রয়েছে। তা এই যে) তারা (অপরকেও) আল্লাহর পথ থেকে নিরুত্তর করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললাম) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) বিশ্বাস করেছে, অতঃপর (তাদের শয়তানদের কাছে যেয়ে

إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

—এই কুফরী বাক্য বলে) কাফির হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কপটতার কারণে

তাদের কর্মকে মন্দ বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা জঘন্যতম কুফর)। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্য বিষয়) বুঝে না। (তারা বাহ্যত এমন চটপটে যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান-শওকতের কারণে) তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে আর (কথায় এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাজ্ঞ ও মিষ্টি হওয়ার কারণে) শুনে, (কিন্তু যেহেতু অন্তঃসার্বশূন্য, তাই বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রক্ষে বিশাল বপু, কিন্তু নিঃপ্রাণ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরূপ কাঠ মোটেই উপকারী নয়। এমনভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শানদার, কিন্তু ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আশংকায় থাকে যে, মুসলমানরা কোন সময় আডাসে-ইঙ্গিতে অথবা ওহীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কাফিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও মুক্কাভিয়ান পরিচালিত হবে। এই ধারণায় তারা এতটুকু শংকিত থাকে যে,) প্রত্যেক শোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত) শত্রু। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আস্থা স্থাপন করবেন না)। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা (সত্য ধর্ম থেকে) কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (অর্থাৎ রোজই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দৃষ্টিমির অবস্থা এই যে) যখন তাদেরকে বলা হয় : [রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে] এসো, আল্লাহর রসূল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দৃষ্টান্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কুফরের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আল্লাহ তা'আলা এহেন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলে : যারা আল্লাহর রসূল (সা)-এর সাহচর্মে আছে, তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করেনা। পন্নিগামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। (তাদের এই উক্তি নিরোঁট মূর্খতা, কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ তা'আলারই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা শহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই নিমিকের একমাত্র পথ মনে করে)। তারা বলে : আমরা যদি এখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিষ্কার করব। এটা তাদের নিবৃদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে সবল এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আল্লাহর (সরাসরিভাবে) তাঁর রসূল (সা)-এর (আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে) এবং মু'মিনদেরই (আল্লাহ ও রসূলের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে)। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (তারা ধ্বংসশীল বিষয়সমূহকে শক্তির উৎস মনে করে)।

**জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়**

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা : এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়াজে অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (র)-র রেওয়াজে অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মাযহারী) ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসুলে করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্ সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষ সার্বিক হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জিহাদের সমাপ্তি ঘটল।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কুফর ও মূর্খতা যুগের শ্লোগান : কিন্তু এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন :

ما بال د عوى الجاهلية — অর্থাৎ এ কি মূর্খতা যুগের আহ্বান ! দেশ ও

বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার কারবার হচ্ছে কেন ? তিনি আরও বললেন :

دعوها فانها منتنة — এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন : প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানদের সাহায্য করা—সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিরস্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম।



এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নিবিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালিমের হাত চেপে ধরা—সে আপন সহোদর ডাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মুখ্যতাসুলভ দুর্গন্ধময় ম্লোগান। এর ফল জাজাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসুলুল্লাহ্ (সা)-র এই বক্তৃতা শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-গুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালিম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ডাই ডাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি মুছলম্বধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত কিন্তু পাখিব স্বার্থের খাতিরে নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করত। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যামেদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চড়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুবিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি হুস্তভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদী-নায় ফিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায় কিরাম। হযরত যামেদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম, তুই-ই দুর্বল, লাঞ্চিত ও ঘৃণিত। পরক্ষান্তরে রসুলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ডালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যামেদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সম্বন্ধ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যামেদের কাছে ওয়র পেশ করে বলল : আমি তো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যামেদ ইবনে আরকাম (রা) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আদ্যোপাত্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যামেদ ইবনে আরকাম (রা) অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : বৎস! দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যামেদ কসম খেয়ে বললেন : না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসুলুল্লাহ্

(সা) আবার বললেন : তোমার কোনরূপ বিব্রাতি হয়নি তো? যান্নেদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সন্দেহের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যান্নেদ ইবনে আব্বাকাম (রা)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অগবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যান্নেদ (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, সমগ্র খায়রাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) এসে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়াজে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেন : আপনি ওস্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলেন : যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরম্ভ করলেন : সমগ্র খায়রাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃ-হত্যাকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে আত্মসম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উক্তীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল : আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বাজক (যান্নেদ ইবনে আব্বাকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সন্তবত যান্নেদ ইবনে আব্বাকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসুলুল্লাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওয়র কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে য়ায়েদ ইবনে আন্নকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেকাকে এক জামগাম্ব খামিয়ে দিলেন। পূর্ণ এক দিন এক রাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পন্থিত্রান্ত সাহাবায়ে কিরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে চলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন : সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসুলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সফর করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশহুজে বললেন : তুই এক কাজ কর। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। তিনি তোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা) তখনই বললেন : আমার মনে হয়, তোর এই বিমূখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে য়ায়েদ ইবনে আন্নকাম (রা) বারবার রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ য়ায়েদ ইবনে আন্নকাম (রা) দেখলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি কুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উদ্ভৃষ্ট বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। য়ায়েদ (রা) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। য়ায়েদ (রা) বলেন : আমার সওয়ারী রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন :

يا غلام صدق الله حديثك و نزلت سورة المنة فقهين في ابن ابي من اولها الى اخرها -

অর্থাৎ হে বালাক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়াজেতে থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগডী (র)-র রেওয়াজেতে আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরানাখিল হয়েছে।

এক রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়েনের মু'মিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়েনের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন : আল্লাহর কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত 'সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে'—এ কথাই ব্যাখ্যানা কর। এই বাক্যে 'সবল' কে?—রসূলুল্লাহ্ (সা), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্বাবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল : আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে : আমি তো ছেলেরপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) পুত্রকে বললেন : তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য আসলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মসনদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হলে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন : আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্য এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত। তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ভাবে তিনি পূণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বর্ণনা করেন : “রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।”

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূণ্যময়ী বিবিদের কাতানে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্য নারীরাও এই শুভ বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযাদে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ : উপরোক্ত ঘটনা সূরা মুনাফিকুনের তফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই :

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন : বনিল মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের ঝগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারামাত করেছিলেন এবং যে কোন স্থানের অধিবাসী, যে কোন বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে নিয়মিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামী সমাজে প্রথিত করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিন্তাচরিত জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সমগ্র সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী মাপকাঠি ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোষ্ঠী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। উপরোক্ত ঝগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যথাসময়ে অকুস্থলে পৌঁছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মূর্খতা ও কুফরের দুর্গন্ধযুক্ত অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে :

## تَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপ-কাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভ্রাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কাল্য়ম করেছে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হুজ্জের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন : মুর্খতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষ্ণকায়, স্বেতকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয়—আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কৃষ্ণর ও ধর্মপ্রোহিতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজাজী, ইয়ামনীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ উপমহাদেশেও পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষয়িক কলহ-বিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং আমরা সর্বত্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কোরআনের মূলনীতি ও রসুলুল্লাহ্ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব স্ব ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহায্যে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা : উপরোক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মুর্খতা যুগের ম্লোগানে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হ'শিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রাতা ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রসুলের মহব্বত

এবং সন্ত্রম এমনই বন্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খায়রাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্মান ও সন্ত্রমের প্রবৃত্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রসুলুজাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙা জওয়াব দিলেন। এরপর রসুলুজাহ্ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রসুলুজাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-র আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সন্ত্রম কেবল আল্লাহ্ ও রসুলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রসুলুজাহ্ (সা)-র কাছে হামির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রসুলুজাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলে মদীনার সন্নিহিতে পৌঁছে পিতার সওয়ালী বসিয়ে দিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রসুলুজাহ্ (সা) এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্চিত। অতঃপর রসুলুজাহ্ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয় :

تو نخل خوش ثمر گيستی که سرو و سمن  
همة ز خویش برید ند و با تو یو ستند

এ ছাড়া বদর, ওহদ ও আহযাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ্ ও রসুলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দূশমন।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد  
خدا که پیک تن بیگانه کا شنا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব : এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রসুলুজাহ্ (সা) মুনাক্কির সরদার ইবনে উবাইয়ের রূপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেননা, এতে আশংকা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে : রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়াজে থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশংকার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশংকার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশংকা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَفْغِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল : তুই জানিস কোরআনে তোঁর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হামির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসুলুল্লাহ্ (সা) তোঁর জন্য আচ্ছাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল : তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সা)-কে সিঁজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌঁছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মামহারী)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا

আহজাহ্ মুহাজির ও মিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আচ্ছাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আচ্ছাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এ স্থলে لَا يَفْقَهُونَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُولُونَ لَنْ نَرَجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَخَيْرِجَنَ الْأَعْرَضِ مِنْهَا الْأَزَلَّ



এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইয়যতদার এবং এর বিপরীতে রসুলুল্লাহ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইয়যত ওয়াল্লারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইয়যত তো আল্লাহর, তাঁর রসুলের এবং মু'মিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মুখতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বেখবর। এখানে কোরআন <sup>لَا يَعْلَمُونَ</sup>

এবং এর আগে <sup>لَا يَفْقَهُونَ</sup> শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের ঋণিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নিবুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইয়যত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে <sup>لَا يَعْلَمُونَ</sup> বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ① وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ② فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ③ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ④

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো কৃতপ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সংকমীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ( অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু ) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ( ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন ) থেকে গাফেল না করে ( অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ে না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরাপ করবে, তারা ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ( কারণ দুনিয়ার উপকার তো খবংস হয়ে যাবে ; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে।

لَا تَلَهُمْ أَمْوَالُهُمْ

এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে

একটি বিশেষ আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছে : ) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ( জরুরী প্রাপ্য ) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে ( পরিতাপ করে ) বলবে : হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন ? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। ( তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ ) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন ( খতম হয়ে ) আসে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত ( কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلَهُمْ أَمْوَالُكُمْ

মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আশ্র-রক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহাত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকুতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সঙ্ঘোষন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে য়োনা। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ব-রুহৎ—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সন্তারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়—ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জগানা নামায, ক্বারও মতে হজ্ব ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।—( কুরতুবী )

সারকথা এই যে, আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এডটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে

এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজিব কর্মে বিলম্ব দেখা দেয় অথবা হারাম ও মকরাহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরাপ

মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **أَوْ لَا تَكُ هُمْ الْخَاسِرُونَ** অর্থাৎ

তারা ই কতিপ্রস্তু। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে।

এই—**وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ**

আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পূঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ব্ব্বহৎ বশ্ব হচ্ছে-ধন সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্ব ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাফা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাফা হজ্ব আদায় করবে অথবা কাফা রোযা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েছেই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের স্তুতি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল : কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন : যে সদকা সূস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে—অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন : আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কষ্ঠ-নালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল : এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

—**لِيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ**

এই আয়াতের তফসীরে বলেন : যে ব্যক্তির যিশ্মায় যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে : আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই

অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই।

— أَكُنْ مِنَ الْمُنِيفِينَ

এমন সৎ কর্ম করে নেব, যম্ভারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরাহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسْمِعُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعِزَّةُ  
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ  
 مُؤْمِنًا ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ يَعْلَمُ مَا  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ، وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ الْمُرْيَاتِكُمْ نَبِؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
 زَفَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ  
 تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرًا يَهْدُونَنَا ، فَكَفَرُوا وَ  
 تَوَلَّوْا وَاسْتَعْفَى اللَّهُ ، وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ ۝ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ، قُلْ بَلْ وَرِثِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْتَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ،  
 وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ فَأَمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ  
 التَّغَابُنِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ  
 وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
 أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

প্ৰথম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষ্ণুর সর্ব শক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আপমন করলে তারা বলত : মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফির হয়ে পেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ পরওয়ালীহীন, প্রশংসার্থ। (৭) কাফিররা দাবী করে যে, কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৯) সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এ দিন হার জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাক্ষ্য। (১০) আর যারা কাফির এবং আমার আল্লাতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাঁরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল এটা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্ব-শক্তিমান। (এটা পরবর্তী বর্ণনার ভূমিকা অর্থাৎ যিনি এমন পূর্ণতাগুণে গুণাবিত, তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব এবং অবাধ্যতা গোনাহ্)। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (এ কারণে সবারই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল)। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (ঈমান ও কুফরের) কাঙ্ক্ষকর্ম দেখেন। (সুতরাং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে (অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উপকারিতা পূর্ণরূপে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। ( কেননা

মানবাকৃতির সমান কোন জীবের আকৃতিতে সৌচ্য নেই)। তাঁর কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সব জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (এসব বিষয়ের দাবী এই যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এছাড়াও) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? (এসব বৃত্তান্তও তোমাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব করে)। অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি (দুনিয়াতেও) আন্দান করেছেন এবং (এ ছাড়া পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মর্মসুদ আযাব। এটা (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের শাস্তি) এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসুলগণ প্রকাশ্যে নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করলে তারা (রসুলগণের সম্পর্কে) বলাবলি করত—মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে (অর্থাৎ মানুষ কি কখনও পয়গম্বর ও পথপ্রদর্শক হতে পারে)? মোটকথা, তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের পরোয়া করলেন না (বরং পর্যুদস্ত করে দিলেন)। আল্লাহ্ (সবকিছু থেকে) পরোয়াহীন (এবং) প্রশংসার্হ। (কারণও অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং আনুগত্যে উপকার হয় না। স্বয়ং অনুগত ও অবোধেরই লাভ লোকসান হয়)। কাফিররা (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ বাক্যে পরকালীন

আযাবের কথা শুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুদ্ভূত হবে না (যার পর عَذَابٌ أَلِيمٌ হওয়ার কথা) আপনি বলে দিন, অবশ্যই হবে; আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুদ্ভূত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে (এবং তদনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে)। এটা (অর্থাৎ পুনরুদ্ভূত ও প্রতিদান) আল্লাহ্‌র পক্ষে (সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণ সহজ। অতএব (ঈমানের এসব কারণ উপস্থিত আছে বলে) তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং আমার অবতীর্ণ নবীর অর্থাৎ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমাবেশ দিবসে একত্র করবেন। এদিনই লাভ লোকসান জাহির হওয়ার দিন। (অর্থাৎ মুসলমানদের লাভ এবং কাফিরদের লোকসান এই দিনে কার্যত জাহির হবে। এর বর্ণনা এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে (জাহান্নামের) উদ্যানে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নির্ঝরিসমূহ প্রবাহিত হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটা মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। এটা খুব মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থান।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে

সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর অর্থ ভাগন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফির

ছিল না। এই কাফির ও মু'মিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্রমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্রমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **كل مولود يولد على الفطرة فإبواه يهود أو ينصر أو يمجس**

—অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাব-ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে (যার ফলে তার মু'মিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল)। কিন্তু এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।—(কুরতুবী)

**দ্বিজাতি তত্ত্ব :** কোরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে—কাফির ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোষ্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোষ্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে একমাত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, সে মানবগোষ্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমাত্র ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনটিই মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়। কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মুর্থতা মুগে বংশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব প্রতিমাকে ভেঙে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোন দেশ, যে কোন ভূখণ্ড, যে কোন বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা একগোষ্ঠীভুক্ত। কোরআন বলে : **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ**

**أَخَوَةٌ** মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। এমনিভাবে কাফির যে কোন দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফির—এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে তিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কুফরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তি-শীল। কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা



يُوقَ شَرَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ تَقْرُؤُوا لِلَّهِ  
 قَرْضًا حَسَنًا يَضْرِبُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝  
 عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(১১) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ, সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (১৩) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মু'মিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মু'মিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুষমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা-স্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, ওন, আনুগত্য কর এবং ব্যস্ত কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কুফর যেমন পরকালীন সাফল্যের পথে পুরাপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ইত্যাদিতে মগণ হলে আল্লাহর আদেশ পালনে ত্রুটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে এরূপ মনে করা উচিত যে, ) কোন বিপদ আল্লাহর আদেশ ব্যতিরেকে আসে না। ( এরূপ মনে করে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করা উচিত )। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে (সবর ও সন্তুষ্টির) পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (কে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেন। সার কথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে ) আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর। যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখ, ) আমার রসূল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (এই দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহর ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগ্রস্তদের এরূপ মনে করা উচিত যে, ) তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের (খর্ষের )

দুশমন ( যদি তারা নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এমন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারলৌকিক অনিশ্চিৎ আছে। ) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক ( এবং তাদের উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাক। ) যদি ( তোমরা এরূপ ক্ষরমায়েশের কারণে রাগ করে তাদের প্রতি কঠোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি ) তোমরা ( তাদের তখনকার ত্রুটি ) মার্জনা কর ( অর্থাৎ শাস্তি না দাও ), উপেক্ষা কর ( অর্থাৎ বেশী তিরস্কার না কর ) এবং ক্ষমা কর ( অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে যাও ) তবে আল্লাহ তা'আলা ( তোমাদের গোনাহের জন্য ) ক্ষমাশীল, ( তোমাদের অবস্থার প্রতি ) করুণাময়। ( এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্তি দিলে নির্ভীক হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় ক্ষমা করা মোস্তাহাব। অতঃপর ধনসম্পদ সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে : ) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। ( উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং কে স্মরণ রাখে। যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহকে স্মরণ রাখে, তার জন্য ) আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব ( এসব কথা শুনে ) তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, ( তার আদেশ-নিষেধ ) শুন, আনুগত্য কর এবং ( বিশেষভাবে যেখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে ) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। ( সম্ভবত এটা সুকঠিন বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ) যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তা'রাই ( পরকালে ) সফলকাম। ( অতঃপর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ( আন্তরিকতাপূর্ণ ) ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মার্ফ করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ( সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং ) সহনশীল ( গোনাহ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না )। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জানী, পরাক্রান্ত, প্রভাময়। ( حَكِيمٌ تَعْلَمُ سِرُّهُمْ ) থেকে শুরুর পর্যন্ত বিষয়বস্তু সূরার বিষয়বস্তুর কারণ স্বরূপ। )

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

— مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ

অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেথাও সামান্যতম বস্তুও নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্য কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হাহাশাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মু'মিনের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত হয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার

শব্দটি **صهفة مجهول** এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য **باب سمع** থেকে ব্যবহৃত হয়। **نغابن** শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য বলা হয় অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরকালে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন—একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর জান্নাতের গৃহের মথার্থ কদর তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরও বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফির, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জান্নাতে ছিল, সেগুলোও জান্নাতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহান্নামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়াজেত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয় করলেন : যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির পূঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবী পেশ করবে। কেউ তার নামায নিয়ে যাবে, কেউ রোযা, কেউ যাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বুখারীর এক রেওয়াজেতে রসূলে করীম (সা) বলেন : যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থকবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফির,

পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; বরং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জাহান্নামের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্য পরিতাপ করবে, যা অস্বাভাবিক বয়স করেছে। হাদীসে আছে :

من جلس مجلساً

لم يذكر الله فيه كان عليه حصره يوم القيامة — যে ব্যক্তি কোন মজলিসে

বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে প্রত্যেক মু'মিনও সেদিন সৎকর্ম হ্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কিয়ামতের নাম **يوم الحسرة** পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

— وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ —

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে :

রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীলে বলা হয়েছে, সেদিন জালিম ও দুষ্কর্মীরা তাদের হ্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিতাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি— এমন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিতাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ হ্রুটির কারণে অনুতপ্ত হবে এবং কম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ

قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۝

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا يَرْسُلْنَا الْبَلَاءَ الْيُسْتَبِينَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فليَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَعُدْوَانِكُمْ فَاخَذُواكُمْ وَإِن تَعَفُوا

وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ

أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْدُ عَظِيمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا

اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۝ وَمَنْ

ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোন মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাধারণ প্রহণ করতে সক্ষম হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামী গোষ্ঠী ও ঈমানী প্রাভুত্বই অষ্টদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, স্নেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সূতায় গ্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মুকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমাগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, যেগুলোকে রসুলুল্লাহ (সা) খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শত্রুদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অভূত পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানী শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মুকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

وَصَوْرُكُمْ فَاحْسِنُ صُورَكُمْ—তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন,

অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সূত্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যই আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে **صَوْر** অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্ট জগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাক্ষা বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাষ্কর্য দেখে জানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গইঞ্জির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য

আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : **فَاحْسِنُ صُورَكُمْ**

অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্ট জীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর

ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে মতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সূত্রী।

بَشْرًا—শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়।

তাই **يَهْدُونَ** বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নব্বয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফিরদের একটি অলৌকিক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সা)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নব্বয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রিসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূলে নয়। রসূল (সা) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্ড্রের নূরের নিরিখে বিচার করা ভুল।

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا

আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি। এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সম্ভৃষ্টি ও অসম্ভৃষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ : কিয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ :

ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ —যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্র করবেন একত্র করার

দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। **يَوْمِ الْجَمْعِ** একত্রিত হওয়ার দিবস ও

**يَوْمُ التَّغَابُنِ** লোকসানের দিবস—এই উভয়টি কিয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার

দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করা হবে। পক্ষান্তরে **تَغَابُنِ** শব্দটি থেকে ব্যুৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে **تَغَابُنِ** বলা হয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন : আর্থিক লোকসান জাপন করার জন্য এই

সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যশ্বারা দুনিয়ার বৃহত্তম বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدَّةٌ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

—অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় করা। তিরমিমী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।

— (রূহল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আযাব ও জাহায্যামের অগ্নিতে লিপ্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদীনায় ছিলেন এবং যখনই কোন যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুরু করে দিত : আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবান্বিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন।—( ইবনে কাসীর )

উপরোক্ত উভয় রেওয়াম্বের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অব-তরণের কারণ হতে পারে। কেননা, হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আলাহর ফরয পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

وَأِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ—পূর্ববর্তী আয়াতে

যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের জুল বুঝতে পেরে ভবি-ষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে : যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্য শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না, বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্য কণ্যাপ-কর। কেননা, আলাহ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্‌গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কহেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত : আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কহেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়।---( রূহল-মা'আনী )

فَتَنَّةٌ—إِنَّمَا أَصْوَابُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ

উদ্দেশ্য এই যে, ধনসম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এ সবেক মহক্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে না, মহক্বতকে স্বাধীনতার রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

ধনসম্পদ সম্ভান-সম্ভতি মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা : সত্য বলতে কি ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতির মহক্বত মানুষের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহক্বতের কারণেই গোনাহে—বিশেষত অবৈধ—উপার্জনে লিপ্ত হয়। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে দেখে অন্যরা বলবে :  
 اكل عيالاً حسناً ۗ অর্থাৎ তার পুণ্যগুলোকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেছে।

—(রাহুল-মা'আনী) এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) সম্ভানদের সম্পর্কে বলেন :  
 مبخلة ۗ অর্থাৎ সম্ভান-সম্ভতি হচ্ছে মানুষের রূপগতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহক্বতের কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহক্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে।<sup>১</sup> জনৈক পূর্ববর্তী বৃষুর্গ বলেন :  
 ا لعیال سوس الطاعات ۗ অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্য-সমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۗ—অর্থাৎ যথাসাধ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন

কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল :  
 اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۗ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে করামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বাস্তব হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া ও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বৃষতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।—(রাহুল-মা'আনী—সংক্ষেপিত)



বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এরপর তাকীদের জন্য বলা হচ্ছে : ) এটা ( অর্থাৎ যা বর্ণিত হল ) আলাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাখিল করেছেন। যে ব্যক্তি ( এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও ) আলাহ্‌কে ভয় করে, আলাহ্‌ তার পাপ মোচন করেন ( যা সর্ব্বহুৎ বিপদমুক্তি ) এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন ( যা সর্ব্বহুৎ উপকার লাভ। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তাদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে : অর্থাৎ ইচ্ছতে স্ত্রীদের আরও অধিকার আছে। তা এই যে ) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। ( অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তাকে ইচ্ছতে বাসগৃহ দেওয়াও ওয়া-জিব তবে বাইন তালাকে উভয়ের এক গৃহে নির্জনবাস জায়েয নয়, বরং উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা জরুরী )। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে ( বাসগৃহের ব্যাপারে ) সংকটাপন্ন করো না ( উদাহরণত এমন কিছু করো না, যাতে সে উদ্ভ্যক্ত হয়ে বের হয়ে যায় )। যদি তালাক-প্রাপ্তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ( পানাহারের ) ব্যয়ভার বহন করবে। ( গর্ভবতী নয় — এমন স্ত্রীদের বিধান এরূপ নয়। তাদের ভরণ-পোষণের মেয়াদ তিন হায়েয অথবা তিন মাস। এসব বিধান ইচ্ছত সম্পর্কে বর্ণিত হল। ইচ্ছতের পর ) যদি তারা ( পূর্ব থেকে সন্তানওয়ালী হোক কিংবা সন্তান প্রসবের পর ইচ্ছত শেষ হোক ) তোমাদের সন্তানদেরকে ( পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ) সন্তানদান করে তবে তাদেরকে ( নির্ধারিত ) পারিশ্রমিক দেবে এবং ( পারিশ্রমিক সম্পর্কে ) পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। ( অর্থাৎ স্ত্রী বেশী দাবী করবে না যে, স্বামী অন্য ধাত্রী খোঁজ করতে বাধ্য হয় এবং স্বামীও এত কম পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না, যাতে স্ত্রীর কাজ না চলে। বরং উভয়ই যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যাতে মাতাই সন্তানকে সন্তানদান করে। এটা সন্তানের জন্য বেশী উপকারী ) তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী সন্তানদান করবে। ( অর্থাৎ তখন অন্য নারী খুঁজে নাও — মাতাকে বাধ্য করো না এবং পিতাকেও না। এই খবরসূচক বাক্য পুরুষকে অল্প পারিশ্রমিক দিতে চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, কোন-না-কোন নারী তো সন্তানদান করবে এবং সে-ও সম্ভবত কম পারিশ্রমিক নেবে না। এমতাবস্থায় মাতাকেই কম দিতে চাও কেন? স্ত্রীকেও বেশী পারিশ্রমিক চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, তুমি সন্তানদান না করলে অন্য কেউ সন্তানদান করবে। দুনিয়াতে তুমিই তো একা নও যে, এত বেশী পারিশ্রমিক দাবী কর। অতঃপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে : ) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ( সন্তানের জন্য ) ব্যয় করবে। যার আমদানী কম সে আলাহ্‌ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। ( অর্থাৎ গরীব ব্যক্তি গরীবানা মতে ব্যয় করবে। কেননা ) আলাহ্‌ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। ( গরীব ব্যক্তি যেন ভয় না করে যে, ব্যয় করলে কিছুই থাকবে না, যেমন কেউ কেউ এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করে দেয়। তাই ইরশাদ হচ্ছে : ) আলাহ্‌ তা'আলা কষ্টের পর সুখ দেবেন ( যদিও

তা প্রয়োজন মাক্ফই হয় )। এর অনুরূপ অন্য আয়াতে আছে : **وَلَا تَغْنُلُوا أَوْلَادَكُمْ**

**خَشْيَةَ اسْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّامُ**

### আনুযায়িক জাতিব্যবস্থা

বিবাহ ও তালাকের শরীয়তসম্মত মর্ষাদা ও প্রজাতিভিত্তিক ব্যবস্থা : সূরা বাকারার তফসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ জেনদেন নয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই সম্মতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কযুক্তই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসরণ করে। কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায় কোন ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্তু কোন-না-কোন প্রকারে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্ম, শিখ, অগ্নিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিকে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ জেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্য জান করে। ধর্মের এসব নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কহীন হয়ে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পাল্পস্পর্শিক সম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্ররুতি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিভাগের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে কেবল একটি জেনদেন ও চুক্তি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্ষাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্ততার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্ররুতি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপকরণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশরুদ্ধি ও সন্তান পালনের সুখম ও প্রজাতিভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল। তাই কোরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কোরআন পাঠে গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদি। কোরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কোরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্তু কোরআন পাক বিবাহ ও তালাকের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাসআলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে নাখিল করেছেন।

এসব মাসআলা কোরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক

সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (৭) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিষিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কণ্ঠের পর সুখ দেবেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পয়গম্বর (সা) ! (আপনি লোকদেরকে বলে দিন : ) তোমরা যখন (এমন) স্ত্রী-দেরকে তালাক দিতে চাও, (যাদের সাথে নির্জনবাস হয়েছে। কেননা, এমন স্ত্রীদের সাথেই

ইদতের বিধান সম্পৃক্ত, যেমন অন্য এক আয়াতে আছে : **ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَهْلٍ**

**أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ** ) তখন তাদেরকে ইদতকালের ( অর্থাৎ

হায়েমের) পূর্বে (অর্থাৎ পবিত্র থাকার অবস্থায়) তালাক দাও। (সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই অবস্থায় তালাকের পূর্বে সহবাসও না হওয়া চাই)। এবং (তালাক দেওয়ার পর তোমরা) ইদতের হিসাব রাখ। (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সবাই হিসাব রাখবে। তবে নারীরা সাধারণত ভুলে যায় বিধায় বিশেষভাবে পুরুষদেরকে হিসাব রাখতে বলা হয়েছে)। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। (অর্থাৎ এসব অধ্যায়ে তাঁর যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো লংঘন করো না; উদাহরণত এক দফায় তিন তালাক দিয়ে না, হায়েম অবস্থায় তালাক দিয়ে না এবং ইদতকালে স্ত্রীদেরকে) তাদের (বসবাসের) গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। (কারণ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় বসবাসের অধিকার রয়েছে)। এবং তারাও যেন নিজেরা বের না হয় (কারণ, বসবাসের অধিকার কেবল স্বামী প্রদত্ত হক নয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা রহিত হয়ে যাবে; বরং এটা শরীয়ত প্রদত্ত হক)। যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (লিপ্ত হলে তা ডিম কথা। উদাহরণত তারা ব্যভিচার অথবা চৌর্য কর্মে লিপ্ত হলে শাস্তিস্বরূপ বহিষ্কার করা হবে। কোন কোন আলিম বলেন : কট্টভাষিণী হলে এবং সার্বক্ষণিক কলহে লিপ্ত হলেও তাদেরকে বহিষ্কার করা জায়েয)। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে, (উদাহরণত স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়) সে নিজেরই ক্ষতি করে অর্থাৎ গোনাহগার হয়। অতঃপর তালাকদাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন তালাকের মধ্যে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়াই উত্তম। ইরশাদ হয়েছে : হে তালাকদাতা) তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় (তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি) করে দেবেন (যেমন তালাকের জন্য অনুতপ্ত হবে। তখন প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হলে ক্ষতিপূরণ সহজ হবে)। অতঃপর তারা (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা

স্ত্রীরা) যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে (এবং ইদ্দত শেষ না হয়), তখন (তোমাদের দু'রকম ক্ষমতা আছে, হয়) তাদেরকে যথোপযুক্ত পছন্দ (প্রত্যাহার করত) বিবাহে রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পছন্দ ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ ইদ্দতের শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় পথ অবলম্বন করবে না যে, রাখাও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেবে)। এবং (যাই কর, রাখ অথবা ছাড়, তার জন্য) তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। [এটা মোস্তাহাব (হিদায়্যা, নিহায়্যা) প্রত্যাহারের বেলায় এজন্য সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী ভিন্নমত ব্যক্ত না করে এবং ছেড়ে দেওয়ার বেলায় এজন্য, যাতে নিজের মনই দুশ্চিন্তামিতে প্রবৃত্ত না হয় এবং প্রত্যাহার করেছিল বলে মিথ্যা দাবী না করে বসে। হে সাক্ষীগণ, যদি সাক্ষা দানের প্রয়োজন হয়, তবে] তোমরা ঠিক ঠিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে (কোনরূপ খাতির না করে) সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তিই উপদেশ দ্বারা লাভবান হয়। নতুন উপদেশ সবার জন্য ব্যাপক। এখন উপরে নির্দেশিত তাকওয়ান্নর কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য (ক্ষয়ক্ষতি থেকে) নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং (অনেক উপকার দান করেন। তন্মধ্যে একটি বড় উপকার হচ্ছে স্নিযিক। অতএব) তাকে এমন জায়গা থেকে স্নিযিক পৌঁছান, যা তার ধারণাও থাকে না। (তাকওয়ান্নর অপর শাখা হচ্ছে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এর বৈশিষ্ট্য এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার (কার্যোদ্ধারের) জন্য তিনিই যথেষ্ট। (অর্থাৎ তিনি নিজে যথেষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। নতুবা তিনি সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট। এই কার্যোদ্ধারও ব্যাপক—অনুভূত হোক কিংবা অননুভূত হোক। কেননা) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কাজ (যেভাবে চান) পূর্ণ করে ছাড়েন। (এমনভাবে কার্যোদ্ধারের সময়ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা) আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ (স্বীয় জানে) স্থির করে রেখেছেন। (তদনুযায়ী তা বাস্তবায়িত করাই প্রভাভিত্তিক হয়ে থাকে। অতঃপর আবার বিধানাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে ইদ্দত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিত বিবরণ এই যে) তোমাদের (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীদের মধ্যে যারা (বেশী বয়স হওয়ার কারণে) ঋতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দত কি হবে, সে) ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে (যেমন বাস্তবে সন্দেহ হয়েছিল এবং প্রায় উঠেছিল) তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও হায়েযের বয়স পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ (তিন মাস) ইদ্দত হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সন্তান পূর্ন প্রসব হোক কিংবা অপূর্ন। যদি কোন অঙ্গ এমনকি, একটি অঙ্গুলিও গঠিত হয়ে থাকে। তাকওয়া নিজেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া উল্লিখিত পৃথিবী ব্যাপারাদি সম্পর্কিত বিধানাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে যে, পৃথিবী ব্যাপারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক? যেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই চলবে। তাই অতঃপর আবার তাকওয়ান্নর বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে : ) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন। (সেটা ইহকালের কাজ হোক কিংবা পরকালের

سورة الطلاق

मन्ना तालाक

मदीनाम अवतीर्ण, १२ आयात, २ रूकू'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي  
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِسَعْرٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِسَعْرٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى  
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ  
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مَخْرَجًا ۝ وَيُزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ  
قَدْرًا ۝ وَاللَّيْ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّةُ  
تِهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ  
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا ۝ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَكْفُرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ۝ اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ  
 سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ  
 فَاتْرَضِعْ لَهُ آخِرَةٌ ۝ لِيُنْفِقَ ذُو سَعْتَمِن سَعْتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ  
 رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ে ইন্দ্রতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইন্দ্রত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইন্দ্রতকালে পৌঁছে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পছায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পছায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে ত্রিষিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর উরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ স্বীয় কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সম্প্রদায় হলে তাদের ইন্দ্রত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইন্দ্রতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইন্দ্রতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাখিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোন গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্বত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এই সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন কষাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোন সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরাসনের জন্য পুরো-পুরি চেষ্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালাকের বিধান নেই, সেগুলোতে এরূপ পরিস্থিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আলাহ্ তা'আলার কাছে খুবই ঘূর্ণাহ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আলাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘূর্ণাহ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

—**تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه عرش الرحمن** অর্থাৎ বিবাহ

কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাকের কারণে আলাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠে। হযরত আবু মুসা (রা)-র রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কোন ব্যাভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ, যেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্বাদ আদ্বাদন করে, আলাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।—(কুরতুবী) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) -এর রেওয়াজেতে রসূলে করীম (সা) বলেন : আলাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আলাহ্‌র কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘূর্ণাহ ও অপছন্দনীয়।—(কুরতুবী)

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোন কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পছায় নিষ্পন্ন হতে হবে—একে নিছক মনের খাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উশ্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোন বিধান বিশেষভাবে রসূলের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রসূল' বলে সম্বোধন করা হয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ — বাফের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা

করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসুলুল্লাহ (সা)-কে সস্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সস্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষ-ভদের আগনার জন্য নয়—সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এ স্থলে বাক্য উহা সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আগনি মু'মিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালীক দেন, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান—فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتْ

এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে

ইদত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। এক. স্বামীর ইত্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদতকে 'ইদতে-ওফাত' বলা হয়। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য এই ইদত চার মাস দশ দিন। দুই. বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য তালাকের ইদত ইমাম আবু হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয। ইমাম শাফেরী (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদত তিন তোহর (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্য কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আল্লাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদত ও তালাকের ইদত একই রূপ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সা) فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتْ

পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর

এক রেওয়াজে لِقَبْلِ عَدَّتْ تِهِنَّ ও এক রেওয়াজে تِهِنَّ لِقَبْلِ عَدَّتْ বর্ণিত আছে।

—(রূহুল-মা'আনী)



বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) একথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায় হয়ে বললেন :

لَهَا جَعَهَا ثَمَّ يَمْسُكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَكُفُّ فَنَبْدُهَا فَلْيُطْلِقْهَا  
طَاهِرًا تَبْلُغُ أَنْ يَمْسُكُهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَطْلُقَ  
بِهَا النِّسَاءَ -

তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিকে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়—এক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। দুই. কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব [যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রা)-এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল]। তিন. যে তোহরে তালাক দেবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। চার.

فَطَلَّقُوا هُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

আয়াতের তকসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদুইট আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযয আবু হানীফা (র)-র মতে হায়েয থেকে ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, সেই তোহরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহর থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহরের শুরুতেই তালাক দেবে। ইদ্দত তিন হায়েয হবে, না তিন তোহর হবে—এই আলোচনা সূরী বাকারার

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

বাক্যে করা হয়েছে।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হল স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কষ্টকর। কেননা, যে হায়েযে তালাক দেবে, সেই হায়েযে তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহরও অযথা অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় হায়েয থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েযের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশী হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ

করে যে, তালাক কোন রাগ মিঠানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারক অবস্থায় উভয় পক্ষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরী যে, স্ত্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইন্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েয অথবা তোহর দ্বারা ইন্দত অতিবাহিত করা জরুরী। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর সাথে এখনও স্বামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু কোন ইন্দতই নেই, তাই তাকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয। এমনিভাবে যেসব স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বেশী বয়স হেতু হায়েয আসে না, তাদেরকে যে কোন অবস্থায় এমনি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েয। কেননা তাদের ইন্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বর্ণিত হবে।—(মায়হারী)

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে **أَحْمَاءٌ وَأَوْحَادٌ** শব্দের অর্থ গণনা করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, ইন্দতের দিনগুলো সম্বন্ধে স্মরণ রেখো এবং ইন্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মত ভুল করো না। ইন্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়, স্ত্রীরা প্রসঙ্গত তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তফসীরের সান্ন-সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে **لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ**—অর্থাৎ

স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয় বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং ইন্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইন্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম, যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইন্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আঞ্জাহরও হক, যা ইন্দত পালন-কারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে **أَلَا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ**—অর্থাৎ ইন্দত পালন-

কারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্জঙ্ক কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্জঙ্ক কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

এক. নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয় বরং নিষেধাত্মকে আরও জোরদার করা। উদাহরণত এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যই বিসর্জন দেয় অথবা ভূমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, ভূমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধা হয়ে যাও। বলা বাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম ঘাট্টা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধাতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয় বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবেনা, কিন্তু যদি তারা অস্বীকারই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয় বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সুন্দী, ইবনে মায়েব, নাখরী (র) প্রমুখ থেকে বণিত আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।—( রাহুল মা'আনী )

দুই. নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই তাকে ইন্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হযরত কাভাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী, যালেদ ইবনে আসলাম, মাহ্‌যাক, ইকরিমা (র) প্রমুখ থেকে বণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

তিন. নির্লজ্জ কাজ বলে কষ্ট কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কষ্টভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইন্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একাধিক রেওয়াজে বণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে

কা'ব ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর কেরাত এরূপ <sup>أَلَا</sup> <sup>أَنْ</sup> <sup>يَفْعَلَنَّ</sup> এই শব্দের

বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।—( রাহুল মা'আনী ) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বণিত হল। পরে আরও বিধান বণিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বণিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কোরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আলাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ করিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাণ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবস্থা কোন আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আলাহুতীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ - لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ আইন-কানূনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে অর্থাৎ আল্লাহ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পূর্ণ হতে পারে, যার পর পারম্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনবিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয় বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। এক. আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন লংঘন করার শাস্তি এবং দুই. স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি। এর স্বরূপ এই :

يُنَادِيَنَّ سَتْمَكْرَ جَفَا بَرٍ مَا كَرَدَ  
بِرْكَوْدِنِ وَّ بِمَا نَدِ وَّ بِرِ مَا كَذَّ شَتَّ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا অর্থাৎ তুমি জান না সন্তবত আল্লাহ

তা'আলা এই রাগ-গোসার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আত্মীয়, সন্তানের লালন-পালন এবং পুত্রের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানূনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ব বিবাহ স্বথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনবিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اٰجُلَهُنَّ فَاِذَا مَسَّوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَاِذَا قُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

—এখানে —اجل শব্দের অর্থ ইন্দত এবং اجل পর্যন্ত পৌঁছান অর্থ ইন্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইন্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখে যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম, না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভাল। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ, তত দিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোসা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্য দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও অর্থাৎ ইন্দত শেষ হতে দাও। ইন্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান : ইন্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার— উত্তম অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারাক্ফ অর্থাৎ যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারাক্ফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজেকর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্য সবার করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিচ্ছতা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্চিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না বরং সদ্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকহর কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান : আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী **لَعَلَّ اللَّهُ يُحَدِّثَ بَعْدَ ذَلِكَ لَكَ امْرَأًا** আয়াত

থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দেবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিস্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দেবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোসা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ ভাণন করে। উদাহরণত এরূপ বলবে না, আমার বাড়ী থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আমার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিস্কার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরীয়তের পরিশোধায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিকভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না বরং উবিষ্মতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَلَكَمُ زَوْجًا غَيْرَهُ

তিন তালাক একযোগে দেওয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (একমত) আছে : আজকাল ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলীর প্রতি অব-হেলা ও উদাসীনা ব্যাপকাকারে হড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক লেখাপড়া জানা দলীল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করে না। অথচ দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেন, তারা পরে অনুতাপ করে এবং স্ত্রী যাতে কোনক্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র) মাহমুদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়াজেতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রসূলুন্নাহ্ (স) ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উম্মতের ইজমাবলে একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েহ। যদি কোন ব্যক্তি তিন তোহুরে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেন, তবে তাও অপহন্দনীয়। এ বিষয়টি উম্মতের ইজমা এবং কোরআনী আম্মাতসমূহের ইলিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতী তালাকের মধ্যে দাখিল কিনা, শুধু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এটা হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপহন্দনীয় ও সূন্নত বিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে দেখুন।

কিন্তু একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম—এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনই হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক একযোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত গোটা মযহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একযোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে থাকে। কেননা কোন কাজ হারাম হলে তার প্রতিবন্ধকার কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় না। যেমন কেউ কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাধিকার মরেই থাকে। এমনিভাবে একযোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল মযহাব চতুষ্টয়ই নয় বরং সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

—وَأَشْهَدُ وَأَنْزَوِي عَدْلٌ مِنْكُمْ وَأَتِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

দের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা সাক্ষীদের উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কাম কর।

অন্তিম বিধান : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্য দুজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর

উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তী-কালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্য সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দৃষ্টমিষ্টলে অথবা স্ত্রীর জীবনসময় পরাজিত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইচ্ছত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদের জন্য **زَوَىٰ عَدْلٌ** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে,

শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষী অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সাল দেবে না। **أَقْوَمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ** বাক্যে সাধারণ

মুসলমানদেরকে সন্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনার সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ-চোরে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

— **ذَلِكُمْ يُوَعَّظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** — অর্থাৎ উপরোক্ত

বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আত্মাহু ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকাল উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় আত্মাহুভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সূচুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

**অপরোধ ও শাস্তির আইন-কানুনে কোরআন পাকের অভূতপূর্ব প্রভাবিতিক ও মুক্ববী-সুলভ নীতি :** বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানুন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কোরআন পাকও আত্মাহু তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাজি সারা বিশ্বের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আত্মাহু-ভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোন পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয় বরং আত্মাহুর ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরী মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন রাখে, তাদের মধ্যে কাঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমন কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কোরআন পাকের এই মুক্ববীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরি-লক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোন সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের সূচি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদা-স্বামী-স্ত্রীরই অন্তর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই শিবাহের খুতবায়

কোরআন পাকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুমতরূপে প্রমাণিত আছে, সেই আয়াতের আলাহুত্তীতির আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আলাহু তা'আলা আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ছুটি করলে, একে অপরকে কষ্ট দিলে আলিমুল গায়েব আলাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি বিধান বর্ণনা করতে যেনে প্রথম বিধানের পরেই **وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ** বলে আলাহুত্তীতির

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর— **وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ**

**اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ** বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে, সে অন্য কারও উপর নয়, নিজের উপরই জুলুম করে। এর অন্তর্ভুক্ত পরিণতি তাকেই হারখার করে দেবে। এরপর আরও চারটি প্রাসঙ্গিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর **ذِكْرُ لَكُمْ**

**يُوعِظُ بِهَا مَنْ كَانَ يَوْمًا مِنَ يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আলাহুত্তীতির ফযীলত ও তার ইহমৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওম্মাকুল তথা আলাহর উপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইন্দতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আলাহুত্তীতির আরও কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কসূত্র স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সন্তানকে সন্ত্যাদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইন্দত এবং স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ, সন্ত্যাদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিন্তা, কোথাও আলাহুত্তীতির প্রের্ত্ব ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওম্মাকুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আলাহুত্তীতির বিষয়বস্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু কোরআনের উপরোক্ত মুরক্বীসুলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :

**— وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ**

অর্থাৎ যে আলাহকে ভয় করে, আলাহু তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে মুক্তির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।



تقوى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আলাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আলাহ্‌কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আলাহ্‌র অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আমোচ্য আয়াতে تقوى তথা আলাহ্‌ভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে—এক. আলাহ্‌ভীতি অবলম্বনকারীর জন্য আলাহ্‌ তা'আলা নিচ্ছৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিচ্ছৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিচ্ছৃতি। দুই. তাকে এমন জাঙ্গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মু'মিন-মুতাকীর জন্য আলাহ্‌ তা'আলায় এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারেনা—(রাহুল মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্কে বজায় রেখে কোন কোন তরুসীরবিদ এই আয়াতের তরুসীরে বলেছেন: তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ আলাহ্‌ভীতি অবলম্বন করবে, আলাহ্‌ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিচ্ছৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলা বাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—(রাহুল মা'আনী)

আয়াতের শানে-নুযুল: হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আওক ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: আমার পুত্র সালামকে শত্রুরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার মা খুবই উদ্ভিগ্ন। এখন আমার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন: আমি তোমাকে ও ছেলের মাকে বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্‌' পাঠ করার আদেশ দিচ্ছি। তারা উভয়েই আদেশ পালন করলেন। এরই প্রভাবে গ্রেফতারকারী শত্রুরা একদিন কিছুটা অনামনক হয়ে পড়লে সুযোগ ব্যস্ত ছেলেকে পলায়ন করে এবং ফেরার পথে শত্রুদের কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে পিতার কাছে নিয়ে আসে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে শত্রুদের একটি উট পেয়ে সে তাতে সওয়ার হয়ে যায় এবং আরও কয়েকটি উট এর সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জ্ঞাত করান। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, তিনি এই প্রশ্নও করেন যে, ছেলেকে যেসব উট ও ছাগল নিয়ে এসেছে, এগুলো আমার জন্য হালাল, না হারাম?

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ لَجَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ لَجَّ আয়াতখানি নাযিল হয়।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, পুত্রের বিরহ ঘটন আওক ইবনে মালেক (রা) ও স্ত্রীর স্ত্রীকে অস্থির করে তুলল, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁদেরকে তাকওয়া তথা আলাহ্‌ভীতি অবলম্বনের

আদেশ দিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তাকওয়ার আদেশের সাথে সাথে 'লা-হাওলা' পাঠ করারও আদেশ দিয়েছিলেন।— (রূহুল মা'আনী)

এই শানে-নুযুল থেকেও একথা জানা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপক।

মাস'আলা : এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনী-মতের মালরূপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনীমতের মালের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী বাস্তত্বমালে দেওয়াও জরুরী নয়, যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিকহুবিদগণ বলেন : কোন মুসলমান গোপনে ছাড়াপত্র ছাড়াই দারুল হরব তথা শহুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফিরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা-ও হালাল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ডিসা নিয়ে শহুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোন ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েয নয়। এমনভাবে যে ব্যক্তি বন্দী হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোন কাফির তার কাছে কোন অর্থ গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ, ডিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মাল হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বর-খেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাস'আলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গচ্ছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা শরীয়তে হারাম।—(মায়হারী)

রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফির অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যর্পণের জন্য হযরত আলী (রা)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র : উপরোক্ত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) আওফ ইয়নে মালেক (রা)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য

বেশী পরমাণে **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** পাঠ করতে বলেছিলেন। হযরত

মুজাব্বিদে আলফে সানী (রা) বলেন : ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশী পরমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুজাব্বিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশীর পরমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এয় শুরুতে ও শেষে একশ বার করে দরাদ পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করতে হবে।—(মায়হারী) হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) একদিন

**وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন।

অতঃপর তিনি বললেন : আবু যর, যদি সব মানুষ কেবল এই আয়াতটি অবলম্বন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট।—(রূহুল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিয়ার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার মুশকিল কাজের জন্য যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সবকাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুজ্জাহ (সা) বলেন :

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو إِخْمًا مَا وَتَرَوْحَ بِطَانًا -

যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করত, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পক্ষী-পক্ষীর ন্যায় নিম্নিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুজ্জাহ (সা) বলেন : আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে।—( মাযহারী )

অবশ্য তাওরাতুল্লাহের অর্থ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলম্বন করবে কিন্তু উপায়াদির উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। কারণ, তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হতে পারে না। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহতীতি ও তাওরাতুল্লাহের ফযীলত এবং বরকত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদ্দতের আরও কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَالَّذِي يَتَسَنَّسَ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَدَّ تَوْنًا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ শিখি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান : সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েম্ব। কিন্তু যেসব মহিলার ব্যয়োরুদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েম্ব আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েম্ব আসা শুরু হয়নি, তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েম্বের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও দিনেই হোক।

اِنْ ارْتَبْتُمْ—অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইন্দত হায়েয দ্বারা

গণনা করা হয় কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ, অতএব তাদের ইন্দত কিভাবে গণনা করা হবে—এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার আলাহুতীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে : **وَمَنْ يَتَّقِ**

اللَّهُ يَجْعَلْ لَكَ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ

করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইন্দতের বণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে :

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ—এটা আল্লাহর বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল

করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহকে

ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

আলাহুতীতির পাঁচটি কল্যাণ : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আলাহুতীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে—১. আল্লাহ তা'আলা আলাহুতীকরদের জন্য ইহকাল ও পরকালের বিপদা-পদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। ২. তার জন্য স্রিয়িকের এমন দ্বার খুলে দেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। ৩. তার সব কাজ সহজ করে দেন। ৪. তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। ৫. তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আলাহুতীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে আলাহুতীকর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়।

اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا—আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইন্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

اَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে

থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইন্দতকালে উদ্ভাঙ করো না : **لَا تُفَارِقُوا**

—এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইন্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে,

তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাব পূরণে রূপগতা করে তাকে উদ্ভাঙ করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

অর্থাৎ—**وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَيْنَ حَمْلَهُنَّ**

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান : তালাকপ্রাপ্তাদের ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণ : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাকেরী, আহমদ (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (র)-এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন : বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর

দলীল পূর্বাঙ্ক এই আয়াত : **أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ**—কেননা, এই আয়াতে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর কিরাত এরূপ :

**أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وَجَدِكُمْ**—সাধারণত

এক কিরাত অন্য কিরাতের তফসীর করে। অতএব প্রসিদ্ধ কিরাতে যদিও **أَنْفِقُوا** শব্দটি

উল্লিখিত নেই কিন্তু তাউহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কিরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিম্মান অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত উমর ফারাক (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়স (রা)-কে তার স্বামী তিন তালাক

দিয়েছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেন নি। হযরত উমর (রা) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন : আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আন্নাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আন্নাহর কিতাব বলে বাহ্যত এই অশ্লীলতাকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত উমর (রা)-এর মতে ভরণ-পোষণও আন্নাহরের মধ্যে দাখিল। রসুলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারৈ-কুতনী ও তিবরানী বণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত উমর (রা) বলেন : আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আন্নাহ পত্রিকার-ভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক-প্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। ‘বাইন তালাক’ অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (র)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মায়হারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجُورَهُنَّ—অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী

হলে এবং সন্তান প্রসব হলে গেলে তার ইন্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা সন্তানদান করে, তবে সন্তানদানের বিনিময় নেওয়া ও দেওয়া জায়েয।

দ্বিতীয় বিধান : সন্তানদানের পারিষ্রমিক : যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে সন্তানদান করা স্বয়ং জননীর যিদ্দায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়া-

জিব। বলা হয়েছে : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ—যে কাজ করত

দায়িত্বে এমমিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্য পারিষ্রমিক নেওয়া ঘুমের শামিল, যা নেওয়া দেওয়া উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইন্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইন্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইন্দত খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে সন্তানদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিষ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

তৃতীয় বিধান : وَأَتْمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ—এর শাব্দিক অর্থ

পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, সন্তানদানের পারিষ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিত্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিত্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

তফদীশ বিধান : **وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهَا أُخْرَى** — অর্থাৎ সন্তানদান

করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয় অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিত্রমিক নিয়েও সন্তানদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনত তাকে বাধ্য করা যাবে না বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়ামমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করেছে, তখন কোন বাস্তব ওয়র আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওয়র না থাকে, কেবল রাগ-গোসার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর কাছে সে পোনাহপার হবে। তবে বিচারক তাকে সন্তানদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্বামী দারিত্র্যের কারণে পারিত্রমিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোন মহিলা বিনাপারিত্রমিকে অথবা কম পারিত্রমিকে সন্তানদান করতে সম্মত হয়, তবে স্বামীকে জননীর দাবী যেনে নিয়ে তার সন্তান পান করাতেই বাধ্য করা হবে না বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার সন্তান পান করানো যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিত্রমিক দাবী করে, তবে সব ফিকহবিদের একমত্যে অন্য মহিলার সন্তান পান করানো স্বামীর জন্য জায়েয নয়।

মাস'আলা : অন্য মহিলার সন্তান পান করানো ছিন্ন হলে সন্তানদাত্রী মহিলা সন্তানকে তার জননীর কাছে রেখে সন্তানদান করবে, এটা জরুরী। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে সন্তানদান করানো জায়েয নয়। কেননা, সহীহ হাদীসদৃষ্টে 'হিয়ানত' তথা মাজন-পাজন ও সেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েয নয়।—(মাহহারী)

পঞ্চদশ বিধান : স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সজতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

**لَوْلَفِي ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقًا فَلْيَلْفِي مَا آتَاهُ اللَّهُ**

অর্থাৎ বিভ্রালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিষিক সীমিত, সে আমদানী অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং স্বামীর আর্থিক সজতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিভ্রালী হলে বিভ্রালীসুলভ ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিভ্রালিনী না হয় বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দারিত্র্যসূত্রে ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিভ্রালিনী হয়। ইমাম আযম (র)-এর মতহাব তাই। কোন কোন ফিকহবিদের উক্তি এর বিপরীত।—(মাহহারী)

**لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا** — এটা

আপের থাকারই ব্যাধি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবার করার

শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে : **سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَصْرٍ إِسْرًا** — অর্থাৎ কালের একরূপ মনে করা

উচিত নয় যে, বর্তমান দারিদ্র্য চিরকাল বজায় থাকবে বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

ভাষ্য : এই আয়াতে সেই স্বামীর আলাহর পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে।—(রাহুল মা'আনী)

وَكَايِنٍ مِّنْ قُرَيْبٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحَاسِبْنَهَا حِسَابًا  
 شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَهَا عَذَابًا نَّكَرًا ۖ فَمَا أَقْبَتُوا بِأَلْأَمْرِهَا وَكَانَ  
 عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۗ أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ فَاثْقُوا  
 اللَّهُ يَأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ أَتَقْدَرُ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ  
 ذِكْرًا ۖ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَمَنْ  
 يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ  
 رِزْقَهُ ۗ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ  
 يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ

(৮) অনেক জনগণ তাদের পালনকর্তা ও তার রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে পাকড়াও করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি



দিয়েছিলেন। (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাসন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (১০) আল্লাহ তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। - অতঃপর, যে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাখিল করেছেন, (১১) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে অজ্ঞকার থেকে আলোকিত আনয়ন করেন। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন (আশ্বাসে), যার উল্দেশে নদী প্রবাহিত, তথ্যই তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাকে উত্তম স্মিতিক দেবেন। (১২) আল্লাহ সন্তোষীপ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই সন্তোষীপে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সর্বকিছু তার পোচরীকৃত।

### তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক জনগণ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছে, অতঃপর আমি তাদের (কাজকর্মের) কঠোর হিসাব নিয়েছি (অর্থাৎ তাদের কোন কুফরী কর্মই ক্ষমা করিনি বরং প্রত্যেকটির শাস্তি দিয়েছি। এখানে হিসাব বলে জিজ্ঞাসাখাদ বোঝানো হয়নি)। এবং আমি তাদেরকে শীষণ শাস্তি দিয়েছি (অর্থাৎ শাস্তি দিয়ে ক্ষমস করছি)। তারা তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাসন করেছে এবং তাদের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (এ হচ্ছে দুনিয়াতে এবং পরকালে) আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (অবশ্যতার পরিণাম স্বধন এই) অতঃপর যে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (ইমানও তাই চায়। ভয় কর অর্থাৎ আনুগত্য কর। এই আনুগত্যের পরা বলে দেওয়ার জন্য) আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশনামা প্রেরণ করেছেন (এবং এই উপদেশনামা দিয়ে) একজন রসূল (সা) (প্রেরণ করেছেন), যিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বিধানাবলী পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অজ্ঞকার থেকে (ইমান ও সৎ কর্মের) আলোকিত আনয়ন করেন। [উদ্দেশ্য এই যে, এই রসূল (সা)-এর মাধ্যমে যে উপদেশ পৌঁছে; তা মেনে চলাও আনুগত্য। অতঃপর আনুগত্য অর্থাৎ ইমান ও সৎ কর্মের জন্য ওয়ার্দ করা হচ্ছে যে] যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন (আশ্বাসে) এমন উদ্যানসমূহে, যার উল্দেশে নদী প্রবাহিত। তথ্যই তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ (তাদেরকে) উত্তম স্মিতিক দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর আনুগত্য অবশ্য পালনীয়। কারণ আল্লাহ সন্তোষীপ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও তদনুরূপ (সাতটি সৃষ্টি করেছেন। তিরমিযীতে আছে, এক পৃথিবীর নিচে দ্বিতীয় পৃথিবী, তার নিচে তৃতীয় পৃথিবী, এভাবে সন্ত পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে)। এসবের (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যে তাঁর (আইনগত; সৃষ্টিগত অথবা উভয় প্রকার) বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়, (এসব কথা এজন্য বলা হয়েছে) যাতে তোমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ সর্বকিছুকে (স্বীয়) আনয়ন পরিধিতে বেঁচন করে রেখেছেন (এতেই বোঝা যায় যে; তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য)।

আনুশঙ্গিক জাহায্য বিষয়

فَكَانَ سَهْنًا هَا حِسًا بِأَشِدِّ يَدًا وَعَدَّ بِنَا هَا عَدًّا بِأَنْفَرًا—আয়াতে উল্লিখিত

এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরিকালে হবে কিন্তু এখানে একে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণে এল নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েছে।—( রাহুল মা'আনী ) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিতাসাবাদ নয় বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরিকালে হবে কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَدًّا بِأَشِدِّ يَدًا—

বাক্যে বর্ণিত আযাব কেবল পরিকালে হবে।

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّكْرَ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَتَرْحَمُوا—এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে,

وَسَلِّمْ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অন্যান্য অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত 'যিকর'-এর অর্থ স্বয়ং রসূল (সা) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন।—( রাহুল মা'আনী )

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ—সপ্ত পৃথিবীর কোথায় কোথায় কিভাবে আছে

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ—এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিকারভাবে বোঝা যায় যে,

আকাশ যেমন সাতটি, পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নিচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নিচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন স্পষ্ট জীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিস্তৃত বলেছেন এবং কেউ মিথ্যা ও মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সত্তাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে স্কি, এসব উধ্যানুসঙ্গীনের উপর আমাদের কোন ইমার অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে

প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আমব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেন : **أَيُّهُمَا مَا بِيَهُمَا اللَّهُ** অর্থাৎ যে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষত বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়—এমন নির্ভেজাল শিক্ষণীয় বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

**يُنزِلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ**—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহর আদেশ দ্বিবিধ—(১) আইনগত, যা আল্লাহর আদিষ্ট বান্দাদের জন্য ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকস্মিক, ইবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে। এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহর তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধানি সমগ্র সৃষ্টি বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্টি জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্টি জীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

سورة التحريم

মহরা তাহরীম

মদীনার অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ

أَزْوَاجِكَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

أَيْمَانِكُمْ، وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذْ أَسْرَ

النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ

قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا، قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ إِنَّ تَتُوبَا

إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا، وَإِنْ تَطَهَّرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ

هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

ظَهِيرٌ ۝ عَلَى رَبِّهِ إِنْ طَلَّقْتُنَّ أَنْ يُبَدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا

مِمَّنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنِيتٍ سَبِيحَاتٍ عِيْدَاتٍ سَبِيحَاتٍ

تَيَّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী! আল্লাহ্ আগনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আগনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ্ ক্রমাশীল, দয়ালয়। (২) আল্লাহ্ জোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি নাড়ের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সেই বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন : যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যান্যের দিকে খুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উঠিয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্ জিবরাঈল এবং সংকর্মপরায়েণ মু'মিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তার পালনকর্তা তাকে পরিত্যক্ত দেখেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্জাবাহ, ইমানদার, নামাযী, তওবা-কারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি (কসম খেয়ে) তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন (তাও আবার) আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য? (অর্থাৎ কোন বৈধ কাজ না করা যদিও বৈধ এবং কোন উপযোগিতার কারণে তাকে কসম দ্বারা জোরদার করাও বৈধ কিন্তু উত্তমের বিপরীত অবশ্যই, বিশেষ করে তার কারণও যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ে স্ত্রীদেরকে খুশী করা)। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। [তিনি গোনাহু পর্যন্ত মাফ করে দেন, আপনি তো কোন গোনাহ করেন নি। তাই এটা আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নয় বরং স্নেহবশে আপনাকে বলা হচ্ছে যে, আপনি একটি বৈধ উপকার বর্জন করে এই ক্রুশ্ট করলেন কেন? রুসুলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন, তাই সাধারণ সম্বোধন দ্বারা কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলা হচ্ছে :] আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কসম খোলা (অর্থাৎ কসম উন্ন করার পর তার কাফফারা দানের পস্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তা'ই তিনি স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজনা দি জেনে তোমাদের অনেক সংকট সহজ করে দেওয়ার পস্থা নির্ধারণ করে দেন। সেমতে কাফফারার মাধ্যমে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় করে দিয়েছেন। অতঃপর স্ত্রীদেরকে বলা হচ্ছে যে, সেই সময়টি স্মরণীয়, যখন নবী করীম (সা) তার একজন বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বললেন। (কথাটি ছিল এই : আমি আর মধু পান করব না কিন্তু কারও কাছে একথা বলো না)। অতঃপর বিবি যখন তা (অন্য বিবিকে) বলে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (এই গোপন কথা প্রকাশকারিণী) বিবিকে কিছু কথা তো বললেন (যে, তুমি আমার কথা অন্যের কাছে বলে দিয়েছ) এবং কিছু বললেন না (অর্থাৎ নবীর উদ্ভতা এতটুকু যে, আদেশ পালন না করার কারণে বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যেয়েও কথিত বাক্যগুলো পূর্ণরূপে বললেন না যে, তুমি আমার এই কথা বলে দিয়েছ, সেই কথা বলে দিয়েছ বরং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন এবং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন না, যাতে

বিবি মনে করে যে, তিনি এতটুকু বিষয়ই জানেন—এর বেশী জানেন না। এতে সজ্ঞা কম হবে। অতএব নবী যখন তা বিবিকে বললেন, তখন বিবি বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন : আমাকে সর্বজ্ঞ, ওলাফিফহাল আলাহ অবহিত করেছেন। [বিবি-গণকে একথা শোনানোর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যখন জানতে পারবে যে, রসুলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ গোপন জানেন, তখন তাঁর উদ্ভূতসুলভ আচরণ দেখে তারা আরও বেশী লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে বিবিগণকে তওবা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে : ] তোমরা উভয়েই ( অর্থাৎ পয়গম্বরের দুই বিবি ) যদি আলাহর কাছে তওবা কর, তবে ( খুব ভাল কথা। ) কেননা, তওবার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে, ) তোমাদের অন্তর ( অন্যান্যের দিকে ) ঝুঁক পড়েছে। ( তোমরা পয়গম্বরের অন্য বিবিগণ থেকে সরিয়ে একান্তভাবে নিজেদের রুখে নিতে চাও। এটা রসুলুল্লাহের লক্ষণ হিসাবে যদিও মন্দ নয় কিন্তু এর কারণে অন্য বিবি-গণের অধিকার হরণ এবং অন্তর ব্যথিত হয়। এই হিসাবে এটা মন্দ ও তওবা করার যোগ্য )। আর যদি ( এমনভাবে ) নবীর বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ, নবীর সহায় আলাহ, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানগণ। উপরন্তু কেবলতা-গণও তাঁর সাহায্যকারী। ( উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের এসব কারসজ্জিতে নবীর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। কারণ, যে ব্যক্তির এমন সহায়, তাঁর রুচির বিরুদ্ধে তৎপরতার পরিণয় মন্দই মন্দ হবে। কোন কোন শানে-নুসুল অনুযায়ী এ কাজে হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা) বাতীত অন্যান্য বিবিও শরীক ছিলেন, যেমন হযরত সওপা ও সফিয়া (রা) প্রমুখ, তাই অতঃপর বছরচান ব্যবহার করে সমাধান করা হচ্ছে যে, তোমরা এই কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ো না যে, পুরুষ যখন, তখন বিবিদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আর আমাদের চাইতে উত্তম বিবি কোথায়? তাই সর্বাবস্থার আমাদের সবকিছুই সম্মত করা হবে। অন্তঃর মনে রেখ ) যদি নবী তোমাদের সর্বত্রকে ভালুক দিয়ে দেন, তবে সম্ভবত তাঁর পালকশর্তী তাঁকে পরিহারে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হরে মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্যকারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, কতক অকুমারী ও কতক কুমারী। ( কোন কোন উপযোগিতাদৃষ্টে বিধবা নারীও কাম্য হলে থাকে, যেমন অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, সমবয়স্কতা ইত্যাদি। তাই একেও উল্লেখ করা হয়েছে )।

### আনুষ্ঠানিক আহার্য বিবরণ

শানে-নুসুল : সহীহ বুখারী ইত্যাদি কিভাবে হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সা) প্রত্যহ নিম্নমিতভাবে আসরের পর মীড়ানো অবস্থায়ই সকল বিধির কাছ থেকে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত য়নব (রা)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রা)-র সাথে পরামর্শ করে ছিন্ন করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সে-ই বন্ধবে : আপনি 'মাগফীর' পান করেছেন। ('মাগফীর' এক প্রকার বিশেষ সূর্যক্ষয়জ্ঞ আঠাকে বলা হয়)। সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন : সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগফীর' বুকে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারুণ্যই

মধু দুর্গজয়ন্ত হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ (সা) দুর্গজয়ন্ত বস্তু থেকে সমস্ত বেঁচে থাকতেন। তাই তিনি অজ্ঞেয় মধু খাবেন না বলে কসম খেয়েছেন। হযরত যম্বুব (রা) মনঃকল্প হবেন চিন্তা করে তিনি নিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি জানা বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়াজে আছে হযরত হাফসা (রা) মধু পান করিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়া (রা) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়াজে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, এককথক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রসুলুল্লাহ (সা) একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপ-যোগিতার কারণে হলে জায়েয—গোনাহ নয় কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসুলুল্লাহ (সা) কষ্ট স্বীকার করে নেবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, এ কাজ রসুলুল্লাহ (সা) কেবল বিবিগণকে খুশী করার জন্য করে-ছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী করা রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা সহানুভূতিতে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أُولَٰئِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

غُفُورٌ رَّحِيمٌ—এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রসুলুল্লাহ

(সা)-র নাম নিয়ে সম্বোধনা করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্বোধন ও সম্ব্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্বীকৃতির সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনি নিজের জন্য একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? ব্যক্তিটি যদিও সহানুভূতিতে বলা হয়েছে কিন্তু দৃশ্যত এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারে যে, সম্ভবত

তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে : وَاللَّهُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ—

অর্থাৎ গোনাহ হলেও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাস'আলা : তিন প্রকারে কোন হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করা যায়। এর বিশদ বর্ণনা সূরা মাঈদার তফসীরে উল্লিখিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই যে, কেউ কোন হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে না করে কিন্তু যদি কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কসম খেয়ে হারাম করে নেয়, তবে তা গোনাহ হবে। কোন প্রয়োজন ও উপ-যোগিতার কারণে হলে জায়েয কিন্তু উদ্ভয়ের খেলাফ। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিশ্বাসগতভাবেও হারাম মনে করে না এবং কসম খেয়েও হারাম করে না কিন্তু কার্যত তা চিরতরে বর্জন করার সংকল্প পোষণ করে। এই সংকল্প সওয়াব মনে করে করলে বিদ'আত ও বৈরাগ্য হবে, যা শরীয়তে নিন্দনীয়। আর যদি কোন দৈহিক অথবা আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে করে তবে জায়েয। কোন কোন সুফী যুগ্ম থেকে ভোগ-সন্তোষ বর্জনের যেসব পন্থা বর্ণিত আছে, সেগুলো এই পর্থাৎসম্বন্ধেই।

উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সা) কসম খেয়েছিলেন। আশ্রিত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম উল্ল করলেন এবং কাফকারা আদায় করেন। দূররে মনসুন্নেক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফকারা হিসাবে একটি ক্বীতদাস মুক্ত করে দেন। —(বন্নাযুল কোরআন)

وَأَذِ اسْرَ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ آزِ وَآجِهٍ حَدِيثًا  
অর্থাৎ যেকোন কসম উল্ল করা জরুরী অথবা উত্তম  
বিবেচিত হক্ক, আশ্রাহ্ শা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম উল্ল করে কাফকারা আদায়  
করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আশ্রাতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَأَذِ اسْرَ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ آزِ وَآجِهٍ حَدِيثًا  
অর্থাৎ নবী যখন তাঁর কোন এক

বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ ও অধিকাংশ রেওয়াজেতে দুশ্চেট এই গোপন কথা  
ছিল এই যে, হযরত যন্নব (রা)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন  
মনঃক্লুগ হল, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং  
বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যন্নব (রা) মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই  
বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়াজেতে  
আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ রেওয়াজেতসমূহে তাই আছে,  
যা লিখিত হল।

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ  
অর্থাৎ

সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আশ্রাহ্ রসূল  
(সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস  
করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ  
(সা)-র ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন বিবির  
কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা  
বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়াজেতে থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রা)-র কাছে  
গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে তা ফাঁস করে দেন।  
এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা  
হবে।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ  
(সা) হাফসা (রা)-কে ভালো করে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু আশ্রাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-  
কে স্নেহের পথে তাঁকে ভালো করে থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রা) অনেক  
নামাম পড়ে অনেক রোযা রাখে। তাঁর নাম জামাতে আপনায় বিবিগণের তালিকায় লিখিত  
আছে। —(মাহহারী)



—ان تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

দুইজন বিবি সক্রিয় ছিলেন তাঁরা কে, এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়াজে বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন : যে দুইজন নারী সম্পর্কে কোরআন থাকে **ان تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ** বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে

হযরত ওমর (রা)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল পরেই জামার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওন্না হতে সুযোগ বুঝে জামিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওয়ূ করছিলেন এবং আশি পানি চেলে দিচ্ছিলেন, তখন প্রশ্ন

করলাম : কোরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে **ان تَتُوبَا** বলা হয়েছে, তাঁরা কে ?

হযরত ওমর (রা) বললেন : আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুজন হলেন, হাফসা ও আয়েশা (রা)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা করলেন। তরুসীরে-মায়হারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবিকে স্মৃতভাৱে স্মরণ করে বলা হয়েছে : যদি তোমাদের অন্তর অন্যায়ের প্রতি স্মৃতি পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ভাল কথা। কারণ রসূলুল্লাহ (সা)-র মহক্বত ও সম্বৃষ্টি কামনা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ, যদ্বারা তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কাজেই এই পোনাহু থেকে তওবা করা জরুরী। অতঃপর বলা হয়েছে :

—وَإِنْ تَطَّاهَرَا عَلَى اللَّهِ فَمَا لَهُ مَوْلَا

তওবা করে রসূলুল্লাহ (সা)-কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ, জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সবকছ ফেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে :

—فَسَى رُبَّةٍ أَنْ تَلْقَيْنَ أَنْ يُبَدِّلَنَّ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ

এই ধারণার জওন্নাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাজাক দিয়ে দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবত তিনি পাবেন না। জওন্নাবের সান্নমর্শ এই যে, আল্লাহ তা'আলার সামর্থের কাছের কোন কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তাজাক দিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মতই নয়, বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরী হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদায়ীক বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مِمَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
كَفَرُوا لَا تَعْتَبُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(৬) হে মু'মিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাল্লাপ হাদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আজাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আজ্ঞা দেন, তাই করে। (৭) হে কাফির সম্প্রদায়। তোমরা আজ ৩৬৪ পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, ( যখন রসূলের বিবিগণেরও সৎ কর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং রসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎ কর্মে উৎসাহ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অরনিকট সব উল্লেখের উপরও এই কর্তব্য আরও জোরদার হয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিল্য না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে ) তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ( জাহান্নামের ) অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর ( নিজেদেরকে রক্ষা করার অর্থ বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ তাদেরকে আজাহ্ বিধি-বিধান শিখা দেওয়া ও তা পালন করানোর জন্য মুখে ও হাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা। অতঃপর সেই অগ্নির আব্বা বর্ণনা করা হচ্ছে : ) যাতে পাল্লাপ হাদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। ( তারা কারও প্রতি দয়া করে না এবং কেউ তাদের মুকাবিলা করে বাঁচতে পারে না )। তারা আজাহ্ যা আদেশ করেন, তা ( সামান্যও ) অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, ( তৎক্ষণাত্ ) তাই করে। ( স্মোটকথা, জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করে ছাড়বে। তখন কাফিরদেরকে বলা হবে : ) হে কাফির সম্প্রদায়। তোমরা আজ ৩৬৪ পেশ করো না। ( কারণ, এটা নিষ্ফল ) তোমাদেরকে তো তারই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা ( দুনিয়াতে ) করতে।

আনুযায়িক ভ্রমতব্য বিষয়

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে :

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন ক্ষতি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুমের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশতাদের করল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'।

أَهْلِيكُمْ শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গোচর-বাদী সবই

দাখিল আছে। এমনকি, সার্বজনিক চাকর-নওকরও এতে দাখিল থাকা প্রবাস্তর-নয়। এক রেওয়াজে আছে, এই আয়াত নাখিল হলে পর হযরত ওমর (রা) আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গোনাই থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহর খিখি-বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে-নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। —(রাহুল মা'আনী)

স্ত্রী সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের জরুরী কতব্য : ফিকহবিদগণ বলেন : স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে : হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের শাকাত, তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তোমাদের সাথে জাহান্নামে সমবেত করবেন। 'তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা' ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্ত খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বুয়ূর্গ বলেন : সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আত্মাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মুখ ও উদাসীন হবে। —(রাহুল মা'আনী)

مُؤْمِنِينَ كَفَرُوا بِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا আয়াতে কাফিরদেরকে

বলা হয়েছে : এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওয়র কবুল করা হবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَنْهُ  
 رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ بَعْتِ  
 تَجْرِمَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ يَوْمَ لَا يُخْرِجُ اللَّهُ الشِّرْكَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ  
 يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ  
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ  
 عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا وَهُمْ بِجَهَنَّمَ ۚ وَمَا وَهُمْ بِمُصِيبَةٍ ۚ ضَرَبَ اللَّهُ  
 مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ نُوحٍ وَامْرَأَاتٍ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ  
 عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا  
 عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنَ ۖ إِذْ قَالَتْ  
 رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ  
 وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ  
 الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ  
 بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ ۚ إِنَّهَا  
 كَانَتْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ, নবী এবং তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও তানদিকে ছুটো-ছুটি করবে। তারা বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আগনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী!

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকট স্থান! (১০) আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহ-পর্ষী ও লূত-পর্ষীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার নূহ ধর্মপরাহণ বাস্তব নূহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিক্রমসম্বাদকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে জাহান্নামে ফেল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল- জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ মু'মিনদের জন্য ফিরাউন-পর্ষীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল : হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিগটে জাহান্নামে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন ও তার দুর্ভয় থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইয়রান-তনর মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন কুর্কে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্য পরিপন্থ করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীদের একজন।

### তরুণীর সীর-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পন্থাই পরিবার-পরিজনকে বলে তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করা যায়। পন্থা এই : ) মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর সামনে সত্যিকার তওবা কর। (অর্থাৎ অন্তরে গোনাহের কারণে পুরোপুরি অনুতাপ থাকবে এবং উবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে। এতে সকল করম-ওয়াজিব বিধানও দাখিল আছে। কেননা, এগুলো পালন না করা গোনাহ এবং যাবতীয় হারাম এবং মকরাহ বিষয়ও দাখিল আছে কেননা, এগুলো করা গোনাহ)। আঁশা (অর্থাৎ ওয়াদা) আছে যে, তোমাদের পালনকর্তা (এই তওবার কারণে) তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে (জাহান্নামের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর মুসলমান সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা দোয়া করবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই নূর শেষ পর্যন্ত রাখুন (অর্থাৎ প্রথমধ্যে যেন নিভে না যায়) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি সব কিছু উপর সর্বশক্তিমান (এই দোয়ার কারণ হবে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু নূর প্রাপ্ত হবে। পুস্তকসমূহে পৌছে যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে, যা সূরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মু'মিনগণ এই দোয়া করবে, যাতে মুনাফিকদের ন্যায় তাদের নূরও নিভে না যায়)। হে নবী! কাফিরদের সাথে (তরবারির মাধ্যমে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মুখে ও বর্ণনার মাধ্যমে) জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। (দুনিয়াতে তো তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং পরকালে) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকট স্থান! (অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজের ঈমানই কাজে আসবে। কাফিরকে তার কোন আত্মীয়-স্বজনের ঈমান রক্ষা করতে পারবে না। এমনভাবে মু'মিনের আত্মীয়-স্বজন কাফির হলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না)। আল্লাহ তাঁ'আলী

কাফিরদের ( শিকর ) জন্য নূহ-পন্নী ও লূত-পন্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা আমার নূহজন সৎকর্মপরায়ণ বাস্তবায়ন বিবাহিতা ছিল। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ( অর্থাৎ নবী হওয়ার কারণে বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্য করবে, কিন্তু তারা তা করেনি ) কালে নূহ ও লূত আঞ্জামহর মুক্শবিলায় তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদেরকে ( কাফির হলে যাওয়ার কারণে আদেশ করা হয়েছে : তোমরা উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। ( অতঃপর মুসলমানদের প্রশান্তির জন্য বলা হয়েছে : ) আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ( সান্ত্বনার ) জন্য ফিরাতুন-পন্নীর ( অর্থাৎ হযরত আহ্মিয়্যার ) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, যখন সে দোয়া করল : হে আমার পালনকর্তা ! আপনার সম্মুখে জাহান্নামে আমার জন্য গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাতুন ( -এর অনিষ্ট ) থেকে এবং তার মুক্শ থেকে ( অর্থাৎ কুকরের ক্রুতি ও প্রভাব থেকে ) মুক্ত রাখুন। আমাকে জালিম ( অর্থাৎ কাফির ) সম্প্রদায়ের ( বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ) ক্রুতি থেকে মুক্ত রাখুন। ( মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ ) ইমরান-উনন্বা মরিয়মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে তার সতীত্বকে ( হাল্জাল ও হারাম উত্তর প্রকার কর্ম থেকে ) বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি ( জিবরাঈলের মাধ্যমে ) তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ( যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল ) এবং কিতাবসমূহকে ( অর্থাৎ উত্তরাত ও ইঞ্জিলকে ) সত্যায়ন করেছিল। এতে তার আকাফিদ বণিত হয়েছে )। সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন ( এতে তার সৎ কর্ম বণিত হয়েছে )।

**আনুষ্ঠানিক উত্তবা বিষয়**

تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا — তওবার শাস্তিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য

গোনাহ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সূরাহর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং উবিষ্যতে তার ধার-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। نَصُوح শব্দটিকে যদি نَصَحَةً থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ ষাঁটি করা। আর যদি نَصَاحَةً থেকে উৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে تَوْبَةً نَّصُوحًا — এর অর্থ এমন তওবা, যা স্নিগ্ধ ও নাম-শশ থেকে ষাঁটি—কেবল আঞ্জামহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نَصُوح শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎ কর্মের হিম্ববস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : বিগত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং উবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই تَوْبَةً نَّصُوحًا — কলবী (র) বলেন : تَوْبَةً نَّصُوحًا হল মুখে ক্রমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উবিষ্যতে সেই গোনাহ থেকে দূরে রাখা।

হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল তওবা কি? তিনি বললেন: ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে—(১) অতীত গুণ্ড কর্মের জন্য অনুতাপ; (২) যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরু করি হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা; (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যান্যভাবে প্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা; (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা নেওয়া; (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া; এবং (৬) নিজেকে যেমন আত্মাহ্নর নাকরমানী করতে দেখেছিল, তেমন এখন আনুগত্য করতে দেখা। —(মামহারী)

হযরত আলী (রা) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

عسى ربكم ان يكفر عنكم

ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সৎ কর্ম হোক, কোনটিই জামাত ও মাগফিরাতের মূল্য হস্ত পাবে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আত্মাহ্নর জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জামাতে দাখিল করতে হবে। সৎ কর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময়ে আইনের দৃষ্টিতে জামাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আত্মাহ্ন তা'আলার রূপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎ কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্যন্ত আত্মাহ্ন তা'আলা রূপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন: হ্যাঁ আমাকেও। —(মামহারী)

مَرَبَّ اللَّهِ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتِ نُوْحٍ

তা'আলা চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম নারীসমূহ দুইজন পন্নগম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফির ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আত্মাহ্নর প্রিয় পন্নগম্বরণগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আ)-র পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' বর্ণিত আছে। অপরজন লুত (আ)-এর পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। —(কুরতুবী) তৃতীয় জন সর্ববৃহৎ কাফির, আত্মাহ্নর দাবীদার ফিরাতনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মুসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আত্মাহ্ন তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জামাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফিরাতন তার পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎ কর্মের বদৌলতে আত্মাহ্ন তা'আলা তাঁকে নবুয়তের ওগাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা কুটিলে তোলা হয়েছে যে, একজন মু'মিনের ঈমান তার কোন কাফির স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফিরের কুফর তার কোন মু'মিন স্বজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিত না হন যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফির পাপাচারীর পত্নী যেন দৃশ্টিভ্রান্ত না হয় যে, স্বামীর কুফর ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে, বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সং কর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ائْتِنِي لِي

عِنْدَكَ بِهَذَا فِي الْجَنَّةِ—এটা ফিরআউন-পত্নী হযরত আছিন্না বিধিতে মুম্বাহিমের

দৃষ্টান্ত। মুসা (আ) যখন মাদু'করদের মুকবিলায় সফল হন এবং মাদু'কররা মুসলমান হয়ে যান, তখন বিবি আছিন্না তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফিরআউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়াম্মেতে আছে, ফিরআউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের ঊপরে ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর কাছে আলোচ্য আয়াতে-বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়াম্মেতে আছে, ফিরআউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্পাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ার বলেন : হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে আম্মেতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জাম্মাতে'র গৃহ দেখিয়ে দেন।—(মাম্বাহরী)

كَلِمَاتٍ رَبِّ—وَمَدَّ قَتْنَا بِكَلِمَاتٍ وَتَبَّهَا وَكُنْتَبَّ বলে পয়গম্বরগণের প্রতি

অবতীর্ণ আল্লাহর সহীকা বোঝানো হয়েছে এবং কতব বলে প্রসিদ্ধ ঈশী গ্রন্থ ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত বোঝানো হয়েছে।

وَمَا نَتْنَا مِنَ الْقَاتِبِينَ—একটি কাতিব বহুবচন। এর অর্থ

নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব। হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণিত হাদীসে রুসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল ও সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরআউন-পত্নী আছিন্না এবং ইমরান-তনম্মা মরিয়ম সিদ্ধি লাভ করেছেন।—(মাম্বাহরী) বাহ্যত এখানে নবুয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।—(মাম্বাহরী)



سورة الملك

अज्ञा मूलक

महाभारत अवतार, ७० अध्याय, २३ क

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْغَفُورُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِن تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَيَسَّ

الْمَصِيرُ ۝ إِذَا الْقُورَانُ فِيهَا سُمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيَّزُ

مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ

نَذِيرٌ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۚ فَكذبنا وقلنا ما نزل

الله من شيء ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۖ

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِدَاتِ الصُّدُورِ ۝ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۙ وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ هُوَ  
 الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن  
 رِّزْقِهَا ۙ وَرَالَيْكُمُ النَّشُورُ ۙ ؕ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ  
 الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ۙ ؕ اَمَرْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ  
 حَاصِبًا ۙ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٌ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ۙ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ طَافَتْ ۙ وَيُفَيْضُنَ  
 رِءُوسَهُنَّ اِلَّا الرِّحْمٰنُ ۙ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيْرٌ ۙ ؕ اَمِنَ هٰذَا  
 الَّذِى هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۙ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ  
 اِلَّا فِى غُرُوْرٍ ۙ ؕ اَمِنَ هٰذَا الَّذِى يَزُرُّكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ۙ بَلْ  
 لَجُوْا فِى عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ۙ ؕ اَمِنَ يَنْشِئُ مَكِيْبًا عَلٰى وُجُوْهِ اَهْدَءِ  
 اَمِنَ يَنْشِئُ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ ؕ قُلْ هُوَ الَّذِى اَنْشَأَكُمْ  
 وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ ۙ وَالْاَفْئِدَةَ ۙ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝  
 قُلْ هُوَ الَّذِى ذَرَاكُمْ فِى الْاَرْضِ وَرَالَيْكُمُ تُحْشَرُوْنَ ۙ ؕ وَيَقُوْلُوْنَ  
 مَعَهُ هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۙ  
 وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ ؕ فَلَمَّا رَاوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ  
 كَفَرُوْا وَ قَبِيْلٌ هٰذَا الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تَدْعُوْنَ ۙ ؕ قُلْ اَرَايْتُمْ  
 اِنْ اَهْلَكَنِى اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىْ اَوْ رَحِمْنَا ۙ فَمَنْ يُجْبِرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ  
 عَذَابِ الْيَوْمِ ۙ ؕ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمْتًا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۙ

## فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّوَبِّئٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্রমাময়। (৩) তিনি সপ্ত আকাশ ভরে ভরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি কিরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বারবার ডাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি বার্থ ও পরিভ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্লেপশাস্ত্র করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত মিক্রণ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথ্য নিষ্ক্রিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্রিপ্ত গর্জন শুনেতে পারে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিষ্ক্রিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তাঁরা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ কোন কিছু নাখিল করেন নি। তোমরা মহা বিম্ব্রাঙ্কিতে পড়ে রুয়েছ। (১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা ওনতায় অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতামনা। (১১) অতঃপর তারা তাদের অপরায় স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্রমা ও মহাপুরকার। (১৩) তোমরা তোমাদের রুখা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সুল্ল জানী সম্যক জাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়ল নিখিক আহার কর + ফাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি জুবনা-মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আসছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমরা নিশ্চিত হয়ে পেলু যে আকাশে যিনি আসেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কৃত কঠোর হয়েছিল আমার স্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ—ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ বাতীত তোমাদের কোন

সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিজ্ঞাতিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিষিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিষিক দেবে? বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতার ভাবে রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হস্তে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সং পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অজ্ঞই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিররা বলে: এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে: এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সংপীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে কে যত্নাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তারই উপর ভরসা করি। সত্যরই তোমরা জানতে পারবে কে প্রকাশ্য পথপ্রদর্শিতার আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের পত্তীরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির প্রোতধারা।

### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

পুণ্যময় (আল্লাহ) তিনি, যার কবজার সমস্ত রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্ব-শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুন্দর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে ধ্বংসশীল এবং কিয়ামতের বিশ্বাসের ফলে পরকালকে অক্ষয় মনে করতে পারে এবং পরকালের সওয়ার্জর্জন ও পরকালের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে কর্ম-ভংগ করতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন-না হলে কর্ম কখন করবে। অতএব কর্ম সুন্দর হওয়ার জন্য মৃত্যু যেন শর্ত এবং জীবন যেন পাত্র। নিছক না থাকাই স্নেহেতু মৃত্যু নষ্ট তাই এটা সৃজিত হতে পারে। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (কাজেই অসুন্দর কর্মের শাস্তি এবং সুন্দর কর্মের জন্য ক্ষমা ও সওয়ার্জর্জন দান করেন)। তিনি ক্ষমত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দুন্দর দ্বিতীয় আকাশ অবস্থিত। প্রমনিভাবে আরও আকাশ রয়েছে। অতঃপর আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে হে দর্শক) তুমি আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিগত কর—কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ অগভীর দৃষ্টিতে তো অনেকবার দেখেছ। এবার গভীর দৃষ্টিতে দেখ) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিব্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (কিন্তু কোন চিড় দৃষ্টিগোচর হবে না। সূর্য্যং আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে সৃষ্টি

করেছেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন দ্রুতি দেখা যায় না। মোট কথা তাঁর সব রকম ক্ষমতা আছে। আমার শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ এই যে) আমি সর্বনিশ্চয় আকাশকে প্রদীপমালা (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি) দ্বারা সুশোভিত করেছি, এগুলোকে (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজিকে) শয়তানের জন্য ক্ষেপণস্ত্র করেছি (সূরা হাজের এর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে) এবং আমি তাঁদের (অর্থাৎ শয়তানদের) জন্য (দুনিয়ার এই ক্ষেপণস্ত্র ছাড়া পরকালে কুফরের কারণে) জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা তাদের পালনকর্তাকে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ) অস্বীকার করে তাঁদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! যখন তারা তথ্য নিষ্কিণ্ত হবে, তখন তার উৎকিণ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (হয় আল্লাহ্ তার মধ্যে উপলব্ধি ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে সে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, না হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কেউ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তেমনি জাহান্নাম তাঁর উদ্ভেজনাবশত জেগে মারতে থাকবে।) যখনই তাতে কোন (কাফির) সম্প্রদায় নিষ্কিণ্ত হবে, তখন তাদেরকে তার সঙ্কীর্ণা জিজ্ঞাসা করবে : তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেনি? (যে তোমাদেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং ফলে তোমরা এ থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে? এই প্রশ্ন শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পয়গম্বর তো অবশ্যই আগমন করেছিল। প্রত্যেক নবাগত সম্প্রদায়কে এই প্রশ্ন করা হবে। কেননা, কুফর ভেদে কাফিরদের সব সম্প্রদায় একের পর এক জাহান্নামে যাবে। তারা (অপরাধ স্বীকার করে) বলবে : হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্যক্রমে) আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ্ (বিধি-বিধান ও কিতাব ধরনের) কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা (ফেরেশতাদের কাছে) আরও বলবে : যদি আমরা সত্যতা অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না। মোটকথা, তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীদের প্রতি অভিযোগ। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, (ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে) তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে (তিনি সব জানেন। কেননা) তিনি তো জব্বার-বিষমাদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। এই সৃষ্টির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তু নিরক্ষুণ্ণ স্রষ্টা। অতএব তোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও স্রষ্টা। তান স্বাতীত কোন বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। তাই আল্লাহ্ জন্ম প্রত্যেক বস্তুর তান অপরিহার্য। এখানে ফেবল কথাবার্তা সম্পর্কিত ত্বনই উদ্দেশ্য নহে, বরং কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্তা বেশী বিধায়-বিশেষ করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সূগম করেছেন। (ফলে তোমরা অনন্যাসে যত্নতর গমনাগমন করতে পার) অতএব তোমরা তার বৃক্কের উপর বিচরণ কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্ট) আল্লাহ্ র যিক আহা কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে স্মরণ কর। কেননা) তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সুতরাং তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়, যা ঈমান ও আনুগত্য)। তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে

(সর্বময় ক্রমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদেরকে (কারানের ন্যায়) ভূমিতে মিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কীপতে থাকবে (ফলে তোমরা আরও নীচে চলে যাবে এবং ভূমি তোমাদের উপরে এসে যাবে) না তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে (সর্বময় ক্রমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদের উপর (আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়) বন্যাবাস্তু প্রেরণ করবেন (ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপযুক্ত শাস্তি এটাই)। অতএব (কোন উপযোগিতাবশত দুনিয়ার শাস্তি টলে গেলেই কি) সঙ্করই (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে (আযাব থেকে) আমার সতর্কবাণী কেমন (নির্ভুল) ছিল। (যদি দুনিয়ার শাস্তি-বাস্তি বাতীত তারা কুফরের অপকারিতা বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে এর নমুনাও বিদ্যমান আছে। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তীরা (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব (দেখে নাও তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল। (এ থেকে পরিত্রাণ বোঝা যায় যে, কুফর গহিত। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও পরজগতে শাস্তি হবে।

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ আয়াতে আকাশ সম্পর্কিত তওহীদের

প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে এবং هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত

প্রমাণাদি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর শূন্যমণ্ডল সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত করা হচ্ছে : ) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকূলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী ? ( উভয় অবস্থাতে ভারী ও ওজনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে অবশ্যে বিচরণ করে—মাটিতে পতিত হয় না)। দয়াময় আল্লাহ্ বাতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখে না। তিনি সবকিছু দেখেন। (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আল্লাহর ক্রমতা তো শুনলে, এখন বল) রহমান আল্লাহ্ বাতীত কে তোমাদের সৈন্য-বাহিনী হয়ে (বিপদাপদ থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করবে? কাফিররা (যারা তাদের উপাস্য সম্পর্কে এলাপ ধারণা-পোষণ করে তারা) তো নিরেষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছে। (আরও বল) তিনি যদি স্মিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে স্মিক দেবে? (কিন্তু তারা এতেও প্রভাবান্বিত হয় না) বরং তাঁরা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) বিমূখতার ডুবে রয়েছে। (সারকথা এই যে, তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা কেমন অনিশ্চয় পূর্ণ করতে সক্ষম নয়, يُنصركم আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার পৌছাতেও সমর্থ নয়, يُرزقكم আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আরাধনা করা নিরেষ্ট বোকামি। উপরে বর্ণিত কাফিরদের অবস্থা শুনে এখন চিন্তা কর যে) যে ব্যক্তি (অসমতল স্তান্ডার কারণে হেঁচট খেলে-খেয়ে) ঊপড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সমতল সড়কে চলে? (মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা ভিন্নই। মু'মিনের চলার পথ সরল ধর্ম এবং সে চলেও সোজা হয়ে স্বস্তি ও বাহ্যিক থেকে আশ্বস্তি করে। পক্ষান্তরে কাফিরের চলার পথ বক্রতা এবং পথপ্রস্তুতাপূর্ণ এবং চলার মধ্যেও সর্বদা বিপদাপদে পতিত হয়। এমতাবস্থায়

সে পন্থাকায় কে কিরূপে পৌঁছেবে? উপরে তওহীদের জগত সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর আত্মা সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে : ) বলুন, তিনিই ( এমন সক্ষম ও নিয়ামতদাতা যিনি ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে কর্তা, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন ( কিন্তু ) তোমরা অজ্ঞই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ( আরও ) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং ( কিয়ামতের দিন ) তোমরা তাঁরই কাছে সমবেত হবে। কাফিররা ( যখন কিয়ামতের কথা শুনে, তখন ) বলে : এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা ( অর্থাৎ পরগণ্ডর ও তাঁর অনুসারীরা ) সত্যবাদী হও, ( তবে বল ) বলুন : এর ( নিদিশ্ট ) জান আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো কেবল ( সংক্ষেপে কিন্তু ) প্রকাশ্য সতর্ককারী। অতঃপর যখন তারা একে ( অর্থাৎ কিয়ামতের আয়াকে ) আসন্ন দেখবে, তখন ( দুঃখভিষ্যো ) কাফিরদের মুখমণ্ডল শ্লান হয়ে পড়বে ( অন্য আয়াতে আছে,

وَجَوَاهِرٌ مُّؤْتَىٰ مِنْهَا غَيْرُهَا تَرَاهَا قَتْرًا

তোমরা চাইতে। [ তোমরা বলতে আয়াব আন, আয়াব আন। কাফিররা তওহীদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়বস্তু শুনে এমন কথাবার্তা বলত, যা ছিল প্রকারান্তরে রসুলুল্লাহ (স)-র মৃত্যু কামনা এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা। তাই অতঃপর এর জুওয়াব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এতে কাফিরদের আয়াব এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সংযুক্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : ] বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখছ—যদি আল্লাহ আমাদের ও আমার সংগীদেরকে ( জোমাদের কামনা অনুযায়ী ) ধ্বংস করেন অথবা ( আমাদের আশা ও স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী ) আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে তোমাদের কি, তোমরা তো কাফিরই এবং কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? ( অর্থাৎ আমাদের যা হবে, দুনিয়াতে হবে এবং এর পরিণাম সর্বাবস্থায় শুভ। কিন্তু তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। তোমাদের দিকে যে মহাবিপদ এলিবে আসছে তাকে কে প্রতিরোধ করবে? আমাদের পাখিব বিপদাপদ দ্বারা তোমাদের সেই মহাবিপদ টলে যাবে না। অতএব নিজের চিন্তা ছেড়ে আমাদের বিপন্ন কামনা করা অনর্থক বৈ নয়। আপনি ভাদেরকে আরও ) বলুন, তিনি আমাদের প্রতি করুণাময়, আমরা ( তাঁর আদেশ অনুযায়ী ) তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই ঔপায় ভরসা করি। ( সুতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আমাদেরকে পরকালের আয়াব থেকে মুক্তি দেবেন এবং ভরসার বরকতে তিনি আমাদেরকে পাখিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন অথবা সহজ করে দেবেন। অতএব সহরই তোমরা জানতে পারবে ( যখন নিজেদেরকে আয়াবে পতিত এবং আমাদেরকে মুক্ত দেখবে ) প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় কে লিপ্ত আছে? ( অর্থাৎ তোমরাই আছ না আমরা আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদি কাফিররা মনে করে যে, তাদের মিস্যা' উপাস্য তাদেরকে রক্ষা করবে, তবে এই ধারণার নিরসনকল্পে আপনি ) বলুন, তোমরা ভেবে দেখছ কি, যদি তোমাদের ( কূপের ) পানি নিশ্চন ( নেই ) অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে স্রোতের পানি ( অর্থাৎ কে কূপে স্রোত প্রবাহিত করবে এবং ভূগর্ভের গভীর থেকে পানি উপরে আমবে। কেউ যদি খনন করার স্পর্ধা দেখায়, তবে আল্লাহ তা'আলা পানি আরও নীচে গিয়ে বক্রে দিতে সক্ষম। যখন

আল্লাহর মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নয়, তখন পরকালে আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কিরূপে)?

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুলকের ফযীলত : এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং 'মুনজিয়া' শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنَجِّمَةُ تَنْجِيهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ** অর্থাৎ এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এই সূরা পাঠ করে, তাকে এই সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—( কুরতুবী )

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকুক। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহর কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কিয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে সেটা সূরা মুলক।—( কুরতুবী )

تَبَارَكَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

শব্দটি **تَبَارَكَ** থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। **بِيَدِهِ الْمُلْكُ**—আল্লাহর হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহর জন্য হাত অর্থে **يَدٌ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বকীয় উর্ধ্ব। তাই এটা একটা **بِأَمْرٍ مِّنْهُ** শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু একই অবস্থা ও স্বরূপ স্থানও আমার বিষয় নয়। এর গিহনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবী করা হয়েছে। এক. তিনি বিদগ্ধমান আছেন, দুই. তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধ্ব, তিন. তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং চার. তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্ব সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতের খেসার নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে : **خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ**—এরপর



কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে: **الَّذِي**

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا — এরপর — **خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ** থেকে

দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে

শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্ট জীব পক্ষীদের উল্লেখ করে **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ** বলা

হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফিরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

**مَرَجٍ وَ الْجِبْنِ** — অর্থাৎ তিনি মরণ ও

জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুইটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিত্বচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরৈক নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিত্বচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুইটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোড়াকার আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জাম্মাতীরা জাম্মাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পূনসি-ন্নাতের সন্মিলনে যবাই করে ঘোষণা করা হবে: এখন যে যে অবস্থায় আছে, অমৃতকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুঙ্গামী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।—(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরৈক নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার

জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মিছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'ম্মানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুমিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীয়ে মাযহারীতে 'আলমে মিছাল' সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

**মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর :** তফসীয়ে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রভা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে।

أَمْمِنَ كَان مَيَّنَّا فَا حَيِّنَا ۝ — অর্থাৎ কাফিরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত

আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে :

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاحْيَا كُمْ ثُمَّ يَمِيْتَكُمْ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ — এখানে জীবনের অর্থ

অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল রুচ্চি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই

মৃত্যু, যার উল্লেখ **يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا** আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার

জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুর নিমিত্ত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন :

أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَا ۝ — কিন্তু এতদসঙ্গেও জড় পদার্থের মধ্যেও অস্তিত্ব জন্য অপরি-

হার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে :

وَأَنَّ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَحْيِيهِ بِحَمْدِ ۝ — অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ

তা'আলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে,

পরবর্তী **لِيَهْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার

কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জান করবে, সে নিশ্চিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উৎসাহ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আশ্শাম ইবনে ইয়াসীর (রা) বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

**كفى بالمرء غنى** অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং

বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধ-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপর্যায়ত। আল্লাহ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন : মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

**أحسَنُ عَمَلًا** এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত

মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহর কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়, বরং কর্মটি ভাল, নিতুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না, বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত

তিলাওয়াত করে **أحسَنُ عَمَلًا** পর্যন্ত পৌঁছে বললেন : সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহর হান্নামরূত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)

**فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ**—এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়

যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরি-  
দৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও  
অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য  
মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না  
যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল  
কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নিয়া  
যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে  
পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বয়ানুল কেররআন)

وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَاءٍ بَيِّعٍ وَجَعَلْنَاَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি ধারা  
সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে  
সংযুক্ত থাকবে, বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই  
আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে  
শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অস্তর করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি  
থেকে কোন আয়তন উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্ব-  
স্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের নাম গতিশীল  
দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে **انقراض الكواكب**  
বলে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শয়তানরা যখন  
উর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিতাড়িত করে দেওয়া  
হয়।—(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার  
পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ**

থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফিরদের শক্তি ও অনুগত মু'মিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে।  
এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

ذُ لُول—هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَوْسَافَ نِ لُولًا

অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔচ্চত্যা প্রদর্শন করে না, তাকে **ذُ لُول** বলা হয়।  
**مناكب** শব্দটি **منكب** এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরোহ-  
হণের স্থান নয়, বরং কোমর অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু  
আরোহীর জন্য নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত স্বভাব  
থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি

যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুস্থম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে রক্ত ও শ্মশা বপন করা যেত না, কৃপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاللَّهُ النُّشُورُ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের

আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন : আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক আহ্বান কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রফতানী আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা।

اللَّهُ النُّشُورُ

বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হ'শিয়ান করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহর আযাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

أَمْ مِّنْكُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুস্থম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

أَمْ مِّنْكُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিত করে দেবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাকীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জ্ঞানি নিষ্ফল হবে। স্বাস্থ্য, সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَوِّفًا كَانَ نَكِيرًا ۝

কর। আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'আলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সভা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ ۝

অর্থাৎ তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিম্নমদুলে ভারী বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাণ্ডিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সত্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা মেরুপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া—এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সম্মিলিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফির ও পাগাচারীদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হ'শিয়ান করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সেনাবাহিনী, সিপাই-সাজী তোমাদেরকে সেই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে :

أَمِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ فَنصركم من دون الرحمن إن

الكَافِرُونَ الْأَفِي غُرُورٍ ۝

এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে সৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তা'আলার যে রিম্বিক পাল্টা, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়; বরং আল্লাহর দান ও বখসিস।

أَمِّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۝

তিনি তা বন্ধও করতে দিতে পারেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফিরদের জন্য পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও

আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকর্মীর বর্ণনায় গুনে না।

بَل لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ — অর্থাৎ তারা অবধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে।

অতঃপর কিয়ামতের মাঠে কাফির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের মাঠে কাফিররা উপড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াজে আছে যে, সাহাবায়ে কিয়াম জিজ্ঞাসা করলেন—কাফিররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ (স) বললেন: যে আল্লাহ তাদেরকে পাল্পে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমস্তক ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিশ্চয়ই আয়াতে তাই বলা হয়েছে:

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ — অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমস্তকে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হিদায়তপ্রাপ্ত, না যে

সোজা চলে? যেমতো ব্যক্তিই মু'মিন! সে-ই হিদায়ত পথে পারে। অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ডানের কৃতিপন্ন বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ — অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং

তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য: আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর ডান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ ডান ও অনুভূতির পাঁচটি উপাঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আত্মাদান ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্য নাক আত্মাদানের জন্য জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই ঘ্রাণ, আত্মাদান ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব-কম বিষয়ের ডান; মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদূতয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবন যেসব বিষয়ের ডান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধান এখানে

পক্ষ ইজিরের মধ্য থেকে মাত্র দুটি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিশ্বরসমূহের জান ও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জানের কেন্দ্র এক পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাকিরদের প্রতি হাশিরারী ও শস্তিবাপী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে : : তোমরা হারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কৃপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহর দান। তিনিই পানি বরাদ্দ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পল্লিত করে পঁচন রোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আন্তে আন্তে গজিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যৱহারকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেহা ইচ্ছা মাটি খনন করলে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি সৃষ্টিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা করেক-কুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা ব্রহ্মার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিহনের স্তরে ডোআদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَبَ مَا لَكُمْ غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ -

অর্থাৎ তারা ভেবে দেখুন, তারা কে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গহীরে চলে যায়, তবে কোন শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলা উচিত **اللَّهُ رِبِّ الْعَالَمِينَ** অর্থাৎ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন—  
আমাদের শক্তি নেই।



سورة القلم

मन्त्रा कवच

मन्त्रा अवतीर्ण, ५२ आक्षर, २ अक्षर

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ ۝ مَا اَنْتَ بِنَعْمَ رَبِّكَ یَسْمَعُونَ ۝ وَاِنْ

لَكَ لَاجْرًا لِّمَا كُنْتَ مَنَّوْی ۝ وَاِنَّكَ لَعَلَّی خَلْقٌ عَظِیْمٌ ۝ فَسُبْحٰرٌ

وَبِجْهْرٍ ۝ بِاَیِّكُمُ التَّفْوِیْهُنَّ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِسَبِّ مَنۢ صَلَّٰ عَنْ

سَبِیْلِهِ ۝ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ ۝ فَاَلَّا تُطِیْعُ الْمُكذِبِیْنَ ۝ وَدُوًّا لِّو

تُدْمِیْنٍ فَبِیْدِهِمْ ۝ وَاَلَّا تُطِیْعُ كُلَّ حَلٰلٍ مَّهِیْنٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَآءٍ

بِغَیْرِ ۝ مَنَآءٍ لِّلغَیْرِ مُفْتَدٍ اَیْمُو ۝ لَعَلَّی بَعْدَ ذٰلِكَ رَیْبٌ ۝

اِنْ كَانَ ذَا مَنَالٍ وَیَمِیْنٍ ۝ اِذَا تَطَّلَعْتُمْ عَلَیْهَا اِیْتِنَا قُلْ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝

سَمِعْتُمْ عَلَی الْخُرطُوْمِ ۝ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ

اِذْ اَقْبَمُوا لَیْسُ مِنْهَا مُصْحِحِیْنَ ۝ وَلا یَسْتَشْفُونَ ۝ فطَافَ عَلَیْهَا طَآئِفٌ

مِّنۢ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِبُونَ ۝ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِیْمِ ۝ فَتَنَادَوْا

مُصْحِحِیْنَ ۝ اِنْ اَعْدَوْا عَلَی حَدِّكُمۡ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِیْمِیْنَ ۝

فَاَنْطَلَقُوْا هُمْ یَتَخَفْتُونَ ۝ اِنْ لَّیْسَ لَهَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمْ مَّسْکِیْنٌ ۝

وَعَدُوا عَلَی حَدِّ قَدْرِیْنِ ۝ فَكَلَّمَا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَصٰآلُونَ ۝ بَلْ

لَعَنُ مَعْرُومُونَ ۝ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلۡ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسْمِعُونَ ۝

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 يَتَّبِعُونَ ۝ قَالُوا يُونُسَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَخَرَّ رَجُلًا أُنْزِلَ  
 لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُهْتَابُونَ ۝ كَذَلِكَ الْعَذَابُ  
 وَالْعَذَابُ الْأَخْرَجَ أَكْبَرُ لَكُمْ أَنْ تَوَاعِبْتُمْ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ وَنَدَى  
 رَبَّهُمْ جَدَّتِ الثَّوَابِ أُنْتَعِلُوا السُّلُوبِينَ كَالْمَجْرِمِينَ ۝  
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝ إِنَّ لَكُمْ  
 فِيهِ لَمَاءً تَخَيَّرُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ يُسَانٌ عَلَيْنَا بِاللُّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّ لَكُمْ لَهَا تَعْلَمُونَ ۝ سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ يَدْعُكَ رَبُّكَ ۝ أَمْ لَهُمْ  
 شُرَكَاءُ ۝ فَمَا تَأْتِي الشُّرَكَاءَ بِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝ يَوْمَ يُكْشَفُ  
 عَنْ سَائِرٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ خَائِفَةً  
 أَبْصَارُهُمْ تَرْمَقُوهُمْ ذُلَّهُ ۝ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ  
 سَلِيمُونَ ۝ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  
 مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ ۝ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝ أَمْ كُنْتُمْ  
 آخِرْتُمْ مَنْ كَفَرْتُمْ مُثْقَلُونَ ۝ أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝  
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ  
 مَكْظُومٌ ۝ كَذَلِكَ أَنْ تَذَرَهُ لَيْسَ مِنْ رَبِّهِ لَيْسَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ  
 نَذِيرٌ ۝ فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِنْ يَكْفُرُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا كَيْفَ يُؤْمِنُوا بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبَعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

## لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নূন—শপথ কলামের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা জিহ্বিকত করে, (২) আগনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আগনি উদ্ভাস নন। (৩) আগনার জন্য অবশ্যই স্মরণে অশেষ স্মরণীয়। (৪) আগনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সত্যই আগনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসব্রত। (৭) আগনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (৮) অতঃপর, আগনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করছেন না। (৯) তারা চান যদি আগনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে মান্হিত, আগনি তার আমুগত্য করছেন না; (১১) যে পশ্চাত্ত নিষা করে একের কথা অপরকে কাছে লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাঙ্গি কষ্টক বাধা দেয়, যে সীমালংঘন করে, যে পাগিত, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কৃষ্ণাভে; (১৪) এ কারকণ্ঠে সে খন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার জরুরি পাঠ করা হলে সে বলে : সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাশিকা লাগিয়ে দেব। (১৭) আমি তাদেরক পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহে' না-কাল। (১৯) অতঃপর আগনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলে। যখন তারা নিশ্চিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিধিই উপসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল কিসফির কর কথা বলতে বলতে, (২৪) জ্ঞান যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করত না পারে। (২৫) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওলামা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেবল, তখন বলল : আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া। (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্বর্ণনা করছ না কেন? (২৯) তারা বলল : আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে তৎসনা করতে লাগল। (৩১) তারা বলল : হার! দুর্ভাগ্য আমাদের, জ্বালামা ছিলাম সীমালংঘনকারী। (৩২) সন্তবত আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তিত এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দেখেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (৩৩) শান্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শান্তি আরও গুরুতর, যদি তারা জানত। (৩৪) মুত্তাফীদের স্মরণ-তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিরামতের জাহাজ। (৩৫) আমি কি আত্মীয়দেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কোমর সিঁড়ি দিচ্ছ? (৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর-- (৩৮) তাতে তোমরা যা পড়তে কর, তাই পাও? (৩৯) মা তোমরা আমির কাছে থেকে

বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যে কোন শপথ দিয়েছে যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে বিভ্রান্ত করুন—তাদের কে এ বিষয়ে দারিত্বশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) পোছা পর্যন্ত পা মোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে আহ্বান জানানো হবে, সত্যপূর্ণ তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি ভ্রমভিত্তিক থাকলে, তারা মাস্হানাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব হারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে আহ্বানার্থে মিলে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি তাদেরকে সফর দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে পরিভ্রমিক চান? কলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে পায়বের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষার সফর করুন এবং মাছুওরাদা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। (৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সাফল্যে বা মিত, তবে সে নিশ্চিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিষ্কিন্ত হত। (৫০) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সংকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (৫১) কাকিররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাদ দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলে : সে তো একজন পাগল। (৫২) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।

তফসীরের আর-সংক্ষেপ

নূন—(এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। শপথ কসমের (সম্ভারা মওহে মাহফুযে সৃষ্টির সূচনা কিংবা হয়েছে) এবং (শপথ) তাদের (ফেরেশতাদের) লিখার [হারা আমলনামা লিখে—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন], আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি উম্মাদনাম (যেমন কাকিররা তাই বলে) উদ্দেশ্য এই স্বে, আপনি সত্য নবী। এই সূরার পক্ষে শপথগুলো খুবই উপযুক্ত। কেননা, কোরআন অবতরণও ভাগ্যলিপির অংশ-বিশেষ। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনার নবুয়ত আল্লাহর জানে পূর্ব থেকেই অধিকারিত। আল্লাহই এটা নিশ্চিত সত্য। হারা এই সত্যকে স্বীকার করে এবং হারা স্বীকার করে, তাদের আমলনামা ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করেছে। সুতরাং স্বীকারের কায়দে শান্তি হবে। এই শান্তিকে উল্লিখ করে ইমান আনা ওয়াজিব। নিশ্চয়ই আপনার জন্য (এই প্রচারকার্যের জন্য) রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (এতেও নবুয়তের উপর জোর দিয়ে শত্রুদের বিচ্যুত উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং সাহাবনা দেওরা হয়েছে যে, কিছুকাল সফর করুন, এর পরিণাম মহাপুরস্কার-স্বাভ)। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (আপনার প্রত্যেকটি কাজ সমস্তাংশে গুণগণিত এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমণ্ডিত। উম্মাদ ব্যক্তি কি পূর্ব চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? এটাও পূর্বোক্ত দোযারোগের জওরার।

অন্তঃপর সন্দেহনা দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ তারা যে কাজে প্রয়োজনীয় করে আপনি একলা দুঃখ করবেন না। কেননা) সত্তরই আপনি দেখে নেন এবং তারাও দেখে নেন যে, কে (সত্যিকার) পাগল ছিল? (অর্থাৎ জানবুদ্ধি লোপ পাওয়াই পাগলামীর স্বরূপ। তখনবুদ্ধির লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান-লোকসান অনুধাবন করণ এবং চিরন্তন লোকসানই প্রকৃত জ্ঞানসন। সুতরাং কিরামতে তারাও জানতে পারবে যে, সত্যের অনুগ্রহীরাই বুদ্ধিমান ছিল; তারা এই জ্ঞান অর্জন করেছে পরন্তু তারাও পাগল ছিল, যারা এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে চিরন্তন লোক-সানকে বরণ করে নিয়েছে)। আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সংপথপ্রাপ্ত। (তাই প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। প্রতিদান ও শাস্তির যৌক্তিকতা তখন তারাও বুঝে নেন যে যখন বুদ্ধিমান ও পাগল কে তাঁ প্রকাশ হয়ে পড়বে। যখন আপনি সত্যের উপর ও তাঁর মিথ্যার উপর আছে, তখন) আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (স্বমন এ পর্যন্ত করেননি। পরবর্তী আয়াতে তাদের আনুগত্যের বিষয়বস্তু জানা যায়। অর্থাৎ) তারা চায় যদি আপনি (নাউম্বিল্লাহ্ স্বীয় কর্তব্য কর্মে অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে) নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবে। [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নমনীয় হওয়ার অর্থ প্রতিমাপূজার নিন্দনা করা এবং তাদের নমনীয় হওয়ার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তুফসীরই বর্ণনা করেছেন]। আপনি (বিশেষভাবে) এরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না, যে কথার কথার শপথ করে, (উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথকারী। অধিকাংশ মিথ্যারসদীই কথার কথার শপথ করে এবং স্বীয় কুকাণ্ডের কারণে অজাহার কাছে ও মানুযের কাছে) কে লক্ষিত, (অন্তরে বাথা দেওয়ার জন্য) যে বিদ্রূপকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, যে ভাল কাজে বাথা দান করে, যে (সমতার) সীমানাঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। [অর্থাৎ আরজ সন্তান। সারকথা এই যে, প্রথমত মিথ্যারোপকারীদের, অতঃপর বিশেষভাবে মিথ্যারোপকারীরা যদি উপরোক্ত মন্দ বিশেষণে বিশিষ্ট হন, তবে তাদের আনুগত্য করবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় প্রধান মিথ্যারোপকারী এরূপই ছিল এবং উপরোক্ত নমনীয়তার প্রভাবে শরীক বরণে এর উপদ্রাভা ছিল। যেটুকু আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না এবং তাও কেবল] এ কারণে যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিপত্তিশালী। তাঁর আনুগত্য করলে নিষেধ করার কারণ এই যে, তাঁর অভ্যাস হচ্ছে) যখন আমার অন্নান্তসমূহ তাঁর কাছে পাঠ করা হয়, তখন সে বলে : সেকালের উত্তম কথা। (অর্থাৎ অন্নান্তসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতঃপর মিথ্যারোপ করাই নিষেধ করার আসল কারণ। তবে এই নিষেধাত্মকে জোরমার করার জন্য আরও কতিপয় বসন্ত্যাম উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এরূপ ব্যক্তির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে) আমি নাসিকা দাগিয়ে দেব (অর্থাৎ কিরামতের দিন তাঁর মুখফণ্ড ও নাকের উপর কুফরের কারণে অপমান ও পরিচেষ্টের অজামত লাগিয়ে দেব। ফলে সে খুব লক্ষিত হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর মকার লোকদেরকে একটি কাহিনী শুনিতে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আমি (মকার লোকদেরকে জোপসাম্মী দিয়ে রেখেছি, যদ্বরূপ তাদের স্পর্ধার অন্ত নেই। এতে করে আমি) তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, (যে, তারা সিরামতের শোকর করে ইমান আনে, না অকৃতভ হলে কুফর করে) স্বমন (তাদের

কুর্বানিয়ারমত দিয়ে) পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে [ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই বাগান আব্বাসিনরাই ছিল, সম্মুদ-ইবনে মুবারক (র) বলেন, ইয়াযেনে ছিল। মক্কাবাসীদের মধ্যে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। এই বাগানের মালিকদের পিতা তার আমলে বাগানের আমদানীর সিংহভাগ পরীষ-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করত। তার মৃত্যুর পর হেজেরা বলল : আমাদের পিতা নিরোধ ছিল। তাই আমদানীর বিরাট অংশ মিসকীনকে দান করে দিত। সম্পূর্ণ আফরানী আমাদের হাতে থাকলে সুখ-স্বাস্থ্যের অন্ত থাকবে না। সেমতে আমরা তাদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছিল।

ছিল) যখন তারা ( অর্থাৎ অধিকাংশ অথবা কতক যেমন **قَالَ أَوْ سَطَّهْمُ** বলা হয়েছে )

পরস্পরে শপথ করেছিল যে, তারা অবশ্যই সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে এবং ( এতদূর আছা ছিল যে ) তারা ইনশাআল্লাহ-ও বলল না। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানের উৎসর এক বিপদ এসে পতিত হল ( সেটা ছিল এক অগ্নি-নির্ভেজাল অথবা বায়ু মিশ্রিত ) এবং তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল যেমন কতিত ক্ষেত। ( অর্থাৎ ফসল থেকে সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু তারা এই বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানত না )। অতঃপর সকালে ( ঘুম থেকে উঠে ) তারা একে অপরকে ডেকে বলল : তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। ( ক্ষেত রূপক অর্থে বলা হয়েছে, অথবা তাতে কাণ্ডহীন উদ্ভিদ যেমন আঁতুর ইত্যাদিও ছিল, অথবা বাগানের সংলগ্ন ক্ষেতও ছিল )। অতঃপর তারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বলতে বলতে চলল যে, অদ্য যখন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা ( স্বভাৱে ) নিজেদেরকে না দিতে সক্ষম মনে করে স্বাভা করল ( যে সব ফল বাড়ীতে নিজে আসবে এবং কাউকে দেবে না )। অতঃপর যখন তারা ( সেখানে পৌঁছল এবং ) বাগানকে ( তদবস্থায় ) দেখল তখন বলল : নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি ( এবং অন্যর চলে এসেছি ; কারণ এখানে তো বাগান বলতে কিছু নেই। এরপর যখন তারা চতুঃসীমা দেখে বিশ্বাস করল যে, এটাই সেই জায়গা, তখন বলল : আমরা পথ ভুলিনি ; ) বরং আমরা কপালপোড়া ( তাই বাগানের এই দশা হয়েছে )। তাদের মধ্যে যে ( কিছুটা ) ভাল লোক ছিল, সে বলল : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম ( যে, এরূপ নিয়ত করো না। মিসকীনদেরকে দিনে বরকত হয়। এরূপ কথা বলার কারণেই আছা তা'আলা তাকে 'ভাল লোক' বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-ও মনে মনে এটা অপহৃদ করা সত্ত্বেও সবার সাথে শরীক ছিল। তাই আমি 'কিছুটা' শব্দটি যোগ করে দিয়েছি। অতঃপর প্রথম কথা শ্রবণ করিয়ে লোকটি বলল : ) এখনও তোমরা আছাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? ( স্বাভাে পাপ মার্জনা করা হয় এবং আরও বেশী বিপদ না আসে )। তারা ( তওবাস্বরূপ ) বলল : আমাদের পালনকর্তা পবিত্র। ( এটা তসবীহ )। নিশ্চিতই আমরা দোষী। ( এটা ইস্তেগফার )। অতঃপর তারা একে অপরকে ডেং সনা করতে লাগল। ( কাজ নষ্ট হলে অধিকাংশ লোকের অভ্যাস এই যে, তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে। অতঃপর তারা সবাই একমত হয়ে ) বলল : নিশ্চয়ই আমরা ( সবাই ) সীমালংঘনকারী ছিলাম। ( একা কক্ষণও দোষ ছিল না। কাজেই একে অপরকে দোষারোপ করা অনর্থক। সবাই মিলে তওবা করা দরকার )। সন্তবত ( তওবার বরকতে ) আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে

উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। (এখন) আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরছি [অর্থাৎ তওবা করছি। পরিবর্তে উত্তম বাগান দুনিয়াতেও হতে পারে, পরকালেও হতে পারে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, বাগানের মালিকরা মু'মিন গোনাহ্‌গার ছিল। এই বাগানের বিনিময়ে দুনিয়াতে তারা কোন বাগান পেয়েছিল কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়নি। তবে রহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে মসউদ (রা)-এর অসম্মতিত উক্তি লিখিত আছে যে, তাদেরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দান করা হয়েছিল। অতঃপর কাহিনীর নির্ধারিত বর্ণনা করা হয়েছে : ) শান্তি এভাবেই আসে। (অর্থাৎ হে মসাবাসীরা, তোমরাও এরূপ বরণ এর চাইতে বেশী শান্তির যোগ্য। কেননা এই শান্তি ছিল গোনাহের কারণে আর তোমরা কেবল গোনাহ্‌গার নও—কাফিরও) পরকালের শান্তি আরও ওরুতর। যদি তারা জানত (তবে ঈমান আনত। অতঃপর কাকিরদের মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা

হয়েছে। তারা বলত : **لَنْ رَجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ الْحَسَنَى** নিশ্চয়

আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জামাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আমি কি আত্মবহদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করব? (অর্থাৎ কাফিররা মুক্তি পেলে বাধ্য ও অবাধ্যদের মধ্যে কি পার্থক্য বাকী থাকবে, মসাবার বাধ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে? অন্য আয়াতে আছে :

**أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ**;

তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? তোমাদের কাছে কি কোন (ঐশী) কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ কর যে, তোমরা যা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে? (অর্থাৎ সেই কিতাবে লিখিত আছে যে, তোমরা পরকালে নিয়ামত পাবে)? না আমার দায়িত্বে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবে কোন শপথ লিখিত আছে (যার বিষয়বস্তু এই) যে, তোমরা তাই পাবে, যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (অর্থাৎ সওয়াব ও জামাত) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ বিষয়ে কে তাদের দায়িত্বশীল? না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে, (যে তাদেরকে সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছে)? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয় (মোটকথা, এই বিষয়বস্তু কোন ঐশী কিতাবে নেই এবং অন্যান্য পন্থায়ও আমার শপথের অনুরূপ কোন ওয়াদা নেই, এমতাবস্থায় তারা কেউ অথবা তাদের কোন শরীক উপাস্য এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারেনা। অতএব কিসের ভিত্তিতে দাবী করা হয়? অতঃপর কিয়ামতে তাদের লাম্বানার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই দিন স্মরণীয়) সেদিন গোছার জ্যোতি প্রকাশ করা হবে এবং সিজদা করতে আহ্বান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এর ঘটনা এরূপ বর্ণিত আছে : কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় গোছা প্রকাশ করবেন। এটা আল্লাহ্র বিশেষ কোন গুণ, যাকে কোন মিলের কারণে গোছা বলা হয়েছে। কোরআনে এর অনুরূপ আল্লাহ্র হাতের কথা আছে। এগুলোকে **مَشَاتِلُهَا**রূপে অভিহিত করা হয়। এই হাদীসেই আছে, এই তাজান্নী দেখে মু'মিন নর-নারী সিজদার পড়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজদা করত, তার কোমর-ভক্তির নায়ন সোজা থেকে যাবে—সে সিজদা করতে সক্ষম হবে না।

এখানে সিজদা করতে আহ্বান জানানোর অর্থ সিজদার আদেশ করা নয়, বরং এই তাজাজীর প্রভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সিজদা করতে চাইবে। তাদের মধ্যে মু'মিনগণ তা করতে সক্ষম হবে এবং লোক দেখানো ইবাদতকারীরা ও কপট বিশ্বাসীরা সক্ষম হবে না। সুতবাং কাফিররা যে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাহুল্য। কাফিররাও সিজদা করতে চাইবে। অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি (লজ্জাবশত) অবনত থাকবে এবং তারা লাশ্ছনাগ্রস্ত হবে। (এর কারণ এই যে) তারা (দুনিয়াতে) যখন সহী সালামতে ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। [ অর্থাৎ ঈমান এনে ইবাদত করতে বলা হত। ঈমান ও ইবাদত ইচ্ছাধীন কাজ। দুনিয়াতে এই আদেশ পালন না করার কারণে আজ কিয়ামতে তাদের এই লাশ্ছনা হয়েছে। অন্য আয়াতে দৃষ্টি উপরে উন্নীত থাকার কথা আছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের আতিশয্যে দৃষ্টি উপরে থাকবে এবং মাঝে মাঝে লজ্জার আতিশয্যে দৃষ্টি অবনত থাকবে। আয়াবে বিলম্বকে কাফিররা তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ মনে করত। অতঃপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আয়াত থেকে যখন জানা গেল যে, তারা আযাবের যোগ্য, তখন ] যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ আযাবের বিলম্ব দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না)। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাবি, তারা টেরও পায় না। আমি (দুনিয়াতে তাদেরকে আযাব না দিয়ে) তাদেরকে সম্মত দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল বলিষ্ঠ। (অতঃপর তারা যেন বয়ত অস্বীকার করে, সেজন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে) আপনি কি তাদের কাছে কোন পারিত্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপেছে (তাই আপনার আনুগত্য করতে চাইছে না)। না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে, অতঃপর তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করছে? (অর্থাৎ তারা কি আলাহর আদেশ-নিষেধ অন্য কোন পন্থায় জেনে নেয়, যদিও পয়গম্বরের মুখাপেক্ষী নয়। বলা বাহুল্য উভয় বিষয় নেই। এমতাবস্থায় নবুয়ত অস্বীকার করা বিস্ময়কর ব্যাপার। অতঃপর রসুলুল্লাহকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যখন জানা গেল যে, তারা কাফির, আযাবের যোগ্য এবং তিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্মত দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশ্রুত সময়ে অবশ্যই আযাব হবে, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবার করুন এবং (বিষয় মনে) মাছওয়াল্লা (ইউনুস পয়গম্বর)-এর মত হবেন না [যে আযাব নাযিল না হওয়ার কারণে বিস্ময় মনে কোথাও চলে গিয়েছিল। একাধিক জায়গায় এই ঘটনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউনুস (আ)-এর সাথে তুলনায় বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। এখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কমুক্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে : সেই সমস্তটি স্মরণীয় ] যখন ইউনুস (আ) দুঃখাকুল মনে দোয়া করেছিল। [এই দুঃখ ছিল একাধিক দুঃখের সমষ্টি—এক. সম্প্রদায়ের ঈমান না আনার, দুই. আযাব টলে যাওয়ার, তিন. আলাহ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে গমন করার, এবং চার. মাছের

পেটে আবদ্ধ হওয়ার। দোয়া ছিল এই :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي



كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ — এর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমা ও আটকাবন্ধা থেকে মুক্তি প্রার্থনা

করা। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহে ইউনুস (আ) মাহের পেট থেকে মুক্তিলাভ করেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সাহায্য না দিত, তবে সে (যে প্রান্তরে মাহের পেটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই) জনশূন্য প্রান্তরে নিশ্চিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হত। (সাহায্য দেওয়ার অর্থ তওবা কবুল করা এবং নিশ্চিত অবস্থায় অর্থ তার ইজতিহাদী ভুলের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে নিশ্চিত হয়েছিল। এই আয়াত এবং সূরা সাকফাতের আয়াতের সান্ন্যয় এই যে, তওবা কবুল না হলে মাহের পেট থেকে মুক্তি সম্ভবপর ছিল না। যদি তওবা করত এবং আল্লাহ তা'আলা কবুল না করতেন, তবে তওবার পাখিব বরকতরূপে মাহের পেট থেকে মুক্তি তো হয়ে যেত, কিন্তু প্রান্তরে যে ভাবে পূর্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, মুক্তির পরও সেভাবে নিক্ষিপ্ত হত এবং তা নিশ্চিত অবস্থায় হত। কিন্তু এখন নিশ্চিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়নি। কারণ তওবা কবুলের পর ভুলের কারণে নিন্দা করা হয় না।) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে (জারও বেশি) মনোনীত করলেন এবং তাকে (অধিক) সংকল্পের দায়িত্ব দেওয়া করে নিলেন। [পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করার কারণে ইউনুসের ক্ষতি হয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করার কারণে উপকার হয়েছে। অতএব, আযাবের ব্যাপারে আপনিও নিজের মহানুসারে তাড়াহুড়া করবেন না, বরং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এর পরিণাম শুভ হবে। কাফিররা রসুলুল্লাহ (সা)-কে পালন বর্জন। সূরার শুরুতে এক উদ্ভিগে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এখন উন্নত উদ্ভিগে তা খণ্ডন করা হচ্ছেঃ] কাফিররা যখন কোরআন শুনে, তখন (শরুতার আতিশয্যে) এমন মনে হয় যেন আপনাকে আহ্বাত দিয়ে ফেলে দেবে (এটা একটা বিশেষ বাকপদ্ধতি, যেমন বলা হয়ঃ অমুক ব্যক্তি এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন খেয়ে ফেলবে।) লাহল মা'আনীতে আছেঃ

نظر الى نظر يركب يمد على او يركب  
 يا لى উদ্দেশ্য এই যে, ক্রোধের আতিশয্যে তারা রসুলুল্লাহ (সা)-কে অনিশ্চয় দৃষ্টিতে দেখে এবং (শরুতাবশত তাঁর সম্পর্কে) তারা বলেঃ সে তো একজন পালন (নাউম্বিল্লাহ) অথচ এই কোরআন তো (যা আপনি পাঠ করেন) বিষয়জগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (পালন ব্যক্তি এমন ব্যাপক উপদেশের কথাবার্তা বলতে পারে না। এতে তাদের দোষারোপের জওয়াব হয়ে গেছে। শরুতাবশত বলে এ কথাটি যুক্ত হওয়ার কারণেও প্রমাণিত হয় যে, তাদের দোষারোপের ভিত্তি দুর্বল। কেননা, শরুতার আতিশয্যে যে কথা বলা হয়, তা ক্রমেপযোগ্য নয়।)

**আনুযায়িক জাতব্য বিষয়**

সূরা মুজকে সৃষ্ট জগতের চাক্ষুশ অস্তিত্বতা থেকে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা

আল্লাহ্ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণ জ্ঞানী ও সর্বভাবে উপস্থিত রসূলকে (নাবী-মুহাম্মাদ্) উদ্দেশ্য ও পাপজন বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতাদি মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সমস্ত তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র অঙ্গে কুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শেখায়েতেন। এই গোটে ক্যাপারটি কাফিরদের জ্ঞান ও অস্বস্তির উৎসে ছিল। তাই তারা একে পাপজামি আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিয়ে বিদায়মান ধর্মীর বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব বস্তুতে নিমিত্ত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কবরও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই মতুম ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাধী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আশ্রয়কার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মুকাবিলার দাঁড়িয়ে যান। বাহ্য দর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাপজামি মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাপজন বলত। সূরার প্রথম আয়াত-সমূহে তাদের এই দ্বন্দ্ব ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

النَّاسُ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَتَتْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

একটি খণ্ড বর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ড বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উদ্দেশ্যে নিষেধ করা হয়েছে।

কজমের অর্থ এবং কজমের ফরীলত : এখানে কজমের অর্থ সাধারণ কজমও হতে পারে। এতে ডায়ালিপি কজম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কজম মাখিল আছে। এখানে বিশেষত ডায়ালিপি কজমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কজম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কজম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কজম আরম্ভ করল : কি লিখব? তখন আল্লাহ্ তকদীর নির্দিষ্ট করতে আদেশ করা হল। কজম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাভাদাহ্ (রা) বলেন : কজম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তকদীরের কজম সৃষ্টি করেছেন। এই কজম সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কজম সৃষ্টি করেছেন। এই কজম সূরার পৃথিবীর অধিবাসীরা লেখে এবং লেখবে। সূরা ইকরার **عَلَّمَ بِالْقَلَمِ** আয়াতে এই কজমের উল্লেখ আছে।

আয়াতে কলাম হলে যদি সর্বপ্রথম সৃষ্টি তফসীরের কলাম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বর্ণনাসম্পর্কে নয়। কাজেই এর শপথ করা উপযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তফসীরের কলাম, ফেরেশতাদের কলাম ও মানুষের স্বল্পবয়সক সার্থকতার কলাম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শপথ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ কামের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। সেশ বিজয়ে তরবারির চাইতে কলাম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজন-বিদিত। আযু হাতেম বন্দী-(র) এই বিশ্বব্দেই দুটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন :

اذا اقسام الا بطل يوم ما يستفهم  
 وعدوة ما يكسب المعجد والكرم  
 كفى قلم الكتاب عزا ورفعة  
 عدى الدهران الله اقسام بالقلم

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনদিন তাদের তরবারির শপথ করে এবং একে সন্মান ও সৌরভের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলাম ও তাদের সন্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরতরে হ্রাসি করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কলামের শপথ করেছেন।

সারকথা, আয়াতে কলাম এবং কলাম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তাঁর শপথ করে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন :

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ

بِمَجْلُونٍ অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপার কখনও পাগল নন।

এখানে بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ স্মরণ করে দাবীর স্বপক্ষে মজীহও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরাপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

অলিমগণ বলেন : কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে مَا يُسْطَرُونَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লেখা হয়েছে এবং লেখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? একরূপ ব্যক্তি তো অপরের ডান-মুঁড়ির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে :

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ অর্থাৎ আপনার জন্য অনেক পুরস্কার রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনাদের যে কাজকে তাঁর পাপজানি বজাছে, সেটা আজ্ঞাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না—চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কেননা পাপজকে তাঁর কর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য যারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ —এতে রসুলে করীম (সা)-র উত্তম চরিত্র সম্পর্কে

চিত্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে : জানপাসীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাপজ ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি-এরূপ হয়ে থাকে ?

রসুলুল্লাহ (সা)-র মহৎ চরিত্র : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আজ্ঞাহ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেননা ধর্ম নেই। হযরত আরেশা (রা) বলেন : স্বয়ং কোরআন রসুলে করীম (সা)-এর মহৎ চরিত্র অর্থাৎ কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রা) বলেন : মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের নিষ্পত্তাচার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেসব নিষ্পত্তাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসুলে করীম (সা)-এর সত্তার আজ্ঞাহ তা'আলা বাস্তবীর উত্তম চরিত্র পূর্ণ মানায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন : **بِعِثَّتْ لَأَتَمُّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ** অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই জন্মিত হয়েছি।—( আবু হাইয়ান )

হযরত আনাস (রা) বলেন : আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রসুলুল্লাহ (সা)-র খিদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি হের্‌সব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও বলেন নি যে, কাজটি এভাবে কেন করলে, অমুক কাজটি করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তাঁর রুচি বিরুদ্ধও হয়ে থাকবে।—( বুখারী, মুসলিম )

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন : তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বলব, মদীনার কোন বাদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।—( বুখারী )

হযরত আরেশা (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা) কখনও স্বহস্তে কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের মরদানে কাফিরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোন খাদিমকে অথবা স্ত্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারও কোন ভুলত্রুটি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আজ্ঞাহর আদেশ লংঘন করলে তাকে শরীরভঙ্গসম্মত শাস্তি দিয়েছেন।—( মুসলিম )

হযরত জাবের (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা) কোন সওয়ালের জওয়াবে কখনও 'না' বলেন নি। —( বুখারী, মুসলিম )

হযরত আরেশা (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা) অন্নীলভাষী ছিলেননা এবং অন্নীলভার ধার—কাজেও যেতেন না। তিনি বাজারে হট্টপোল করতেন না এবং মন্দ ব্যবহারের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা ও সার্জন করে দিতেন। হযরত আবুদাঈদ (রা) বলেন : রসুলে করীম (সা)-এর উক্তি এই যে, আমলের দাঁড়ি-পাল্লার উত্তম চরিত্রের সমান

কোন আকসের ওজন হবে না। আলাহ তা'আলা পাকিস্তানকারী মন্দভাবী ব্যক্তিকে গুলন্দ করেন না।

হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়াজে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : মুসজিদার ভাঙ্গ সচ্চরিত্রতার গুণ দ্বারাই সেই ব্যক্তির মর্তবা লাভ করে, যে সারা রাত ইবাদতে আশ্রিত থাকে এবং সারাদিন রোযা রাখে।—( আবু দাউদ )

হযরত মা'আয (রা) বলেন : ( আমাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময় ) ঘোড়ার জিনের সাথে সংকল্প মোহোর আংটিতে যখন আমি এক পাশাখলায় তখন রসুলুল্লাহ (সা) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেন :

يَا مَعَاذَ أَحْسَنِ خَلْقٍ لِلنَّاسِ —হে মা'আয, জনদের প্রতি সচ্চরিত্রতা

প্রদর্শন করবে।—( মালেক )

এসব রেওয়াজে তফসীয়ে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হল।

لَا تُصِرُّوْا بِمِصْرٍ وَبِصُرُوْنَ بِأَيْكُمُ الْمَفْتُوْنَ —নীশ্বই আপনিও দেখে নেবেন এবং

কাকিররাও দেখে নেবে যে, কে বিকরপ্রভ। مِصْرٍ শব্দের অর্থ এ স্থলে বিকরপ্রভ—পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হলেছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য কাঁস হয়ে যাবে যে, রসুলুল্লাহ (সা) পাগল ছিলেন, না হান্ন তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সভ্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসুলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ ও মুহম্বতাসে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগ্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

لَا تَطْعِ الْكُذِّبِيْنَ - وَنَّوَأُ لَوْ تَذَهْنُ فُهِدَ هُنُونُ —অর্থাৎ আপনি মিথ্যা-

রোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চান যে, আপনি প্রচারকার্বে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমাপূজার তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনাদের প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্খাতন ত্যাগ করবে। —( কুরতুবী )

মা'আজা : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'—কাকির ও পাগাচারীদের সাথে এই মর্মে কোন চুক্তি করা দীনের ব্যাপারে শৈখিল্যের নামাজ ও হারাম।—( মাযহারী ) অর্থাৎ বৈমতিক না হলে এলাপ চুক্তি না-আয়েশ।

وَلَا تَطْعِ كُلَّ حَلَا فِي مَهْمِي هَمَارِ مَشَاءَ بِنَمِيهِمْ مَنَاعٍ لِلتَّخْيِيرِ مَعْتَدِ ائْتَمِ

مَثَلٌ لِّمَنْ لَّمْ يَذُرْ نَجْمًا — আপনি আনুসৃত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথার কথার মশখ করে, লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিশ্কা করে, যে একেবারে কথা অপসারণ করে লাগার, যে সংকাজে বাধাদান করে, যে স্ত্রীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। (শব্দের অর্থ পিতৃ-পরিচর্যহীন — জারজ।) আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে আরজই ছিল।

প্রথম আয়াতে সাধারণ ক্বাফিরদের আনুসৃত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন-রূপ নবনীয়তা অবনমন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দৃষ্টমতি ক্বাফির ওমীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও তার আনুসৃত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মনোচক্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করায় পর বলা হয়েছে :

صَنِمَةٌ عَلَى

مَثَلٌ لِّمَنْ لَّمْ يَذُرْ نَجْمًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। ফলে পূর্ববর্তী সর্বলোকের সামনে তার লাঞ্ছনা কুটে উঠবে। মতটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের ঠোঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওমীদের নাসিকাকে মূণ প্রকাশার্থে মতটির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَمْمَارَ الْفِجَةِ — অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে

পরীক্ষার ফলেছি; যেমন উদ্যানের মালিকদেরকে পরীক্ষার ফলেছিলাম। পূর্বের আয়াত-সকলের সূত্রাহ্ (স)-র প্রতি মক্কাবাসী-ক্বাফিরদের দোষারোপের জওরায় ছিল। আনোচা আয়াতসমূহে আয়াত্ তা'আলা বিপুল-মুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষার ফলের অর্থ একরূপ হতে পারে যে, যদিও তারা ক্বাইনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন অম্বাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা জুখিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমন আয়াত্ অম্বাহ্ মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত-তো এই যে, রসূলুজাহ্ (স)-কে তাদের মধ্যেই পরদা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাহ্ দ্বাঙ্গীল করেছেন। এসব নিয়ামত মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষারূপ। আয়াত্ দেখতে চান যে, তারা এসব নিয়ামতের ফলভোগ্য প্রকাশ করে কিম্বা এবং আয়াত্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা ক্বফর ও অবাধ্যতার অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের ক্বাইনী থেকে তাদের শিকার প্রবেশ করা উচিত। এই আয়াতগুলোকে মক্কার অবতীর্ণ মর্মে বলা হইবে ও এই তফসীর সঠিক। কিন্তু অনেক তফসীরবিল এই আয়াতগুলোকে

মদীনায় অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুভিক্কের আয়াব, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুভিক্কের সময় তারা ক্ষুধার ভাঙনের মত জন্তু ও বৃক্কের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হিজরতের পরবর্তী ঘটনা।

**উদ্যানের মালিকদের কাহিনী :** হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষা অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত য়ায়েদ ইবনে সুবায়র-এর এক রেওয়াম্নেতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারুও কারুও মতে এটা আবিসিনিয়ান ছিল—(ইবনে কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে-কিতাব। ইসা (আ)-র আকাশে উদ্ভিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে 'আসহাবুল-জান্নাত' তথা উদ্যানওয়াল্লা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় যে, তাদের মালিকানাধীন কেবল উদ্যানই ছিল না, চাষাবাদের ক্ষেত্রেও ছিল। তবে উদ্যানের প্রসিদ্ধির কারণে উদ্যানওয়াল্লা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের বাচনিক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এই ঘটনা নিম্নরূপ :

ইয়ামনের 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে হুরওয়ান নামক একটি উদ্যান ছিল। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূমির মধ্যে থেকে ক্ষেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ক থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল : আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়াম্নেতে আছে, পুত্রবৃত্ত উচ্ছ্বল সুবকদের ন্যায় বলল : আমাদের পিতা বেওক্ব্ব ছিল। তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

— **أَنْ أَقْسَمُوا لَيْسَ مِنْهَا مَهْمُهُنَّ وَلَا يَحْتَكُونَ** — অর্থাৎ তারা পরস্পরে

শপথ করে বলল : এবার আমরা সকল-সকলই একই ক্ষেতের ফসল কেটে আনিব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পারে এবং পেছন পেছনে না চলে। এই পরিকল্পনার

প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, 'ইনশাআল্লাহ্' বলারিও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল এ কাজ করব' বলা সুমত। তারা এই সুমতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ **لَا يَسْتَنْوُونَ**—এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দেব না।—(মাযহারী)

**نَطَافٍ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ**—অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে

এই ক্ষেত্রে ও উদ্যানে এক বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, একটী অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। **وَهُمْ نَائِمُونَ**—অর্থাৎ এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন।

**كَالْمُرْتِمِ**—এর অর্থ **صُرْمٍ** শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কঠন করা।

কতিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাক্ষ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। **صُرْمٍ**—এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল।—(মাযহারী)

**فَتَنَادُوا مَصْبُحِينَ**—অর্থাৎ তারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে

লাগল : যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল। **وَهُمْ يَتَنَحَّاهُ فَنُونَ** অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলছিল, স্বাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেলে সাথে না চলে।

**حَرْدٍ وَغَدَاً وَعَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ** শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা,

গোসা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওজানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও স্বায়, তবে তাকে হুট্টিয়ে দেবে।

**فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَأَمَّاؤُن**—যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান



কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল : আমরা পথ ভুলে গিয়ে এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, পথভ্রমণই এসেছে; কিন্তু কেউ পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল : **بَلْ نَحْنُ مُكْرَمُونَ**—আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

**قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ**—তাদের মধ্যে যে মস্কারি ব্যক্তি

ছিল, অর্থাৎ পিতার নাম সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল : আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দেবেন না, অথচ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয় পবিত্র। স্বারা তার পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন।—(মাযহারী)

**قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ**—তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না

শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ভুলি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালিম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের আংশও হজম করতে চেষ্টা করত।

এই মধ্যস্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সক্ষম হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুসরণ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

**فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْنَ**—অর্থাৎ তারা নিজেরদের অপরাধ স্বীকার

করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, হন্দরুন এই আয়াব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না, বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সমস্ত নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغُوتٍ — অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত

করার পর স্বখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহ্গার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি তওবার হুদাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওয়াজেতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বন্দোজতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক-একটি আঁড়ুর-গুচ্ছ এক খন্ডরের বোঝা হয়ে যেত।—(মাহহারী)

كَذَلِكَ الْعَذَابُ — মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং

উদ্যান মালিকদের ক্ষেত ছলে হাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্বখন আল্লাহর আযাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ার এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না, বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আল্লাহ্‌তীক্ষদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে মক্কার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবী করত যে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকালের কাহিনী উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত যদি এক্সপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার ন্যায় নিয়ামত ও অসাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবীর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা সৎ ও অপরাধীদেরকে সমান করে দেবেন—এ কেমন উদ্ভট ও অতিনব সিদ্ধান্ত! এর পক্ষে না আছে কোন প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোন সাক্ষ্য এবং না আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা। এমতাবস্থায় কেমন করে এক্সপ দাবী করা হয় ?

কিয়ামতের একটি সুক্তি : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সৎ-অসতের প্রতিদান ও শাস্তি হওয়া সুক্তিগতভাবে অবশ্যস্বাভাবী। কেননা, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে সাধারণত যারা পাপাতারী, কুকর্মী, চোর-ডাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং মজা লুটে। একজন চোর ও ডাকাত মাঝে মাঝে এক স্ত্রীতে এই পরিশোধ ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন শুভ্র ও সাধু ব্যক্তি সারা জীবনেও উপার্জন করতে পারে না। তদুপরি সে আল্লাহ ও পরকালের ভয় কাকে বলে, জানে না এবং কোন লজ্জা-শরমের বাধাও মানে না, যে-ভাবে ইচ্ছা মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে যায়। পক্ষান্তরে সৎ ও শুভ ব্যক্তি প্রথমত আল্লাহকে ভয় করে, যদি তাও না থাকে, তবে সামাজিক লজ্জা ও শরমের চাপে দমিত

হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুক্করী ও বদমায়েশেরা সফল এবং সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ দৃষ্টিপোচর হয়। এখন সাহনেও যদি এমন সম্মন না আসে যাতে সৎ ব্যক্তি উত্তম পুরস্কার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শাস্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোন মন্দকে মন্দ এবং পোনাহকে গোনাহ বলা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়, দ্বিতীয়ত ন্যায় ও সুবিচারের কোন অর্থ থাকে না। যারা আলাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা এই প্রশ্নের কি জওয়াব দেবে স্রে, আলাহর ইনসাফ কোথায় গেল ?

দুনিয়াতে প্রায়ই অপরাধী ধরা পড়ে, লাক্ষিত হয় এবং সাজা ভোগ করে। এতে করে সৎ লোকের স্বাভিজ্য দুনিয়াতেই ফুটে উঠে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানূনের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি? উপরোক্ত বস্তব্যে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা, প্রথমত সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রের দেখা শুনা সম্ভবপর নয়। যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সর্বত্র সংগৃহীত হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেলেও ঘুষ, সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির অনেক চোর দরজা দিয়ে অপরাধী নাগালের বাইরে চলে যায়। বর্তমান যুগে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শাস্তি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এ যুগে কেবল সেসব বেওকুফ, নির্বোধ ও অসহায় ব্যক্তি শাস্তি-পায়, যারা চালাকী করে কোন চোর দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘুষের টাকা নেই বা কোন বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নিবুদ্ধিতার কারণে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কোরআন পাকের **أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ** বাক্যটি এই সত্য ফুটিয়ে

তুলেছে যে, সৃষ্টিগতভাবে এরূপ সময় আসা জরুরী যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, যেখানে অপরাধীদের জন্য কোন চোর-দরজা থাকবে না, যেখানে ইনসাফই ইনসাফ হবে এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য দিওয়ালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোন মন্দ কাজ মন্দ নয়, কোন অপরাধ অপরাধ নয় এবং আলাহর ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কোন অর্থ থাকে না।

যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন ও ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি নিশ্চিত, তখন অতঃপর কিয়ামতের কিছু জয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন **كشفاً** অর্থাৎ গোছা উন্মোচিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ তরুসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

**فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الصِّدْقِ**—অর্থাৎ যারা কিয়ামতের কথা

অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে 'ছেড়ে দিন' কথাটি একটি বাক পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আলাহর

উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে বাস্তব এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসব বেদনাদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-র মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হ্রাসত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে: আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দিই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনন্দের জন্য অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ (স)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ) কাফিরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আশ্রাবের দোয়া করেছিলেন। আশ্রাবের আলামত সামনেও এসে গিয়েছিল এবং ইউনুস (আ) আশ্রাবের জায়গা থেকে অন্যত্র সরেও গিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর সমগ্র সম্প্রদায় কাকুতি-মিনতি ও আন্তরিকতা সহকারে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হ'শিয়ায় করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর ইউনুস (আ) হ'শিয়ায় হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি-নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবীর কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আযাব প্রেরণের আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। আমার নিগূঢ় রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সম্যক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

مَا حِبِّ حَوْتٍ — وَلَا تَكُنْ كَمَا حِبِّ الْحَوْتِ

'মাছওয়াল' বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

يَزِلْقُونَ — وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَهْرُ لِقْوُكَ بِأَبْمَا وَهُمْ

। থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হোচট দেওয়া, ভূপাতিত করা।—(রাগিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে রহমান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর কলাম ব্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা

হয়। তারা বলে: এ তো পাগল। — وَمَا هُوَ إِلَّا زَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

কলাম বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাক্ষ্য প্রতিশ্রুত। এরূপ

কলজামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফিরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কার জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফিররা রসুলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার জন্য সর্বপ্রয়ত্নে চেষ্টা করত। তারা রসুলুল্লাহ (স)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের হিফাযত করলেন। কসে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্ৰেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং

لَيْزُ لِقَوْنِكَ بِأَبْصَارِهِمْ  
আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। সহীহ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আয়তবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে **وَإِنْ يَكَادُ**

الَّذِينَ كَفَرُوا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁদিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।—(মাযহারী)

سورة العاقبة

سُورَةُ الْعَاقِبَةِ

मन्त्रान्न अवतीर्ण, ०२ आनात्, २ ऋक्

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْعَاقِبَةُ ۝ مَا الْعَاقِبَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَاقِبَةُ ۝ كَذَبْتَ سُوءُ

وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَاَمَّا سُوءُ فَاهْلِكُوا بِالطَّائِفَةِ ۝ وَاَمَّا عَادُ

فَاهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَمَّا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ

اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۝ كَانْتَهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ

خَاوِيَةٍ ۝ قَهْلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

وَالْمُؤْتَفِكَةُ ۝ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً

رَآيَةً ۝ اِنَّا لَنَاطِقُا الْمَآءَ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ

تَذِكْرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝ وَاِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَّاِحْدَاةٌ ۝

وَ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاِحْدَاةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَالشَّقَاتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَاللَّمَلِكُ

عَلَى اَرْجَائِهَا ۝ وَيَخْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۝

يَوْمَئِذٍ تَعْرِضُونَ لَا تُخْفِيَنَّ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ

بِئَمْنِيَةٍ ۝ فَيَقُوْلُ هَآؤُمْ اَقْرَبُوا كِتٰبِيَةَ ۝ اِنِّي كُنْتُ اَنْىٰ مَلِيٍّ

حَسَابِيَةَ ۝ فَهُوَ فِى عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا

دَابِيَهُ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَأْتُمْ فِي أَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝  
 وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشَآلِهِ ۝ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ  
 كِتَابِيهِ ۝ وَلَمْ آذِرْ مَا حَسَابِيهِ ۝ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝  
 مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۝ خُدُوهُ فَغُلُوهُ ۝  
 ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا  
 فَاسْلُكُوهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِآلِهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُرُ  
 عَلَىٰ طَعَامِ السَّكِينِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ  
 إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۝ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْغَاطِقُونَ ۝ وَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝  
 وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ  
 شَاعِرٍ ۝ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ۝ وَلَا يَقُولُ كَآفِرِينَ ۝ قَلِيلًا مَّا  
 تَدَّكَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا  
 بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا  
 مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَمِيزِينَ ۝ وَإِنَّهُ  
 لَشَدِيدُ الْحَكْمَةِ الْمُتَّقِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۝  
 وَإِنَّهُ لَحَسْبَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْهُ

بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে শুরু

- (১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ ও সামূদ পোত্র মহাপুরুষকে মিথ্যা' কহেছিল। (৫) অতঃপর সামূদ পোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপত্তির দ্বারা

(৬) এবং আদ পোতকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাদে হারা, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খজুর কাণ্ডের ন্যায় তুণ্ডাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (৯) কিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসুলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপ-যোধ্যা রূপে গ্রহণ করে। (১৩) যখন নিংগার ফুৎকার দেওয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন কিরামত সংঘটিত হবে। (১৬) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্লিষ্ট হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরাধকে তাদের উর্ধ্ব বহন করবে। (১৮) সেই দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর হার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ নাও তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন স্বাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিদগ্ধ দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা যাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) হার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ হায়! আমার যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতা-দেরকে বলা হবেঃ ধর একে, গলার বেড়ী পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিষ্কপ কর জাহা-রামে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় সে মহান জাহা হতে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীমকে আহ্বায় দিতে উৎসাহিত করত না। (৩৫) অতঃপর আজকের দিন এখানে তার কোন সুবাদ নেই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নেই রুস্ত-নিঃসৃত সূজ ব্যতীত। (৩৭) পোনাঙ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার—(৪০) নিশ্চয়ই এই কেশরজান একজন সম্মানিত রসুলের স্বামীত্ব। (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীত্বিরমাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালন-কর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম; (৪৬) অতঃপর কেউ দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না। (৪৮) এটা জাহাঙ্গীরদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ



করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাফিরদের জন্য অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের গম্বীরতা বর্ণনা করুন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (এই বাক্যের উদ্দেশ্য কিয়ামতের গুরুত্ব ও উন্ন্যাবহতা বর্ণনা করা) সামুদ ও 'আদ সম্প্রদায় এই খটখট শব্দকারী (মহাপ্রলয়)-কে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর সামুদকে তো প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আদকে এক ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা নির্মূল করা হয়েছে, যাকে আন্নাহ তা'আলা তাদের উপর সাত রাত্রি ও অষ্ট দিবস অবিরাম চড়াও করে রাখেন। অতএব (হে সঘোষিত ব্যক্তি) তুমি (তখন সেখানে উপস্থিত থাকলে) তাদেরকে দেখতে যে, তারা অন্তঃসারণ্য খজুর কাণ্ডের ন্যায় ভূগাতিত হয়ে রয়েছে (কারণ, তারা অন্তঃসার্যদেহী ছিল)। তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ তাদের কেউ

বৈতে নেই। অন্য আয়াতে আছে : **هَلْ تُحِيسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا**

এমনিভাবে) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা (কওমে নূহ, 'আদ ও সামুদ সবাই এতে দাখিল আছে)। এবং (জুত সম্প্রদায়ের) সংলগ্ন বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল (অর্থাৎ কুফর ও শিরক করেছিল। তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল (কুফর ও শিরক থেকে বিরত না হয়ে কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল)। ফলে আন্নাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করেছিলেন। (তদ্ব্যতী 'আদ ও সামুদের কাহিনী তো এইমাত্র বিরত হল। কওমে জুত ও ফিরাউনের পরিণতি অনেক আয়াতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং কওমে নূহের শাস্তি পরে বর্ণিত হচ্ছে)। যখন (নূহের আমলে)। অলৌকিক হস্তে, তখন আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ মু'মিনদেরকে, কারণ তাদের স্মৃতি তোমাদের অস্তিত্বের কারণ হয়েছে) নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম। যাতে এই ব্যালারকে আমি তোমাদের জন্য স্মৃতি করে দিই এবং কান একে স্মরণ রাখে। (কোন স্মরণ স্মৃতি—কথাটি রূপকভাবে বলা হয়েছে।) সারকথা, এই ঘটনা স্মরণ রেখে যেন পাবিত্ব কারণ থেকে বৈতে থাকে। অতঃপর কিয়ামতের উন্ন্যাবহতা বর্ণিত হচ্ছে : তখন সিংগার একমাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে, (অর্থাৎ প্রথম ফুৎকার) এবং গৃহিবী ও পর্বতমালা (স্বহান থেকে) উত্তোলিত হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিচ্ছিন্ন হবে (অর্থাৎ এখন আকাশ মজবুত ও ফাটল-বিহীন হলেও সেদিন এরূপ থাকবে না, বরং তা দুর্বল ও বিদীর্ণ হয়ে যাবে)। এবং ফেরেশতাগণ হারা আকাশে ছড়িয়ে আছে, যখন আকাশ ফাটতে থাকবে, তখন তারা আকাশের প্রান্তদলে থাকবে। (এ থেকে জানা যায় যে, আকাশ মধ্যস্থল থেকে বিদীর্ণ হয়ে চতুর্দিকে সংকুচিত হবে। তাই ফেরেশতাগণও মধ্যস্থল থেকে প্রান্তদলে চলে যাবে।

এসব ঘটনা প্রথম ফুৎকারের সময়কার। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়কার ঘটনা এই যে) সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনাব পাজনকর্তার আরশকে তাদের উপরে বহন করবে। (হাদীসে আছে, বর্তমানে চারজন ফেরেশতা আরশকে বহন করছে। কিয়ামতের দিন আটজনে বহন করবে। সারকথা, আটজন ফেরেশতা আরশকে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। অতঃপর তাই বর্ণিত হচ্ছেঃ) সেইদিন তোমাদেরকে (হিসাব-নিকাশের জন্য আলাহর সামনে) উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু (আলাহর সামনে) গোপন থাকবে না। অতঃপর (আমজনাযা উত্তিরে হাতে দেওয়া হবে, তখন) যার আমজনাযা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে (আনন্দের আতিশয়ো আশেপাশের মোকদেরকে) বলবেঃ নাও, আমার আমজনাযা গড়ে দেখ। আমি (পূর্ব থেকেই) জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (অর্থাৎ আমি কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ইমানদার ছিলাম। এর বরকতে আলাহ আমাকে পুরস্কৃত করেছেন)। সে সুখী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ সুউচ্চ বেহেশতে থাকবে, যার ফজসমূহ (এতটুকু) অবনমিত থাকবে (যে, যেভাবে ইচ্ছা আহরণ করতে পারবে। আদেশ হবেঃ) বিগত দিনে (অর্থাৎ দুনিয়ার থাকাকালে) তোমরা যেসব কাজ-কর্ম করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর ভূপ্তি সহকারে। যার আমজনাযা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে (নিদারুণ অনুতাপ সহকারে) বলবেঃ হায়, আমাকে যদি আমার আমজনাযা দেওয়া না হত, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত (এবং পুনরুজ্জীবিত না হতাম) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নিষ্ফল হল। এরূপ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবেঃ) ধর একে এবং পল্লীর বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর নিষ্কেপ কর জাহান্নামে এবং শৃঙ্খলিত কর সত্তর-ছয় দীর্ঘ এক শিকলে। (এই পজ কতটুকু, তা আলাহ তা'আলাই জানেন। কেননা, এটা পরজগতের পজ। অতঃপর এই আশ্বাবের-কারণ বলা হচ্ছেঃ) সে মহান আলাহতে বিশ্বাসী ছিল না (অর্থাৎ পরগণ্ডরদের শিক্ষানুযায়ী জরুরী ইমান অবলম্বন করেনি) এবং (নিজে দেওয়া তো দূরের কথা,) মিসকীনকে আহাৰ্য দিতে (অপন্নকে) উৎসাহিত করত না। (সারকথা এই যে, আলাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত ইবাদতের মূল কথা হচ্ছে আলাহর মাহায্য ও সৃষ্টির প্রতি দয়া। এই ব্যক্তি উভয়টি বর্জন ও অস্বীকার করেছিল বিধায় তার এই আহাৰ্য হয়েছে)। অতএব আজ এখানে তার কোন সূহাদ মেই এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতধৌত পানি ব্যতীত, (উদ্দেশ্য, সুখাদ্য পাবে না)। স্বা গোনাহগার ব্যতীত কেউ ধাবে না। (অতঃপর কোরআনের সত্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মধ্যে কিয়ামতের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোরআনকে মিথ্যা করা ই উচ্চ-খিত আশ্বাবের কারণ)। অতঃপর তোমরা যা দেখ এবং যা দেখ না, আমি তার লগথ করছি, (কেননা কোন কোন সৃষ্টি কার্যত অথবা ক্ষমতাপূর্ণভাবে দেখার শক্তি রাখে এবং কোন কোন সৃষ্টি এই শক্তি রাখে না। উদ্দেশ্যের সাথে এই শপথের বিশেষ সম্পর্ক এই যে, কোরআন পাক নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা তাদের দৃষ্টিগোচর হত না এবং যার কাছে কোরআম অবতীর্ণ হত, তিনি দৃষ্টিগোচর হতেন। অতএব এখানে স্পষ্ট সৃষ্টির

শপথ বোঝানো হয়েছে)। নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার অনীত (আল্লাহর) কলাম (অতএব যার প্রতি এই কলাম অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই রসূল) এটা কোন কবির রচনা নয় [ কাফিররা রসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলত, কিন্তু ] তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (এখানে 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে) এবং এটা কোন অতীক্ষিয়-বাদীর কথা নয় (কোন কোন কাফির এরূপ বলত, কিন্তু) তোমরা কমই অনুধাবন কর (এখানেও 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে। সারকথা, কোরআন কবিতাও নয়— অতীক্ষিয়বাদও নয়; বরং) এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (অতঃপর এর সভ্যতার একটি স্থিতি প্রদর্শন করা হয়েছে:) যদি সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) আমার নামে কোম (মিথ্যা) কথা রচনা করত (অর্থাৎ যা আমার কলাম নয়, তাকে আমার কলাম বলত এবং মিথ্যা নবুয়ত দাবী করত) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতেন না। (কণ্ঠশিরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায়। তাই অর্থ হত্যা করা)। এই কোরআন আল্লাহ-ভীরুদের জন্য উপদেশ। (অতঃপর মিথ্যারোপকারীদের প্রতি শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারীও রয়েছে। (আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। এ দিক দিয়ে) এই কোরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ। (কেননা, মিথ্যারোপের কারণে এটা তাদের আয়বের কারণ)। এই কোরআন নিশ্চিত সত্য। অতএব (এই কোরআন যার কলাম) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার পবিত্রতা (ও প্রশংসা) বর্ণনা করুন।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার কিয়ামতের উল্লেখ ঘটনাবলী, কাফির ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মু'মিন আত্মাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কিয়ামতকে হাক্কুল-কারিয়া, ওয়ালকিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

حاقة শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন-কারী। কিয়ামতের জন্য এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কিয়ামত নিজেও সত্য এবং স্বাভাবিক প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কিয়ামত মু'মিনদের জন্য আশ্রিত এবং কাফিরদের জন্য হাক্কুলাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কিয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বাস্তবিক প্রমাণ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উপরে এবং বিস্ময়কররূপে উল্লাহ।

قارعة শব্দের অর্থ ষট্‌ষট্‌ শব্দকারী। কিয়ামত যেহেতু সব মানুষকে জ্বির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নশিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই একে قارعة বলা হয়েছে।

قارعة শব্দটি طغها থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কার্যের শব্দ; যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশী। মানুষের মন

ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামুদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বক্তৃৎমিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হাদসিও ক্ষেটে গিয়েছিল।

رِيمٍ مَّرْمَرٍ—এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড কাঁতাস।

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ—এক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে, বুধবারের সন্ধ্যা

থেকে এই অঞ্জঝাবামুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়েছিল।

حَاسِمٍ—শব্দটি حَاسِمٍ এর বহুবচন। এর অর্থ মূলোৎপাটন করে দেওয়া।

مُؤْتَفِكَاتٍ এর অর্থ পরস্পরে মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বক্তৃৎসমূহকে مُؤْتَفِكَاتٍ বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বক্তৃৎগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পর তাদের বক্তৃৎগুলো তখনই হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

فَإِذَا نَفَخْنَا فِي السُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً—তিরমিহীতে হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে ওমরের রেওয়াজেতে আছে سُوْرٍ শিং-এর আকারের কোন বস্তুকে বলা হয়।

কিন্নামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। نَفْخَةً وَاحِدَةً এর অর্থ হঠাৎ একযোগে

এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে।

কোরআন ও হাদীস দ্বারা কিন্নামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎ-

কারকে نَفْخَةٌ বলা হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে : فَصَعِقَ مَنْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী

ক্ষেত্রশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজান হয়ে যাবে।

(অতঃপর এই অজান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে)। দ্বিতীয় ফুৎকারকে نَفْخَةً

بَعَثَ বলা হয়। بَعَثَ শব্দের অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে

যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে : ثُمَّ نُفِّخُ فِيهَا أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

مِنْظَرُونَ

—অর্থাৎ পুনরায় শিংগার ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ালেতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْحَةُ نَزْعٍ কিন্তু রেওয়ালেতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। ঊর্ধ্বতে একে نَفْحَةُ نَزْعٍ বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نَفْحَةُ صَعْنٍ হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

وَيَوْمَ نَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ

আটজন ফেরেশতা আলাহ্ তা'আলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ালেতে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে চারজন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চারজন মিলিত হবে।

আলাহ্ আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতার কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের স্বাভাবিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেরীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আলাহ্ আরশ উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

কর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আশ্চর্যগোপনকারী আশ্চর্যগোপন করতে পারবে না। আলাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আশ্চর্যগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সত্ত্বক এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ একটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘরবাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আশ্চর্যগোপনকারীরা আশ্চর্যগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আশ্চর্যগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَآؤُمْ أَثَرُهُمْ وَأُكْتَابُهُمْ

আমলনামা ডান হাতে আসবে, সে আহলাদে আউখানা হয়ে আলোপালের লোকজনকে বলবে : নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ مِنِّي سُلْطَانٌ

সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর

আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও  
প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। **سَلْطَانَ** এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে।  
তখন অর্থ হবে, হার। আজ আশাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ  
নেই।

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى  
وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى

অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে : এই অগ্নি-

রাখীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়াজগে আছে যে,  
এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্য দৌড় দেবে।

ثُمَّ فِي سُلْطَانٍ ذَرَّتْهَا سَهْمُونَ ذَرَأًا مَا سَلَكَوْا  
অতঃপর তাকে সত্তর

গজ দীর্ঘ এক শিকলে প্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেওয়া যায়।  
কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা ভসবীহর দানা প্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে  
বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও  
সমর্থন আছে।—( মাঈহারী )

حَمِيمٌ غَلِيظٌ لَّهُ الْيَوْمَ هَوْلًا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ  
এর অর্থ

সুহাদ। **غَسِيلِينَ** সেই পানি, যন্নারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা  
হবে। আন্নাতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহাদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে  
না এবং আশাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা  
পানি ব্যতীত কিছু হবে না। 'কিছু হবে না' এর অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বলা  
হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে  
পারবে, যেমন অন্য আন্নাতে জাহান্নামীদের খাদ্য হাঙ্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব  
উভয় আন্নাতে কোন বৈপরিত্য নাই।

فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ  
অর্থাৎ সে সব বস্তুর শপথ যা

তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র  
সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন : 'যা দেখ না' বলে আন্নাহর সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো  
হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পর-  
কালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।—( মাঈহারী )

وَتَبِينَ تَقُولُ—**تَقُولُ** শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। **وَتَبِينَ** হাদয়

থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, স্বর মাধ্যমে আশ্বা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই  
শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফিরদের কেউ রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়তাবাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ তথা অতীন্দ্রিয়বাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নফলবিদ্যার মাধ্যমে জেনে নিলে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বাক্ষর কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোপের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে কালাম শুনান, তা আঞ্জাহুর কালাম নয়। তিনি নিজেই নিজের কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আঞ্জাহুর কালাম বলে প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আঞ্জাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রসুল আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করত, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ দিতাম? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে: যদি এই রসুল একটি কথাও আমার নামে মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর আমার শক্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোন অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দ্বারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আঞ্জাহ্ না করুন, রসুলুল্লাহ্ (সা) আঞ্জাহ্ তা'আলার নামে কোন মিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হত। এখানে কোন সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করবে, তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোন আযাব আসেনি।

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾—এর আগের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে,

রসুলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আঞ্জাহুর কালামই বলেন। এই কালাম আঞ্জাহুতীন্দ্রিয়দের জন্য উপদেশ। কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, এসব অকাণ্ড ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারূপ করতে থাকবে। এর পন্থাশ্রম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছে:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ لَعَلَّ الْيَقِينِ﴾—অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও

সংশয়ের অবকাশ নেই। সবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ—এতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফিরদের

কথার দিকে ভ্রুক্লেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِلُّ رَبًّا مَّا يَتَّقُو لَوْ نَفَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

مِنَ السَّاجِدِينَ—অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাফিরদের অর্থহীন কথাবার্তায়

মনঃক্লান্ত হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফিরদের কথার দিকে ভ্রুক্লেপ করবেন না।

আবু দাউদে হযরত ওকবা ইবনে আমের কুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ

رَبِّكَ الْعَظِيمِ আয়াতখানি নাখিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : একে তোমাদের

রুকুতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতখানি নাখিল হয়,

তখন তিনি বললেন : একে তোমাদের সিজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকু ও সিজদায় এই দু'টি ভসবীহ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিনবার পাঠ করা সুমত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।





سورة المعارج

सूरा मा'आरिज

মক্কান অবতীর্ণ : 83 আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَالَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝ لِلْكَافِرِیْنَ لَیْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ الْمَعَارِجُ ۝ تُعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالتُّرُومُ اِلَيْهِ فِیْ یَوْمٍ ۝ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاَصْبِرْ صَبْرًا جَمِیْلًا ۝ اِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیْدًا ۝ وَنَرُوهُ قَرِیْبًا ۝ یَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاوٰتُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا یَسْئَلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمًا ۝ یُبْصِرُوْنَهُمْ ۝ یَوْمَ ذَا الْمِجْرَمِ كُوْفِیْتَدٰی مِّنْ عَذَابٍ یَّوْمَئِذٍ بِبَنِیْنِهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِیْنِهِ ۝ وَفِصْلِیْتِهِ الَّتِی تُوْبٰی ۝ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۝ ثُمَّ یُنْحِیْهِ ۝ كَلَّا ۝ اِنَّهَا لَظِلٌّ ۝ نَّزَاعَةٌ لِلسَّوْءِ ۝ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرُوْتُوْا ۝ وَجَمَعَ قَاوِمٌ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۝ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝ وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝ اِلَّا الْمُصْلِحِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝ وَالَّذِیْنَ یُصَدِّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَأْمُوْمٍ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمِنَ ابْتغَى  
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَ  
 عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ  
 هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝  
 فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ  
 الشِّمَالِ عِزِينَ ۝ أَيُّطِعُ كُلُّ آمِرٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ۝  
 كَلِمَاتًا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ  
 وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَلْقَادِرُونَ ۝ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ  
 بِمَسْبُوقِينَ ۝ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ  
 الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَىٰ  
 نَصْبٍ يُؤْفَضُونَ ۝ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَلِكَ  
 الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে শুরু।

(১) একবাক্তি চাইল, সেই আশাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত—(২) কাকিরদের জন্ম, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সমুদ্রত মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব আগনি উত্তম সবার করুন। (৬) তারা এই আশাবকে সুদূরপর্যন্ত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রসিন পশমের মত (১০) বজ্র বজ্র খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপন্নকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহার ব্যক্তি মুক্তিপনস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সব-কিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা জেলিহান

অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পূজীভূত করেছিল, অতঃপর আপনিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হাহতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন রূপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যার নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কালেম থাকে (২৪) এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বোনায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল—নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্ববান, (৩৫) তারাই জামাতে সম্মানিত। (৩৬) অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে আসছে (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করছে যে, তাকে নিয়ামতের জামাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াল ও অস্তায়ালসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সঙ্কম (৪১) তাদের পরিষর্ভে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধের অতীত নয়। (৪২) অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্বীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। সেদিন তারা কবর থেকে প্রত্যবেগে বের হবে—যেহে তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৪৩) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনভাবপ্রসূ। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত।

### তিফসীরের সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তি (অস্বীকারের ছলে) চায় সেই আযাব সংঘটিত হোক, যা কাফিরদের জন্য অবধারিত (এবং) যার কোন প্রতিরোধকারী নেই (এবং) যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, যিনি সিঁড়িসমূহের (অর্থাৎ আকাশসমূহের) মালিক। (যেসব সিঁড়ি বেয়ে) ফেরেশতাগণ এবং (সীমানদারদের) রূহ তাঁর কাছে উর্ধ্বারোহন করে। (তাঁর কাছে অর্থ উর্ধ্ব জগত, যা তাদের উর্ধ্ব গমনের শেষ সীমা। এই উর্ধ্ব গমনের পথ আকাশ, তাই আকাশকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সেই আযাব) এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ (পাখিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (উদ্দেশ্য, কিস্যামতের দিন কিছুটা আসল পরিমাণের কারণে এবং কিছুটা উঁয়াবহতার কারণে দিনটি কাফিরদের কাছে এত দীর্ঘ মনে হবে। কুফর ও অবাধ্যতার পার্থক্য হেতু এই দিনের উঁয়াবহতা ও দৈর্ঘ্য বিভিন্নরূপ হবে—কারও জন্য অনেক বেশী এবং কারও জন্য কম। তাই এক আয়তে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এটা কেবল কাফিরদের জন্যই। হাদীসে আছে,

মু'মিনদের জন্য দিনটি এক ফরয নামায পড়ার সমান ছোট মনে হবে)। অতএব (আযাব যখন আসবেই) আপনি (তাদের বিরোধিতার মুখে) সবর করুন, এমন হবর, যাতে অভিযোগ নেই। (অর্থাৎ তাদের কুফরের কারণে এমন মনঃক্লম হবেন না যে, মুখে অভিযোগ উচ্চারিত হয়ে যায়, বরং তাদের শাস্তি হবে—এই মনে করে সহ্য করে যান। তাদের অস্বীকার করার কারণ এই যে) তারা (কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) এই আযাবকে (অর্থাৎ এর বাস্তবতাকে) সুদূর পরাহত মনে করে, আর আমি (এর বাস্তবতা নিশ্চিতরূপে জানি বলে) একে আসন্ন দেখছি। (এই আযাব সেদিন সংঘটিত হবে) যেদিন আকাশ (রং-এ) তেলের তলানীর মত হবে (অন্য এক আয়াতে **كَالْدِهَانِ** অর্থাৎ লাল চামড়ার ন্যায় বলা হয়েছে। লাল গাঢ় হওয়ার কারণেও কালো মত রং হয়ে যায়। সুতরাং লাল ও কালো উভয়টিই শুদ্ধ। অথবা প্রথমে এক রং হবে, অতঃপর তা পরিবর্তিত হয়ে অন্য রং হবে। কোন কোন তফসীরবিদের ন্যায় যদি এর তফসীরেও যয়তুনের তলানী বলা হয়, তবে উভয়ের অর্থ এক হয়ে যাবে। সারকথা, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে) এবং পর্বত-সমূহ হলে যাবে রঙিন (ধূন করা) পশমের ন্যায় (যেমন অন্য আয়াতে **كَالْعِهْنِ**

**الْمَنْغُوشِ** বলা হয়েছে অর্থাৎ উড়তে থাকবে। পর্বতও বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে।

তাই রঙিন বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আছে : **وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ**  
**وَرُءُوهَا سَوَابِرٌ أَسْوَدٌ كَالْإِبْرَةِ**  
 (ও হ্রম্বের বিভিন্ন রঙের) এবং (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না  
 (যেমন অন্য আয়াতে আছে **لَا يَتَسَاءَلُونَ**) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে

অর্থাৎ (একে অপরকে দেখবে কিন্তু কেউ কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। সূরা সাফ-ফাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের কথা মতানৈক্যের ছলে আছে, সহানুভূতির ছলে নয়। তাই এই আয়াত সেই আয়াতের পরিপন্থী নয়। সেদিন) অপরাধী (অর্থাৎ কাফির) মুক্তিপণ-স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভ্রাতাকে, গোষ্ঠীকে, যাদের মধ্যে সে থাকত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজে (আযাব থেকে) রক্ষা করতে চাইবে। (অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কাল পর্যন্তও যার জন্য জীবন উৎসর্গ করত, আজ তাকে নিজের স্বার্থে আযাবে সোপর্দ করে দিতে প্রস্তুত হবে কিন্তু) এটা কখনও হবে না। (অর্থাৎ কিছুতেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে না বরং) এটা জেলিহান অগ্নি, যা চামড়া (পর্বত) তুলে দিবে। সে (নিজে) সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (দুনিয়াতে সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং (ইবাদতে) বিমুখ হয়েছিল এবং

( অপরের প্রাণ আত্মসাৎ করে অথবা মালসাবশত ) সম্পদ পূজীভূত করেছিল, অতঃপর তা আগলিয়ে রেখেছিল। ( উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হুক ও বান্দার হুক নষ্ট করেছিল অথবা বিশ্বাস ও চরিত্র ভ্রষ্টতার দিকে ইঞ্জিত করা হয়েছে। ডাকা আকরিক অর্থেও হতে পারে। অতঃপর আত্মাবের কারণ হয়, এরূপ অন্যান্য মন্দ স্বভাব, তা থেকে মু'মিনদের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ) মানুষ ভীক সৃজিত হয়েছে। ( মানুষ বলে এখানে কাফির মানুষ বোঝানো হয়েছে। সৃজিত হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, প্রথম সৃষ্টির সমস্ত থেকেই সে এরূপ বরং অর্থ এই যে, তার স্বভাবে এমন উপকরণ রাখা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে এসব মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বভাবগত ভীকতা নয় বরং ভীকতার ইচ্ছাধীন মন্দ প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। অতঃপর এসব প্রতিক্রিয়া বণিত হয়েছে অর্থাৎ ) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে ( বৈধ সীমার বাইরে ) হাহতাস করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়,

তখন ( জরুরী হুক আদায়ে ) রূপণ হয়ে যায়। ( এ হচ্ছে مِنْ أَدْبَرٍ থেকে বণিত আত্মাবের কারণসমূহের পরিশিষ্ট )। কিন্তু নামাযী ( অর্থাৎ মু'মিন আত্মাবের কারণসমূহের ব্যতিক্রম ভুক্ত ) যে তার নামাযের প্রতি ধ্যান রাখে ( অর্থাৎ নামাযে বাহ্যিক ও আকরিকভাবে অন্য দিকে ধ্যান দেয় না )। এবং যার খনসম্পদে যাচুঞাকারী ও বঞ্চিতের হুক আছে এবং যে প্রতিফল দিবসে বিশ্বাস করে এবং যে তার পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত থাকে। নিশ্চয়ই তার পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। এবং যে তার যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তার স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় ( সংযত রাখে না ) ; কেননা তাদের বেলায় এতে কোন দোষ নেই। অতএব যারা এদের ছাড়া ( অন্য জামগায় যৌনবাসনা চরিতার্থ করতে ) চায়, তারাই ( শরীয়তের ) সীমালংঘনকারী। এবং যে তার আমানত ও অস্বীকার রক্ষা করে এবং যে তার সাক্ষ্যদানে সরল—নিষ্ঠাবান। ( তাতে কমবেশী করে না )। এবং যে তার ( ফরয ) নামাযে যত্নবান। তারাই জাম্মাতে সম্মানিত। ( অতঃপর কাফিরদের আশ্চর্যজনক অবস্থা এবং কিয়ামতের অনস্বীকার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ যখন পরিকাররূপে সপ্রমাণ হয়েছে, তখন ) কাফিরদের কি হল যে, ( এসব বিষয়বস্তুর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য ) তারা আপনার দিকে উর্ধ্বাঙ্গে ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে ছুটে আসছে। ( অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করা উচিত ছিল কিন্তু তারা তা না করে সংঘবদ্ধ হয়ে এগুলোর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টাবিপ্লুপ করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসে। সেমতে নবুয়তের খবর শুনে শুনে তারা এ উদ্দেশ্যেই আগমন করত এবং ইসলামকে মিথ্যা ও নিজেদের সত্যপন্থী মনে করত। এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জাম্মাতের যোগ্য পাত্রও মনে করত, যেমন বলত :

وَلَيْنَ رُجِعْتِ اِلَى رَبِّي اَنْ لِي عِنْدَهُ لِلْعُسَىٰ

তাই এ বিষয়টি অস্বীকারের হলে বলা হচ্ছে : ) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তোকে কিয়ামতের জাম্মাতে দাখিল করা হবে? কখনই নয়। ( কেননা জাম্মাতের কারণাদির উপস্থি-  
তিতে তারা জাম্মাত কিরূপে পেতে পারে? কাফিররা এ প্রসঙ্গে কিয়ামতকেও অস্বীকার করত  
ও অসম্ভব মনে করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অসম্ভব মনে করা নিবুদ্ধিতা

ছাড়া কিছুই নয়। কেননা) আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারাও জানে। (অর্থাৎ তারা জানে যে, বীর্ষ থেকে মানব সৃষ্টি হয়েছে। বলা বাহুল্য, নির্জীব বীর্ষ ও সজীব মানবের মতটুকু ব্যবধান মৃতের অংশ ও পুনরুজ্জীবিত মানবের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান নেই। কেননা, মৃতের অংশ পূর্বে একবার সজীব ছিল। সুতরাং কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করা নিবৃদ্ধিত। অতঃপর অন্যভাবে কিয়ামতের অসম্ভাব্যতা দূর করার জন্য বলা হচ্ছেঃ) আমি শপথ করছি পূর্বাচল ও অস্ত্রাচলসমূহের পালনকর্তার (শপথের জওয়াব এইঃ) নিশ্চয়ই আমি তাদের পরিবর্তে (দুনিয়াতেই) উৎকৃষ্টতর মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (সুতরাং অধিকতর গুণসম্পন্ন নতুন মানব সৃষ্টি করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? সত্য সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা বিরত হয়না, তখন) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়াকৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন কোন এক উপাসনালয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে (লজ্জায়) অবনমিত এবং তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত। (এখন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে)।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سؤال—سأل سائل শব্দটি কখনও তথ্যানুসঙ্গানের অর্থে আসে। তখন আরবী

ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে با অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নব্বর ইবনে হারেস এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূ-

জুল্লাহ (সা)-র প্রতি মিথ্যারূপ করতে মেয়ে খুশ্টতাসহকারে বসেছিল : اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجابا من السماء او ائتنا بهذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجابا من السماء او ائتنا

দের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন। (মায়হারী) আয়াহ তা'আলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন। (মায়হারী) সে আয়াহর কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আয়াহর পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আয়াহর পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

معراج শব্দটি معراج এর বহুবচন। এটা عروج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উর্ধ্বা-  
রোহণ করা। معراج ও معراج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নিচে থেকে উপরে  
আরোহণ করার জন্য অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহর বিশেষণ **ذِي الْمَعَارِجِ**  
এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-  
নিচে সন্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রা) **ذِي الْمَعَارِجِ** এর অর্থ করেছেন  
আকাশসমূহের মালিক।

**تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ**—অর্থাৎ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো এই

মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুহুল আমীন' অর্থাৎ জিবরাইল আরোহন করেন  
জিবরাইল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম  
উল্লেখ করা হয়েছে।

**فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ**—অর্থাৎ উল্লিখিত আশাব

সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবু সাঈদ  
খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ (সা)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে  
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমার প্রাণ যে সত্য্য করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি  
—এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।  
—(মাযহারী)

হযরত আবু হুরায়রা থেকে নিশ্চিন্ত হাদীসে বর্ণিত আছে : **يَكُونُ عَلَى الْمَوْتِ**  
**مَنْبِئِينَ كَمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ**—অর্থাৎ এই দিনটি মু'মিনদের জন্য জোহর  
ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।—(মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক  
ব্যাপার অর্থাৎ কাফিরদের জন্য এতটুকু দীর্ঘ এবং মু'মিনদের জন্য এতটুকু খাট হবে।

কিনামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য  
আয়াতে কিনামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে  
এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই :

**يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ**

**أَلْفَ سَنَةٍ مَا تَدُونَ** আল্লাহর কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী

পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্ব গমন করেন এমন এক দিকে যা তোমাদের হিসাব

অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যত উক্ত আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দু'শেট এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফিরদের জন্য পঁচাত্তর হাজার বছর এবং মু'মিনদের জন্য এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফিরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবত কোন কোন দলের জন্য এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখস্বাস্থ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে মাহহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পাখিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পঁচাত্তর হাজার বছরের ব্যবধান আছে। অতএব পঁচাত্তর বছর নিচে আসার এবং পঁচাত্তর বছর উর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পাখিব হিসাবেই 'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কিয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পাখিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

أَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يُرَوُّنَهَا بِعُهُودٍ وَأَمْشَىٰ رَبُّهَا فِى السَّمَاءِ كَمَا يَمْشَىٰ رَبُّكَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ — এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর

ও নিকট বোঝানো হয়নি বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আন আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَيَبْصُرُونَ نَارًا لَّيْسَ لَهَا دُخَانٌ يُغَيِّبُهَا وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَيَبْصُرُونَ نَارًا لَّيْسَ لَهَا دُخَانٌ يُغَيِّبُهَا — শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম

বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না—সাহায্য করা তো দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকানয় বরং আত্মাহর কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি চ্ছুক্ষেপ করতে পারবে না।

لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَيَبْصُرُونَ نَارًا لَّيْسَ لَهَا دُخَانٌ يُغَيِّبُهَا — শব্দের অর্থ অগ্নির জেলিহান শিখা।

شَوَىٰ - এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ



জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা হবে, যা মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مِنْ أَدْبُرِ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى—এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে

ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পূজীভূত করে এবং তা আগলিয়ে রাখে। পূজীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পূজীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরম ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

هَلْوَعٌ—এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য,

ভীরা ব্যক্তি। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধনসম্পদের লোভ করে। সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেন : এর অর্থ কুপণ এবং মুকাতিল বলেন : এর অর্থ সংকীর্ণমনা অধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় هَلْوَعٌ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষমুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানব-স্বভাবে সৎ কাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هَلْوَعٌ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে :

إِذَا مَسَّ الشَّرَّ جُزُوعًا وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرَ مَنُوعًا—অর্থাৎ মানুষ এত

ভীরা ও বে-সবর যে, যখন সেকোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হাহাশা শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কুপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হাহাশা বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কুপণতা বলে ফরম ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ছুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মু'মিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ থেকে শুরু করে لَا الْمُصَلِّينَ থেকে শুরু করে

পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مُصَلِّينَ শব্দ বলে মু'মিনের ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মু'মিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মু'মিন বলার যোগ্য

হতে পারে। অতঃপর তাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ**

**صَلَاتِهِمْ دَأِئِمُونَ** —অর্থাৎ যে নামাযী তার সমগ্র নামাযে নামাযের দিকেই মনোযোগ

নিবদ্ধ রাখে, এদিক-সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (র) বর্ণিত রেওয়াজেতে আবুল খায়র বলেন : আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বত্র নামায পড়ে? তিনি বললেন : না, এই অর্থ নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং

ডানে-বামে ও আগেপিছে তাকায় না। অতঃপর **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ**

**يَتَذَكَّرُونَ** বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরাবৃত্তি নেই। এর পরে উল্লিখিত মু'মিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মু'মিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আলাহ'র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তা হুসুলু'ল্লাহ্ করার ক্রমতা কারও নেই : **وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ** —এই আয়াত থেকে জানা

গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আলাহ' তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আলাহ' তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

**فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ** —এর পূর্বের আয়াতে

যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারাম : অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেন : আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মকরহ বললেন। তিনি আরও বললেন : আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমাদের মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সান্নাদ ইবনে শুবায়র (রা) বলেন : আলাহ' তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : **ملعون ملعون من نكح يدا** অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য।—(মাযহারী)

সব আলাহুর হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত : **وَالَّذِينَ هُمْ**

**لَا مَا نَاتِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَأَعُونَ**—এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা

হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্ব্যপেক্ষ করা হয়েছে। আয়াতটি এই : **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ**

**أَنْ تُوَدَّوْا وَالْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**—উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত

করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সেই অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ভুলটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আলাহুর হকও দাখিল আছে এবং আলাহুর পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর, ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ভুলটি করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী)

**وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ**—এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন

আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কমবেশী করা হারাম। বিপুলভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দুশ্চেট ফরয।—(মাযহারী)

سورة نوح

سُورَةُ نُوحٍ

মহান্নাম অবতীর্ণ : ২৮ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ  
مَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَوْيُحْيُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُسْتَقَرٍّ ۝ إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ مَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ قَالَ  
رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا  
فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي  
أَذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَآسَاطَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي  
دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝  
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ  
مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ  
لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝  
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ  
نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ أَنْتَبَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ  
 سَاطَا ۝ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ  
 عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝  
 وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ  
 وَدًّا وَلَا سُوَاعَاةَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا  
 كَثِيرًا ۝ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝ مَتَا خَطَبَتِهِمْ  
 أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا ۝ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 أَنْصَارًا ۝ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ  
 دَيًّا ۝ إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا  
 فَاجِرًا كَفَرًا ۝ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا  
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলে : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মসুদ শাস্তি আসার আগে। (২) সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহর নির্দিষ্টকাল যখন উপস্থিত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (৫) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে জ্বলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব উচ্ছৃঙ্খল প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চূপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছি : তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমশীল। (১১) তিনি

তোমাদের উপর অজস্র সৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধনসম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্-শ্রেষ্ঠকে আশা করছ না। (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লজ্জা কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোকরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টিকা থেকে উৎপত্ত করেছেন। (১৮) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুৎপত্ত করবেন। (১৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চলাকোরা কর প্রস্তুত পথে। (২১) নূহ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করেছে এমন লোককে, যার ধনসম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা বলছে : তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূরা, ইয়াওছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ এরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব আপনি জালিমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের ধোনাহ্ সমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ আরও বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাগাচারী, কাফির। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে—তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছিলাম একথা বলে : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে (কুফরের শাস্তি থেকে) সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মভঙ্গ শাস্তি আসার আগে (অর্থাৎ তাদেরকে বল : আল্লাহ্-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মর্মভঙ্গ শাস্তি ভোগ করতে হবে—দুনিয়াতে মহাপ্রাণ কিংবা পরকালে জাহান্নাম) সে (তার সম্প্রদায়কে) বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (আমি বলি : ) তোমরা আল্লাহ্-র ইবাদত কর (অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর), তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নিদিল্ট (অর্থাৎ মৃত্যুর) সমস্ত পর্যন্ত (বিনা শাস্তিতে) অবকাশ দিবেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন না করলে মৃত্যুর পূর্বে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়, বিশ্বাস স্থাপন করলে তা আসবে না। এছাড়া মৃত্যুর ভৌ) আল্লাহ্-র নির্ধারিত সমস্ত (আছে) যখন (তা) আসবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন সর্বাধিকারী—ঈমান অবস্থায়ও,

কুকুর অবস্থায়ও। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক অবস্থায় পরকালের আযাব ছাড়া দুনিয়াতেও আযাব হবে এবং এক অবস্থায় উভয় জাহানে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)। খুব চমৎকার হত যদি তোমরা (এসব বিষয়) বুঝতে! (যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এসব উপদেশ সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, তখন) নূহ (আ) দোয়া করলেন : হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত্রি (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (পলায়ন এভাবে করেছে যে) আমি যতবারই তাদেরকে (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি, যাতে (ঈমানের কারণে) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে (যাতে সত্য কথা কানে প্রবেশও না করে, এটা চরম ঘৃণা)। মুখমণ্ডল বন্ধায়ত করেছে যাতে সত্য ভাষণদাতা দেখাও না যায় এবং সে-ও তাদেরকে না দেখে (তারা কুকুরে) জেদ করেছে এবং (আমার আনুগত্যের প্রতি চরম উচ্ছ্রাত্য প্রদর্শন করেছে)। অতঃপর (এই উচ্ছ্রাত্য সত্ত্বেও আমি বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতে থাকি। সেমতে) আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি (অর্থাৎ সাধারণ বক্তৃতা ও গুণায় করেছি, যাতে স্বভাবতই আওয়াজ উচ্চ হয়ে যায়)। অতঃপর আমি তাদেরকে (বিশেষ সম্বোধনস্বরূপ) ঘোষণা-সহকারে বুঝিয়েছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (অর্থাৎ সম্ভাব্য সব পন্থায়ই বুঝিয়েছি। এ ব্যাপারে) আমি বলেছি : তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আন, যাতে গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়)। তিনি অভ্যন্ত ক্ষমাশীল। (তোমরা ঈমান আনলে পারলৌকিক নিরামত ক্ষমা ছাড়া তিনি ইহলৌকিক নিরামতও দান করবেন। সেমতে) তিনি তোমাদের উপর অজ্ঞ প্রজ্ঞাধারা প্রেরণ করবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (অধিকাংশ মন নগদ ও দ্রুত নিরামত অধিক তজব করে, তাই এসব নিরামত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাভাদাহ্ (রা) বলেন : তারা সংসারের প্রতি লোভী ছিল, তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাদেরকে আরও বলেছি : ) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র মাহাছো বিশ্বাসী হচ্ছে না। অথচ (শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে) তিনি তোমাদেরকে নানাভাবে সৃষ্টি করেছেন। উপাদান-চতুষ্টয় দ্বারা তোমাদের খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রম করে তোমরা পরিপূর্ণ মানব হয়েছ। এটা মানবসত্তার প্রমাণ, অতঃপর বিশ্বচরাচরের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে : তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং তথায় চক্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে? আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (হয় এভাবে যে, হযরত আদম [আ] সৃষ্টিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন, না হয় এভাবে যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে, বীর্য খাদ্য থেকে, খাদ্য উপাদান-চতুষ্টয় থেকে এবং উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে সৃষ্টিকাই প্রবল)। অতঃপর তাতে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে নিবেন এবং (কিয়ামতে) আবার (সৃষ্টিকা থেকে) পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা কর। (এসব কথা নূহ [আ] আল্লাহ্ তা'আলার কাছে

ফরিদাদ করে বললেন। অবশেষে) নূহ (আ) বললেন : হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে অমান্য করেছে আর এমন লোকদের অনুসরণ করেছে, যাদের ধনসম্পদ ও সম্ভান সম্ভতি কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে, (এখানে সম্প্রদায়ের অনুসৃত সরদারবর্গ বোঝানো হয়েছে। এই সরদারদের ধনসম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতিই তাদের অবাধ্যতার কারণ ছিল। ক্ষতি করা এই অর্থেই বলা হয়েছে। তাদের অনুসৃত সরদাররা এমন) যারা (সত্যকে মিটানোর কাজে) উন্নয়নক চক্রান্ত করেছে। তারা (অনুসারীদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনও ত্যাগ করো না এবং (বিশেষভাবে) ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াওছ, ইয়াউক ও নসরকে (সমধিক প্রসিক্রির কারণে এসব দেবদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এরা অনেকেকে পথহারা করেছে। (এই পথভ্রষ্ট করাই ছিল উন্নয়নক চক্রান্ত।

আপনার বক্তব্য **لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ** থেকে আমার বুঝতে বাকী

নেই যে, এরা ঈমান আনবে না। তাই দোয়া করি) আপনি এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন, (যাতে ওরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য পাল্ল হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, দোয়ার উদ্দেশ্য অধিক পথভ্রষ্টতা নয় বরং ধ্বংসের যোগ্য পাল্ল হওয়ারই দোয়া করা হয়েছে। ওদের শেষ পরিণতি এই হয় যে) ওদের এসব গোনাহর কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার পর) জাহান্নামে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা আজাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। নূহ (আ) আরও বললেন : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না, (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিন। অতঃপর এর কারণ বর্ণিত আছে : ) আপনি

যদি ওদেরকে রেহাই দেন, তবে ( **لَنْ يُؤْمِنَ**—বক্তব্য অনুযায়ী) তারা আপনার বাস্তব-দেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং (পরেও) তাদের কেবল পাগাচারী ও কাফির সম্ভানই জন্মগ্রহণ করবে। (কাফিরদের জন্য বদদোয়া করার পর মু'মিনদের জন্য নেক দোয়া করলেন : ) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, স্বারা মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র কেনান ব্যতীত পরিবার-পরিজনকে) এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। (এ স্থানে উদ্দেশ্য যেহেতু কাফিরদের জন্য বদদোয়া ছিল, তাই পরিশেষে আবার বদদোয়াই করা হচ্ছে : ) এবং জালিমদের ধ্বংস আরও বাড়িয়ে দিন। [ অর্থাৎ ওদের উদ্ধারের যেন কোন উপায় না থাকে এবং ধ্বংসই যেন প্রাপ্ত হয়। এই দোয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। বাহ্যত জানা যায় যে, নূহ (আ)-র পিতামাতা মু'মিন ছিলেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হলে দূরবর্তী পিতৃ ও মাতৃপুরুষ বুঝানো হবে]।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

**يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ** অব্যয়টি প্রায়শ কতক অর্থ জাপন করার



জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বাস্তব হক মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে, যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে, যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কলট দেওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এতেও বাস্তব হক আদায় করা অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আয়াতে **مِنْ** অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে উল্লিখিত শর্তটি অপরিহার্য।

اجل مسمى — وَيُؤْتِي خَيْرِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ এর অর্থ নিদিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য

এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নিদিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পাখিব আয়াবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান না আনলে নিদিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আয়াবে ধ্বংস করে দেওয়ারও আশংকা আছে। বয়সের নিদিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণত তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়াও সম্ভবপর। পিতা মাতার আনুগত্য ও সেবা-মত্বের ফলে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা : তফসীরে মাহহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : তকদীর দুই প্রকার—১. চূড়ান্ত অকাটা এবং ২. শর্তযুক্ত। অর্থাৎ লওহে মাহফুযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্ আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণত ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে।

উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লিখিত আছে।

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَ أُمِّ الْكِتَابِ

মাহফুযে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। 'আসল কিতাব' বলে সেই কিতাব বুঝানো হয়েছে, যাতে অকাটা তকদীর লিখিত আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাটা ফয়সালা লিখা হয়।

হযরত সালমান ফারসীর হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

—অর্থাৎ দোয়া **لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر**

ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহর ক্ষমতাসীল সোধ করতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সার কথা, আয়াতে নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার কালে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হয়ত নূহ (আ)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পাখিব আযাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আযাব ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না বরং অকাটা তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেন নি এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এতে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। **انَّ اَجَلَ اللهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ** আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে।

অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্য নূহ (আ)-র বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে : নূহ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্লান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

স্বাহাহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন : তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহর-রের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কন্ডলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চেতনা ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও বায়দ ইবনে আস-রেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেন : **رب اغفر لقومي انهم لا يعلمون**—অর্থাৎ হে আমার

পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য-পালনে মশগুল থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ্ (আ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মো'জেযা হিসেবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুশ্চিন্তিত প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ্ (আ) সর্ব-শক্তিমান আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন : আমি ওদেরকে দিবা-রাত্রি দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে —সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জাহ্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি—ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাস্থ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলে দিলেন : আপনার সমগ্র সম্প্র-দায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না।

أَنْتَ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ

আল্লাহের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ্ (আ)-র মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মু'মিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্ (আ) তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পাখিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

অধিকাংশ আলিম বলেন যে, গোনাহ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ তা'আলা যথাস্থানে রুষ্টি বর্ষণ করেন, দুশ্চিন্তা হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন লোকস্বার্থের কারণে খিলাফত হয় কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের ফলে পাখিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا

এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এতে <sup>نُهَيْنَ</sup> বলায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগগনে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের <sup>جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا</sup> আয়াতের তফসীলে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ (আ) আরও বলেন :

<sup>مَكْرِبًا</sup> <sup>وَمَكْرِبًا</sup> <sup>مَكْرِبًا</sup> অর্থাৎ তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণা ও দুশট লোকদেরকেও নূহ (আ)-র গিছনে জেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, <sup>لَا تَذُرُّنَّ دَأً وَلَا سُوءًا عَا وَلَا</sup>

<sup>يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا</sup> অর্থাৎ আমরা আমাদের দেবদেবী বিশেষত এই পাঁচজনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লিখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ (আ)-র আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল : তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পূনক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল : তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারম্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِرُ الْفَالِغِينَ إِلَّا ضَلَالًا — অর্থাৎ এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও

বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সে মতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সঙ্করই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا وَأُذِخُوا نَارًا — অর্থাৎ তারা তাদের গোনাহ

অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যত পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্ কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলা বাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে বরং এটা বরযখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আযাব কোরআন দ্বারা প্রমাণিত : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বরযখ জগতে অর্থাৎ কবরে বাস করার সময়ও মৃতদের আযাব হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কমীর আযাব হবে, তখন সৎকমীরও কবরে সুখ ও নিয়ামত-প্রাপ্ত হবে। সহীহ ও মৃত্যুওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আযাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এত অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উশ্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আলামত।

سورة الجن

सूरा जिन्न,

मक़ास अवतीर्णः २८ आयत, २ रूक़

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اُوْحٰی اِلٰیَّ اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا  
عَجَبًا ۙ يَهْدِيْۤاِلَ الرُّشْدِ فَاَمْتًا بِهٖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ۙ  
وَ اِنَّكَ تَعْلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ وَاِنَّهٗ كَانَ  
یَقُوْلُ سَفِیْهُنَا عَلٰی اللّٰهِ شَطَطًا ۙ وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ  
وَ الْجِنُّ عَلٰی اللّٰهِ كِذْبًا ۙ وَاِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ  
بِیْرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمُ رَهَقًا ۙ وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ  
یَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ وَاِنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مِیْلَتٌ حَرَسًا شَدِیْدًا  
وَ شُهْبًا ۙ وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ، فَمَنْ یَسْمِعِ  
الْاِنَّ یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ وَاِنَّا لَآ نَدْرِیْ اَشْرًا اُرِیْدَ بِمَنِ فِی  
الْاَرْضِ اَمْرًا اَرَادَ بِهٖمْ رَثْمًا رَّشَدًا ۙ وَاِنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا  
دُوْرٌ ذٰلِكَ كُنَّا طَرٰیْقٌ قَدَّ دَا ۙ وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تُعْجِزَ اللّٰهُ فِی  
الْاَرْضِ وَلَنْ تُعْجِزَهُ هَرَبًا ۙ وَاِنَّا لِنَسْمِعُنَا الْهُدٰی اَمْتًا بِهٖ ، فَمَنْ  
یُّؤْمِنُ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَغْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ وَاِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ  
وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ، فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۙ وَاِنَّا

الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ  
 لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝ لِنُقْتِهِمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ  
 يَسْأَلْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ  
 أَحَدًا ۝ وَاللَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝  
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا  
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۚ  
 وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ  
 وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَوُتَّ لَهَا فَتًا لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝  
 حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصِرًا وَآقِلُ  
 عَدَدًا ۝ قُلْ إِنْ أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ  
 رَبِّي أَمَدًا ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ  
 ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيُؤْتِي  
 خَلْفَهُ رَصَدًا ۝ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ  
 بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

পন্নম করুণাময় ও অসীম দয়ালবান আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন : আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন প্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে : আমরা বিস্ময়কর কোরআন প্রবণ করেছি, (২) যা সংসদ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্শাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পক্ষী গ্রহণ করেন নি এবং তার কোন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা

বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিম্-এর আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিম্-দের আশ্রয়িতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেরেছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ প্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনে চাইলে সে স্বল্প উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবী-বাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অসীম, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন! (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎ কর্ম পরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং পরায়ণ করেও তাকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আভাবহ এবং কিছু সংখ্যক অন্যান্যকারী। যারা আভাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (১৫) আর যারা অন্যান্যকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়ম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আধাবে পরিচালিত করবেন (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে ডেকোনা। (১৯) আর যখন আল্লাহ্‌র বাণী তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিম্ তার কাছে ডিঙি জমাল। (২০) বলুন : আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুন : আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুন : আল্লাহ্‌র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমন কি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুন : আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না (২৭) তার মনো-নীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অঙ্গ ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, (২৮) যাতে আল্লাহ্‌ জেনে নেন যে, রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূল-গণের কাছে যা আছে, তা তার জানগোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।



## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযুল : আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার। প্রথম ঘটনা এই : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে শয়তানরা আকাশে পৌঁছে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পর উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা হল। এই অভাবিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে যয়ে একদল জিম্ম রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সূরা আহকাফে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা এই : মুর্খতা যুগে মানুষ সফরে থাকা অবস্থায় যখন কোন জঙ্গলে অথবা বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন জিম্মদের সরদারের হিফায়ত পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করত :

عوز بعزیز هذا الوادی من شرسفها ء تومه — অর্থাৎ আমি এই

প্রান্তরের সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করেছি তার সম্প্রদায়ের নির্বোধ দুর্ভটদের থেকে। তৃতীয় ঘটনা এই : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুর্থ ঘটনা : রসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলে বিরোধী কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রথমোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে দূররে মনসূর থেকে এবং শেষোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

আপনি ( তাদেরকে ) বলুন : আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিম্মদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর ( স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ) তারা বলেছে : আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। ( বিষয়বস্তু দেখে কোরআন প্রতিপন্ন হয়েছে এবং মানব রচিত কালাম-সদৃশ নয় দেখে বিস্ময়কর প্রতিপন্ন হয়েছে )। আমরা ( এখন থেকে ) কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ( এটা 'বিশ্বাসস্থাপন করেছি' কথাটিরই ব্যাখ্যা )। এবং ( তারা নিশ্চিন্দুত বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল : ) আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার শান উর্ধ্ব। তিনি কোন পক্ষী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। ( কেননা এটা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। এটা 'শরীক করব না' কথাটির ব্যাখ্যা )। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। ( অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা ইত্যাদি কথাবার্তা )। অথচ আমরা পূর্বে মনে করতাম মানুষ ও জিম্ম কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না। ( কেননা, এটা চরম ধুটতা। এতে তারা তাদের মূশরিক হওয়ার কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ জিম্ম ও মানব শিরক করত। এতে আমরা মনে করলাম যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে এর অধিক লোক মিথ্যা বলবে না। সে মতে আমরাও সে পথ অবলম্বন করলাম। অথচ যে কোন মানবগোষ্ঠীর ঐকমত্য সত্যতার প্রমাণ নয় এবং প্রত্যেক ঐকমত্যের অনুসরণ ওয়র হতে পারে না। উপরোক্ত শিরক ছিল অভিন্ন ও ব্যাপক। এছাড়া কিছু সংখ্যক মানুষের একটি বিশেষ শিরক ছিল, যার ফলে জিম্মদের কুফর ও ওঙ্কত্য বেড়ে যায়। তা এই যে, ) অনেক মানুষ অনেক জিম্ম-এর আশ্রয় গ্রহণ করত। ফলে তারা জিম্মদের আশ্রয়িতা আরও

বাড়িয়ে দিত। (তারা এই অহমিকায় লিপ্ত হত যে, আমরা জিদ্দের সর্দার তো পূর্ব থেকেই ছিলাম, এখন মানুষও আমাদেরকে বড় মনে করে। এতে তাদের আশঙ্কান্বিতা চরমে পৌঁছে এবং কুফর ও হঠকারিতায় আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে। এপর্যন্ত তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছে : অর্থাৎ জিদ্-রা পরস্পরে আলোচনা করল) আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী (অর্থাৎ প্রহরারত ফেরেশতা) ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (অর্থাৎ এখন প্রহরা বসেছে, যাতে জিদ্-রা ঐশী সংবাদ নিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ গেলে উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিতাড়িত করা হয়। ইতিপূর্বে) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। (এসব ঘাঁটি আকাশগাত্রে কিংবা বায়ুমণ্ডলে কিংবা মহাশূন্যে হতে পারে। জিদ্-রা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং তাদের কোন ওজন নেই। তাই তারা এসব ঘাঁটিতে অবস্থান করতে সক্ষম, যেমন কতক পক্ষী বায়ুমণ্ডলে চলতে চলতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করতে পারে)। এখন কেউ শুনে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। [উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে সূরা হিজরের দ্বিতীয় ককুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রিসালত সম্পর্কিত এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মোহাম্মদ (সা)-কে রিসালত দান করেছেন এবং বিজ্ঞানি দূর করার জন্য অতীজিয়বাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সংবাদ চুরি বন্ধ হওয়ার কারণেই এই জিদ্-রা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছেছিল। প্রথম ঘটনা তাই বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তু সমূহের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছে :] আমরা জানি না (এই নতুন পয়গম্বর প্রেরণ দ্বারা) পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদেরকে হিদায়ত করার ইচ্ছা রাখেন? (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণের সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য জানা নেই। কারণ রসুলের অনুসরণ করলে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিরোধিতা করলে ক্ষতি ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতে অনুসরণ হবে, না বিরোধিতা হবে তা আমাদের জানা নেই। ফলে পয়গম্বর প্রেরণ করে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য, না হিদায়ত করা উদ্দেশ্য, তা আমরা জানি না। একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের অনুমান ছিল তাদের সম্প্রদায়ে মু'মিন কম হবে। কাজেই অধিকাংশ লোক শাস্তির যোগ্য হবে। এছাড়া জিদ্-রা অদৃশ্যের খবর জানে না বলে তওহীদের বিষয়বস্তু জোরদার করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস এই যে, জিদ্-রা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে)। আমাদের কেউ কেউ (পূর্ব থেকেই) সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ একরূপ নয়। (সার কথা) আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (এমনিভাবে এই পয়গম্বরের খবর শুনে এখনও আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার লোক আছে। আমাদের পথ এই যে,) আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে যেয়ে) আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পলায়ন করেও তাঁকে পরাভূত করতে পারব না। (পলায়ন করার অর্থ পৃথিবী ছাড়া আকাশে চলে যাওয়া। এটা فِي الْأَرْضِ এর বিপরীত হিসাবে বোঝা যায়।

অন্য এক আয়াতে তদ্রূপ বলা হয়েছে : **مَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ**

—এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত সতর্ক করা যে, আমরা কুফরী করলে আল্লাহর আযাব

থেকে রক্ষা পাব না। তাদের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও কারও ঈমান না আনা সত্য যে সত্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, এটা চিরন্তন রীতি। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব যে (আমাদের মত) তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করবে না। (লোকসান হল কোন সৎকাজ অলিখিত থেকে যাওয়া এবং জোর-জবর হল যে গোনাহ করা হয়নি, তা লিখিত হওয়া। উৎসাহ প্রদানই সম্ভবত এ কথা'র উদ্দেশ্য)। আমাদের কিছু সংখ্যক (এসব ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়বস্তু বোঝে) আজাবহ (হয়ে গেছে) এবং কিছু সংখ্যক (পূর্বের ন্যায়) বিপথগামী (হয়ে গেছে)। যারা আজাবহ হয়েছে, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (ফলে তারা সওয়াবের অধিকারী হবে)। আর যারা বিপথগামী, তারা জাহান্নামের ইচ্ছান। (এ পর্যন্ত জিম্মদের কথাবার্তা সমাপ্ত হল। অতঃপর ওহীর আরও বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আরও ওহী করা হয়েছে যে) তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) যদি সত্যপথে কান্নেম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি (যে, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, না অকৃতজ্ঞ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কাবাসীরা যদি উপরে জিম্মদের উজ্জিতে নিষ্পিত শিরক না করত, তবে তৃতীয় ঘটনায় বণিত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চেপে বসত না। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। কুফরের শাস্তি মক্কাবাসীদের জন্যই বিশেষভাবে নয়; বরং) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠোর আযাবে দাখিল করে। এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, সব সিজদা আল্লাহর হক। (অর্থাৎ কোন সিজদা আল্লাহকে করা এবং কোন সিজদা অপরকে করা জায়েয নয়; যেমন মুশরিকরা করত)। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কারও ইবাদত করো না। (এতেও উপরোল্লিখিত তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। এবং ওহীর এক বিষয়বস্তু এই যে) যখন আল্লাহর বান্দা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার কাছে ভিড় করার জন্য সমবেত হয় (অর্থাৎ বিস্ময় ও শঙ্কুতা হেতু প্রত্যেকেই এভাবে দেখে যেন এখনই জড়ো হয়ে হামলা করে বসবে। এটাও তওহীদের পরিশিষ্ট! কেননা, এতে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা তওহীদকে ঘৃণা করে। অতঃপর এই বিস্ময় ও শঙ্কুতার জওয়াব দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে : ) আপনি (তাদেরকে) বলুন : আমি তো কেবল আমার পালনকর্তার ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (অতঃপর এটা কোন বিস্ময় ও শঙ্কুতার বিষয় নয়। অতঃপর রিসালত সম্পর্কিত আলোচনা করা হচ্ছে : ) আপনি

(আরও) বলুন : আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনার মালিক নই। (অর্থাৎ তোমরা যে আমাকে আযাব আনার ফরমায়েশ কর, এর জওয়াব এই যে, আমার এরূপ ক্ষমতা নেই। এমনভাবে কেউ কেউ বলে যে, আপনি তওহীদ ও কোরআনে কিছু পরিবর্তন করলে আমরা আপনাকে মেনে নিব। এর জওয়াবে) আপনি বলুন : (আল্লাহ না করুন, আমি এরূপ করলে) আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (উদ্দেশ্য এই যে, কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে রক্ষা করবে না এবং আমি খুঁজে কোন রক্ষাকারী পাব না)। কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছোনো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (অতঃপর তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে : ) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (কিন্তু কাফিররা এখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। এবং উল্টা মুসলমানদেরকে ঘৃণিত মনে করে। তারা এই মূর্খতা থেকে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে কার সহায়াকারী দুর্বল এবং কার দল কম। (অর্থাৎ কাফিররাই দুর্বল ও কম হবে। অতঃপর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামত হবে হবে জিজ্ঞাসা করে। জওয়াবে) আপনি (তাদেরকে) বলুন : আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। (কিন্তু সর্বাবস্থায় সেটা সংঘটিত হবে। নির্দিষ্ট সময় এটা অদৃশ্য বিষয়)। অদৃশ্যের জানী তিনিই। পরন্তু অদৃশ্যের বিষয় তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নির্ধারণ সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে নবুয়ত সপ্রমাণকারী জ্ঞান যথা ভবিষ্যদ্বাণী অথবা নবুয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত জ্ঞান যথা বিধি-বিধানের জ্ঞান এগুলো প্রকাশ করার সময়) তিনি তার অগ্র ও পশ্চাতে প্রহরী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, [যাতে শয়তান সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং ফেরেশতাদের কাছে শুনে কারও কাছে বলতে না পারে। সেমতে রসূলুল্লাহ (স)-র জন্য এরূপ পাহারাদার ফেরেশতা চারজন ছিল। এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়,] যাতে আল্লাহ (বাহাত) জেনে নেন যে, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার পয়গাম (রসূল পর্বস্ত) পৌঁছিয়েছে কি না। আল্লাহ তা'আলা তাদের (অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশতাদের) সব অবস্থা জানেন (তাই এ কাজে দক্ষ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন)। তিনি সব কিছুই গণনা জানেন (সূতরাং ওহীর এক একটি অংশ তাঁর জানা আছে এবং তিনি সবগুলো সংরক্ষণ করেন। সারকথা এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের জ্ঞান নয়। তাই কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় না জানা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। তবে নবুয়তের জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং এতে কোন ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে না। অতএব তোমরা এসব জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হও এবং বাড়তি বিষয়ের পিছনে পড়ো না)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ — শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত

আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিন্দের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

**জিন্দের স্বরূপ :** জিন্ আলাহ তা'আলার একপ্রকার শরীরী, আত্মধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই তাদেরকে জিন্ বলা হয়। জিন্-এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন্ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নয় ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তারাও জিন্দের দৃষ্টি শ্রেণীর নাম। জিন্ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহর অকাটা বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।—( মাযহারী )

لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ — থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সা)

জিন্দেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আলাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

**সূরা জিন্ অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা :** সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হয়রত ইবনে আক্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সা) জিন্দেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উচ্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিন্‌রা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিন্দের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজায়ে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জিন্দের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল : এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল : **إِنَّا سَمِعْنَا**

قَرَأْنَا عَجَبًا — আলাহ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসূলকে

অবহিত করেছেন।

**আবু তাগেবের ওফাত ও রসূলুল্লাহ (সা)-র তায়েফ গমন :** অধিকাংশ তরুসীর-বিদ বলেন : আবু তাগেবের মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোত্রের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুকাবিলায় তায়েফের সকাফ গোত্রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক

(র) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) তায়্যেফে পৌঁছে সকীফ গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে গেলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিল ওমায়্যের পুত্র আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্বগোত্রের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জওয়াবে ভ্রাতৃদ্বয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

সকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোত্রের দু'শ লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করতে থাকল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়্বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দু'শটার তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আঙ্গুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়্বা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দু'শ লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তাঁর স্বওরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আঙ্গুরের দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরূপ অভিনব ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বর্ণিত নেই। দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ اِنى اشكو الهك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس  
وانت ارحم الراحمين و انت رب المستضعفين فاننت ربي الى من  
تكنى الى بعد يتجهمنى او الى عد و ملكته امرى ان لم تكن ساخطا  
على فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى  
اشرفت له الظلمات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة من ان تنزل بى  
غضبك لك العتبي حتى ترضى و لا حول و لا قوة الا بك -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতায়, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন—পরের কাছে ? যে আমাকে আক্রমণ করে, না কোন শত্রুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোন কিছুই পন্নওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।)

আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যশ্ভারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গমবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সম্ভুল্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোন অনিশ্চ থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোন পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে।—(মায়-হারী)

ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃত্ব এই অবস্থা দেখে দয়াপ্র' হল এবং 'আদ্দাস' নামক তাদের এক খৃস্টান গোলামকে ডেকে বলল : একগুচ্ছ আসন্ন একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বল। গোলাম তাই করল। সে আসন্নের পাত্র রসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদ্দাস' এই দৃশ্য দেখে বলল : আল্লাহর কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাক্যটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আদ্দাস, তুমি কোন শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল : আমি খৃস্টান এবং আমার জন্মস্থান 'নামনুমা' শহরে। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : ভাল কথা। তাহলে তুমি আল্লাহর সৎবাদ্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ)-র শহরের অধিবাসী। সে বলল : আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরূপে? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা, তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তেমনি আমিও আল্লাহর নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রসুলুল্লাহ (সা)-র পদতলে লাটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তপদ চুম্বন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাদের একজন অপরাধনকে বলল : লোকটি তো আমাদের গোলামকে নষ্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল : আদ্দাস, তুমি লোকটির হস্তপদ চুম্বন করলে কেন? সে বলল : আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বৃকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বলল : আরো পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মদ্যুত না করলে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বা-বস্বায় তার ধর্মের চেয়ে ভাল।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রসুলুল্লাহ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহা-জ্জুদের নামায় গুরু করেন। ইয়ামেনের নছীবাইন শহরের জিন্নদের এই প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।—(মায়হারী)

জৈনক সাহাবী জিন্ন-এর ঘটনা : ইবনে জওয়া (র) 'আহ-হুফওয়া' গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জৈনক বৃদ্ধ জিন্নকে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায় পড়তে দেখেন। সে পশমের জোকা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রা) বলেন : নামায় সম্মাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল : তুমি এই জোকবার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোকবাটি সাতশ বছর

ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোকা পরিধান করেই আমি হযরত ইসা (আ)-র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর এই জোকা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন্ন সম্পর্কে 'সূরা জিন্ন' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—(মাযহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিন্ন-এর ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-কে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র ইচ্ছাকৃতভাবে জিন্নদের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জমলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লিখিত আছে। এটা বাহ্যত সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফকাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিন্নদের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে একবার দু'বার নয়—হয় বার আগমন করেছিল। অতএব সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَأَن تَعَالَى جَدْرَبْنَا — শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ তা'আলার

জন্য বলা হয় تَعَالَى جَدًّا — অর্থাৎ আল্লাহর শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে

رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে।

কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শান যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَأَن تَقُولَ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَكَ قَوْلٌ

شَطَطٌ — শব্দের অর্থ অবাতির কথা, অন্যান্য ও জুলুম।

উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন জিন্ন রা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে : আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহর শানে অবাতির কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন্ন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَأَن تَقُولَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا

هَمًّا رَهَقًا — এই আয়াতে মু'মিন জিন্ন রা বলেছে : মূর্খতা যুগে মানুষ যখন কোন বিজন

প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিন্নদের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিন্ন রা মনে করে বসল, আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জিন্নদের পথপ্রলটতা আরও বেড়ে যায়।

জিন্নদের প্রেরণায় হযরত রাকফ ইবনে ওমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ : তফসীরে-মাযহারীতে আছে 'হাওয়ালতিফুল-জিন্ন' কিতাবে হযরত রাকফ ইবনে ওমায়র (রা) সাহাবীর



ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ বশিত আছে। তিনি বলেন : এক রাত্রিতে আমি মরুভূমিতে সফর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হয়ে আমি উঠে থেকে নেমে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি যগোত্রের অভ্যাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম : **أَنى أَعُوذُ بِعَظْمِهِ هَذَا الْوَادِى** অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের জিহ্ব সন্নদারের আশ্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তন্দ্বারা আঘাত করতে চায়। আমি রুদ্ধ হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম :

এটা শব্দতানী কুমন্ত্রণা, আসল স্বপ্ন নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গেলাম। পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুষ্পার্শ্বে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি খরখর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিদ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক রুদ্ধ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করছে। ইতি-মধ্যে তিনটি বন্য পর্দভ সামনে এসে গেলে রুদ্ধ যুবককে বলল : এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য পর্দভ নিয়ে চলে গেল। অতঃপর রুদ্ধ আমাকে বলল : হে বোকা মানব! তুমি কোন প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিহ্বদের উপদ্রব আশংকা কর, তবে এ কথা বলো :

**اعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادى** অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের ভয় ও অনিশ্চি থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর কোন জিহ্ব-এর আশ্রয় গ্রহণ করো না। কেননা, সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিহ্বদের আশ্রয় গ্রহণ করত। আমি রুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম : মুহাম্মদ কে? সে বলল : ইনি আরব নবী—প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলল : ইনি খজুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদীনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদীনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। রসূলে করীম (সা) আমাকে দেখে আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন : আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাকে **وَ أَتَى كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْأَنْسِ يَعُوذُونَ** এ আয়াতখানি নাথিল হয়েছে।

—**وَأَتَى كَانِ رِجَالٌ مِّنَ الْأَنْسِ يَعُوذُونَ** আরবী

অস্তিত্বের **سَمَا** শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমাল্য অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিম্-র আকাশের সংবাদ শোনার জন্য মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো—আকাশ পর্যন্ত নয় : জিম্ ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বুখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা)-র এই হাদীস :

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر الذي قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسبغ فتتوجه إلى الكهان فيكذبون معها ما لا تذبغة من عند أنفسهم -

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—ফেরেশ-তারা ‘ইনান’ অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবतरণ করে। সেখানে তারা আলাহ্-র জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতী-স্ত্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।—(মাযহারী)

বুখারীতেই আবু হুরায়রা (রা)-র এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আলাহ্ তা‘আলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরতোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেন এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীস্ত্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যালোচনা করে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরে-শতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নিবিদ্রে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হিফায়-তের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিভাড়মের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিম্-রা চিন্তিত হয়ে কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর ‘নাখলা’ নামক স্থানে একদল জিম্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল থেকে একে শয়তান বিভাড়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে : প্রচলিত ডায়ায় **شهاب ثاقب** বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এরজন্য **انقراض الكوكب** শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ডায়া এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রত্নলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। মাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিভাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নব্বুত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

—أَنَا لَأَنْدَرِي أَشْرًا وَيَدِي مَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا—

অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে—১. পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, ২. তাদের হিদায়তের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন্ন ও শয়তান আল্লাহর ওহীতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

بخس — فَمَنْ يُّؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেওয়া এবং رَهَقٌ শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনের প্রতিদান কম দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা হবে না।

مسجد مساجد — وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদ-সমূহ কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। অতএব তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না; যেমন ইহদী ও খৃস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এধরনের শিরকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া **مسجد** শব্দটি এখানে **مصدر مؤمى** হয়ে সিজদার অর্থেও হতে পারে।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সিজদা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, সে যেন তাকে সিজদা করে। অতএব অপরকে সিজদা করা থেকে বিরত থাক।

উশ্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলিমের মতে কুফর।

—**قَدْ اِنَّا دَرِيْ اَتْرَيْبٌ مَا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَكَ رَبِّيْ اٰمِدًا**—এখানে

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যে সব অবিশ্বাসী আপনাকে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন : কিয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কিয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালন-কর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা

হয়েছে যে, **عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُّظْهَرُ عَلٰى غَيْبَةِ اَحَدًا** অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়েব' নই বরং আলেমুল গায়েব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য : **اَلَا مِّنْ اِرْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ نَّانَةٌ**

—**يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا**—উপরোক্ত বোকাসূলভ প্রশ্নের জওয়াব

এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম। অর্থাৎ রসূল গায়েব জানেন না—এ কথাই অর্থ যে, কোন গায়েব জানেন না নস্ব। বরং রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়েবের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়েবের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি বিধানের জ্ঞান এবং সম্মোপযোগী গায়েবের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এ সব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুর্পাশে অন্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়েব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে **اَسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ** বলা হবে। অর্থাৎ যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই

গায়েব প্রমাণ করা হয়নি বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে-গায়েব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে **انباء الغيب** শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে: **تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهَا إِلَيْكَ**

কোনকোন অজ্ঞ লোক গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না। তারা পরমস্বল্পপদের জন্য বিশেষত শেষ নবী (সা)-এর জন্য সর্বপ্রকার ইলমে-গায়েব সম্প্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আলাহ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গায়েব তথা সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা অপূ-পরমাণু সম্পর্কে জানকান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আলাহর আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।—(নাউশ্বিজাহ্) যদি কোন ব্যক্তি তার সোপান ভেদে তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ আলেমুল-গায়েব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পরমস্বল্পপদকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়েবের বিষয় বলে দেওয়ার কল্পনে তাঁরা আলেমুল-গায়েব হয়ে যাবেন না। অতএব বিষয়টি উত্তররূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

এক শ্রোণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুলাহ্ (সা) 'আলেমুল-গায়েব' নন, তখন তারা এই অর্থ বুঝে যে, নাউশ্বিজাহ্ রসূলুলাহ্ (সা) কোন গায়েবের খবর রাখেন না। অস্বচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবর্তন করবে হতে পারে না। কেন না, এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রিসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মু'মিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে: **وَإِخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَا**—অর্থাৎ প্রত্যেক

বস্তুর পরিসংখ্যান আলাহ তা'আলাই পেছন্নীকৃত। পরহাউর অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অপূ-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জজ্বিলসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জজ্বিল আছে, প্রত্যেক সৃষ্টিতে কত সংখ্যক কোঁটা কণিক হর এবং সারা জাহানের রুকসমূহের পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত ইলমে-গায়েব যে আলাহ তা'আলাই বিশেষ গুণ, অর্থাৎ একথা অব্যবাহার কুটিলে তৈরি হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝা-বুদ্ধিতে পতিত না হয়।

ইলমে-গায়েবের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি বিধান সূরা নম্বরের **قُلْ لَا يَعْلَمُ**

**مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ** আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

سورة المزمل

मूला मूला मूला

मकान अवधीर्ण : २० आयत, २ रूक्

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ ۖ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ ۖ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ  
قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۖ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ  
قَوْلًا ثَقِيلًا ۖ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيَلِّ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۖ  
إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ  
تَبَتُّلًا ۖ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۖ  
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۖ وَذُرْنِي وَ  
الْمُكذِبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمُ قَلِيلًا ۖ إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمًا  
ۖ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ۖ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۖ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ  
الْجِبَالُ ۖ وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ  
رَسُولًا ۖ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَى  
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۖ فَلَكَيفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرُ  
تُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۖ السَّمَاءُ مُنْفِطِرَةٌ بِهِ ۖ كَانَ  
وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۖ إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ  
سَبِيلًا ۖ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ

وَثَلَاثَةٌ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
 عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ  
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে বহাদুরত, (২) রাত্রিতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে ; (৩) অর্ধ রাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আরুত্তি করুন সুবিনাস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফিররা যা বলে, তজ্জনা আপনি সবার করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিস্ত-বৈস্তবের অধিকারী মিথ্যারোপ-কারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও গল্লিকুণ্ড, (১৩) গলগ্রহ হয়ে যাক এমন খাদ্য এবং যন্ত্রপালায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রসূল। (১৬) অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সে দিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে রুজ ? (১৮) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যাক ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার

দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার গালনকর্তা জানেন আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আনুষ্ঠান কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আনুষ্ঠান কর। তোমরা নামায কাম্বায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অশ্রেয় পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বন্দুরত, [ এভাবে সম্বোধন করার কারণ এই যে, নবুয়তের প্রথমভাগে কোরা-ইশরা তাদের 'দারুলমদওয়া' তথা পরামর্শ গৃহে একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপযুক্ত ও সর্বসম্মত খেতাব সম্পর্কে পরামর্শ করে। কেউ বলল : তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী। অন্যরা তাতে সায় দিল না। কেউ বলল : তিনি উন্মাদ। এটাও অগ্রাহ্য হয়ে গেল। আবার কেউ বলল : তিনি যাদুকার। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু অনেকেই এর কারণ বর্ণনা করল যে, তিনি বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেন। যাদুকার খেতাবই তাঁর জন্য উপযুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। প্রায়ই দুঃখ ও বিষাদের সময় মানুষ এরূপ করে থাকে। তাই তাঁকে প্রফুল্ল করার জন্য ও কৃপা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত আলী (রা)-কে আবু তোরাব বলে সম্বোধন করেছিলেন। সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ সব বিষয়ের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আরও বেশী মনোনিবেশ করুন, এভাবে যে ] রাত্রিতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি (এতে বিপ্রাম গ্রহণ করুন) অথবা তদপেক্ষা কম। দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের বেশি সময় আরাম করুন অথবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী (দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের চেয়ে কম সময়ে বিপ্রাম করুন। সারকথা, রাত্রিতে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া তো করণ্য হল কিন্তু সময়ের পরিমাণ কতটুকু হবে তা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—তিনিটির মধ্য থেকে যে কোন একটি—অর্ধ রাত্রি, দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি) এবং (এই দণ্ডায়মান অবস্থায়) কোরআন স্পষ্টভাবে পাঠ করুন (অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হওয়া চাই। নামাযের বাইরেও এভাবে পাঠ করার আদেশ আছে। অতঃপর এই আদেশের কারণও উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে) আমি আপনার প্রতি এক ভারী কালাম অবতীর্ণ করব



[ অর্থাৎ কোরআন মজীদ, যা অবতরণের সময় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে দিত। হাদীসে আছে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র উরু যামেদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরুতে রাখা ছিল। ফলে যামেদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরু ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) উক্টুর উপর সওয়ার অবস্থায় ওহী নাযিল হলে উক্টুরী বোঝার ভায়ে ঝুঁকে পড়ত এবং নড়াচড়া করতে পারত না। কনকনে শীতের মধ্যে ওহী নাযিল হলেও তার সর্বত্র ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এ ছাড়া কোরআনকে সংরক্ষিত রাখা ও অপরের কাছে পৌঁছানোও কষ্টসাধ্য ছিল। অসব কারণে 'ভারী কালাম' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হওয়াকে কঠিন মনে করবেন না। আমি তো আরও ভারী কাজ আপনাকে সোপর্দ করব। আপনাকে সাধনায় অভ্যস্ত করার জন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। যে ভারী কালাম আপনার প্রতি নাযিল করব, তার জন্য শক্তিশালী যোগ্যতা দরকার। অতঃপর দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ] নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তিদলনে খুব সহায়ক এবং (দোয়াহোক কিংবা কিরাআত) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (অবসর মুহূর্তে হওয়ার কারণে দোয়া ও কিরাআতের ভাষা ধীর ও শান্তভাবে উচ্চারিত হয় এবং একাগ্রচিত্ততাও হাসিল হয়। অতঃপর তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রাত্রির বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে—) নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে (সাংসারিক—যেমন গৃহস্থালীর কাজকর্ম এবং ধর্মীয় যেমন প্রচার কাজ। তাই রাত্রিকে নিদিষ্ট করা হয়েছে। রাত্রি ছাড়া অন্যান্য সময়েও আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন অর্থাৎ স্মরণ ও মগ্নতা সার্বজনিক ফরয। একাগ্রচিত্ততার অর্থ আল্লাহর সম্পর্ক সবকিছুর উপর প্রবল হওয়া। অতঃপর তওহীদসহ এ বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করুন। কাফিররা যা বলে, তজ্ঞন্যে সবার করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। [ অর্থাৎ তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। 'সুন্দরভাবে' এই যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিশোধের চিন্তা করবেন না। অতঃপর তাদের আযাবের সংবাদ দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে ] বিতর্কিতের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে (বর্তমান অবস্থায়) আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিন। (অর্থাৎ আরও কিছু দিন সবার করুন। সত্বরই তাদের শাস্তি হবে। কেন না) আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নি, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মবৃন্দ শাস্তি। (সুতরাং তাদেরকে এসব বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা সেদিন হবে,) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) বহমান বাজুকা-স্তূপ হয়ে যাবে (এবং উড়তে থাকবে। অতঃপর মিথ্যারোপকারীদেরকে সন্নাসরি সঙ্ঘো-ধন করা হয়েছে এবং রিসালত ও শাস্তি সপ্রমাণও করা হয়েছে) নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি (কিয়ামতের দিন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন যে, ধর্ম প্রচারের পর তোমরা কি ব্যবহার করেছ), যেমন ফিরাউনের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতএব তোমরা যদি (রসূল প্রেরণের পর নাফরমানী ও) কুফরী

কর, তবে (এমনভাবে তোমাদেরকেও একদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সেই দুর্ভোগের দিন সামনে আছে। অতএব তোমরা) সেই দিন (অর্থাৎ সেই দিনের বিপদ) থেকে কিরাপে আত্মরক্ষা করবে, যা (ভয়বহতা দৈর্ঘ্যের কারণে) বালককে করে দিবে বৃদ্ধ! সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (এটা টলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই)। এটা (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়বস্তু) একটা (সারণ্য) উপদেশ। অতএব ফার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক। (অর্থাৎ তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর সূরার শুরুতে বর্ণিত রাস্তার ইবাদত ফরয হওয়ার আদেশ রহিত করা হচ্ছেঃ) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবং আপনার কতক সহচর (কখনও) রাস্তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) আর্থাৎ এবং (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ (নামাযে) দণ্ডায়মান হন। দিবা ও রাস্তার পূর্ণ পরিমাপ আল্লাহ তা'আলাই করতে পারেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। (ফলে তোমরা খুবই কষ্ট ভোগ কর। কেননা, অনুমান করলে কম হওয়া সন্দেহ থাকে এবং অনুমানের চেয়ে বেশী করলে সারারাত্রি ব্যস্ত হয়ে যায়। উভয় বিষয়ে আত্মিক ও দৈহিক কষ্ট আছে) : অতএব (এসব কারণে) তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ রহি করে দিয়েছেন। কাজেই (এখন) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর। (এখানে কোরআন পাঠ করার অর্থ তাহাজ্জুদ পড়া। কারণ, এতে কোরআন পাঠ করা হয়। এই আদেশ মোস্তাহাব বিধান প্রমাণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদ পড়া আর ফরয নয়। এই আদেশ রহিত। এখন যতক্ষণ পার মোস্তাহাব হিসাবে ইচ্ছা করলে পড়ে নাও। রহিত হওয়ার অসঙ্গ কারণ কষ্ট।

عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ

পূর্ববর্ত বিষয়বস্তু এর ভূমিকা। অতঃপর রহিত করণের দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হচ্ছেঃ) তিনি (আরও) জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ জীবিকা অল্পেপে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। (এসব অবস্থায় নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া কঠিন। তাই আদেশ রহিত করা হয়েছে। কাজেই এ কারণেও অনুমতি আছে যে) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর। (তাহাজ্জুদ রহিত হয়ে গেলেও এই আদেশ এখনও বহাল আছে যে) তোমরা (ফরয) নামায কায়ম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতাপূর্ণ) স্মরণ দাও। তোমরা যে সৎ কর্ম নিজেদের জন্য অগ্র (পরকালের পুঁজি করে) পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে গণ্য থাকবে এবং পুরস্কার হিসাবে যথিতরূপে পাবে। (অর্থাৎ সাংসারিক কাজে ব্যয় করলে যে প্রতিদান ও উপকার পাওয়া যায়, সৎ কাজে ব্যয় করলে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে)। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমা প্রার্থনা করাও বহাল নির্দেশাবলীর অন্যতম)।

আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ - مَزْمِلُ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مَدْرٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ

প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূর্য্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর স্নেহগায়ত্রয়ে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইকরা সূর্য্য প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদিজা (রা)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন : **زملوني , زملوني** অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন : একদিন আমি পথচলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি বুলবুল চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম : আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** আয়াত নাশিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের

কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য **يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ**

বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।—(রাহুল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী : **مدثر و مزل** শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জগানা নামায ফরয ছিল না। পাঞ্জগানা নামায মেরাজের রাস্তিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগভী (র) বলেন : এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাস্তির নামায রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি বরং তাতে রাস্তির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ

হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাক্বি নামায়ে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (র) বলেন : এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অধিকাংশ রাক্বি তাহাজ্জুদের নামায়ে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদত্বয় ফুলে যায় এবং

আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ **فَاَقْرَأْ** **وَأَقْرَأْ**

**مَا تيسرَ مِنْهُ**

অবতীর্ণ হলে দীর্ঘরূপ নামায়ে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত

করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যস্ত করা হয় যে, যতরূপ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততরূপ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মে'রাজের রাক্বিতে পাঞ্জগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ (সা) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।  
—(মায়হারী)

**قُمِ اللَّيْلُ** — **قُمِ اللَّيْلُ** শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ

হয়েছে সমস্ত রাক্বি নামায়ে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাক্বি নামায়ে মশগুল থাকুন

কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : **نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ**

**قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ**

অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাক্বি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামায়ে মশগুল হোন। এটা **قَلِيلًا** ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রব্র হয় যে, অর্ধেক রাক্বি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাক্বির প্রাথমিক অংশ তো মাগন্বিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অভিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাক্বির অর্ধেক। সেটা সারা রাক্বির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাক্বির কমেও অনুমতি আছে, বেশীও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সান্নমর্ম এই যে, কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাক্বির চেয়ে কিছু বেশী নামায়ে মশগুল থাকা ফরয।

**تُرْتِيلُ** এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে

বাক্য উচ্চারণ করা।—(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কোরআন তিলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ

করবেন।—(কুরত্ববী) **وَتُرْتِيلُ** বলে রাক্বির নামায়ে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেবল আত, তসবীহ, রুকু, সিজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা করে আদান করতেন। সাহাবী ও তাবয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই পাঠ করতেন। রান্নির নামাযে তিনি কিরাপে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এই প্রস্নের জওয়াবে হযরত উস্মে সামমা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।—( মাযহারী )

যথা সম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করেন, তাঁর কিরা'আতের মত অন্য কারও কিরা'আত আলাহ্ তা'আলা শুনে না।—( মাযহারী )

হযরত আলকামা (রা) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করতে দেখে বলেন :

لقد وتل القرآن فداه أبي وامى — অর্থাৎ সে কোরআন তরতীল করেছে ;

আমার পিতামাতা তার জন্য উৎসর্গ হোন।—( কুরতুবী )

তবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তশ্বার প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন :

আলাহ্ তা'আলা **وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً** আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন,

এটাই সেই তরতীল।—( কুরতুবী )

قول ثقيل—أنا سنلقي عليك قولاً ثقيلًا ( ভারী কালাম ) বলে কোরআন

পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্য আলাহ্ তা'আলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বস্ত্য। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নামিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উষ্ণ উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নিয়ে পড়ত।—( বুখারী )

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কশেট অভ্যস্ত করার জন্য তাহাজ্জুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রান্নিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে উবিষ্ম্যতে কোরআন অবতীর্ণ কণ্ঠসাধ্য ও ভারী বিধি বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

نَا شَيْئَةً اِنَّ نَا شَيْئَةً اَللَّيْلِ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্য

দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাযের জন্য গাভ্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়সান (রা) বলেন : শেষরাতে গাভ্রোত্থান করাকে نَا شَيْئَةً اَللَّيْلِ বলা হয়। ইবনে য়ায়েদ (রা) বলেন : রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা نَا شَيْئَةً اَللَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়িকা (রা) এক প্রবন্ধে উল্লেখ করে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুযায়ের (রা)ও তাই বলেছেন।— (মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষত ইশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই قِيَامُ اللَّيْلِ ও نَا شَيْئَةً اَللَّيْلِ-এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (র) বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা), সাহাবায়ে কিরাম, টাবেয়ীন ও বুযুর্গত্রণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাতে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম ও অধিক বরকতের কারণ। তবে ইশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সূন্নত আদায় হয়ে যায়।

و طَاءٌ— هِيَ اَشَدُّ و طَاءٌ শব্দে দুইকম কিরা'আত আছে। প্রসিদ্ধ কিরা'আতে ওয়াও

এর উপর যবর এবং ছোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিণ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির নামায প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বেশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কিরা'আত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিরা'আত হচ্ছে

لَهُوَ اَطُّوْا مَدَّةَ مَا حَرَّمَ

এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে এই অর্থই বণিত আছে। ইবনে য়ায়েদ (রা) বলেন : উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্য গাভ্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাঙ্ঘতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : اَشَدُّ و طَاءٌ-এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাঙ্ঘতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

اقوم শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কোরআন তিলাওয়াত

অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী **أَنَا سُنْتُكَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا** আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসুলুল্লাহ (সা)-র নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত ও রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্য ব্যাপক।

**سَبِحْ—إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا** শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও

ঘোরাকেরা করা। এ কারণেই সাতার কাটাকেও **سَبْحًا** ও **سَبْحًا** বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অশ্বেষণে ঘোরাকেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্য ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসুলুল্লাহ (সা) ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততার থাকতে হয়। ফলে একপ্রতিভে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

**জ্ঞানভাষা :** ফিকাহবিদগণ বলেন : যে সব আলিম ও মাশায়খ জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আত্মা তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্য ও অনেক আলিম ও ফিকাহবিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

**تَبَتَّلْ—وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَهُ تَبَتُّلًا** এর শাব্দিক অর্থ মানুষ

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আত্মাহকে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আত্মাহকে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসুলুল্লাহ (সা) কোন সময় আত্মাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসুলুল্লাহ (সা)-কে দিবারাত্রি সর্বরূপ আত্মাহকে স্মরণ করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রব্রন দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেওয়া হয় অর্থাৎ মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যাপ্ত রেখে ইত্যাদি যেকোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : **كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حِينٍ** অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) সর্বত্র আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্তাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার—১. শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং ২. আল্লাহর গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।—( মাওজানা খানডী )

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ **وَتَبَتَّلْ إِلَهُ تَبْتِيلًا** অর্থাৎ আপনি

সমস্ত সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহর সত্ত্বিটি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসার, চলাফেরার দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়দ (রা) বলেন : **تَبَتَّل** -এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।—( মাযহারী ) কিন্তু এই **تَبَتَّل** তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহেদ সেই **رَهْبًا نَهَيْتَ** তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে **لَا رَهْبًا نَهَيْتَ فِي الْإِسْلَامِ** বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীরতের পরিত্যাগ **رَهْبًا نَهَيْتَ** -এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহর সত্ত্বিটি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্কহেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কহেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্কে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্কহেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি স্বাভাবিক সাংসারিক কাজ-করবারের পরিপন্থী নয়, বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পন্নগন্নগণের সূন্নত; বিশেষত পন্নগন্নগণ শিরোনামগি মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা)-র সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে **تَبَتَّل** শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে দীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস'।—( মাযহারী )

ভাষ্য : অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূফী বুয়ুর্গণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন :



আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিব্যাত্মি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে—প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওভপ্রাভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই

পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ১. **وَ تَبْتَئِلُ** এবং ২. **وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ** **الْيَهْ تَبْتِيْلًا**

এখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সার্বজনিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ভুলি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সূফী-ব্যুর্গগণের পরিভাষায় **وصول الى الله** আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহর পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেষ সাদী (র) উপরোক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

**تعلق حجاب است و به حاصلی — چو پوند ها بکسلی واصلی**

ইসমে যাভের বিবর অর্থাৎ বারবার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলাও ইবাদত : আয়াতে

ইসম শব্দ উল্লেখ করে **وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ** বলা হয়েছে এবং **وَ اذْكُرْ رَبِّكَ** বলা

হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে অর্থাৎ আল্লাহ বারবার উচ্চারণ করাও আদিল্ট বিষয় ও কাম্য।—(মায়হানী) কোন কোন আলিম একে বিদ'আত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

**رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا**—যাকে কোন কাজ

সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে **وکیل** বলা হয়। কাজেই **فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا** বাক্যের

অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কান্নবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওম্মাকুল বলা হয়। এই সূরার রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কান্নখী (র) বলেন : সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কহেদ এবং ৫. তাওম্মাকুল। তাওম্মাকুলের

সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার **رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**

বর্ণনা করে ইঙ্গিত করার হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালন-কর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাঙ্গি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিশ্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে

কখনও ব্যক্তি হতে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে : **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىَّ**

**فَأَنَا جَارٌ لَهُ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাঙ্গি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

**তাওয়াক্কুলের শরীয়তসম্মত অর্থ :** আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আশ্রয়স্থলর যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের স্বরূপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন :

**أَنْ نَفْسَانِ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا إِلَّا فَاتَقُوا اللَّهَ وَاجْمَلُوا نِيَّ الطَّلَبِ** অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার

অবস্থানিত ও লিখিত রিমিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর।— (মায়হারী) তিরমিযীতে আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অথবা উড়িয়ে দেবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে।— (মায়হারী)

**وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ**—ইমাম কারখী (র)-র উক্তি মতে এটা রসূলুল্লাহ

(সা)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহর পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্ধাতন ও গালিগালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের

কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অজিত হয় না।

هَجْرٌ — وَ أَهَجَرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا — এর শাব্দিক অর্থ বিষম ও দুঃখিত মনে

কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নেবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেনে هَجْرًا جَمِيلًا শব্দ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদমর্যাদার

খাতিরে আপনি কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বন্ধিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এলাপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের উৎপীড়নের কারণে সবার ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হমকি, শাস্তি ও জিহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জিহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবার ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জিহাদ বিশেষ আয়াতের আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবার ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাস্থনার জন্য কাফিরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আয়াত তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তবে বিশেষ সহস্যের ভাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিলে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ

أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهْلَمٌ قَلِيلًا — এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে

বলা হয়েছে। نِعْمَةٌ শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাদুর্ভ। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিবাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাহ-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে نَكَالٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থ আটকবস্থা ও শিকল। এরপর আহাম্মাদের উল্লেখ করে আহাম্মাদীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে— **طَعَامًا زَانِغًا**—এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায়

এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদ্গীরণও করা যায় না। আহাম্মাদীদের খাদ্য ঘরী ও যাক্বুমের অবস্থা তাই হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : তাতে আগুনের ফোঁটা থাকবে, যা গলায় আটকে যাবে।—(নাউমুবিলাহ মিনহ) শেষে বলা হয়েছে : **وَعَذَابُ الْيَمِينِ**—নিদিল্ট

আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সুধূর্ণগণের পরকাল স্তীতি : ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কোরআন পাকের এই আয়াত শুনে ভয়ে অস্তান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র) একদিন রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীত হলে অন্তরে এই আয়াতের কল্পনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুত্র হযরত সাবেত বানানী, ইয়াযীদ যব্বী ও ইয়াহুইয়া বাক্বা (র)—র কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহ পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সন্মত করলেন। —(রাহল মা'আনী)

অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে : **يَوْمَ تَرُجَّفُ الْأَرْضُ**

**وَالْجِبَالُ**—এরপর কাফিরদের ফিরাউন ও হযরত মুসার কাহিনী শুনিতে সতর্ক করা

হয়েছে যে, ফিরাউন পরগণের মুসা (আ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে প্রেরণার হয়েছে, তোমরা মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমন ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে রুদ্ধ পরিণত করে দেবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিদ্যুত হয়েছে। সেদিন এমন স্তীতি ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে যে, বালকও রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারণও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও রুদ্ধ বলসে পৌঁছে যাবে।—(কুরতুবী, রাহল মা'আনী)

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় : সূরার শুরুতে **قُمِ اللَّيْلُ** বলে রসূলুল্লাহ (সা) ও

সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দিনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মেহনতমজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পদমুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ফলস্বায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি

أَنَا سَأَلْتَنِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এরচেয়ে ভারী

ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর জান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেওয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মিরাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেরানা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

বাহ্যত রসূলুল্লাহ (সা) ও সমস্ত উশ্মত থেকে এই রহিত ফরয হয়ে গেছে। তবে তাহাজ্জুদের নামায মোস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়—এই বিধান এখনও বাকী আছে। এখন এই নামাযে কোন সময়সীমা এবং কোরআন পাঠের কোন বাঁধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করতে পারে।

শরীয়তের বিধান রহিত হওয়ার স্বরূপ : বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশীর ভাগ কারণ, অভিজ্ঞতার পরনতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীতে এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা, কোন নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াবে, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোন কোন বিধান আল্লাহর জানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য স্থায়ী। আল্লাহর কাছে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ

প্রকৃতপক্ষে তাঁ দ্বারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য নয়, বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়, উপরোক্ত বক্তব্যে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য তাহাজ্জুদের নামায

ফরয ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের **وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فَلَ لَكَ** আয়াত-  
খানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র দায়িত্বে তাহা-  
জ্জুদের নামাযকে একটি অতিরিক্ত ফরয হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, **نَا فَلَ**

শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত; মানে অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামায এখন কারও উপর ফরয নয়। তবে মোস্তাহাব সবার জন্যই। আয়াতে **نَا فَلَ لَكَ**

বলে পারিভাষিক নফল বোঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের তফসীরে দেখুন।

ফরয তাহাজ্জুদ রহিতকারী **فَاَقْرَأُوا مَا تيسَّرُ مِنْهُ لَكُمْ اِنْ رَبَّكَ يَعْلَمُ** থেকে

পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মসনদে আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামায নিছক নফল ও মোস্তাহাব থেকে যায়।—(রাহুল মা'আনী)

এর পর রহিতকরণের কারণ-বর্ণনা গুলসঙ্গে বলা হয়েছে : **عَلِمَ اَنْ لَنْ نَحْصُوهُ**

— **احصاء** শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্রি কত-টুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও

খুশু-খুশুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে **احصاء** শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যাহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে : **من احصاهادخل الجنة** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জাহাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

**تَوْبَةً—فَتَابَ عَلَيْكُمْ** শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তও-

বাক্যেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে : **فَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبِعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ**

—অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে সতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

**وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ**—এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো

হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মি'রাজের রাক্বিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকাকালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে।

সুতরাং সূরার শেষের **اقِيمُوا الصَّلَاةَ** আয়াতে পাড়গানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, বাহুরে মুহীত)

এমনি ভাবে **وَاتُوا الزَّكَاةَ** বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু

প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন : যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে।—রাহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

**وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا**—আল্লাহর পথে ঋণ করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবায়ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই **أَقْرِضُوا اللَّهَ** বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**وَمَا تَقْدَرُوا لَآنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ**—অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ

সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়াত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন; তারা ওসীয়াত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশী ভালবাসে? সাহাবায়ে কিরাম আশ্রয় করলেন : নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশী ভালবাসে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : খুব বুঝে শুনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোন উত্তর জানা নেই। তিনি বললেন : (আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয়—তোমার ওয়ারিশের ধন। —(ইবনে কাসীর)



سورة المدثر

मूरा मुद्दासुत्र

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبِّكَ فَكْدِرْ ۖ

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۚ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُوتَ وَتَكُنْ لِرَبِّكَ فَاضِرٌ ۖ فَإِذَا نُقِرَ

فِي النَّاقُورِ ۖ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۖ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ

لَيْسِرٍ ۖ ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ

وَبَيْنَ شُهُودًا ۖ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهْنِيدًا ۖ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَهُ ۖ

كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۖ سَأَرْهُقَهُ صَعُودًا ۖ إِنَّهُ

فَكَرَّ وَقَدَّرَ ۖ فَعَقَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ ۖ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

يُبْحَرُ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۖ وَمَا

أَدْرَاكَ مَا سَقَرُهُ ۖ لَا يُبْقَى وَلَا تَذَرُ ۖ لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا

تِسْعَةَ عَشْرٍ ۖ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا

عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ۖ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۖ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا

ارَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي  
 مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى  
 لِلْبَشَرِ ۗ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا  
 لَإِحْتَكَاةُ الْكَبِيرِ ۗ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۗ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّمَ  
 أَوْ يَخَّرَهُ ۗ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۗ فِي جَنَّتِ  
 تَيْسَاءُ لَوْنٌ ۗ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۗ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۗ قَالُوا  
 لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ۗ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۗ وَكُنَّا نَحْوُ  
 مَعَ الْخَائِضِينَ ۗ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۗ حَتَّىٰ آتَانَا  
 الْيَقِينَ ۗ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ ۗ فَمَا لَهُمْ عَنِ  
 التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ ۗ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۗ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَةٍ ۗ بَلْ  
 يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مَنشُورَةً ۗ كَلَّا بَلْ لَأَ  
 يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۗ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۗ وَمَا  
 يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ۗ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْوَرَةِ ۗ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে চাদরাহত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুক দেওয়া হবে, (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফিরদের জন্য এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি (১৩) এবং সদাসংগী পূত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সম্বলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ

করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে, (২০) জাবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে। (২১) সে জাবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে ক্রুদ্ধিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে, (২৪) এরপর বলেছে : এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, (২৫) এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এই সংখ্যা করেছি—যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনগণ সন্দেহ গোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথছড়ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সং পথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্ডের শপথ, (৩৩) শপথ স্নানির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রত্যাকালের, যখন তা আলোকোন্মোচিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে আম্মাতে এবং পরম্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে : তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহায্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের স্মৃতি পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন? (৫০) যেন তারা ইতস্তত বিক্লিষ্ট গর্দভ (৫১) হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বলং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রস্থ দেওয়া হোক। (৫৩) কখনও না বলং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র। (৫৫) অতএব যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না কিন্তু যদি আল্লাহ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বরাহাদিত, উঠুন (অর্থাৎ স্বীয় জায়গা থেকে উঠুন অথবা প্রস্তুত হোন) অতঃপর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করুন, (যা নবুয়তের দায়িত্ব। এখানে 'সুসংবাদ প্রদান করুন' বলা হয়নি। কারণ, আয়াতটি একেবারেই নবুয়তের প্রথম দিকের। তখন দু-একজন ছাড়া কেউ মুসলমান ছিল না। ফলে সতর্ক করাই অধিক সমীচীন ছিল।) আপন পালনকর্তার

মাহাত্মা যোগা করুন, (কেমনা, তওহীদই তবলীগের প্রধান বিষয়বস্তু। অতঃপর নিজেরও কতিপয় জরুরী পালনীয় কর্ম, বিশ্বাস ও চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। কারণ, যে তবলীগ করবে, তারও আত্মসংশোধন প্রয়োজন)। আপন গোশাক পবিত্র রাখুন (এটা কর্ম সম্পর্কিত বিষয়। শুরুতে নামায করত ছিল না, তাই নামাযের আদেশ করা হয়নি।)। (৩য়) এই যে) এবং প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন [যেমন এ পর্যন্ত আছেন। এটা বিশ্বাসগত বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের ন্যায় তওহীদে অটল থাকুন। রসুলুল্লাহ (সা) শিরকে দ্বিপ্ত হবেন এরূপ আশংকা ছিল না। তবুও তওহীদের শুরুতে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে এই আদেশ করা হয়েছে]। প্রতিদানে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। [এটা চারিত্রিক বিষয়। পরগণার ব্যতীত অপরের জন্য এ কাজ জান্নেয় হলেও অনুভব। সূরা রোমের আয়াত وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّهَا

শান ও মর্যাদা সবার উর্ধ্বে, তাই এটা তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে]। এবং (সভর্করণের কাজে নির্ভাতনের সম্মুখীন হলে তজ্জনা) আপনায় পালনকর্তার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবার করুন। (এটা তবলীগ সম্পর্কিত বিশেষ নৈতিকতা। সূত্রাং উল্লিখিত আয়াতসমূহে নিজের ও অপরের চরিত্র এবং কর্ম সংশোধনের বিভিন্ন ধারা বাড়া হয়েছে। অতঃপর সভর্ক করার পরও যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য এই শাস্তিবাপী রয়েছে যে) যেদিন শিংগার ফাঁক দেওয়া হবে, সেদিন কাফিরদের জন্য এক উত্তরাত্ম দিন হবে, যা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। (অতঃপর কতিপয় বিশেষ কাফির সম্পর্কে বলা হচ্ছে : ) যাকে আমি (সন্তান ও ধন সম্পদ থেকে রিত্ত) একক সৃষ্টি করেছি (জন্মের সময় কল্পও ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকে না। এখানে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে)। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (আমিই তাকে বুঝে নেব)। আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি ও সদাসংগী পূর্ববর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সম্বলতা দিয়েছি। এরপরও (সে ঈমান এনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বরং কুফর ও অমর্যাদার ভঙ্গিতে এই বিপুল ধনসম্পদকে সামান্য মনে করে) সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই। কখনও (সে বেশী দেওয়ার যোগ্য) নয়, (কেমনা,) সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (বিরুদ্ধাচরণের সাথে যোগ্যতা কিরূপে থাকতে পারে। তবে ভিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশী দিলে সেটা ভিন্ন কথা। আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে এই ব্যক্তির উন্নতি বাহ্যত বন্ধ হয়ে যায়। সে মতে এরপর তার কোন সন্তান হয়নি এবং ধনসম্পদও বাড়েনি। এ শাস্তি দুনিয়াতে আর পরকালে) তাকে সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) জাহান্নামের পাহাড়ে আরোহণ করাব। (তিরমিযীর হাদীসে আছে জাহান্নামে একটি পাহাড়ের নাম 'সউদ'। সত্তর বছরে এর শূণ্য পৌঁছবে, এরপর সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে। এরপর সর্বদাই এমনিভাবে আরোহণ করবে এবং নিচে পতিত হবে। উল্লিখিত হঠকারিতাই এই শাস্তির কারণ। অতঃপর এর আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে : ) সে চিন্তা করেছে (যে কোর-আন সম্পর্কে কি বলা যায়) অতঃপর (চিন্তা করে) মনস্থির করেছে (পরে তা বর্ণিত হবে)। ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। (তীব্র নিন্দা ভাপনার্থে বাস্তব বিস্ময় প্রকাশ করা

হয়েছে)। অতঃপর সে (উল্লিখিত লোকজনের প্রতি) দৃষ্টিপাত করেছে (যাতে স্থিতিস্থাপক কথাটি তাদের কাছে বলে) অতঃপর সে প্রকৃষ্ট করেছে এবং মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (আপত্তিকর-বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মুখ বিকৃত করে ঘৃণা প্রকাশ করাই সাধারণ অভ্যাস)। এরপর বলেছেঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (উপরোক্ত মনস্থির করার বিষয়বস্তু এটাই। উদ্দেশ্য এই যে, এই কোরআন আল্লাহর কালাম নয় বরং মানুষের কালাম, যা তিনি কোন যাদুকরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন অথবা তিনি নিজেই এর রচয়িতা। তবে বিষয়বস্তু তাদের কাছ থেকে বণিত, যারা পূর্বে নবুয়ত দাবী করত।

অতঃপর এই হঠকারিতার বিস্তারিত শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে **سَاءَ مَا كَانُوا عَمِلِينَ** বাক্যে (তা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছিল)। আমি সত্বরই তাকে জাহান্নামে দাখিল করব। আপনি কি বুঝলেন জাহান্নাম কি? এটা (এমন যে, প্রবিশ্ট ব্যক্তির কোন কিছু দংশ করতে) বাকী রাখবে না এবং (কোন কাফিরকে ভিতরে না নিয়ে) ছাড়বে না। মানুষকে দংশ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। তাদের একজনের নাম মালেক। তারা কাফিরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেবে। শক্তিশালী একজন ফেরেশতা ই জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও উনিশ জনকে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যায় যে, শাস্তি দানের কাজটি খুবই গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা হবে। উনিশ সংখ্যার গুণ তত্ত্ব আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে অভ্যাজনের কাছে যা অধিক গ্রহণযোগ্য, তা এই যে, আসলে সত্য বিশ্বাস-সমূহের বিরোধিতার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কর্ম সম্পর্কিত নয় এমন অকাটা বিশ্বাস নয়টি ১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. জগতের নতুনত্বে বিশ্বাস করা, ৩. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ৪. সমস্ত ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস রাখা, ৫. পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৬. তকদীরে বিশ্বাস করা, ৭. কিয়ামতে বিশ্বাস করা, ৮. জাম্মাত ও ৯. দোযখে বিশ্বাস করা। অন্যসব বিশ্বাস এগুলোর শাখা-প্রশাখা। কর্ম সম্পর্কিত অকাটা বিশ্বাস দশটি—পাঁচটি করণীয় অর্থাৎ এগুলো করা যে ওয়াজিব, তা বিশ্বাস করা জরুরী। যথা, ১. কালেমা উচ্চারণ করা, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রমযানের রোযা রাখা এবং ৫. বায়তুল্লাহর হজ্ব করা। আর পাঁচটি বর্জনীয় অর্থাৎ এগুলো করা হারাম এরূপ বিশ্বাস রাখা জরুরী। যথা, ১. চুরি করা, ২. ব্যভিচার করা, ৩. হত্যা করা, বিশেষত সন্তান হত্যা করা, ৪. অপবাদ আরোপ করা, ৫. সৎ কাজে অবাধ্যতা করা, এতে গীবত, জুলুম, অন্যায্যভাবে ইয়াতীমদের মাল ভরূপ করা ইত্যাদি দাখিল আছে। এখন সব বিশ্বাসের সমষ্টি হল উনিশ। সম্ভবত এক এক বিশ্বাসের শাস্তি দেওয়ার জন্য এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তওহীদের বিশ্বাসটি সর্বমুহৎ বিধান্য তার জন্য একজন বড় ফেরেশতা মালেককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আয়তের বিষয়বস্তু শুনে কাফিররা উপহাস করেছিল। (তাই পরবর্তী বিষয়বস্তু নামিল হয় অর্থাৎ) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক (মানুষ নয়) কেবল ফেরেশতা নিযুক্ত করেছি। (তাদের মধ্যে এক একজন ফেরেশতা সমস্ত জিন ও মানবের সমান শক্তিধর)

আমি তাদের সংখ্যা (বর্ণনায়) এরূপ (অর্থাৎ উনিশ): রেখেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষার জন্য যাতে কিতাবীরা (শোনার সাথে সাথে) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবিগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এই আশ্চর্য বিষয়বস্তু দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? (কিতাবীদের বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলার দৃষ্টি করণ সম্ভবপর—১. তাদের কির্তাবীও এই সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব শোনা যাত্রাই মেনে নেবে। তাদের কিতাবে এখন এই সংখ্যা উল্লিখিত না থাকলে সম্ভবত বিকৃতির কারণে মিটে যায়। ২. তাদের কিতাবে যদি এই সংখ্যা না থাকে, তবে তারা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত জ্ঞানের উপায় নেই; এমন অনেক বিষয় তাদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সেগুলোর নাম এই সংখ্যার বিষয়কে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি তাদের কাছে ছিল না। অতএব আয়াতে বিশ্বাসের অর্থ হবে অস্বীকার ও উপহাস না করা। এই দৃষ্টি করণের মধ্য থেকে প্রথম কারণটি স্পষ্ট। মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ারও দৃষ্টি করণ হতে পারে—১. কিতাবীদের বিশ্বাস দেখে তাদের ঈমান গুণগত শক্তিশালী হবে। কারণ, রসুল্লাহ্ (সা) কিতাবীদের সাথে মেলামেশা না করা সত্ত্বেও তাদের গুহীর অনুরাগ খবর দেন। অতএব তিনি অবশ্যই সত্য নবী। ২. নতুন কোন বিষয়বস্তু অন্তর্গত হলেই মু'মিনগণ তৎপ্রতি ঈমান আনত। সুতরাং সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নামিল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ঈমানের পরিমাণ বেড়ে গেল। এরূপ সন্দেহ পোষণ না করার কথাটি তাকীদার্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। রোগ কি, এ ব্যাপারেও দুরূহ সম্ভাবনা আছে—১. সন্দেহ; কেমনা, সত্য প্রকাশিত হলে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে এবং কেউ তা মেনে নিতে ইতস্তত করে। মক্কাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক থাকা বিচিত্র নয়। ২. নিকট তথা কপটতা। এমতাবস্থায় আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, মদীনার কপট বিশ্বাসী থাকবে এবং তাদের এই স্বভাব হবে। মু'মিন ও কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করার বিষয়টি আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করা হল আভিধানিক অর্থে এবং মু'মিনদের শরীয়তের পরিভাষণে অর্থে। অতঃপর উভয় দলের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে মু'মিনগণকে যেমন বিশেষ হিদায়ত দান করেছেন এবং কাফিরদেরকে বিশেষ পথভ্রষ্ট করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন। (অতঃপর পূর্বের বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। নতুবা) আপনার পালনকর্তার (এসব) বাহিনী (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তাদের) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (তিনি ইচ্ছা করলে অগণিত ফেরেশতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে পারতেন। এখনও তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উনিশ হলেও তাদের সহকারী ও সাহায্যকারী অনেক। মুসলিমের হাদীসে আছে, জাহান্নামকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সত্তর হাজার বন্দী থাকবে এবং প্রত্যেক বন্দী সত্তর হাজার ফেরেশতা ধারণ করে রাখবে। জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার যা আসল উদ্দেশ্য, তা সংখ্যানুভা অথবা সংখ্যাধিক্য অথবা উনিশ সংখ্যার রহস্য উন্মোচন করা অথবা না করার উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেই আসল

উদ্দেশ্য এই যে) এটা (অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা) মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয় (যাতে তারা আযাবের কথা শুনে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। এই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আসল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে এসব ব্যুত্থি বিষয়ের পেছনে না গড়াই মুক্তিসঙ্গত। অতঃপর জাহান্নামের শাস্তির কিছুটা বর্ণনা আছে, যা মানুষের জন্য উপদেশ হওয়ার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে। ইরশাদ হচ্ছে : ) চঞ্জের শপথ, শপথ রান্নির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোত্তাসিত হয়, নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী— তোমাদের মধ্যে যে, (সৎ কাজের দিকে) অগ্রণী হয়, তার জন্য অথবা যে (সৎ কাজ থেকে) পশ্চাতে থাকে, তার জন্যও। (অর্থাৎ সবার জন্য সতর্ককারী। এই সতর্ককরণের ফলাফল কিয়ামতে প্রকাশ পাবে, তাই কিয়ামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহের শপথ করা হয়েছে।) সেমতে চঞ্জের রুদ্ধি ও হ্রাস এ জগতের উন্নয়ন ও অবনতির নমুনা। চঞ্জে যেমন এক সময়ে তার আলো হারিয়ে ফেলে, তেমনি জগৎও নিরেট অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এমনভাবে দিবা ও রান্নির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ সত্যাসত্যের গোপনীয়তা ও বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বিশ্বজগতের বিলুপ্তি রান্নির অবসানের মত এবং পরকালের প্রকাশ প্রভাতকালীন উজ্জ্বল্য সঙ্গত। অতঃপর দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে : ) প্রত্যেক ব্যক্তি তার (কুফরী) কৃত-কর্মের বিনিময়ে (জাহান্নামে) আটক থাকবে কিন্তু ডানদিকস্থরা (অর্থাৎ মু'মিনগণ, তাঁদের বিবরণ সূরা ওয়াক্কাসের বর্ণিত হয়েছে। নৈকট্যশীলগণও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জাহান্নামে আটক থাকবে না) তাঁরা থাকবে জান্নাতে (এবং) অপরাধী কান্নিরদের অবস্থা (তাঁদের কাছেই) জিজ্ঞাসা করবে। (জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বাক্যালাপ কিয়ামতে হবে, এ সম্পর্কে সূরা আ'রাকের তরুণীরে বর্ণনা করা হয়েছে। শাসানোর জন্য এই জিজ্ঞাসা করা হবে। মু'মিনগণ কান্নিরদেরকে জিজ্ঞাসা করবে) তোমাদেরকে জাহান্নামে কিসে দাখিল করল? তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না, অত্যাচারকে (ওয়াজিব) আহায্য দিতাম না এবং যারা (সত্য ধর্মের বিপক্ষে) সমালোচনামুখর ছিল, আমরাও তাদের সাথে মিলে (ধর্মের বিপক্ষে) আলোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মুছা পর্যন্ত। (অর্থাৎ নাকরমানীর উপরই আমাদের জীবনাবসান হয়। ফলে আমরা জাহান্নামে চলে এসেছি। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কান্নিররাও নামায, রোযা ইত্যাদি ব্যাপারে আদিষ্ট। কেননা, জাহান্নামে দুটি বিষয় থাকবে—এক. আযাব ও দুই. আযাবের তীব্রতা। সুতরাং উল্লিখিত কর্মসমূহের সমষ্টি আযাব ও আযাবের তীব্রতা এই দুই—এর কারণ হতে পারে, এভাবে যে, কুফর ও শিরক কারণ হবে আযাবের এবং নামায ইত্যাদির তরুণ কারণ হবে আযাবের তীব্রতার। কান্নিররা নামায-রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে আদিষ্ট নয়—এর অর্থ এই নেওয়া হবে যে, নামায-রোযার কারণে তাদের আসল আযাব হবে না এবং মূল ঈমানের সাথে যেহেতু নামায-রোযাও প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়, তাই নামায-রোযা তরুণ করার কারণে আযাবের তীব্রতা হতে পারে)। অতএব (উল্লিখিত অবস্থার) সুপারিশ-কারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (অর্থাৎ কেউ তাদের জন্য সুপারিশই

করতে পারবে না। কারণ, অন্য এক আয়াতে আছে : **فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ**—কুফ-

রের কারণে যখন তাদের এই দুর্গতি হবে, তখন) তাদের কি হল যে, তারা (কোরআনের এই) উপদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয় যেন তারা ইতস্তত বিক্লিষ্ট গর্দভ, সিংহ থেকে পলায়নপর। (এই তুলনায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত গর্দভ বোকামি ও নির্বুদ্ধিতায় সুবিদিত। দ্বিতীয়ত তাকে বন্য খরা হয়েছে, যে ভয় করার নয়, এমন জিনিসকেও অহেতুক ভয় করে এবং পালিয়ে ফিরে। তৃতীয়ত সিংহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। ফলে তার পলায়ন যে চরম পর্যায়ে হবে, তা বলাই বাহুল্য। এই পলায়নের অন্যতম কারণ এই যে, কাফিররা কোরআনকে তাদের ধারণায় যথেষ্ট দলীল মনে করে না) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত (প্রশী) কিতাব দেওয়া হোক।—[ দুয়রে-মনসুরে কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কতক কাফির রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল : আপনি যদি আমাদের অনুসরণ কামনা করেন, তবে বিশেষভাবে আমাদের নামে আকাশ থেকে এমন কিতাব আসতে হবে, যাতে আপনাকে অনুসরণ করার আদেশ থাকবে। অন্য এক আয়াতে যেমন আছে :

**مُنشَرَةً (উন্মুক্ত) حَتَّىٰ نُنزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَقْرُءُهُ** উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ সাধারণ পত্র যেমন খোলা হয় ও পঠিত হয়, তেমনি পত্র আমাদের নামে আসা চাই। অতঃপর এই বাজে দাবী খণ্ডন করা হয়েছে : ] কখনই না, (এর প্রয়োজন নেই এবং এর যোগ্যতাও তাদের মধ্যে নেই। বিশেষত অনুসরণের নিয়তে এই দাবী করা হয়নি)। বরং (কারণ এই যে,) তারা পরকালকে (অর্থাৎ পরকালের আযাবকে) ভয় করে না। তাই (সত্যাবেশণ নেই। কেবল হঠকারিতাবশতই এসব দাবী করা হয়, যদি কদাচ

এসব দাবী পূরণও করা হয় তবে তার অনুসরণ করবে না। অন্য আয়াতে আছে :

**وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ** অতঃপর খণ্ডন ও শাসানোর ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে,

যখন প্রমাণিত হল যে, তোমাদের দাবী অনর্থক, তখন এটা) কখনও (হতে পারে) না; (বরং) এটাই (অর্থাৎ কোরআনই) যথেষ্ট উপদেশ, অন্য সহীফার প্রয়োজন নেই। অতএব যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা, সে জাহান্নামে যাক। আমার তাতে পরওয়া নেই। কোরআন দ্বারা কিছু কিছু মানুষের হিদায়ত হয় না ঠিক, কিন্তু এতে কোরআনের কোন ভ্রুটি নেই। কোরআন স্বস্থানে হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। (আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু কোরআন অবশ্যই উপদেশ। অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহর আনুগত্য কর। কেননা) তিনিই (অর্থাৎ তাঁর আযাবই ভয়ের যোগ্য) এবং তিনিই



(বান্দার গোনাহ) ক্রমা করার অধিকারী। (অন্য আয়াতে আছে : **إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ**  
**الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ**)

### জানুশজিক জাতব্য বিষয়

সূরা মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়াজেত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইক্‌রার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি খুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন : **زَمَلُونِي زَمَلُونِي** আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাথিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে

সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি **رَثَار** থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। **مَزْمَل** শব্দের

অর্থ এর কাছাকাছি। রাহুল মা'আনীতে জাবের ইবনে য়ায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্‌সির সূরা মুহযাশ্শিমলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই রেওয়াজেত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়াজেতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যদি সূরা মুহযাশ্শিমল এর আগে অবতীর্ণ হত, তবে হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) তা বর্ণনা করতেন বলা বাহুল্য যে, মুহযাশ্শিমল ও মুদ্দাস্‌সির শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। হতে পারে যে, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই ঘটনা হচ্ছে জিবরাঈল (আ)-কে আকাশের নীচে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখা, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে কম-পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূরা মুহযাশ্শিমল ও মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াত-সমূহ ওহীর বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে নাথিল হয়েছে। সে সম্পর্কে রেওয়াজেতসমূহের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে সূরা ইক্‌রার প্রাথমিক আয়াতসমূহ যে সর্বাগ্রে নাথিল হয়েছে, একথা সহীহ্ রেওয়াজেত দ্বারা প্রমাণিত। উভয় সূরা যদিও কাছাকাছি সময়ে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে, তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সূরা মুযাশ্শিমলের শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যক্তিগত সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে এবং সূরা মুন্দাস্‌সিরের শুরুতে দাওয়াত, তবলীগ ও জনশুদ্ধি সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

সূরা মুন্দাস্‌সিরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই : **قُمْ فَأَنْذِرْ**

অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্বাহ্বাদন পরিচয় করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন।

**أَنْذِرْ** শব্দটি **فَأَنْذِرْ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা,

যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ বিস্মৃ ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা **بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ** উপাধিতে ভূষিত হন। **نَذِيرٌ** এর অর্থ স্নেহ ও সমমমিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ক-কারী এবং **بَشِيرٌ** এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই উভয় উপাধি কোরআনের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মু'মিন মুসলমান গণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফির, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই : **وَرَبِّكَ فَكْبِرْ** অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা

করুন কথায় ও কাজে। এখানে **رَبِّ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহ আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে তাহরীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই : **ثَوْبٍ لِّبَاسٍ وَثِيَابٍ** শব্দটি **ثَوْبٍ لِّبَاسٍ** এর বহুবচন।

এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও **ثَوْبٍ لِّبَاسٍ** বলা হয়, এমনভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও **ثَوْبٍ لِّبَاسٍ** বলে ব্যক্ত করা হয়, স্বার সাক্ষা কোরআন ও আল্লাহী বাণ্য পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যত এতে কোন বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে প্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে

মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা, গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরী না করা এবং নিষিদ্ধ কাট্‌সাটে তৈরী না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং সর্বাঙ্গ-স্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহবিদগণ বলেন : নামায ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েয নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভূক্ত।—(মাযহারী)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে : **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ**

**التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**—হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

তাই মুসলমানকে সর্বাঙ্গস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্টি হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই : **وَالرَّجْزَ فَاهُجْرًا**—তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা কাতা-

দাহ্, যুহরী, ইবনে মায়দ প্রমুখ এ স্থলে **رَجْزٍ**-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়াজেতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ্। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসুলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই ঐ সবেব ধারে কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে রসুলকেই সঙ্কো-ধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসুলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ : **وَلَا تَمْنُنَ تَسْتَكْثِرُ**—অর্থাৎ বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও

প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দেবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া মিন্দনীয় ও মাকরুহ্। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষত রসুলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ : **وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ**—এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া ও-

বশে রাখা। তাই আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কামেয় রাখা, আল্লাহর

হান্নামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্ররুভিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হাহতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এ স্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিশ্চ সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্য সমীচীন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেওয়ার পর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে।

نَا قُور

অর্থ শিংগা এবং نَقْر বলে শিংগায় ফঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত দিবস সকল কাফিরের জন্যই কঠিন হবে—এ কথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুশ্চিন্তিত কাফিরের অবস্থাও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দিনি : এই কাফিরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সম্মতির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন : তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে

বলা হয়েছে : وَجَعَلْتُ لَكَ مَا لَمْ مَدْ وَا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত।

জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কোরাইশ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সে তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।—(কুরতুবী) কিন্তু এই পাণ্ডিত্য আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে আল্লাহ্‌র কলাম মেনে নেওয়া সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা বকে। সে কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে কুরতুবীতে তার ঘটনা নিশ্চরূপ বর্ণিত হয়েছে :

রসূলে করীম (সা) একদিন اَلَيْهٖ حَم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ

المصير

পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তিলা-

ওয়াত শুনে এক আল্লাহ্‌র কলাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধা হয় যে :

والله لقد سمعت منة كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لعلاوة وان عليه لعلاوة وان اعلاء لمثمر وان اسفلة

## لمفرق وانة ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر-

—“আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাদুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ চাকচিক্য। এর বাহ্যিক আবরণ হাদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।”

আরবের সর্ববৃহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কোরাইশ-দের মধ্যে জাগরণের সাদা পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফির কোরাইশ সরদাররা চিন্তান্ত্বিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল। আবু জাহল বলল : চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এখনি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

আবু জাহল ও ওলীদের কথোপকথন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সত্যতায় মতৈক্য : আবু জাহল মুখমণ্ডলে কুঞ্জিম বিষম্বলতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌঁছল (এবং ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয়)। ওলীদ বলল : ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষম্বল কেন? আবু জাহল বলল : বিষম্বল না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ, তুমি এখন বৃড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আবু বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহায্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম শুনে বাহ্বা দাও এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। [বাহাত চাঁদা করে ওলীদকে অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে আহায্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিথ্যা ছিলই]। একথা শুনে ওলীদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল : একি বললে, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের রুটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না? লাভ ও ওয়যার শপথ, আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উম্মাদ বল, একথা মিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোন পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছ কি? আবু জাহল স্বীকার করে বলল : না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বলল : তোমরা তাকে কবি বল। জিজ্ঞাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আরুত্তি করতে শুনেছ? আবু জাহল বলল : না, শুনিনি। ওলীদ বলল : তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পর্যন্ত তার কোন কথা মিথ্যা পেয়েছ কি? এর জওয়াবেও আবু জাহলকে **لا والله**

(না, আল্লাহ্‌র শপথ) বলতে হল। ওলীদ আরও বলল : তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতীন্দ্রিয়বাদীদের হয়ে থাকে? আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালরূপেই চিনি। তার

কালাম অতীশ্রিয়বাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবু জাহ্লকে لا والله বলতে হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র কোরাইশ গোত্রের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আবু জাহ্ল হার মানতে বাধ্য হল এবং উপরোক্ত কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদেরকেই সম্বোধন করে বলল : তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবু জাহ্লের দিকে চোখ তুলে তাম্বিল্য প্রকাশার্থে মুখ তেং-চাল। অবশেষে বলল : মুহাম্মদকে উম্মাদ, কবি, অতীশ্রিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে যাদুকর বলালে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি যাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে যাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও যাদুকরদের যাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। যাদুকররা তাদের স্বাদু বলে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিউ। নাউযবিলাহ্। তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ। যে-ই ঈমান আনে সে-ই তাঁর কাফির পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনার শেষাংশই কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে :

اِنَّهٗ فُكِّرُوْا قَدْرًا فَمَا كَيْفَ قَدَّرْتُمْ كَيْفَ قَدَّرْتُمْ نَظَرْتُمْ عَيْسًا  
وَبَسْرْتُمْ اَدْبُرًا وَاَسْتَكْبَرْنَا فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰرُ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ  
الْبَشْرِ-

এখানে تقدیر শব্দটি থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নব্বয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে যাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে فَقَدَّرْتُمْ كَيْفَ قَدَّرْتُمْ قَدَّرْتُمْ কয়েক বারের প্রতি পুনঃ পুনঃ অভি-সম্পাত করেছেন।

কাফিররাও মিথ্যা ভাষণে বিরত থাকত : চিন্তা করুন, সব কোরাইশ সরদারই কাফির পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ ও অশ্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফিররাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দরবারে আবু সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফিররা রসূলে করীম (সা)-এর

বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপন্নীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয়; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফির পাপিষ্ঠই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধা করাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করে।—( নাউম্বিল্লাহ )

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত : ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ তা'আলা

যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল **بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ شُرُوهَا** অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি

কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তরকে শান্ত রাখে। তাদের উপস্থিতির দ্বারা পিতা-মাতার সেবামন্ত্র ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপন্নীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রাখছে আরাম-আশ্রয়, মার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের বেতন ও অগাধ আমদানীর খবর তাদের কানে পৌঁছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে ভ্রাতৃ-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেঞ্চবর হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তার নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কোরআন বলে : **فَسُوا اللَّهَ فَاَنسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ**

**وَمَا يَعْلَمُ جُلُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ**—তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু

জাহ্নের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনেল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুন্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরাইশ কাফির বলে উঠল : হে কোরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের ফিসসা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্গ বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত, ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে আত্মব দেওয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কিস্যামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা

হয়েছে : **كَبُرَ لَهَا لِأَحَدِي الْكَبِيرِ**—শব্দটি কবরী এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে,

তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি সাক্ষাত গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানা রকম আযাব।

**لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ**—এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান

ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্য ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

**رَهِيْنَةً كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً إِلَّا أَصْحَابَ الْاٰلْمِيْنِ**—এর অর্থ এখানে

প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, ‘আস্‌হাবুল ইয়ামীন’ তথা ডানদিকের সৎ লোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহান্নামে বন্দী থাকাও অর্থ হতে পারে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে বন্দী থাকবে। কিন্তু ‘আস্‌হাবুল ইয়ামীন’ বন্দী থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা, যারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও করম সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দী থাকার কোন কারণ নেই। এই তফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত এবং দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে কোন স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা। এটা হযরত আলীর উক্তি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে : এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে—১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই সূরায় নৈকট্যশীল-গণকে ডান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু ‘আস্‌হাবুল ইয়ামীন’ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্‌হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে—একথা কোন আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তফসীর জাহান্নামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর যুক্তিসূক্ত হবে বলে মনে হয়।



فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ — এখানে هم সর্বনাম দ্বারা যেসব অপরাধীকে

বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—১. তারা নামায পড়ত না, ২. তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহ্বায দিত না অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, ৩. ভ্রাতৃ লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ ও অস্বীকারে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, ৪. তারা কিয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কিয়ামত অস্বীকার করার মত কুসূত্রী করে, তাদের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফির। কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে,

তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ বলা হয়েছে।

কাফিরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, মু'মিনের জন্য হবে : এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্য সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সংকর্মপরায়নগণ—এমনকি সাধারণ মু'মিগণও অপরের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন : পরকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, পয়গ-ম্বরগণ, শহীদগণ ও সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার লোক মুক্তি পাবে না ; অর্থাৎ যারা নামায ও যাকাত তরক করে, কাফিরদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় শরীক থাকে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বেনামাযী ও যাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবুল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়াজে থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় যে, যারা কিয়ামত অস্বীকার সহ উপরোক্ত চারটি অপরাধ করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবুল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার ব্যতীত আল্লাদা আল্লাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাস্তি জরুরী নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোনাহগার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রসূলগণের শাফা'আত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউযে কাওসারের অভিত্ত অস্বীকার করে, সুপারিশ এবং হাউযে কাওসারে তার কোন অংশ নেই।

تَذْكَرَةٌ — এখানে تَذْكَرَةٌ তথা উপদেশ বলে কোর-

আন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, রহমত, গম্ব, সওয়াব ও আযাবের অধিতীয় স্মারক। শেষে বলা

হয়েছে **لَا أَنۡتَ تَدۡرِكُهُ**—অর্থাৎ নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে  
 রেখেছ। **قَسُورَةٌ** এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরাম  
 থেকে উদ্ভূত অর্থ বর্ণিত আছে।

**هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ**—আল্লাহ তা'আলা **أَهْلُ التَّقْوَىٰ** এই অর্থে যে,

একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার স্রোত। **أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ**  
 হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় বড় অপরাধী ও গোনাহ্‌গারের অপরাধ ও গোনাহ্‌ যখন  
 ইচ্ছা ক্রমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ أَيَحْسَبُ  
 الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانَهُ ۖ  
 بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۖ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ فَإِذَا بَرِقَ  
 الْبَصْرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ يَقُولُ الْإِنْسَانُ  
 يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُغُ ۖ كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۖ  
 يُكْتَبُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۖ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ  
 بَصِيرَةٌ ۖ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۖ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَهْجَلَ بِهِ ۖ إِنْ  
 عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ۖ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا  
 بَيَانَهُ ۖ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذُودُونَ الْآخِرَةَ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ  
 نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ  
 أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  
 رَاقٍ ۖ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ وَالتَّتَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۖ إِلَىٰ  
 رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ۖ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ  
 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَقُولُ ۖ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۖ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۖ أَيَحْسَبُ

الْإِنْسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّتْ أَلْمَرْيَكَ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُثْنَى ۖ ثُمَّ كَانَ  
عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوًى ۖ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۗ  
الَّذِينَ ذَلِكَ بِقُدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنَ أَلْمَوْتَى ۗ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে খিয়ার দেয়—(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (৪) পরন্তু আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও খুশীভূত করতে চায়, (৬) সে প্রসন্ন করে—কিয়ামত দিবস হবে? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—(১০) সেই দিন মানুষ বলবে: পলায়নের জায়গা কোথায়? (১১) না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন তাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ৰমান, (১৫) যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি শ্রুত ওহী আহ্বিত করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ডালা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রাণ কঠাগত হবে (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের রূপ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি; (৩২) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দন্ততরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? (৩৭) সে কি স্থলিত বীর্য ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয় (অর্থাৎ সৎ কাজ করে বলে : আমি কি করেছি। আমার কাজে আন্তরিকতা ছিল না, এতে অমুক দোষ ছিল। আর যদি গোনাহ হয়ে যায়, তবে খুব অনুতাপ করে।— (দূররে মনসূর) এই অর্থের দিক দিয়ে নফসে মৃতমান্নিমা তথা প্রশান্ত মনও এতে দাখিল আছে। শপথের জওয়াব উহা আছে, অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। উভয় শপথ স্থানোপযোগী। কেননা, কিয়ামত হচ্ছে পুনরুত্থানের স্থান। আর ধিক্কারকারী মন কার্যত কিয়ামত বিশ্বাস করে। অতঃপর যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তাদেরকে খণ্ডন করা হয়েছে : ) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না ? (এখানে মানুষ মানে কাফির। অস্থিই দেহের আসল খুঁটি, তাই বিশেষভাবে অস্থির কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আমি অবশ্যই একত্রিত করব এবং এই একত্রিত করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কেননা ) আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সম্মিলিত করতে সক্ষম। (দুই কারণে অংগুলী উল্লেখ করা হয়েছে : এক, অংগুলী দেহের অংশ এবং প্রত্যেক বস্তু তার অংশ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের বাক-পদ্ধতিতেও এরূপ স্থলে বলা হয় : আমার অংগে অংগে ব্যথা; অর্থাৎ সমস্ত দেহে ব্যথা। দুই, অংগুলী ছোট হলেও তাতে শিল্প নৈপুণ্য অধিক এবং স্বভাবত কঠিন। সুতরাং যে একে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হবে, সে সহজ কাজ আরও বেশী পারবে। কিন্তু কতক লোক আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। বরং মানুষ (কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে) ভবিষ্যৎ জীবনেও (নিবিবাদে) পাপাচার করতে চায়। তাই (অস্বীকারের হলে) সে প্রবল করে কিয়ামত দিবস কবে ? (অর্থাৎ সে সারা জীবন গোনাহ ও কুপ্রবৃত্তিতে অতিবাহিত করবে বলে স্থির করে নিয়েছে। তাই সে সত্যাত্মবোধের চিন্তাই করে না যে, কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করবে। ফলে উপর্যুপরি অস্বীকারই করে)। অতএব যখন (বিষ্ময়াতিশয্যে) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, (এই বিষ্ময়ের কারণ হবে এই যে, যেসব বিষয়কে সে মিথ্যা মনে করত, সেগুলো হঠাৎ চোখের সামনে মর্তমান হয়ে দেখা দেবে)। এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে ( শুধু চন্দ্রই কেন, বরং সূর্য ও চন্দ্র (উভয়ই) এক রকম (অর্থাৎ জ্যোতিহীন) হয়ে যাবে, (চন্দ্রকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, চান্দ হিসাব রাখার কারণে আরবরা এর অবস্থা অধিক গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করত)। সেদিন মানুষ বলবে : এখন পলায়নের জায়গা কোথায় ? (ইরশাদ হচ্ছে : ) কখনই (পলায়ন সম্ভবপর) নয়। (কেননা) কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছেই তাঁই হবে। (এরপর হয় জাহাতে যাবে, না হয় জাহান্নামে। পালনকর্তার সামনে যাওয়ার পর) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অগ্র প্রেরণ করেছে এবং যা পশ্চাতে রেখেছে। (মানুষের নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবহিত করার উপরই নির্ভরশীল নয়) বরং মানুষ নিজেই নিজের কর্ম সম্পর্কে (আপনা আপনি জাজ্জল্যমান হওয়ার কারণে) চক্ষুমান হবে যদিও (স্বভাবদোষে তখনও) তার অজ্জহাত (বাহানা) পেশ করতে চাইবে। (কাফিররা বলবে : وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ—কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা মিথ্যাবাদী।

অতএব অবহিত করার জন্য অবহিত করা হবে না।, বরং হ'শিয়ান ও নিরুদ্ভব করার জন্য

হবে)। হে পয়গম্বর, ( **بَلِ الْإِنْسَانِ وَ يَنْبُؤ** থেকে দুটি বিষয় জানা যায়—এক.

আল্লাহ তা'আলা সব বিষয় সম্পর্কে পরিভ্রাত। দুই. আল্লাহ তা'আলা উপযোগিতার তাগিদে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জান মানুষের চিন্তায় উপস্থিত করে দেন যদিও তা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত হয়। কিয়ামতের দিন এরা প করা হবে। সুতরাং আপনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কিছু বিষয়বস্তু ভুলে যাবেন—এই আশংকায় এত কষ্ট কেন স্বীকার করবেন যে, একাধারে ওহীও শুনবেন, তা পাঠও করবেন এবং লক্ষ্যও রাখবেন, যেমন এ পর্যন্ত এই কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন। কেননা, আমি যখন আপনাকে পয়গম্বর করেছি এবং আপনাকে তবলীগের দায়িত্ব দিয়েছি, তখন উপযোগিতার তাগিদ এটাই যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়বস্তু আপনার চিন্তায় উপস্থিত রাখতে হবে। আমি যে এই উপস্থিত রাখতে সক্ষম, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, এখন থেকে আপনি আর এ কষ্ট স্বীকার করবেন না এবং যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন) আপনি ( ওহী শেষ হওয়ার পূর্বে ) দ্রুত কোরআন আরজি করবেন না, যাতে আপনি তা তাড়াতাড়ি শিখে নেন। ( কেননা ) আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং ( আপনার মুখে ) তা পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি ( অর্থাৎ আমার ফেরেশতা পাঠ করে ) তখন আপনি ( সর্বাঙ্গকরণে ) সেই পাঠের অনুসরণ করুন ( অর্থাৎ সেদিকেই মনোনিবেশ করুন এবং আরজিতে মশগুল হবেন না। অন্য আয়াতে আছে :

( **وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ** ) অতঃপর ( আপনার

মুখে মানুষের সামনে ) এর বিশদ বর্ণনাও আমার দায়িত্ব। ( অর্থাৎ আপনাকে মুখস্থ করানো, আপনার মুখে উচ্চারিত করা এবং তবলীগের সময়েও মনে রাখা ও মানুষের সামনে পাঠ করিয়ে দেওয়া, এসব আমার দায়িত্ব। এই বিষয়বস্তু প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হল। অতঃপর আবার কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে —) অবিশ্বাসীরা, ( কিয়ামতে অবশ্যই মানুষকে অপ্রপশ্চাতের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তোমরা তো মনে কর কিয়ামত হবে না, ) কখনও এরা প নয়। ( তোমাদের কাছে এর না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই )। বরং তোমরা পৃথিবী জীবনকে ভালবাস এবং ( এতে মগ্ন হয়ে ) পরকালকে ( গাফেল হয়ে ) উপেক্ষা কর। ( সুতরাং যার ভিত্তিতে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার কর, তা ভ্রান্ত। অতএব, কিয়ামত হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে, যার বিবরণ এই : ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উঁদার হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। ( অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অতঃপর লাসানো হচ্ছে যে, তোমরা যে পৃথিবী জীবনকে প্রিয় এবং পরকালকে বর্জনীয় মনে করছ, ) কখনও এরা প নয়। ( কেননা, দুনিয়ার সাথে একদিন বিচ্ছেদ হবেই এবং সবশেষে পরকালে যেতে হবে )। যখন প্রাপ কঠাগত হয় এবং ( খুব পরিতাপ সহকারে ) বলা হয় ( অর্থাৎ শুভ্রা-কারী বলে : ) কোন ঝাড়ফুককারী আছে কি? ( উদ্দেশ্য যে কোন চিকিৎসক। আরবে

কাড়কুঁকের প্রচলন বেশী ছিল বলে ﴿قُل﴾ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) এবং তখন সে (মরণো-  
 মুখ ব্যক্তি) বিশ্বাস করে যে, (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের রূপ এসে গেছে। এবং (তীব্র  
 মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে) গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার  
 চিহ্ন স্মৃষ্টি উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোছার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়) সেদিন তোমার  
 পালনকর্তার নিকট নীত হবে। (এমতাবস্থায় দুনিয়াপ্রীতি ও পরকাল বর্জন খুবই মুর্থতা।  
 আল্লাহর কাছে পৌঁছার পর যদি সে কাফির হয়, তবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে।  
 কেননা,) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাম পড়েনি, কিন্তু (আল্লাহ ও রসূলকে) মিথ্যারোপ  
 করেছে এবং (বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (তদুপরি সত্যের প্রতি আহ্বান-  
 কারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তজ্ঞনা) দস্তভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে।  
 (উদ্দেশ্য এই যে, কুফর এবং অবাধ্যতা করে তজ্ঞনা অনুতাপও করেনি, বরং উল্টা গর্ব  
 করত এবং চাকর-নওকর ও পরিবার-পরিজনের কাছে যেয়ে আরও বেশী অহংকারী হয়ে  
 যেত। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবেঃ) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ (আবার শোন)  
 তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (এক বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় অধিক পরিমাণ জানা  
 গেল এবং বহু বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় গুণের আধিক্য জানা গেল। মানুষের আদিষ্ট হওয়া  
 ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উপর উপরোক্ত প্রতিদান নির্ভরশীল। তাই অতঃপর এই দুটি  
 বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে)। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?  
 (বিধানাবলী আরোপ করা হবে না এবং তার হিসাব নিকাশও হবে না? বরং উভয় বিষয়  
 নিশ্চিত। পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করাও তার নিবৃদ্ধিতা)। সে কি (প্রথমে নিছক  
 মায়ের গর্ভাশয়ে) স্খলিত বীর ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ  
 তাকে (মানবরূপে) সৃষ্টি করেছেন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে  
 সৃষ্টি করেছেন মূগল—নর ও নারী। (অতএব, যে আল্লাহ প্রথমে স্বীয় কুদরত দ্বারা এসব  
 করেছেন,) সেই আল্লাহ কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (অথচ পুনরায় সৃষ্টি  
 করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর)।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

لا ابصيا لا —এখানে لَا أَتَسْمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَتَسْمُ بِالنَّفْسِ الْوَامَةِ

অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতি-  
 রিক্ত ﴿ل﴾ ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের  
 ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না' এরপর স্বীয়  
 উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হাশিমার ও তাদের  
 সন্দেহ-সংশয়ের জঞ্জাল দান করা হয়েছে। প্রথমে কিয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা'  
 তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা হয়েছে। শপথের জঞ্জাল স্থানের  
 ইঙ্গিতে উহ্য আছে; অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যস্বাবী। কিয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী

হয়েছে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এমনভাবে নফসে-লাওয়ামার শপথও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। 'নফস' শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সূরিসিহত। **لَوْمَ** শব্দটি **لَوْمَ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও তিরস্কার দেওয়া। 'নফসে-লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে তিরস্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ভুলটির কারণে নিজেকে ভৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎ কর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কাফিল মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ভুলটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎ কাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎ কাজ করতে পারত। সে বেশী সৎ কাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (র) নফসে লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফসে-মু'মিনা।' তিনি বলেছেন : আল্লাহর কসম, মু'মিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে তিরস্কারই দেয়। সৎ কর্ম-সমূহেও সে আল্লাহর শানের মুকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও ভুলি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহর হুক পূরাপূরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ভুলি থাকে এবং তজ্জন্য নিজেকে তিরস্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বসরী (র) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নফসে লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সন্ত্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেকে কাজ কর্ম হিসাব করে ভুলটির জন্য অনুতপ্ত হয় ও নিজেকে তিরস্কার করে।

নফসে লাওয়ামার এই তফসীরে 'নফসে মুতমায়িনাও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফসে মুতাকীরই' উপাধি।

নফসে আশ্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িনা : সূফী বুয়ুর্গগণ বলেন : নফস মজ্জাগত

ও স্বভাবগতভাবে **مَارَةً بِالْحَسْوَةِ** হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত

হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ইমান, সৎ কর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ভুলটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎ কর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকটা লাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়ত-বিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িনা উপাধি প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রসঙ্গ জওলাব আছে। প্রশ্ন এই যে,



মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।  
এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্র করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জওয়াবে বলা

হয়েছে : **بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ** — এর সার্বমর্ম এই যে,

চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন অস্থিসমূহকে একত্র করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা  
বিস্মিত হচ্ছ : অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও রখিত  
প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব,  
যে ক্ষমতামালী সত্তা প্রথমবার সারা বিশ্বে বিচ্ছিন্ন কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে  
একত্র করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে?  
তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আস্থা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে  
তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুত্থানে কুদরতের আত্মবলীর কর্ম : চিন্তার বিষয় এটা যে, একজন মানুষ  
যে দেহাবয়ব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আল্লাহর কুদরত পুনর্বারও তার  
অস্তিত্বে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত করে দেবেন। অথচ সৃষ্টির  
আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কত বিচিত্র আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ  
করেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কার সাধ্য যে, তাদের সবার আকার-আকৃতি ও দৈহিক  
গঠনের গুণাগুণ আলাদা আলাদাভাবে স্মরণও রাখতে পারে—পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করা  
তো দুরের কথা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, আমি কেবল মৃত ব্যক্তির  
বড় ও প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ববৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম নই বরং মানব অস্তিত্বের  
ক্ষুদ্রতম অঙ্গকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আয়াতে বিশেষভাবে অংগুলীর  
অগ্রভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই মানুষের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ। এই ছোট অঙ্গের পুনঃ সৃষ্টি-  
তেই যখন কোন পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বড় বড় অঙ্গের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও  
ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করার জন্য  
তার সর্বত্রই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সে আলাদাভাবে পরিচিত হয়।  
বিশেষত মানুষের যে মুখমণ্ডল করায়ক বর্গ ইফির বেশী নয়, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা  
এমন সব স্বাতন্ত্র্য রেখেছেন, যার ফলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমণ্ডল অপরের  
সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায় না। মানুষের জিহ্বা ও কঠনালী সম্পূর্ণ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও  
পরস্পরে স্বতন্ত্র। ফলে, বালক, বৃদ্ধ এবং নারী ও পুরুষের কঠনর আলাদা-আলাদাভাবে  
চিনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কঠনর পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। আরও বেশী বিস্ময়কর  
বস্তু হচ্ছে মানুষের বুদ্ধাজলি ও অংগুলীর অগ্রভাগ। এগুলোর উপর যে সব রেখা ও কারুকার্যের  
জাল বিস্তৃত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ মাত্র অর্ধ ইঞ্চি পরিমিত  
মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি  
যুগে বুদ্ধাজলির টিপকে একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বস্তুরূপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের  
ফয়সালা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এটা কেবল বুদ্ধাজলিরই  
বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক অংগুলীর অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে স্বতন্ত্র।

একথা যুঝে নেওয়ার পর বিশেষভাবে অংশুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার কারণ আপনা-আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এই মানুষ পুনরায় কিরূপে জীবিত হবে। আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের সৃষ্টিতে তার স্বচ্ছানুলি ও অঙ্গুলীসমূহের রেখা যেভাবে ছিল, পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রূপই থাকবে।

لَهْفَجِرَ أَمَّا مَ—<sup>١٨</sup> শব্দের অর্থ সন্দেহ ও ভবিষ্যত। আম্মাতের অর্থ এই

যে, কাফির ও গাফিল মানুষ আল্লাহ তা'আলার কৃদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অন্ততপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শিরক, অস্বীকার ও মিথ্যারূপে অটল থাকতে চায়।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ وَخَفَّتِ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—<sup>١٩</sup> এখানে কিয়াম-

মতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। بَرِقَ অর্থ চক্কুতে ধাঁধা লেগে গেলে এবং দেখতে পারল না। কিয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্কু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। خَفَّتِ শব্দটি خُصُوفُ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে

না বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্র করা হবে এবং উভয়েই জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত হবে। কোন কোন রেওয়াজে তাই বর্ণিত আছে।

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ—<sup>٢٠</sup> অর্থাৎ মানুষকে সে দিন অবহিত

করা হবে, যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎ কাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে)। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন : مَا قَدَّمَ বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং مَا أَخَّرَ বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মূল্য কয়তে পারত কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بصيرة و بصير—بَلِ الْأَنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

এর অর্থ চক্ষুমান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে :

بَصِيرَةٌ بِمَا تَرَىٰ—এখানে بصيرة শব্দটি بصائر من ربكم

অর্থ প্রমাণ। معذار শব্দটি ওহর অর্থে معذار এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই

যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ-

অসৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে : وَوَجَدُوا مَا مَعَلُوا حَافِرًا

অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بصير- এর অর্থ, প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই-নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অস-প্রত্যক্ষ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ভুলি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ভাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

বাক্যের অর্থ তাই।

এ পর্যন্ত কিয়ামতের পরিস্থিতি ও উন্মত্ততা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরীঈল (জা) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুল্লাহ (সা) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। এক. কোথাও এক শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। দুই. কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরীঈল (জা) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সা) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে শ্রুত আয়ত্তি করতেন, যাতে বাকবাকর পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে অল্লাহ তা'আলা কোরআন বিভক্ত পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হ-বহ তা পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে শ্রুত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না।

أَنْ لَا تُعْرَبَ بِهَا لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهَا

مَلَيْنَا جَمْعًا وَقُرْآنًا অর্থাৎ আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দক্ষিণ। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে : قَا زَا قُرْآنًا ۙ فَآ قَاتَهُمُ قُرْآنًا ۙ—এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না বরং চুপ করে শোনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ প্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত না করার একটি প্রমাণ : সহীহ হাদীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামাযে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুকু করে, তখন সব মুক্তাদী রুকু করবে এবং যখন সিজদা করে তখন সবাই সিজদা করবে। মুসলিমের রেওয়াজেতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে— যখন ইমাম কিরাআত করে, তখন তোমরা চুপ করে প্রবণ কর। ا زَا قُرْآ فَا نَصْتُوا

এ থেকেও স্বেচ্ছা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। রুকু ও সিজদার ইমামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে রুকু ও সিজদা আদায় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিরাআত করা কিরাআতের অনুসরণ নয় বরং কিরাআতের অনুসরণ এই যে, ইমাম যখন কিরাআত করবে, তখন তোমরা চুপ করে শুনবে। ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরাআত করা উচিত নয়—এই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও অপর কয়েকজন ইমামের এটাই দলীল।

অবশেষে বলা হয়েছে : ا نَّ مَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন

না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা সুস্থিরে দেওয়াও আমার দক্ষিণ, আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কোরআন ও তার ভিত্তি ও সঙ্গিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ামতের পরিস্থিতি ও তদ্ব্যবহারই অবশিষ্ট আয়োচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রর হয় যে, এই চার আয়াতের পূর্বপর সম্পর্ক কি? তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আলাহ স্বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এমনকি, তার অংশুকার অপ্রভাগ এবং তাতে অংকিত রেখা ও চিহ্নসমূহকেও হুবহু পূর্বের ন্যায় করে দেবেন। এতে কেশপ্র পরিমাপ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আলাহ তাআলার জান ও অসীম হয় এবং তথ্যাবলী সংরক্ষণের পদ্ধতিও অধিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রসুল্লাহ (সা)-কে এই চার আয়াতে সান্দ্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ভুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনার ভুল করারও আশংকা আছে কিন্তু আলাহ তাআলা এসব বিষয়ের উর্ধে। এসব বিষয়ের দক্ষিণ তিনি নিজেই প্রহণ করেছেন। তাই আপনি

কোরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وَجُودًا يُؤْمِنُ بِمَا نَزَرْنَا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً—অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-

খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জাম্মাতীগণ চর্মচক্রে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাতাতের সকল আজিম ও ফিক্‌হবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারিজী সম্প্রদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের কারণে দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্রে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জমাতাতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আল্লাহর দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোন দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জাম্মাতীগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সন্তোহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।—(মায়হারী)

لَا إِذَا بَطَغَتِ التُّرَاتِي وَتَهَلَّ مِنْ رَأْنٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ—দুর্বলতা আম্মাত-

সমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জাম্মাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আম্মাতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আম্মাতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কঠিনালীতে এসে ঠেকে। শুভ্রাফারীরা চিকিৎসার ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে মাওয়ার সম্বর। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের

চেষ্টা করা। وَالتَّتَفُّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা।

গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা উপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : এখানে দুই গোছা বলে দুই অঙ্গ—ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আম্মাতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং

পরকালের প্রথম দিনের সন্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় প্রেক্ষভাব থাকবে।

এর— **وَيْلٌ لَّكَ فَالْوَالِي** — **أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى**

অপন্নং। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধনসম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্য এখানে চারবার **وَيْلٌ** তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই ভোমার প্রাপ্য।

**أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَهْدِيَ الْمَوْتَىٰ**—অর্থাৎ জীবন মৃত্যুও

সারা বিশ্ব যে সত্তার কর্তৃত্বগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন? রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কিয়ামতের এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত

**بَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ**—অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং

**أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْعَاكِمِينَ**। সূরা ফীনের শেষ আয়াত

পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা

হয়েছে : যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের **نَبَأِي خَدِيبٌ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ** আয়াত পাঠ

করে তার বলা উচিত **أَمَّا بِاللَّهِ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝  
 إِذْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ وَنَسَّيْنَاهُ فِجْعَانًا سَمِيعًا  
 بَصِيرًا ۝ إِذْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِذْ آغْرَقْنَا  
 لُكْفُرِينَ سَالِسِلًا وَأَغْلَقْنَا أَسْعَدِيًّا ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ  
 كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا  
 ۝ يُوقُونَ بِاللَّيْلِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ وَ  
 يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا  
 نُطْعِمُكُمْ لُوحَهُ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ إِذْ نَخَّافُ  
 مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝ فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ  
 وَلَقَّهْمُ نَصْرًا وَسُرُورًا ۝ وَجَزَّهْمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝  
 مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ، لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا  
 ۝ وَوَدَّيْنِيَّةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قَطُوفُهَا تَذَلِيلًا ۝ وَيُطَافُ  
 عَلَيْهِمْ بِأَيِّتِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا  
 مِنْ فِضَّةٍ قَدْرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

تَجِيلاً ۝ عَمَّا فِيهَا سَتِي سَلْسِبِيلاً ۝ وَيَطْوِي عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ  
 مُخَلَّدُونَ ۝ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْ لَوْ أَمْتَنُورًا ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ  
 ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ  
 وَاسْتَبْرَقٌ رَوْحَلُوهَا أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝  
 إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ۝ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا  
 عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ  
 آيْمًا أَوْ كُفُورًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ الْيَلِ  
 فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ ۝ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ  
 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۝ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝ إِنَّ  
 هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَمَا  
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝  
 يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ  
 عَذَابًا أَلِيمًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে—এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি প্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিভাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রকলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই সৎ কর্ম-শীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা ব্যরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ



পান করবে—তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মায়ত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে উন্নত করে, যেদিনের অনিশ্চয় হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবপ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহ্বায়ে দান করে। (৯) তারা বলে : কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আহ্বায়ে তোমাদেরকে আহ্বায়ে দান করি এবং তোমাদের কাছে ঋণের প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ উন্নতকর দিনের উন্নত রাখি। (১১) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের অনিশ্চয় থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও জানন্দ। (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জামাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার হুকুমদ্বারা তাদের উপর যুঁকি থাকবে এবং তার কলসসমূহ তাদের আয়ত্বাধীন রাখা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্র (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'হানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জামাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে মোরাকেরা রাখবে চির কিশোররূপ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিকীর্ণত মগ্নিমুক্ত। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামত-রাহি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নিমিত্ত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহরা'। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আপনাদের প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাখিল করেছি। (২৪) অতএব আপনি আপনাদের পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের অনুসন্ধান করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (২৬) রাহির কিছু অংশে তার উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাহির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পাখির জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক জানব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহর অভিপ্ৰায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্যকোন অভিপ্ৰায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বত্ত্ব, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা করুক রহমতে দাখিল করেন। আর আলিমদের জন্য তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মসুদ শাস্তি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে মানুষ ছিল না—বীর্য ছিল, এর আগে খাদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুষ্টয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ

নব্ব ও নারী উভয়ের বীর্ষ থেকে। কেননা, নারীর বীর্ষও ভিতরে ভিতরে তার গর্ভাশয়ে স্থলিত হয়। এরপর কখনও গর্ভাশয়ের স্রুশ দিয়ে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কখনও ভিতরে থেকে যায়। মিশ্র বীর্ষের আনেক অর্থ এই যে, এই বীর্ষ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছি) এভাবে যে, তাকে আদিষ্ট করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে প্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন (সমঝদার) কল্পে দিয়েছি। (বাকপদ্ধতিতে সমঝদার বুদ্ধিমার্ককেই বিশেষভাবে শ্রোতা ও চক্ষুমান বলা হয়। তাই আদিষ্ট হওয়ার যে ভিত্তি সমঝদার হওয়া, তা এখানে উল্লিখিত না হলেও বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে আদিষ্ট হওয়ার গুণাবলীসহ সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার সময় আসল, তখন আমি তাকে (ভালমন্দ ভ্রাত করে) পথনির্দেশ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে বলেছি। অতঃপর) হয় সে কৃতজ্ঞ (ও মু'মিন) হয়েছে, না হয় অকৃতজ্ঞ (ও কাফির) হয়েছে অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিলাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মু'মিন হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাফির হয়েছে। অতঃপর উভয় দলের প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে : আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ী ও লেজিহান অগ্নি। (আর) যারা সৎকর্মশীল তারা এমন পানপাত্র (অর্থাৎ পানপাত্র থেকে শরাব) পান করবে যার মিশ্রণ হবে কাফুর অথবা এমন ঝরনা থেকে (পান করবে) যা থেকে আল্লাহর বিশেষ বাস্পাণ পান করবে এবং যাকে (তারা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে। (জান্নাতের ঝরনাসমূহ জান্নাতীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কারামত। দুপুরে মনসুয়ে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের হাতে স্বর্ণের ছড়ি থাকবে। তারা এসব ছড়ি দ্বারা যে দিকে ইশারা করবে, সে দিকে ঝরনা প্রবাহিত হবে। জান্নাতের কাফুর শুভ্রতা, শীতলতা, চিত্তবিনোদন ও বলবীর্ষ বর্ধনে অতুলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করার জন্য কতক উপযুক্ত বস্তু মিশ্রিত করার নিয়ম আছে। সে মতে জান্নাতের শরাবে কাফুর মিশ্রিত করা হবে। নৈকট্যশীল বাস্পাদের জন্য নির্দিষ্ট ঝরনা থেকে শরাবের পাত্র পূর্ণ করা হবে। অতঃপর এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই স্বাভাবিক। এতে করে সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও জোরদার হয়ে যায়। যদি **إبرار و عباد الله** বলে একই শ্রেণীর লোক বোঝানো হয়ে থাকে, তবে দুই জায়গায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক জায়গায় মিশ্রণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় জায়গায় তার আধিক্য ও আয়ত্বাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা বিলাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়ত্বাধীন হওয়া ভোগ-বিলাসের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলা। অতঃপর সৎকর্মশীলদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে : ) তারা মানিত পূর্ণ করে (আন্তরিকতা সহকারে, কেননা) তারা এমন দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা হবে ব্যাপক। (অর্থাৎ কমবেশী সবাই এই কঠোরতার আওতায় পড়বে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। তার এমন আন্তরিক যে, আর্থিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ আন্তরিকতা কম থাকে—তারা আন্তরিক। সেমতে) তারা আল্লাহর প্রেমে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে আহ্বাষ মান করে। (বন্দী মজলুম হলে তার সাহায্য করা যে শুভ কাজ, তা বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে-অপরাধ করে বন্দী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য

সেওলাও শুভকাজ। তারা-আহার্য দিনে মুখে অথবা অন্তরে বলেঃ) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য সেই এবং তোমাদের কাছে কোন (কার্যত) প্রতিদান ও (মৌখিক) কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (কেননা) আমরা তোমাদের পালনকর্তার তরুফ থেকে এক ভয়ংকর ও ভিত্ত দিনের আশংকা রাখি। (তাই আশা করি যে, এসব আন্তরিক কর্মের বসৌলতে সেদিনের ভিত্ততা ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকব। এ থেকে জানা গেল যে, পরকালের ভয়ে কোন কাজ করা আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার পরিপন্থী নয়।) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে (এই আনুগত্য ও আন্তরিকতার বরকতে) সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (অর্থাৎ মুখ-মুণ্ডলে সজীবতা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন) এবং তাদের দৃঢ়তার প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন আমানত ও রেশমী পোশাক। তারা তথায় (অর্থাৎ জামাতে) আরামকেন্দারায় (আরামে ও সম্মানে) হেলান দিয়ে বসবে। তারা তথায় রৌদ্রক্ಷয় ও শৈত্য অনুভব করবে না (বরং আনন্দদায়ক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হবে)। সেখানকার (অর্থাৎ জামাতের) বুদ্ধ-ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে (অর্থাৎ নিকটে থাকবে)। ছায়া অন্যতর বিলাস উপকরণ। জামাতে চন্দ্র-সূর্য নেই। সত্যএর, ছায়ার মানে কি? জওয়াব এই যে, সম্ভবত জন্যান্য জ্যোতির্ময় বস্তু নিচয়ের আলোকেই ছায়া বলা হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন সাধন করাই বোধ কর ছায়ার উপকারিতা। কেননা, এক অবস্থা যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, অবশেষে তা থেকে মন ভরে যায়। এবং জামাতের ফলমূল তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (কলে সর্বকণ সর্বভাবে অনায়াসে তা গ্রহণ করতে পারবে) তাদের কাছে (পানাহারের বস্তু পৌছানোর জন্য) রূপার পাত্র পরিবেশন করা হবে এবং স্ফটিকের পানপাত্র। এটা হবে রূপার স্ফটিক—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (অর্থাৎ এমন পরিমাপ করে ভর্তি করা হবে যে, অভূপ্তি না থাকে এবং উত্তম ও না হয়। কারণ, উত্তমের মধ্যেই বিতৃষ্ণা রয়েছে। রূপার স্ফটিকের অর্থ এই যে, রূপার মত শুভ্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। পাথির রূপা স্বচ্ছ নয় এবং স্ফটিক শুভ্র নয়। সুতরাং এটা এক অভূতপূর্ব বস্তু হবে। তথায় তাদেরকে (উল্লিখিত কাফুর মিশ্রিত শরাব ব্যতীত অন্যও) এমন পাত্র-পান পান করানো হবে, যাতে যানজাবীদের মিশ্রণ থাকবে। (উত্তমের সৃষ্টি ও মুখের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য শরাবে এর মিশ্রণ করারও নিয়ম আছে। অর্থাৎ) এমন বরনা থেকে (তাদেরকে পান করানো হবে) যার নাম (সেখানে) সাজসাবীল (প্রসিদ্ধ) হবে। (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত বরনার শরাবে কাফুরের এবং এই জামাতে বর্ণিত বরনার শরাবে যানজাবীদের মিশ্রণ থাকবে। এর সহস্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। তাদের কাছে (এসব বস্তু নিয়ে) চির-কিশোর বালকরা ঘোরাকেরা করবে (তারা এমন সূত্রী যে) হে পাঠক, তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্লিপ্ত মগ্নমুগ্ন। (পরিষ্কৃততা ও চাকচিক্যে তাদেরকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং চলাকেরা দিক-দিকে বিক্লিপ্ত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উচ্চস্তরের তুলনা। কেবল উল্লিখিত বিলাস-সামগ্রীই নয় বরং সেখানে আরও সর্বপ্রকার বিলাস-দ্রব্য এত অধিক ও উচ্চমানের থাকবে যে) হে পাঠক, যদি তুমি সেই স্থানটি দেখ, তবে তুমি অগাধ নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে। তাদের (অর্থাৎ জামাতীদের) আন্তরণ হবে-চিকন সবুজ রেশমী বস্ত্র ও

মোটী রেশমী বস্ত্র। (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে পৃথক আনন্দ রয়েছে)। তাদেরকে পরিষ্কার করানো হবে রৌপ্য নিষ্পিত কাপড়। (এই সূরার তিন জায়গায় রূপার আসবাব-পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে স্বর্ণের আসবাবপত্রের বর্ণনা আছে। কিন্তু উজ্জ্বলের মধ্যে কোন বৈপর্নীয়তা নেই। কেননা, উজ্জ্বল প্রকার আসবাবপত্র থাকবে। এর রহস্য বিলাসব্যাসনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার প্রতি নব্বয় রাখা। পুরুষের জন্য অলংকার দৃশ্যীয় বলে প্রয়োগটা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দৃশ্যীয়, পরকালেও তা দৃশ্যীয় হবে—এটা জরুরী নয়)। তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যে শরাব পান করতে দিবেন; তা দুনিয়ার শরাবের ন্যায় অপবিত্র, বিবেকবুদ্ধি বিজ্ঞাপকারী ও নেশায়ুক্ত হবে না বরং আল্লাহ তা'আলা) তাদেরকে শরাবান-তহরা (পবিত্র শরাব) পান করাবেন। এতে নাপাকী ও ময়লা থাকবে

না, যেমন অন্য আয়াতে আছে : <sup>لَا يَذُوقُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ</sup> সূরার তিন জায়গায়

শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জায়গায়

<sup>يَشْرَبُونَ</sup> দ্বিতীয় জায়গায় <sup>يَسْقَوْنَ</sup> এবং তৃতীয় জায়গায় <sup>سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ</sup> শব্দ

ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম জায়গায় সাধারণভাবে পান, দ্বিতীয় জায়গায় সম্মানে পান এবং তৃতীয় জায়গায় চূড়ান্ত সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সূতরাং একই বিষয়-বস্তুর বারবার উল্লেখ হয়নি। এসব নিরাময় দিলে আত্মিক সুখ বৃদ্ধি করার জন্য জায়াতী-গণকে বলা হবে : এটা তোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে কৃত) তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ (স)-কে সাম্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, শত্রুদের শাস্তি আপনি শুনলেন। অতএব, এ শত্রুতা ও বিরোধিতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং ইবাদত ও প্রার্থনার কার্যে মশগুল থাকুন। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি অন্তরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই :] আমি আপনার প্রতি অল্প অল্প করে কোরআন নাখিল করেছি (যাতে অল্প অল্প করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপকৃত হতে

পারে, যেমন সূরা ইসরার শেষে বলা হয়েছে : <sup>وَقَرَأْنَا فَرَقَانًا</sup> ) অতএব আপনি

আপনাদের পালনকর্তার (তবলীগসহ) আদেশের উপর অটল থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। [অর্থাৎ তারা যে তবলীগ করতে নিষেধ করে, তা মানবেন না। এখানে উদ্দেশ্য গুরুত্ব প্রকাশ করা। নতুবা রসূলুল্লাহ (স) তাদের কথা মেনে চলবেন—এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন (অর্থাৎ ফরয নামায পড়ুন) এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ুন। অতঃপর সাম্বনাদানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাফিরদের নিন্দাও রয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের বিরোধিতার আসল কারণ এই যে) তারা পাখি জীবনকে ভাঙবাসে এবং উবিষ্যতে আগমনকারী এক কতিন দিবসকে পলচ্যে একলে রাখে। (সূতরাং দুনিয়াপ্রীতি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা সত্যের

দূষণ হয়ে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসম্ভাব্যতা নিরাসন করার জন্য বলা হয়েছেঃ) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (অতএব, উত্তম বিশ্বয় থেকে আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় বিশ্বয়বস্তুর নির্ধারিত বর্ণনা করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (এরূপ সন্দেহ করা উচিত নয় যে কেউ কেউ তো কোরআন থেকে হিদায়ত পায় না। আসল ব্যাপার এই যে, কোরআন স্বস্থানে উপদেশ ও যথেষ্ট হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কতক লোকের জন্য আল্লাহর অভিপ্রায় না হওয়ার পশ্চাতে রহস্য আছে। কেন না) আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুফর ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মান্বদ শাস্তি।

#### আনুষ্ঠানিক জ্ঞানীয় বিশ্বয়

সূরা দাহরের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'।—(ফ্রাহল মা'আনী) এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কিয়ামত, জাহ্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিগুহ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

অব্যয়টি আসনে প্রম্ববোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন জ্ঞান্যমান ও প্রকাশ্য বিশ্বয়কে প্রবের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এই উত্তরই দেবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণত কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে—এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বয়টি যে একেবারে চক্ষু জ্ঞান্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, **قَدْ** অব্যয়টি এখানে **هَلْ** (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অভিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। **حِينٌ** শব্দটিকে **نَّوِيْنٌ**-সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অভিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অভিবাহিত হয়েছে—একথা বলা দূরত্ব হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ-মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারণের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণত নয় মাস হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যষ্ঠ স্তর অভিবাহিত হয়—দীর্ঘ থেকে দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্ষ থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্ষও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও शामिल করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য আনবুজিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে প্রল্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সন্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোন নাম-নিশানা ছিল না, কোন ডব্রিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোন আশংকা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্ত তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হ'শিয়ার, জানী, শ্রোতা ও চক্ষুমান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود يم و تقاضا ما نبود — لطف تو نا گفته ما می شنود

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে : **اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ**

**اِمْشَاج** — অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছি। **اِمْشَاج**

শব্দটি **مَشْج** অথবা **مَشْج** -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলা বাহুল্য, এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্ষ বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এখানে **اِمْشَاج** বলে রক্ত, মেছা, অঙ্গ, পিত্ত—এই শারীরিক উপাদান চতুস্তয় বোঝানো হয়েছে। এগুলোর দ্বয়ে বীর্ষ গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা शामिल আছে : চিন্তা করলে দেখা যায় উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুস্তয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায় এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে शामिल হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের অনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে



يُؤْتُونَ بِالذِّكْرِ—এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎ কর্মশীল বান্দাগণকে এসব

নিয়ামত কিসের ডিঙিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। **ذِكْر**—এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেওয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। একরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এর বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জামাতীদের মহান প্রতিদান ও অকুর্ত নিয়ামত লাভের কারণে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব ফরয-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও ফরয কর্ম পালনের বিষয় शामिल হয়ে গেছে। ফলে জামাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরয ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও ওরুফপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

**মাস'আলা :** কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয়, তা জায়েয ও হালাল হওয়া চাই এবং পোনাহ্ না হওয়া চাই। কেউ কোন নাজায়েয কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম উক্ত করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোন ব্যক্তি ফরয নামায অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-র মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরীয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত কল্পতে হবে, যেমন নামায-রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদত শরীয়তে উদ্দিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না, যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানামার পশাংগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكُونًا وَهَيْمًا وَآسِرًا—অর্থাৎ জামা-

তীদের এসব নিয়ামত একারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহাৰ্য দান করত। **عَلَى حُبِّهِ**—এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের

অতিরিক্ত আহাৰ্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও ইয়াতীমদেরকে আহাৰ্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে— সে কাফির হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দীকে খাওয়ানো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।



কেউ বন্দীকে আহাৰ্শ দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাকির হলেও তাকে খাওয়ানো সওয়ালের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হিফায়তের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

قَوَارِيرٍ مِّنْ فَضَّةٍ—দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র ঘাড় মোটা হলে থাকে—আয়নার

মত স্বচ্ছ হয় না। পল্লান্তরে কাঁচ নিমিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কিন্তু জামাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : জামাতের সব বস্তুর নখীর দুনিয়াতেও পাওয়ামায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নিমিত প্লাস ও পাত্র জামাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

وَيَسْتَوْنَ فِيهَا كَأَنَّ مِرْآةً زَنْجَبِيلًا—এর প্রসিদ্ধ অর্থ

শুঁঠ। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জামাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : জামাতের বস্ত্র ও দুনিয়ার বস্ত্র নামেই কেবল অস্তিত্ব। বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শুঁঠের আলোকে জামাতের শুঁঠকে বোঝার উপায় নেই।

سَوَآءٌ أَسَاوِرٌ وَحُلُوءٌ أَسَاوِرٌ مِّنْ فَضَّةٍ—এর বহুবচন। অর্থ কংকন।

যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দৃশ্যগত। জওয়ান এই যে, কোন অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দৃশ্যগত হওয়া—এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোনকোন দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দৃশ্যগত, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হলে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বৃকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে স্বয়ং এরূপ হতে পারে, তখন জামাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোন মানে থাকতে পারে না। জামাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উদ্ভূত বিবেচিত হবে।

أَنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا—অর্থাৎ জামাতীরা স্বয়ং

জামাতে পৌঁছে যাবে, তখন আলাহর তরফ থেকে বলা হবে : জামাতের এসব বিস্ময়কর

অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আত্মাহ্বর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিভেস করে দেখুন, জাভাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রুকুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে, নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, এতে আত্মাহ্ব তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ বিতরণ করছেন। সাধারণ জাভাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রসুলুল্লাহ (স)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে কোরআন অবতরণ। এই মহান নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রসুলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফিররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হুমরাণি করে, তৎক্ষণা আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারান্নি আত্মাহ্বর ইবাদতে মশগুল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফিরদের হুমরাণিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফিরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মুখুরা পাখিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অখচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপেক্ষণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে : نَحْنُ

خَلَقْنَاَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ — অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের

গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

মানবদেহের গ্রন্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা : এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আন্নারের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিবারান্ন নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী ক্রিভাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে। এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আশি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সর্গর্বে অক্ষত আছে।

سورة المرسلات

সূরা মুরসলাত

মক্কাম অবতীর্ণ : ৫০ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝ وَالنُّشْرِ نَشْرًا ۝

فَالْفُرْقَاتِ فَرَقًا ۝ فَالْمَلَقَاتِ ذِكْرًا ۝ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ۝

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ۝ فَإِذَا النُّجُومُ طُبِسَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ

فُرِجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ۝ لِآيٍ يَوْمٍ

أُجِلَّتْ ۝ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝ ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ

الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي

قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا ۝ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۝

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شِجَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً

فَرَاتًا ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنظَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ

بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ إِنظَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شَعْبٍ ۝ لَا ظَلِيلٍ

وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۝ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا كَالْقَصْرِ ۝

كَاتِهٖ جَلَّتْ صُفْرَةٌ ۖ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا يَوْمُ لَا  
 يَنْطِقُونَ ۖ وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ قَيْدٌ وَّوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ هَذَا  
 يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ  
 فَكِيدُوا ۖ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ  
 وَعُيُونٍ ۖ وَفَوْكَاهِ بِمَا يُشْتَهَوْنَ ۖ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ  
 لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ كُلُوا وَشَمِعُوا قَلِيلًا ۖ إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ ۖ  
 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا  
 لَا يَزْكَعُونَ ۖ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ فَبِأَيِّ  
 حَدِيثٍ بَعْدَهَا يُؤْمِنُونَ ۖ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝাটিকার শপথ, (৩) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপূজা বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ—(৬) ওষু-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নরকসমূহ নির্বাচিত হবে, (৯) যখন আকাশ ছিন্নযুক্ত হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং (১১) যখন রসুলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্য (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

(২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি খারগকারিগীরগে, (২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে?  
 (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে  
 জুফা নিবারণকারী সুপের পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে!  
 (২৯) চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (৩০) চল তোমরা তিন  
 কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সূনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা  
 করে না। (৩২) এটা অষ্টালিকা সদৃশ রূহৎ স্কুলিংপ নিষ্ক্রেপ করবে (৩৩) যেন সে  
 পীতবর্ণ উদ্ভ্রুপ্রণী। (৩৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন  
 দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না (৩৬) এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেওয়া হবে  
 না। (৩৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি  
 তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি। (৩৯) অতএব তোমাদের  
 কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। (৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের  
 দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌তীরুরা থাকবে ছায়ার এবং প্রভাবসমূহে—(৪২) এবং  
 তাদের বাঞ্ছিত ফলমুলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে : তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে  
 তুপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সংকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।  
 (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৬) কাফিরগণ, তোমরা কিছুদিন  
 খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের  
 দুর্ভোগ হবে। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না।  
 (৪৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৫০) এখন কোন কথায় তারা এরপর  
 বিশ্বাস স্থাপন করবে?

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কল্যাণের জন্য প্রেরিত বাম্বুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (যাতে বিপদ-  
 শংকা থাকে) মেঘ বিস্তৃতকারী বাম্বুর শপথ (যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়) মেঘগুঞ্জকে  
 বিচ্ছিন্নকারী বাম্বুর শপথ (বৃষ্টির পর এরূপ হয়ে থাকে) এবং সেই বাম্বুর শপথ যে, (অন্তরে)  
 আল্লাহ্‌র স্মরণ অর্থাৎ (তওবা অথবা সতর্কবাণী) জাগরিত করে। (অর্থাৎ উপরোক্ত  
 বাম্বুরসমূহ আল্লাহ্‌র অপার কুদরত জ্ঞাপন করার কারণে আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হওয়ার  
 কারণ হয়ে থাকে। এই মনোযোগ বিবিধ হয়ে থাকে—(১) এ সব বাম্বু ভীতিপ্রদ হলে  
 ভয় সহকারে এবং (২) তওবা ওয়রখাহী সহকারে। এটা ভয় ও আশা উভয় অবস্থাতে  
 হতে পারে। বাম্বু কল্যাণবাহী হলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
 করা হয় এবং নিজ ভুলটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়ে। পক্ষান্তরে বাম্বু ভয়াবহ হলে  
 আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করে গোনাহের জন্য তওবা করা হয়। অতঃপর শপথের জওয়াব  
 বর্ণিত হয়েছে) তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (অর্থাৎ কিসামত  
 সংঘটিত হবে। এসব শপথ কিসামতের খুবই উপযুক্ত। কেননা, প্রথমবার শিংগায় ফু'ক  
 দেওয়ার পর বিষজগতের ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা বঞ্জবাম্বুর সমতুল্য এবং দ্বিতীয়বার ফু'ক  
 দেওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী তথা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ইত্যাদি কল্যাণবাহী বাম্বুর

সাথে সামঞ্জস্যশীল, যশ্কারী বৃষ্টি এবং বৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে : ) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নিষ্পত্ত হয়ে যাবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন পর্বতমালা উড়তে থাকবে এবং যখন রসূলগণকে নিদিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে, (তখন সবার বিচার হবে। অতঃপর সেই দিবসের উন্মাদহতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু জানা আছে কি) পয়গম্বরগণের ব্যাপার কোন দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিচার দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এই প্রয় ও উত্তরের উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, কাফিররা সবসময়ই রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। এখনও তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যারোপ করেছে। তাদেরকে এ বিষয়ে পরকালের ভয় প্রদর্শন করা হলে তারা পরকালকেও অস্বীকার করে। এই মিথ্যারোপের ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই চুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, একে স্থগিত রাখার ফলে কাফিররা আরও অস্বীকার ও মিথ্যারোপের সুযোগ পায়। মুসলমানরাও এব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সুতরাং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা একে স্থগিত রেখেছেন কিন্তু একদিন না একদিন অবশ্যই এই বিচার সংঘটিত হবে)। আপনি জানেন সেই বিচারের দিবস কেমন? (অর্থাৎ খুবই কঠিন। যারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তাদের বোঝা উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর অতীত ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে)। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করিনি? অতঃপর তাদের পশ্চাতে পরবর্তীদেরকেও (আযাবে) একত্র করব। (অর্থাৎ আপনাদের উন্মত্তের কাফিরদের উপরও ধ্বংসের শাস্তি নাযিল করব। বদর, ওহদ ইত্যাদি যুদ্ধে তাই হয়েছে। অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। অর্থাৎ কুফরের শাস্তি দেই—উভয় জাহানে কিংবা পরকালে। যারা কুফরের কারণে আযাবের যোগ্য হওয়াকে মিথ্যা মনে করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা ও মৃতদের পুনরুজ্জীবনকে আরও ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (অর্থাৎ বীর্য) থেকে সৃষ্টি করিনি? (অর্থাৎ প্রথমে তোমরা বীর্য ছিলে)। অতঃপর আমি তা এক নিদিষ্ট সময়ে পর্যন্ত রেখেছি সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ নারীর গর্ভাশয়ে)। অতঃপর আমি (এ সব কাজের) এক পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। আমি কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী! (এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনর্বীর জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং যারা এই সত্যকে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতাকে মিথ্যারোপ করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আনুগত্য ও ঈমানে উৎসাহিত করার জন্য কতক নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে) আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃতদেরকে ধারণকারী-রূপে সৃষ্টি করিনি? (জীবন এর উপরই অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পর দাফন, নিমজ্জিত ও প্রচ্ছলিত হওয়ার পথে অবশেষে মানুষ মাটির সাথেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরও ভূমি নিয়ামত। কেননা, মৃতরা মাটি না হয়ে গেলে জীবিতদের জীবন দুবিষহ হয়ে যেত, তারা পৃথিবীতে বসবাস এমনি, চলাফেরা করার জায়গা পেত না)। আমি তাতে (অর্থাৎ ভূমিতে) স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা (যশ্কারী অনেক উকপান সাধিত হয়)। এবং

তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি। (একে স্মৃত্ত নিয়ামতও বলা যায় এবং ভূমি সম্পর্কিত নিয়ামতও বলা যায়। কেননা, পানির কেন্দ্রস্থল ভূমিই। এসব নিয়ামত তওহীদকে জরুরী করে। সূতরাং যারা এই সত্য বিষয়কে অর্থাৎ তওহীদ জরুরী হওয়াকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের কতক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে : ) তোমরা সেই আঘাবের দিকে চল, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (এর এক শাস্তি এই নির্দেশের মধ্যে আছে—) চল, তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে—যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং উভাথ থেকে রক্ষাও করে না। [এখানে জাহান্নাম থেকে নির্গত একটি ধূম্রকুণ্ডলী বোঝানো হয়েছে। আধিক্যের কারণে এটা উপরে উঠে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে।—(তাবারী) হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাফিররা এই ধূম্রকুণ্ডলীর নিচে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে নেক বান্দাগণ আরশের ছায়া-তলে অবস্থান করবে। অতঃপর এই ধূম্রকুণ্ডলীর আরও কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।] এটা অট্টালিকা সদৃশ পীতবর্ণ উষ্ণ শ্রেণীর ন্যায় সফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। [নিয়ম এই যে, অগ্নি থেকে সফুলিঙ্গ উদ্ভিত হওয়ার সময় বিরাট আকারে উদ্ভিত হয়, এরপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। সূতরাং প্রথম তুলনাটি প্রথম অবস্থার দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয় তুলনাটি শেষ অবস্থার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে।—(রাহুল মা'আনী) অতঃপর যারা এই সত্য ঘটনাকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে,] সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে)। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কোন কথা বলবে না এবং কাউকে ওয়র পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (কারণ, বাস্তবে কোন সঙ্গত ওয়র থাকবেই না। যারা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করছে, তারা বুঝে নিক যে,) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর তাদেরকে বলা হবে : ) এটা বিচার দিবস, (যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে) আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে (বিচারের জন্য) একত্র করছি। অতএব অদ্যকার ফলাফল ও বিচার থেকে আশ্চর্যকার কোন অপকৌশল তোমাদের কাছে থাকলে তা আমার কাছে প্রয়োগ কর। (কাফিররা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের মুকাবিলায় মু'মিনদের পুরস্কার বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্‌ত্বীকরণ থাকবে ছায়ায়, প্রস্রবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে : )। আপন (সৎ) কর্মের বিনিময়ে খুব তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (কাফিররা জাহান্নামের নিয়ামতসমূহকেও মিথ্যা বলে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আবান কাফিরদেরকে হ'শিয়ার করা হয়েছে। কাফিররা) তোমরা (দুনিয়াতে) কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও (সত্বই দুর্ভোগ আসবে। কেননা) তোমরা নিশ্চিতই অপরাধী। (অপরাধীদের অবস্থা তাই হবে। যারা অপরাধের শাস্তিকে মিথ্যারোপ করে, তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কাফিররা এমন অপরাধী যে) যখন তাদেরকে বলা হয় : নত হও, (অর্থাৎ ঈমান ও দাসত্ব অবলম্বন কর) তখন তারা নত হয় না। (এর

চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হবে। তারা এই অপরাধকেও মিথ্যা মনে করে। অতএব তারা বুঝে নিকষে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কোরআনের এসব বর্ণনা শোনা-  
মাত্রই ভয়ে ঈমান আনা উচিত ছিল। এর পরও যখন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তখন) এরপর (অর্থাৎ প্রাজ্ঞভাষী, সতর্ককারী কোরআনের পর) তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (এতে কাফিরদেরকে শাসনো হয়েছে এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা)-কে নিরাশ করা হয়েছে)।

### আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

সহীহ বুখারীর রেওয়াজেতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : আমরা মিনার এক গুহায় রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুন্নসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ (সা) সূরাটি আরজি করতেন আর আমি তা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। সূরার মিস্ততায় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু সে পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।—(ইবনে কাসীর)

এই সূরায় আত্মা তা'আলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কিয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাবে সেগুলোর স্থলে এই পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে : **عاصفات مرسلات ملقها ت الذكرو -**  
- **فارقان - فاشرات -** কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরো-পুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেরীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারও, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পন্নগছন্নগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। একারণেই ইবনে জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন : সবই হতে পারে কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতা-গণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্ধের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্ধ করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তাই এ স্থলে ইবনে কাসীরের ফরাসালাই উত্তম



মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আগনি তফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা, এতে এই মত অবলম্বন করেই তফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ

ناشرات و عاصفات - এক ফেরেশতাগণের সাথে ঋণ ঋণীভাবের জন্য এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতানুযায়ী আলাতসমূহের অর্থ এইঃ প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। عرفا -এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, রুশ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। صرفا -এর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও রুশ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। عاصفات -সবটি -থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঋণীকা ও ঋণীভাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। ناشرات -বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা রুশ্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فاورقات -এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ যারা ওহী নামিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিতে তোলে। ملقىات الذکر -এটাও ফেরেশতাগণের বিশেষণ। ذکر -এর অর্থ কোরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গম্বরগণের নিকট ওহী ও কোরআন নামিল করে। এভাবে কোন বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই তফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে। এতদূত্বের মধ্যে মিল কি? জওয়াব এই যে, আল্লাহর কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে—এক. রুশ্টিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপনুটি ঋণীকা ও অকল্যাণকর। এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা যায়।

عذراً أو نذراً -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ

তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নামিল করা হয়, যাতে তা মু'মিনদের জন্য হুঁটি-বিদ্যুতি থেকে ওসরুখাহীর কারণ হয় এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হয়ে যায়।

বান্দু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ বলেছেন : **إِنَّمَا تُؤَدُّونَ**

**لَوَاعِعُ** অর্থাৎ তোমাদেরকে পন্নগম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতি-

দান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুম্বারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই :

**تَوَقَّهتِ إِكْتِنًا وَأَذَّا لِرُّسُلًا قَتَّتْ** থেকে উদ্ভূত। এর আসল

অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী বলেন : এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পন্নগম্বরগণের জন্য উশ্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পন্নগম্বরগণকে একত্র করা হবে।

অতঃপর **وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন খুবই

ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফির ও মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। **وَيَلْ** শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে **وَيَلْ** জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পূঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত

লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলা হয়েছে **أَلَمْ تَهْلِكِ الْأُولَئِينَ** অর্থাৎ

আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামূদ, কওমে লূত, কওমে ফিরআউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। **ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ**

এক কিয়ামাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কিয়ামাত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উশ্মতে মুহাম্মদীর কাফির। উদ্দেশ্য, পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফিরদেরকে ভবিষ্যৎ আমাবের খবর দেওয়া। এই আমাব বদর, ওহূদ প্রভৃতি মুহূর্তে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আযাব নাছিল হত, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত হত আর বর্তমান কাফিরদের উপর রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে আসমানী আযাব আসে না বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আযাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয় না—কেবল প্রধান অপরাধীরাই নিহত হয়।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا — অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে

জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য কِفَات করিনি? كِفَات শব্দটি كَفَيْت থেকে উদ্ভূত এর অর্থ মিলানো। كِفَات সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমি ও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

قَصْرًا — এর অর্থ অট্টালিকা।

قَصْرًا — এর অর্থ অট্টালিকা।  
قَصْرًا উটকে বলা হয় এবং صَفْرًا শব্দটি صَفْرًا — এর বহুবচন অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিষ্কাশন করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উজ্জ্বল প্রেণীর সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صَفْرًا — এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা, পীতবর্ণ উট কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে—(রাহুল মা'আনী)

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ — অর্থাৎ সেদিন কেউ

কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওয়র পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফিরদের কথা বলা এবং ওয়র পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওয়র পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেওয়া হবে—(রাহুল মা'আনী)

كُلُّوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَجْرِمُونَ — অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে

নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। পরগল্পগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যান্যাপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে। —(আবু হাইয়ান)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْكِعُوا لَا يَرْكِعُونَ — এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে

ঝুঁকুর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে আত্মাহুঁ বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ

কেউ রুক্কু পাকিভাষিক অর্থও নিরেছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুক্কু বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।—(রাহুল মা'আনী)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ آيَةِ مَنُونٍ

অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরূপর আর কোন কথার বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে যখন এই সূরা তিলাওকরাতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার **أَمَّا بِالله** বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরেও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

سورة الذبا

मन्ना नावा

मन्नाय अवतीर्णः 80 आयत्त. २ रुकू

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَلَّمَ یَسَّاءَ لَوْنًا ۝ وَعَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۝ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ۝ كَلَّا

سِیَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سِیَعْلَمُونَ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝

وَاَخْلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا ۝ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّیْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا

النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَبَنینَا قَوْفُلًا كَرِیْمًا ۝ اِذَا جَا ۝ وَجَعَلْنَا لِرِجَالِكُمْ مَازِجًا ۝ وَانزَلْنَا

مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝ لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ وَجِئْتَ الْاَفَّاكًا ۝ اِنَّ یَوْمَ

الْقَصْرِ كَانَ مِیقَاتًا ۝ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ

فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝ وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

لِلظَّالِمِیْنَ مَا بَا ۝ لَیْسَیْنَ فِیْهَا اَحْقَابًا ۝ لَیْدُفُّونَ فِیْهَا بَرْدًا ۝ وَلَا شَرَابًا ۝

الْاَحْمِیْمِیَّا وَعَسَاقًا ۝ جَزَاءً وَّفَاكًا ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَیْرِجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوْا

بِاٰیٰتِنَا كِذِّا بَا ۝ وَكُلَّ شَیْءٍ اَحْصٰیْنٰهُ كِتٰبًا ۝ فَذُرُّوْا فَلَئِنْ زٰیْدَكُمْ اِلْعٰذَابًا ۝

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَعٰزِلًا ۝ حَلٰلِیْقًا ۝ وَاعْتَابًا ۝ وَكَوٰعِبًا ۝ اَشْرَابًا ۝ وَكَاسًا ۝ دِهَاقًا ۝

لَا یَسْمَعُونَ فِیْهَا الْغَوَا ۝ لَا كِذِّا بَا ۝ جَزَاءً ۝ مِّنْ رَّبِّكَ ۝ عَطَا ۝ حِسَابًا ۝ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَمَا

بَیْنَهُمَا ۝ الرَّحْمٰنُ ۝ لَا یَمِیْلُ كُوْنٌ مِّنْهُ ۝ حِطَابًا ۝ یَوْمَ یَقُوْمُ الزُّجُوْمُ ۝ الْمَلٰٓئِكَةُ ۝ صُفٰٓةً ۝ لَا یَسْکَبُوْنَ

اِلٰی مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ ۝ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذٰلِكَ ۝ الْیَوْمُ الْحُحُ ۝ فَمَنْ ۝ شَاءَ ۝ اتَّخَذْ اِلٰی رَبِّهٖ

مَا بَا ۝ اِنَّا نَذْرَنكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۙ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ

لَيْلَتِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? (২) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ছুমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লাস্তিদূরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ, (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত আকাশ, (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তন্দ্রারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল বস্তু এবং পানীয় আশ্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পূঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিকূল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। (২৮) এবং আমার আয়াতসমূহতে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব তোমরা আশ্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আনুর (৩৩) সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তার সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ থাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে তিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কান্না বলবে : হায়, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিনামত অস্বীকারকারীরা) কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে? তারা সেই

মহা ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, যে বিষয়ে তারা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতবিরোধ করে। (অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করার অর্থ অস্বীকারের হলে জিজ্ঞাসা করা। এই প্রশ্ন ও জওয়াবের উদ্দেশ্য বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং গুরুত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে অস্পষ্ট রোধ পরে তফসীর করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাদের এই মতবিরোধ ভ্রান্ত। তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং কিয়ামত আসবে এবং) তারা সত্বরই জানতে পারবে। (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন তারা আয়াবে পতিত হবে, তখন প্রকৃত সত্য এবং কিয়ামতের সত্যতা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। আমি পুনশ্চ বলছি তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং আসবে এবং) সত্বরই তারা জানতে পারবে। (কাফিররা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাই অতঃপর তার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে অসম্ভব মনে করলে আমার কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে। আমার কুদরতকে অস্বীকার করা বিস্ময়কর বটে। কেননা) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (ভূমির) পেরেক? (অর্থাৎ পেরেকের মত করেছি। কোন কিছুতে পেরেক মেরে দিলে যেমন তা স্থানচ্যুত হয় না, তেমনি ভূমিকে পর্বতমালার মাধ্যমে স্থিতিশীল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমি কুদরতের আরও নিদর্শন প্রকাশ করেছি। সেমতে) আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিপ্রামের বস্ত্র। আমিই রাত্তিকে আবরণ করেছি। আমিই দিবসকে জীবিকার সময় করেছি। আমিই তোমাদের উর্ধ্ব মজবুত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি। আমিই (আকাশে) এক উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ সূর্য। অন্য আয়াতের আছে

وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا

আমিই জলধর মঘমালা থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করি, যাতে তন্দ্বারা শস্য, উদ্ভিদ, পাতাঘন উদ্যান উৎপন্ন করি। (এগুলো থেকে আমার অপার শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায়। অতএব, কিয়ামতের ব্যাপারে আমার শক্তিকে কেন অস্বীকার করা হয়? অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে : ) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে। (অর্থাৎ) যখন শিংগায় ফুক দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের পৃথক পৃথক দল হবে। এরপর মু'মিন, কাফির, সৎ কর্মপরায়ণ, অসৎ কর্মপরায়ণ সবাই পৃথক পৃথক দলে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে)। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে অনেক দরজা হয়ে যাবে (অর্থাৎ অনেক দরজা খুলে দিলে যেমন অনেক জায়গা খুলে যায়, তেমনি আকাশের অনেক জায়গা খুলে যাবে। সূত্রাং কথাটি তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। বস্ত্র দরজা তো আকাশে এখনও আছে—একথা বলে আর আপত্তি তোলা যাবে না। এই খোলা ফের-শতাদের অবতরণের জন্য হবে। সূরা ফোরকানে একেই تَشَقُّقُ السَّمَاءِ বলে ব্যক্ত

করা হয়েছে)। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে (যেমন অন্য আয়াতে

ثَوْبًا مَّهِلًا

বলা হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বিতীয়বার ফুক দেওয়ার সময় সংঘটিত

হবে। তবে পর্বতমালা চালনার ঘটনাটি যে জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই উত্তরস্থিত সস্তাবনা রয়েছে—দ্বিতীয় বার ফুক দেওয়ার পরেও হতে পারে এবং প্রথমবার ফুক দেওয়ার পরেও হতে পারে। দ্বিতীয় ফুকের পর দুনিয়ার সবকিছু পুনরায় নিজস্ব আকৃতি ধারণ করবে। হিসাবের সময় হলে পর্বতমালাকে ভূমির সমান করে দেওয়া হবে, যাতে ভূমির উপর কোন আড়াল না থাকে এবং একই সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম ফুকের মূল উদ্দেশ্যই সবকিছু ধ্বংস করা। প্রথম ফুক থেকে দ্বিতীয় ফুক পর্যন্ত সময়কে একই দিন ধরে নিয়ে সেই দিনকে সব ঘটনার সময় বলা হয়েছে। অতঃপর এই বিচার দিবসের কিষ্কার বর্ণনা করা হয়েছে) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে (অর্থাৎ আশাবের ফেরেশতাগণ ওঁতে পেতে থাকবে যে, কাফির আসলেই তাকে ধরে আশাব দেওয়া শুরু করবে। এটা) অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল। তারা তখন অশেষকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। তারা তখন কোন শীতলবস্ত্র (অর্থাৎ আরামদায়ক বস্ত্র) এবং পানীয় আশ্রয়দান করবে না (ফলে তৃষ্ণা নিবারণিত হবে না) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পূজ পাবে। এটা (তাদের) পুরোপুরি প্রতিফল। (যেসব কাজের এটা প্রতিফল তা এই যে) তারা (কিয়ামতের) হিসাব-নিকাশ আশা করত না এবং (হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য সত্য বিষয় সম্বলিত) আশ্রয় আশ্রয়সমূহতে মিথ্যা-রোপ করত। আমি (তাদের কর্মসমূহের মধ্যে) সবকিছুই (আমলগামায়) লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। অতএব (এসব কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বলা হবে : এখন এসব কর্মের) হাদ আশ্রয়দান কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (অতঃপর মু'মিনদের ফয়সালা উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আলাহু'জ্জালিমের জন্য রয়েছে সাক্ষ্য অর্থাৎ (আহার ও ভ্রমণের জন্য) উদ্যান (তাতেও নানারকম ফলমূল থাকবে), আঙ্গুর (গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মনোরঞ্জনের জন্য) সম-বয়স্ক পূর্ণ যৌবনা তরুণী এবং (পান করার জন্য) পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা তখন অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনে না। (কেননা তখন এগুলো থাকবে না)। এটা প্রতিদান, যা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্বয়ং পুরস্কার—যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, (যিনি) দয়াময়। কেউ (স্বৈচ্ছায়) তাঁর সাথে কথা বলার অধিকারী হবে না। যেদিন সকল রাহুখারী ও ফেরেশতা (আলাহুর সামনে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, (সেদিন) দয়াময় আলাহু'জ্জালিমকে (কথা বলার) অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে ঠিক কথা বলবে। (ঠিক কথার অর্থ যে, যে কথার অনুমতি দেওয়া হবে, তাই বলবে অর্থাৎ কথা বলাও সীমিত হবে—যা ইচ্ছা, তা বলতে পারবে না। অতঃপর উল্লিখিত সব বিষয়-বস্তুর সারমর্ম বলা হয়েছে)। এ দিবস নিশ্চিত। অতএব স্বার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার কাছে (নিজের) ঠিকানা তৈরী করুক (অর্থাৎ ভাল ঠিকানা পেতে হলে ভাল কাজ করুক। লোকসকল) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। (এই শাস্তি এমন দিনে সংঘটিত হবে) যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম (সামনে উপস্থিত) দেখে নিবে এবং কাফির (পরিভাষ করে) বলবে : হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! (তাহলে আশাব থেকে বেঁচে যেতাম। চতুর্দশ জন্তুদেরকে স্বয়ং মৃত্তিকায় পরিণত করে দেওয়া হবে, তখন কাফিররা একথা বলবে)।



আনুমানিক আড়াই বিষয়:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ — অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর

আজাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন: **نَبَأَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ** শব্দের অর্থ মহা খবর।

এখানে মহা খবর বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। আজাহের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফিররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচনা সূরার শুরুতে কাফিরদের অবস্থা উল্লেখ করে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত সম্পর্কে কাফিররা যেসব ঘটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন যে, কাফিরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তখ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে ভাকীদের জন্য

দুবার উল্লেখ করেছে— **كَلَّا سَعَلْمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَعَلْمُونَ** — অর্থাৎ কিয়ামতের

বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে ছাদয়গম হবে না বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অভিসহর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আজাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রভা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, স্বন্দারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, **جَعَلْنَا**

**تَوَكَّمُ سَبَاتًا** — **سَبَاتًا** শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন

করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অস্তর ও মস্তিষ্কে এমন স্থিতি ও শক্তি

দান করে, স্বায়-বিকল্প দুনিয়ার কোন শক্তি হতে পারে না। একারণেই কেউ কেউ **سَيِّئَاتٍ** এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

**নিদ্রা খুব বড় নিয়ামত :** এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যুগলাকারে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে নিদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা যায় এটি এক বিরাট নিয়ামত। নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মুর্খ, রাজা-প্রজ্ঞা সবাই এই ধন সম্বন্ধে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এই নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিরস্ত্রিত কক্ষ, নরম তোষক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোষক, বালিশ অথবা প্রাসাদ-বাগানের অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সন্ন্যাসি তাঁর কাছে থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব লক্ষ্যহীন ব্যক্তিকে কোন শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এই নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বাটিকা সেবন করে এই নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায়শ এই বাটিকাও নিদ্রা আনমনে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নিবিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ তার উপর জোরজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রাকামী মহা অবদানের পরিশিষ্ট

বর্ণনা করা হয়েছে যে, **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَآئِنًا** — অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি অবিরণ।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ঐশ্বর্য করেছেন যে, তিনি-তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই এক-যোগে নিদ্রা স্নেহেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অন্যান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হত, তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে **وَجَعَلْنَا آئِنَهَا وَمَعَا شَأ** — মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য

স্বয়ংক্রিয় আর্হর্ষ প্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাফাৎ মৃত্যু হয়ে

হাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরী, যা আলোকোচ্ছল পরিকল্পে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে : তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোচ্ছল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ

উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে : **وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا**—অর্থাৎ আমি

একটি প্রোচ্ছল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এর পর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا**—এর বহুবচন।

এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমাল। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমাল। থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়তে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে **سِمْاء** শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

**أَنَّ يَوْمَ الْقَضِ كَانَ مِيقَاتًا**—অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে

আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অন্যান্য আয়তে থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহর সন্দেশে উপস্থিত হবে। হযরত আবু স্বর গিফারী (রা)-র রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপৃতি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পাবে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পাল্পে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে।—(মালহারী) কোর্আন-কোরআনেতে আয়তের তফসীরে দল দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

**وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا**—অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও

অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বস্থান থেকে বিদ্যুত

হয়ে তুলার নাম উড়তে থাকবে। **سراب** -এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির হে বাজুকাজুপসুর থেকে পানির নাম স্বপ্নমল করতে থাকে তাকেও **سراب** -এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়।—(সেহাহ, রুজিব)

**إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا**—যে স্থানে বসে কারও দেখাশোনা অথবা

অপেক্ষা করা হয়, তাকে **مِرْصَادًا** বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুত্র তথা পুত্রসিরাহ। সওগ্গাবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতার পাঁকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে সওগ্গাবদাতা ফেরেশতার তাদের গড়ব্য স্থানে নিয়ে যাবে। (মাযহারী)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : জাহান্নামের পুত্রের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাপদের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অস্ত্রে স্বেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে।—(কুরতুবী)

**إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا**—এটা **لِلطَّاغُوتِ مَا بَآ**

বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুত্রের উপর দিয়ে স্বেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমানাঘনকারীদের আবাসস্থল। **طَاغِي** এর বহুবচন এবং **طَاغِي** থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। **طَاغِي** এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে **طَاغِي** অর্থ কাফির। কু-বিশ্বাসী, পঞ্চভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কোর-আন ও সুন্নাহর সীমা ভিঙিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেহী, খারিজী ও মৃত্যুশিলা সম্প্রদায়।—(মাযহারী)

**لَا يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أَحْقَابًا**—এর বহুবচন। অর্থ

অবস্থানকারী। **حَقِيبَةً** এর বহুবচন। অর্থ সূদীর্ঘ সময়। ইবনে জুরীর হযরত আলী (রা) থেকে এর পরিমাণ আলি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটালি বছরে এক **حَقِيبَةً** হয়। অপর কল্পকজন সাহাবী এর পরিমাণ আলির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়।—(ইবনে-কাসীর) কিন্তু মসনদে বাহহারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

**لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ كُمْ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ فِيهَا أَحْقَابًا وَالْحَقِيبُ بَعْضٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلَاثَةٌ وَسِتُونَ يَوْمًا مِمَّا تَعْدُونَ -**

হাদীসীদের স্বাক্ষরে সোনাহের সাজান জাহাঙ্গামে-নিষ্কেপ করা হবে, তাঁকে কয়েক হক্বা জাহাঙ্গামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হক্বা আশি বছরের বয়স বোঝায় এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে।—(মাসহরী)

এই হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর না হলেও এতে **أحقاب** শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরাধকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রসুলুল্লাহ (সা)-রই উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোন এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অতিম বিষয়বস্তু এই যে, হক্বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইয়াসর রায়হাতী **أحقاب**-এর অর্থ করেছেন **دورا متتابعة** অর্থাৎ টিপসুপরি বহু বছর।

জাহাঙ্গামে চিরকাল কসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও অণ্ডরাহ : হক্বার পরিমাণ হত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফির জাহাঙ্গামীরাও জাহাঙ্গাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। যে সব আয়াতে **خالدین فیها أبدا** বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, জাহাঙ্গাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফিররা কখনও জাহাঙ্গাম থেকে বের হবে না।

সুন্দী হসরত মুররা ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন : যদি জাহাঙ্গামীদেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহাঙ্গামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না কয়েকদিন জাহাঙ্গাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জাহাঙ্গামীদেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ হত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জাহাঙ্গাম থেকে বহিস্কৃত হবে।—(মাসহরী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতের **أحقاب** শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হক্বা অতিবাহিত হলে পরে জাহাঙ্গামীরা জাহাঙ্গাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী হওয়ার কারণে খণ্ডিত নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হক্বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শুধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হক্বা জাহাঙ্গামে থাকবে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কয়েক হক্বার পর জাহাঙ্গাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহাঙ্গাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হসরত হাসান (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন : আয়াতে **أحقاب** তা'আলা জাহাঙ্গামীদের জন্য কোন সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, স্বাক্ষরা তাদের জাহাঙ্গাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) কাভাদাহ থেকেও এই তফসীরই

বর্ণনা করেছেন যে, **أَحْقَاب**-এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হক্বা শেষ হলে দ্বিতীয় হক্বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এখানে **وَيَحْتَمِل** বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, **طَاغُثِينَ**-এর অর্থ কাফির না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যাঁরা বাতিল আকীদার কাফলে পঞ্চপ্রভট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রকৃতিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সার্বমর্থ হবে এই যে, যে সব কালেমা উল্লেখকারী তওহীদ পন্থী লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুরানের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফির নয়, তারা কয়েক হক্বা পর্যন্ত জাহালামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহালাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মামহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মসনদে বাযহাযর বণিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, কয়েক হক্বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহালাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

কিন্তু আবু হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত **أَقْتَمُوا كَأَن لَّمْ يَرَوْا بَازِلًا** -  
**طَاغُثِينَ** - এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, **حَصَا بَأْوَكَدَّ بَوَا بَا يَا ثَنَا كَذَا بَا**

এর অর্থ এখানে তওহীদ পন্থী স্নাতদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা পরিষ্কার বণিত আছে। এমনিভাবে আবু হাইয়ান মুকাত্তিলের এই উক্তিই প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মনসূখ বা রহিত।

একদল তফসীরকারক আরোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী **لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا** থেকে **جَمَلَةً حَالِيَةً** আয়াতটি **أَحْقَابًا** থেকে **شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا**

আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সূদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোন শীতলপ্রবায় ও পানীয় আশ্রয়ন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সূদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুঃবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আশ্রয় হতে পারে। **حَمِيمًا** এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে পোশত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়ীতৃড়ি ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যাবে। **غَسَاقًا** - জাহালামীদের কতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

**جَزَاءُ وَثَاقًا** - অর্থাৎ জাহালামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায়

ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُو قُوًا فَلَنْ نُّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا — অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর

ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছে—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলেতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আত্মা কেবল সৃষ্টিই করবেন। অস্তঃপরে কান্নারদের বিপরীতে মু'মিন মৃত্যুকীদের সওয়াব ও জালালের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا — অর্থাৎ জালালের এসব নিয়ামত মু'মিনদের

প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জালালের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহর দান বলা হয়েছে। বাহ্যিক উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোন কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কাররূপে যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কোরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছেন যে, জালাতে প্রবেশাধিকার এবং জালালের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জালাতীদের কর্মের প্রতিদান—প্রকৃষ্ট প্ৰস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহর দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জালাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায় কিরাম আরম্ভ করলেন : আপনিও কি? উত্তর হল : হ্যাঁ; আমিও আমার কর্মের জোরে জালাতে যেতে পারি না।

حَسَبًا শব্দে অর্থ স্ববিধ হতে পারে—এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিশেনাজ ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে—

اِحْسَبْتُ فَلَا نَايَ اَمْطَهْنَا مَا يَكْفُوهُ حَتَّىٰ قَالَ حَسْبِي — অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার

প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট, এমনকি, সে বলে উঠল, বাস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মুকাবিলা করণ। তফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত সুআহিদ (র) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আল্লাতের অর্থ করেছেন—এই দান জালাতীদেরকে তাদের আমলের হিসাব দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসাবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মুকাবিলায় সাহাবায় কিরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহর পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহদ পর্যন্ত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ مِنْ قَبْلِكَ وَأنتَ بِلِقَاءِ رَبِّكَ فَاعٍ ۗ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا

সম্পর্কমুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবোঁ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মাকে সেরাপ সওয়ার দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হল? যদি একে আল্লাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মঙ্গল-দানে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভ্রামণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ

'রাহ' বলে এখানে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে, রাহ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তগত আছে। এই তক্ষসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে—একটি রাহের ও অপরাষ্ট ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ ۗ

হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসির ফলে দেখবে, নাহয় কাজকর্ম সব সন্দরী হলে সামনে এসে থাকবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবলে ও বরষে হতে পারে।—(মাঝকারী)

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا كَيْفَ لِي بِمَا كُنتُ تُرَابًا

থেকে বলিত আছে, কিস্যাতের দিন সমস্ত ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মনিব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তাঁরও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে : মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কান্নাররা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের অশ্রাব থেকে বেঁচে যেতাম।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالنُّزُعَاتِ عُرْفًا ۝ وَالنُّشُطِ نَشْطًا ۝ وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا ۝ فَالْسَّيْقَاتِ  
 سَبْقًا ۝ فَالْبُدْبُرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝  
 قُلُوبٌ يُّومِيذٍ وَآجِفَةُ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ يَقُولُونَ أَيْنَا الْمَرْدُ  
 وَدُونِ فِي الْحَافِرَةِ ۝ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرْتُمُ حَاسِرَةً ۝  
 فَاثْمَاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَاذْأَهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُّوسَىٰ  
 ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَالِدِ الْمُقَدَّسِ طَوْسَىٰ ۝ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝  
 فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَزَكَّىٰ ۝ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْتَبَىٰ ۝ فَآرَاهُ الْآيَةَ  
 الْكُبْرَىٰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۝ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝ فَقَالَ أَنَا  
 رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ ۝ فَآخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْأَخْرَجِ وَالْأُولَىٰ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً  
 لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۝ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ۝ رَفَعَ سَنَكُمَا  
 فَسَوَّيَاهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝ أَخْرَجَ  
 مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَابِكُمْ ۝ وَذَٰذَا  
 جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ۝ يَوْمَ تَذُكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ  
 لِمَنْ يَّرَىٰ ۝ فَآتَا مَنْ طَغَىٰ ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَسَىٰ النَّفْسَ الَّتِي حَقَّتْ مِنَ الْمَكَارِمِ  
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قَدْ فَخِمْتَ الْأَنفُسَ الَّتِي  
رَبُّهَا ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَحْشَاهُ ۗ كَانَتْ لَهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهَا لَمْ يَلْبَثُوا  
إِلَّا عَشِيرَةَ اللَّيْلِ ۗ

পরম করুণাময় ও হেঁসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাধন খুলে দেয় মুদুভাবে; (৩) শপথ তাদের, যারা সত্তরল করে দ্রুতগতিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের, যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে—কিয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎপামী; (৮) সেদিন অনেক হাদয় ভীত-বিহ্বল হবে। (৯) তাদের দৃষ্টি নত হবে। (১০) তারা বলে : আশ্রয় কি উল্ঠা পায় প্রত্যাবর্তিত হবেই—(১১) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও ? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশ হবে ! (১৩) অতএব এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা মরদানে আবিষ্কৃত হবে। (১৫) মুসার হৃদয় আপনার কাছে পৌঁছেছে কি ? (১৬) যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুরা উপত্যকার আহ্বান করেছিলেন, (১৭) ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল : তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি ? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্ঠায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল (২৪) এবং বলল : আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন ? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অক্ষ-কারাঙ্ঘ্র এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুর্লদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে (৩৫) অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে (৩৬) এবং দর্শকদের জন্য জাহালাম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে (৩৮) এবং পৃথিবী জীবনকে অপ্রাধিকার দিয়েছে, (৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহালাম। (৪০) পক্ষাঙ্ঘ্র যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান

হওয়ারকে ভয় করছে এবং খেলাফ-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাতঃ (৪২) তারা আপনাকে দ্বিভাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনাকে কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম আন আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করছেন। (৪৬) যেদিন তারা এক দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সজ্জা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সেই ফেরেশতাপদের সারা (কারিকদের) প্রাণ নির্মমভাবে বের করে। শপথ তাদের, সারা (মুসলমানদের আত্মা যদুভাবে বের করে যেন) বাঁধন খুলে দেয়। শপথ তাদের, সারা (আত্মাকে নিয়ে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান হয় যেন) সম্বরণ করে। অতঃপর (যখন আত্মাকে নিয়ে পৌঁছে, তখন আত্মা সম্পর্কে আত্মার আদেশ পালনার্থে) দ্রুত অগ্রসর হয়, অতঃপর (এই আত্মা সম্পর্কে সওয়ারাবের আদেশ হোক অথবা সওয়ারাবের, উত্তর) কার্য নির্বাহ করে। (এসব শপথ করে বলেন যে) কিয়ামত অবশ্যই হবে, সেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুক)। অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী (অর্থাৎ শিংগার দ্বিতীয় ফুক)। অনেক হাদিস সেদিন ভীত-বিহ্বল হবে, তাদের দৃষ্টি (অনুভূতাপের ভারে) নত হবে। (কিন্তু তারা এখন কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলেঃ আমরা কি পূর্বাক্ষয় প্রত্যাভিত হব? (অর্থাৎ যুদ্ধের পর আবার পুনরুদ্ধার হবে কি? উদ্দেশ্য, এটা কিরূপে হতে পারে?) গল্পিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও কি? (উদ্দেশ্য, এটা শুবই কঠিন। যদি এরূপ হয়) তবে তো এ প্রত্যাহ্বর্তন (আমাদের জন্য) সর্বনাশ হবে। (কারন, আমরা তো এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। উদ্দেশ্য মুসলমানদের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ করা যে, তাদের বিশ্বাস অনুসারী আমাদের বিরূতি ক্ষতি হবে। উদাহরণত একজন অন্যজনকে গুডেচার বশবর্তী হয়ে সতর্ক করে বলেঃ এ পথে স্বেয়ো না, সিংহ আছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি অস্বীকারের ছলে কাউকে বলেঃ ভাই, সে দিকে স্বেয়ো না, সিংহ খেয়ে ফেলবে। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সিংহ বলতে কিছুই নেই। অতঃপর খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করে) অতএব, (তারা বুঝে নিক যে, আমার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয়; বরং) এটা তো কেবল এক মহানাদ হবে, সার ফলে তারা চতুষ্কণাৎ ময়দানে অধিকৃত হতে হবে। [অতঃপর রসুলুল্লাহ (স)-কে সাম্বনা দেওয়ার জন্য মুসা (আ) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আপনাকে কাছে মুসা (আ)-র বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুম্মা উপত্যকায় আহ্বান করেন যে, তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। তার কাছে স্বেয়ো বলঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (তোমার সংশোধনের নিমিত্ত) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার (সত্তা ও গুণাবলীর) দিকে পত্র দেখাব, যাতে (তোর সত্তা ও গুণাবলী শুনে) তুমি তাঁকে ভয় কর। [এই সুরের ফলশ্রুতিতে তোমার সংশোধন হয়ে যাবে। এই আদেশ শুনে মুসা (আ) তার কাছে গেলেন এবং পন্নগাম পৌঁছালেন] অতঃপর (সে যখন নবুয়তের নিদর্শন

চাইল, যখন) তিনি তাকে মহানিদর্শন (নবুয়্যতের) দেখালেন (অর্থাৎ লাঠি-অথবা লাঠিও সুস্ত্র হাত)। কিন্তু সে (অর্থাৎ ফিরায়ুন) মিথ্যারোপ করল ও অমান্য করল। অতঃপর [মুসা (আ)-র কাছ থেকে] প্রস্থান করল এবং (উঁর বিরুদ্ধে) চেষ্টা করল। সে (সকলকে) সমবেত করল এবং (তাদের সামনে) সজোরে ঘোষণা করল ও বলল : আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। ('সেরা' কথাটি এমনিতেই প্রশংসার্থে যোগ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য আন্ধ ও পালনকর্তা আছে)। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন (ইহকালের শাস্তি নিমজ্জিত করা এবং পরকালের শাস্তি জাহান্নামে প্রদর্শিত করা)। নিশ্চয় এতে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (অতঃপর কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করার মুক্তিগত জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তোমাদের (পুনর্বীর) সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের? (এটা অন্যের দিক দিয়ে বলা হয়েছে)। নতুবা আল্লাহর পক্ষে সব সৃষ্টিই সমান। বলা বাহুল্য, আকাশের সৃষ্টিই অধিক কঠিন। এই কঠিনতর সৃষ্টিই যখন তিনি সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমাদের সৃষ্টি আর কি কঠিন হবে। অতঃপর আকাশ সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে)। আল্লাহ্ একে নির্মাণ করেছেন, এর ছাদ উচ্চ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন, (যাতে এর মধ্যে ফাটল, ছিদ্র ও জোড়া তালি না থাকে)। তিনি এর রাস্তিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (আকাশের রাস্তি ও আকাশের সূর্যালোক বলার কারণ এই যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দ্বারা দিবারাস্তি হয়। সূর্য আকাশের সাথে সম্পৃক্ত)। এর পক্ষে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং (বিস্তৃত করে) এর মধ্য থেকে এ পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন। তিনি পর্বতকে (এর উপর) প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (আসল প্রমাণ ছিল আকাশ সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবী সর্বদা দৃষ্টির সামনে থাকে বলে সম্ভবত এর উল্লেখ করা হয়েছে)। এছাড়া আকাশের সমান না হলেও মানব সৃষ্টির চেয়ে পৃথিবী সৃষ্টি কঠিনতর। সুতরাং প্রমাণের সারমর্ম এই যে, এমন এমন বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বীর সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? অতঃপর পুনরুত্থানের পর দান প্রতিদানের বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বীর সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে অর্থাৎ মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম সমরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা যাবে, তখন যে ব্যক্তি সীমানাঘন করেছে এবং (পরকালে অবিশ্বাসী হয়ে) পৃথিবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে থাকাকালে) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় করেছে (ফলে কিয়ামত, পরকাল ও হিসাব-নিকাশে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছে) এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (অর্থাৎ বিসৃষ্ট বিশ্বাসসহ সব কর্ম ও সম্পাদন করেছে) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সৎ কর্ম জান্নাতের পথ। এর উপর জান্নাত নির্ভরশীল নয়। কাকিররা অস্বীকারের ফলে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞাসা করত, তাই অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (কেননা, জানা থাকলেই বর্ণনা করা যায়। অথচ আমি এর নিদর্শন সমস্ত কাউকে বলিনি, বরং) এর চরম জান শুধু আপনার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। আপনি তো কেবল

( সংক্লিষ্ট স্ববরের ভিত্তিতে ) এমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেম, যে একে ভয় করে ( এবং ভয় করে ইমার আনে । যারা কিয়ামতের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করছে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, ) যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন ( স্ত্রীদের ) মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র একদিনের শোষণ অথবা এক দিনের প্রথমংশ অবস্থান করেছে । ( অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘজীবন খাটো মনে হবে । তারা মনে করবে জাহাব বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছে । সার কথা এই যে, তড়িঘড়ি কর কেন? যখন আসবে, তখন মনে করবে যে, দ্রুত এসে গেছে । তোমরা এখন যাকে বিলম্ব মনে করছ, তখন কিন্তু তা বিলম্ব মনে হবে না ) ।

আনুশঙ্গিক জাভাব্য বিষয়

نَزَعَ نَارَ عَاتٍ - শব্দটি থেকে উদ্ভূত । অর্থ কোন কিছুকে

উৎপাটন করা । - أَعْرَاقٌ وَ غُرُقٌ - এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে করা । বাক-  
পদ্ধতিতে বলা হয় : - أَعْرَقَ النَّازِعُ فِي الْقَوْسِ - অর্থাৎ তাঁর নিক্ষেপকারী ধনুকে  
পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে । সূর্য্যর গুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে  
তাঁদের শপথ করা হয়েছে । শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে । অর্থাৎ কিয়ামত ও হালক-  
নশর অবশ্যই হবে । ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধান নিয়োজিত  
রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ  
পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে । এই সম্পর্কের  
কারণে সূর্য্য তাদের শপথ করা হয়েছে ।

এছলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে । এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা  
বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত । উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা । মানুষের মৃত্যু ঘারা এই  
বর্ণনা শুরু করা হয়েছে । কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে  
থাকে । কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ । প্রথম বিশেষণ **وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا**

—অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী । এখানে আত্মাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো  
হয়েছে, যারা কাফিরদের আত্মা নির্মমভাবে বের করে । যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে  
থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নয় । এ কারণেই কাফিরদের আত্মা প্রায়ই  
সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মতোই । তার আত্মার উপর  
যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে । এটা তো আল্লাহর উক্তি থেকেই জানা যায় ।  
তাই আলোচ্য আয়াতে স্ববর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে  
বের করা হয় ।

الثَّانِيَةَ نَشْطًا - শব্দটি থেকে উদ্ভূত । অর্থ

বঁধন খুলে দেওয়া । কোন কিছুতে পানি অথবা হাভাস ভতি থাকলে যদি তার বঁধন খুলে দেওয়া

হয়, তবে সেই পানি বা বস্তাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করার এক-এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ক্ষেত্রেশতা মু'মিনের রাহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রাহ কবজ করে—কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধান কোন মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে—যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাকিরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরষাশের আত্মাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ক্ষেত্রেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রাহের সামনে বরষাশের সওয়াল নিয়ামত ও সুসংবাদ ভ্রূসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ **سَبِيحًا—وَالسَّابِقَاتِ سَبِيحًا** এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ

করা। এখানে উদ্দেশ্য শ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণ-টিও মৃত্যুর ক্ষেত্রেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রাহ কবজ করার পর তারা শ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ **فَالسَّابِقَاتِ سَبِيحًا**—উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ক্ষেত্রেশতাগণের

হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌঁছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জাহান্নাম এবং কাকিরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আত্মাবের জাহান্নাম পৌঁছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ **فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا**—মৃত্যুর ক্ষেত্রেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই

যে, যে আত্মাকে সওয়াল ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য সওয়াল ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং স্বাক আত্মাব ও কন্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আত্মাব ও কন্টে রাখার ব্যবস্থা করে।

কবরে সওয়াল ও আত্মাব : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষেত্রেশতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রাহ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় শ্রুতবেগে পৌঁছিয়ে দেয় ও সেখানে সওয়াল অথবা আত্মাব এবং কন্টে অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আত্মাব ও সওয়াল কবরে অর্থাৎ বরষাশে হবে। হাশিরের আত্মাব ও সওয়াল এর পরে হবে। সহীহ হাদীসসমূহে এর বিলাদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মসনদে আহমদের বরাতে দিয়ে মেশকাত্তে এতদসম্পর্কিত হযরত বারী ইবনে আযেব (রা)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফস ও রাহ সম্পর্কে কাশী সানাউল্লাহ (র)-র উপাদেশ বক্তব্য : তফসীরে মায-হারীর বরাতে দিয়ে নফস ও রাহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে

উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাহী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

হযরত বারা ইবনে আয়েব (রা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফস উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সৃষ্টি দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের রূহ একটি অশরীরী আত্মাহুত নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ। কারণ, দেহের জীবন নফসের উপর এবং নফসের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফসের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ প্রকৃতি ব্যতীত কেউ জানে না। নফসকে আত্মাহুত তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফস যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব-দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এই সৃষ্টি দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সৃষ্টি দেহ সম্পর্কেই উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সৃষ্টি দেহই সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সৃষ্টি দেহ অর্থাৎ নফসের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আশ্রয় এবং সওয়াবও নফসের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফসেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ ইঞ্জিয়ানে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফসের সওয়াব এবং আশ্রয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ কবরে থাকে কথ্যটি নফস কবরে থাকে অর্থে বিগুল্ক এবং নফস রূহ জগতের অথবা ইঞ্জিয়ানে থাকে কথ্যটি রূহ থাকে অর্থে নিছুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়াজের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফিরদের আপত্তি ও তার জওয়াব

উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : **سَاهِرَةٌ - فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ**

অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে তুর্পট সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই **سَاهِرَةٌ** বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবস্থাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রসুলুল্লাহ (সা) যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মুসা (আ) ও ফিরআউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী

পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

نَكَالٌ — শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক

শাস্তি, স্বা দেখে অন্যরাও আভঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالٌ الْآخِرَةُ হল ফিরাউনের পরকালীন আশাব এবং نَكَالٌ الْاُولَى -দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আশাব। অতঃপর মরে মাটিতে পলিপত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরাপে হবে! কাফিরদের এই বিস্ময়ের জওয়ার দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবখান মানুষকে হাশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিস্যামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জালাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জালাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, ফস্ফারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জাহান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলায় কারণ এই যে, অনেক জাহান্নাত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপারিশে অথবা সরাসরি আজ্জাহর রহমতে কোন কোন জাহান্নামীকে জাহান্নাতে পৌঁছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জাহান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, স্বা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে। فَأَمَّا مَنْ طَغَى

وَإِثْرَ الْعَهْوَةِ الدُّنْيَا — এক. আজ্জাহ তা'আলা ও তাঁর রসুলের অবাধ্যতা করা।

দুই. পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অপ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আশাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অপ্রাধিকার দেওয়া।

দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَانَّ

الْجَحِيمِ هِيَ الْمَأْوَى — অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জালাতীদেরও দুটি

বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى



النَّفْسَ مِنَ الْهَوَىٰ -এক. দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরাপ উন্নত করা যে, একদিন

আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হলে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। দুই: অবৈধ খেলাল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় : **فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** -

অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

খেলাল-খুশীর বিরোধিতার তিন স্তর : আলোচ্য আয়াতে জান্নাত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ, প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দ্বিতীয় শর্ত নিজেকে খেলাল-খুশী থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয়ই মানুষকে খেলাল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাহ্বী সানাউল্লাহ পানিপথী (র).তফসীরে মাশহুরীতে খেলাল-খুশীর বিরোধিতার তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তর এই যে, যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কোরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌঁছলেই সে সূন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোন গোনাহ করার সময় আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোন জায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোন নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার অশংকা দেখা দিলে সেই জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিণতি। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবর ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরিশেষে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। যে কাজে জায়েয ও নাজায়েয উত্তমবিধ সম্ভাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কাজটি তার জন্য জায়েয নাজায়েয। উদাহরণত জনৈক রুগ্ন ব্যক্তি অল্প করতে সক্ষম কিন্তু অল্প করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবস্থায় তায়াশুম করা জায়েয কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে কিন্তু খুব বেশী কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয কিনা তা সন্দেহ হয়ে গেল। এরাপ ক্ষেত্রে সন্দেহ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়েয কাজ করা তাকওয়া এবং খেলাল-খুশীর বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নফসের চরিত : যেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ, সেসব বিষয়ে খেলাল-খুশীর বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু খেলাল-খুশী এমনও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্মে शामिल হয়ে যায়। রিযা, নাম-যশ, আত্মপ্রীতি এমন সুক্ক গোনাহ ও খেলাল-খুশী, যাতে মানুষ প্রায়শই ধোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে

সঠিক ও যিওক্ত মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করাই সর্ব-প্রথম ও সর্বাধিক জরুরী। কিন্তু এ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র অব্যর্থ ও অমোহ ব্যবস্থাপন আছে। তা এই যে, এমন শায়খে-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যিনি কোন সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নফসের দোষত্রুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শায়খ-ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন : আমি প্রথম বয়সে কাঠমিস্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মতো এক প্রকার শৈথিল্য ও অজ্ঞকার অনুভব করে কয়েকদিন রোযা রাখার ইচ্ছা করলাম, যাতে এই অজ্ঞকার ও শৈথিল্য দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোযা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শায়খে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মেহমানদের জন্য গৃহ থেকে আহ্বার্থ আনিলেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। জন্তঃপর বললেন : যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীর বান্দা, সে অত্যন্ত মন্দ বান্দা। এই খেয়াল-খুশী তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেন : খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়ে যে রোযা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে নেওয়াই উত্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে ফেলেন। তখন আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, যিকর-আযকার ও নফল ইবাদতে কোন শায়খে-কামেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা, শায়খে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুঝেন। যে নফল ইবাদতে নফসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শায়খের নিকট আর্হ করলাম, হযরত, পরিভাষায় থাকে ফানাফিলাহ্ ও বাকাবিলাহ্ বলা হয়, এলাপ শায়খ পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেন : এলাপ পরিহিতিক-সম্বন্ধীনে হলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইন্তেগফার করা উচিত। কেননা, রসূলে করীম (সা) বলেন : আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মজিনতা অনুভব করি। তখন আমি প্রত্যহ একশ বার ইন্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক যিকর, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে এমন পবিত্র করা, যাতে খেয়াল-খুশীর চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওজীহের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সুফী বুয়ুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিলাহ্ ও বাকাবিলাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণীর ওজীগণের সম্পর্কেই কোরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

إِنَّ عِبَادِي لَكَ لَمَعِينٌ — অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের

উপর ভোর কোন ক্ষমতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : لَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ هُوَ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُنَّتْ بِهِ — অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ততক্ষণ কামেল মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার খেয়াল-খুশী আমার শিকার অনুসারী না হয়ে যায়।

কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এই সংবাদ কোন ফেরেশতা অথবা রসূল (সা)-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবী অসার।

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ ۙ يَزْكُرُ ۙ اَوْ يَذْكُرُ  
 فَنَنْفَعُهُ الذِّكْرَ ۙ اَمَّا مِنْ اَسْتَعْفَىٰ ۙ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۙ وَمَا عَلَيْكَ اَلَا  
 يَزْكُرُ ۙ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۙ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۙ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۙ كَلَّا اِنَّهَا  
 تَذْكِرَةٌ ۙ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۙ فَمَنْ شُحِفَتْ تُكْرِمُهُ ۙ فَمَنْ زُوغِرَتْ مُطَهِّرُهُ ۙ بِاَيْدِي  
 سَفَرَةٍ ۙ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۙ قَبِيلَ الْاِنْسَانِ مَا اَكْفَرَةٌ ۙ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۙ  
 مِنْ لُطْفَةٍ ۙ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۙ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ ۙ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَہُ ۙ ثُمَّ  
 اِذَا شَاءَ اَنْشُرُهُ ۙ كَلَّا لَئِن اَقْبَضْنَا مَا اَمْرُهُ ۙ فَلَا يَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَايَةِ ۙ  
 اَلَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۙ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ فَاَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۙ وَوَعْبًا  
 وَغَضْبًا ۙ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۙ وَحَدَاقٍ عَلْبًا ۙ وَفَاكِهَةً وَابْجًا ۙ مَتَاعًا  
 لَكُمْ ۙ وَلَا تَعْلَمُكُمْ ۙ فَاِذَا جَاءَتْ السَّاعَةُ ۙ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ۙ  
 وَاٰوِيهِ ۙ وَاٰوِيهِ ۙ وَصَاحِبَتِهٖ ۙ وَبَيْنِيهِ ۙ لِكُلِّ اَمْرٍ ۙ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ  
 يُغْنِيهِ ۙ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۙ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۙ وَوُجُودٌ  
 يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۙ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجِرَةُ ۙ

## পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) তিনি দ্রুতক্রিয় করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তার কাছে এক অজ্ঞ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হঠাৎ পরিণত হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবতা করলেন। (১১) কখনও এরাপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে কবুল করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত আছে স্পষ্টমানিত, উচ্চ, পবিত্র পরসমূহ, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) স্বারা মহত, পৃথঃ চরিত। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুধু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুপরিমিত করেছেন তাকে (২০) অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর তখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি ভয়ত বা ভাদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার ধর্ম্যের প্রতি লজ্জা কৃতজ্ঞ। (২৫) আমি আশ্চর্য উপায় পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এরপর আমি সৃষ্টিক কীর্তি করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আলুর, শাক-সবজি, (২৯) ফলদ্রব্য, গম্বীর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ সন্তানের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পরাভব করবে মানুষ তার জ্ঞাতার কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিছকের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফির সার্গিকের দল।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে-নুযুল : এসব আয়াতে অবতরণের কাহিনী এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে বসে কিছু মুশরিক সন্ন্যাসকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন কোন রেওয়াজে তাদের এই নামও বর্ণিত আছে—আবু জাহ্ল ইবনে কিলাম, ওতবা ইবনে স্ববায়ী, উম্মাই ইবনে খলুফ, উমাইয়া ইবনে খলুফ। ইতিমধ্যে অজ্ঞ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মেয় মকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। এই বাক্য বিরতিতে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং তার দিকে তাকালেন না। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। স্বখন তিনি মজলিস ত্যাগ করে গৃহে রওতানা করেন, তখন গৃহীর লক্ষণাদি ফুটে উঠল এবং আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল। এই ঘটনার পর স্বখনই এই অজ্ঞ সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসলেন, তখনই তিনি তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রদর্শন করলেন।—(দুররে মনসূর) আয়াতে এই ঘটনা স্মরণে করা হয়েছে :

পরশম্বর (সা) প্রাকৃষ্টিত করলেন এবং তাঁকাজেন না। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (এখানে অনুপস্থিত পদবাচ্যে বলা হয়েছে। এতে বড়ার চরম দয়া ও অনুকম্পা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে। কারণ, এতে প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি দোষারোপ করা হয়নি। অতঃপর বিমুখতার সন্দেহ দূরীকরণার্থে উপস্থিত পদবাচ্যে বলা হচ্ছে : আপনি কি জানেন সে (অর্থাৎ অন্ধ সাহাবী আপনার শিক্ষা দ্বারা) হয়তো (পুরোপুরি) শুদ্ধ হত অথবা (কমপক্ষে কোন বিশেষ ব্যাপারে) উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার (কিছু না কিছু) উপকার হত। পরন্তু যে ব্যক্তি (ধর্ম থেকে) বেপরোয়া আপনি তার চিন্তায় মগ্ন হন। অথচ সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (তার বেপরোয়া ভাব উল্লেখ করে তার প্রতি বেশী মনোযোগী না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। যে ব্যক্তি আপনার কাছে (দীনের আগ্রহে) দৌড়ে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে, আপনি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। [এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর ইজতিহাদী ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই ইজতিহাদের উৎস ছিল এই যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে সম্পাদন করাই সর্বজনস্বীকৃত। রসূলুল্লাহ (সা) কুফরের ভীততাকে গুরুত্বের কারণ মনে করেছেন। উদাহরণত যদি ডাক্তারের কাছে একজন কলেরা রোগী ও একজন সর্দিরোগী একই সময়ে উপস্থিত হয়, তবে কলেরা রোগীর চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার উজির সারমর্ম এই যে, রোগের ভীততা তখনই গুরুত্বের কারণ হবে, যখন উভয় রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী হয়। কিন্তু গুরুতর রোগী যদি চিকিৎসা প্রত্যাশীই না হয় বরং চিকিৎসার বিরোধিতা করে, তবে যে রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী সে-ই অগ্রাধিকার পাবে যদিও তার রোগ খুব হালকা হয়। অতঃপর মুশরিকদের প্রতি এত বেশী মনোযোগী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছে : আপনি ভবিষ্যতে] কখনও এরূপ করবেন না। (কেননা) কোরআন (নিছক একটি) উপদেশবাণী। (আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা)। অতএব, যে ইচ্ছা করবে সে একে কবুল করবে। (যে কবুল করবে না, তার কারণে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? অতঃপর কোরআনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে) এটা (অর্থাৎ কোরআন লওহে মাহফুযের) সম্মানিত, (অর্থাৎ পছন্দনীয় ও মকবুল) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (কেননা, লওহে মাহফুয আরাশের নিচে অবস্থিত) পবিত্র সহীফাসমূহে লিখিত আছে (দুর্মতি শয়তান সেখানে পৌছতে পারে না। আল্লাহ বলেন : لا يمسها

إلا المطهرون) মহৎ ও পূতঃ চরিত্র লিপিকারদের (অর্থাৎ ফেরেশতাগণের) হস্তে।

[এসব গুণ ভাণন করে যে, কোরআন আল্লাহর কিতাব। লওহে-মাহফুযে একই বস্তু। কিন্তু এর অংশসমূহকে সুহফ (সহীফাসমূহ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণকে লিপিকার বলা হয়েছে। কারণ, তারা আল্লাহর আদেশে লওহে মাহফুয থেকে লিপিবদ্ধ করে। আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশবাণী। আপনি উপদেশ গুনিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবেন—কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। সুতরাং এ ধরনের

অপ্রাধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর কাফিরদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে] মানুষ (অর্থাৎ কাফির মানুষ, যারা এহেন উপদেশবাণী দ্বারা উপকৃত হয় না, যেমন আবু জাহ্ন প্রমুখ। তারা) ধ্বংস হোক। সে কত অকৃতজ্ঞ! (সেদেখে নাযে) আল্লাহ্ তাকে কি বস্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন, (অর্থাৎ তুচ্ছ বস্ত) গুরু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুপরিমিত করেছেন, অতঃপর তার (বের হওয়ার) পথ সহজ করেছেন। (সেমতে এমন অপ্রশস্ত জাফলা দিয়ে এমন সূঠাম শিশুর নিবিয়ে বের হয়ে আসা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও শক্তিমতাই জ্ঞাপন করে)। অতঃপর (বয়স শেষ হলে) তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র এসব কর্ম প্রমাণ করে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন এবং তাঁর নিয়ামত ভোগ করে। সূতরাং তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা জরুরী ছিল। কিন্তু) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি এবং তিনি যে আদেশ করেছিলেন, তা পূর্ণ করেনি। অতএব, মানুষ (তার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার পর বেঁচে থাকা ও আরাম-আয়েশ করার উপকরণাদির প্রতি লক্ষ্য করুক। উপা-হরণত সে) তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (যাতে তা কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও ঈমান আনার কারণ হয়। অতঃপর লক্ষ্য করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, ময়তুন, খজুর, ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস। (কিছু) তোমাদের ও (কিছু) তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (এগুলো নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণ। এ-গুলোর প্রত্যেকটি কৃতজ্ঞতা ও ঈমান দাবী করে, অতঃপর উপদেশ কবুল না করার শাস্তি ও কবুল করার সওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তারা অকৃতজ্ঞতা ও কুফর করে) অতঃপর যেদিন কর্তাবিদারক নাদ আসবে, (অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হবে, তখন সব অকৃতজ্ঞতার মজা টের পেলে হবে। অতঃপর সেদিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে) সেদিন (উপরে বর্ণিত) মানুষ পলায়ন করবে তার স্ত্রী, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি দরদ দেখাবে না, যেমন অন্য আয়াতে আছে

لَا يَسْتَلِحُّ حَمِيمٌ حَمِيمًا — (কারণ) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা

তাকে অপর থেকে নিলিপ্ত রাখবে। (অতঃপর মু'মিনদের ও কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন (ঈমানের কারণে) উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন কুফরের কারণে, ধূলি ধূসরিত হবে। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির, পাপাচারীর দল। (কাফির বলে ভ্রান্ত বিশ্বাসী এবং পাপাচারী বলে ভ্রান্ত কর্মী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

### আনুমানিক জাতব্য বিশ্বয়

শানে নুযুলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উশ্ম-মকতুম (রা)-এর ঘটনার ইমাম বগভী (র) আরও রেওয়াজেত করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন।

তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বান্ধবের আওয়াজ দেন।—(মাস্‌হারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়াজেতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মক্কার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরাপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উশ্ম মকতুম (রা)-র এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। এর বিপরীত কোরআনে নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোন সময় তাদের কাছে তবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাভীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপর্যায় ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উশ্ম মকতুম (রা)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফির নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাশিল হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাকে কিছু হাশিয়ায় করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্বত্রই গোনাহ। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উশ্ম মকতুম (রা) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হাশিয়ায় করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জওয়াবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদী, কথা শুনেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত। অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া স্বাভাবিক? এটা সত্যি যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উশ্ম মকতুম (রা)

মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কোরআন **أَمْحَى** শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওষর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমাই ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাল্ল ছিলেন না। এ থেকে জানা যায়



যে, কোন অপারক ব্যক্তির দ্বারা অভ্যন্তরীণ মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিস্কার্য হবে না।

مَسَّ وَتَوَلَّى — প্রথম শব্দের অর্থ রুগ্নতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে

বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে উৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী

وَمَا يُدْرِيكَ (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওষরের দিকে

ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোমোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফিরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অসহনীয় কণ্ঠের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّ يَزُكِّيْ أَوْ يَذْكُرُ تَنْفَعَهُ الذِّكْرُ — অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই

সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তন্দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। زُكِّي- শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহল পরিমাণে স্মরণ করা।— (সিহাহ্)

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— يَذْكُرُ ও يَزُكِّي — প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ভীরুদের স্তর। স্বারা নফসকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাঁফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ, যে আল্লাহর পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত করা হয়—যাতে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতই—প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। —(মাস্হাবী)

প্রচার ও বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ কোরআনী মূলনীতি : একেই রসূলুল্লাহ্ (স)-র সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়—১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তত্ত্ব বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হিদায়তের দিকে মনোযোগ। কোরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ছুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সম্পর্কে দুরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যার্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কোরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو  
دیروالے کج ادا کھدین یہ پدنا می بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাক এ বিষয়টিই পরিকারভাবে বর্ণনা করেছে।

مَا مِنْ اُمَّةٍ اَسْتغْنٰی فَاَنْتَ لَهَا تَصَدٰی

প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মগন আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অশ্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আত্মাকে উন্নত করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

مَهْفٰنِیْ مَكْرَمًا مَّرْفُوْعًا مَطْهُرًا

হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহু-বচনে প্রকাশ করা হয়েছে।

مَكْرَمًا-বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং  
مَطْهُرًا-বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং আবুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

مَا فَرَّكَ سَفْرًا - بِاَيْدِیْ سَفْرًا كِرَامٍ بَرَرًا

হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেলামুন-কাতেবীন অথবা পন্নগম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আক্বাস (রা) ও মুজাহিদ (রা)-এর তফসীর।

سَفَرَةٌ-শব্দটি سَفَرٌ এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পন্নগম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ের কিরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রসুলুল্লাহ (সা) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কিরা'আতে বিশেষত কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষত নব্ব্ব কিন্তু কল্ট-শ্বট কিরা'আত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কিরা'আতের সওয়াবও কল্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষত ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাযহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ

أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, যে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না।

তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন : مِنْ نُّطْفَةٍ—অর্থাৎ মানুষকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি

করেছেন। خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ—অর্থাৎ কেবল বীর্ষ থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুর্লভ হয়ে যেত।

قَدَرَهُ-শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ স্বখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাপ লিখে দেন। ১. সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, ২. তার বয়স কত হবে, ৩. কি পরিমাণ স্নিগ্ধ পাবে এবং ৪. পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগ্য হবে।—(বুখারী, মুসলিম)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। স্বীয় গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তা'আলার অপার

শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীসাল্যামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ—নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার

পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নিয়ামত। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : نَحْفَةُ-

الموت মৃত্যু মূ'মিনের জন্য উপটৌকনস্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত

রয়েছে। فَأَقْبَرَهُ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও

এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাঁফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ—এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,

আল্লাহর উপরোক্ত নিদর্শনাবলী ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিষিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিস্বামতের প্রসঙ্গ জানা হয়েছে।

فَإِذَا جَاءَتِ الْمَأْتَةُ—এমন কঠোর নাদ, স্বর ফলে মানুষ প্রবণ

শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিস্বামতের হট্টগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَغْرُرُ الْمُرءُ مِنْ أَخِيهِ—এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের

দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন

দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে—পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফিরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

---

سورة التکویر

সূরা তাকুইর

মক্কায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ১ রুক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَاِذَا  
الْاَشْجَارُ عُثِّلَتْ ۝ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّفُوسُ  
رُجِرَتْ ۝ وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِّتَتْ ۝ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَاِذَا الصُّحُفُ  
نُشِرَتْ ۝ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُورَتْ ۝ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝  
عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۝ فَلَا اَقْبِمُ بِالْحَفِيسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنُسِ ۝ وَالنَّيْلِ  
اِذْ اَنْعَسَ ۝ وَالصُّبْرِ اِذَا تَنْفَسَ ۝ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ  
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ اٰمِيْنٍ ۝ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝  
وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْاُفُقِ الْمَيْمِيْنِ ۝ وَمَا هُوَ عَلَيَّ الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ  
شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝ فَاَيْنَ تَذٰهَبُوْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ لِمَنْ شَاءَ  
مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝ وَمَا تَشَاءُوْنَ ۝ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অগসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উতাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আকাশসমূহকে মূল করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে

(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামে অগ্নি প্রকলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জাহ্নাত, সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমনকালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সন্মানিত রসুলের জানীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে রূপগতা করেন না। (২৫) এটা বিভাঙ্কিত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, (২৮) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আল্লাহ রুকুল আলামীনের জতিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

**তরসীরের সার-সংক্ষেপ**

যখন সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র খসিষ্ট হবে, যখন পর্বতমালা চালিত হবে যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য জন্তুরা (অস্থির হয়ে) একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (এই ছয়টি ঘটনা প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার সময় হবে। তখন দুনিয়া জনবসতিপূর্ণ হবে এবং শিংগা ফুঁকের ফলে এসব বিবর্তন সংঘটিত হবে। উষ্ট্রী ইত্যাদিও স্ব-স্ব অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং কতকগুলো উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসবের নিকটবর্তী হবে। এ ধরনের উষ্ট্রী আরবদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তারা সর্বরূপ এগুলোর দেখাশোনা করে। কিন্তু তখন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কারও কোন কিছুই দিকে লক্ষ্য থাকবে না। বন্য জন্তুরাও অস্থির হয়ে একদল অপর দলের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সমুদ্রে প্রথমে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে এবং ভূমিতে ফাটল সৃষ্টি হবে। ফলে সব

মিষ্টি ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাবে। **وَإِذَا الْبِحَارُ رُجِبَتْ** আয়াতে এর উল্লেখ

করা হয়েছে। এরপর উত্তাপের আতিশয্যে সব সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হবে। সম্ভবত প্রথমে বায়ু হয়ে পরে অগ্নি হয়ে যাবে। এরপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর যে ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। ঘটনাগুলো এই) যখন এক এক শ্রেণীর লোককে একত্র করা হবে, (কাফির আলাদা, মুসলমান আলাদা, তাদের মধ্যে এক এক তরীকার লোক আলাদা আলাদা)। যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য প্রোথিতকারী নরপিশাচদের অপরাধ প্রকাশ করা) যখন আমলনামা খোলা হবে

(যাতে সবাই নিজ নিজ আমল দেখে নেয়, যেমন অন্য আয়াতে আছে : **يَلْقَاهُ مَنْشُورًا**)

যখন আকাশ খুলে যাবে, (ফলে আকাশের উপরিস্থিত বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হবে। এছাড়া

আকাশ খুলে যাওয়ার ফলে ধূসরাপি বহিত হতে থাকবে **يَوْمَ تَشُقُّ السَّمَاءُ** - আয়াতে

স্বার উজ্জ্বল করা হয়েছে)। স্বখন আহাম্মাদ (আরও বেশী) প্রজ্ঞিত করা হবে এবং জালাতকে নিকটবর্তী করা হবে (প্রথম ফুক ও দ্বিতীয় ফুকের এসব ঘটনা স্বখন সংঘটিত হয়ে থাকে, তখন) প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিলে এসেছে। (এই ছাদস্ববিদারক ঘটনা স্বখন হবে, তখন আমি অবিশ্বাসীদেরকে এর স্বরূপ বলে দিচ্ছি এবং বিশ্বাসীদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করছি। কোরআন যেনে নিলে এবং তদনুযায়ী কাজকর্ম করলে এই উভয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কোরআনে এর প্রমাণ এবং মুক্তির পছা আছে। তাই) আমি শপথ করি সেসব নক্ষত্রের, যেগুলো (সোজা চলতে চলতে) পশ্চাতে সরে স্বায় (অতঃপর) পশ্চাতেই (চলমান হয় এবং পশ্চাতে চলতে চলতে এক সময় উপস্চাচলে) অদৃশ্য হয়ে স্বায়। (পাঁচটি নক্ষত্র এরূপ করে। এগুলো কখনও সোজা চলে, কখনও পশ্চাতে চলে। এরা হচ্ছে শনি, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ)। শপথ নিশা অবসান ও প্রভাত আগমন কালের, (অতঃপর জওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে) এই কোরআন একজন সম্প্রামিত ফেরেশতার অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর আনীত কালাম, যিনি শক্তিশালী, আঙ্গনের মালিকের কাছে মর্ষাদাশীল, সেখানে (অর্থাৎ আকালে) তাঁর কথা মান্য করা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতার তাঁকে মানে। মিরাজের হাদীস থেকেও একথা জানা স্বায়। তাঁর আদেশেই ফেরেশতাগণ আকালের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছিল এবং তিনি) বিশ্বাসভাজন (তাই বিশ্বাস-ভাবে ওহী পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর স্বায় প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে : ) তোমাদের সাধী [ অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) স্বায় অবছা তোমরা জান ] উম্মাদ মন্ন (নবুয়ত অস্বীকারকারীরা তাই বলত)। তিনি ফেরেশতাকে (আসল আকৃতিতে আকাশের) পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেনও (পরিষ্কার দিগন্ত অর্থ উর্ধ্বদিগন্ত, যা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সূরা নজমে আছে

وَهُوَ بِآلَافِ اَلْاَعْلَىٰ )। তিনি অদৃশ্য (অর্থাৎ

ওহীর) বিশ্বাসদিতে কৃপণতা করেন না (অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাই করত। তারা অর্থের বিনি-ময়ে কোন বিষয় প্রকাশ করত। এতে করে স্বেন বলা হয়েছে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং নিজের কাজের কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) কোন বিতাড়িত শরতানের উক্তি নয়। [ এতে পূর্বাঙ্ক ‘অতীন্দ্রিয়বাদী’ নন কথাটি আরও জোরদার হয়ে গেছে। সারকথা এই স্বে, মুহাম্মাদ (সা) উম্মাদ নন, অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং অর্থহোজীও নন। তিনি ওহী নিলে আগমনকারী ফেরেশতাকে চিনেনও। এই ফেরেশতাও অনুরূপ গুণ-সম্পন্ন। সুতরাং এই কোরআন অবশ্যই আলাহর কালাম এবং তিনি আলাহর রসুল (সা) উপরোক্ত শপথগুলো উদ্দিষ্ট বিষয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। নক্ষত্রসমূহের সোজা চলা, পশ্চাৎগামী হওয়া ও অদৃশ্য হওয়া ফেরেশতার আগমন-নির্গমন ও উর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হওয়ার সাথে মিল রাখে এবং নিশার অবসান ও প্রভাতের আগমন কোরআনের কারণে কক্ষরের অক্ষকার দূরীভূত হওয়া এবং হিদায়ত জ্যোতির আগমনের অনুরূপ]। অতএব তোমরা (এ ব্যাপারে) কোথায চলে যাচ্ছ (এবং কেন নবুয়ত অস্বীকার করছ) ? এটা তো (সাধারণভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ (এবং বিশেষভাবে) এমন ব্যক্তির জন্য, স্বে তোমাদের মধ্যে সোজা চলার ইচ্ছা করে। (কোরআন সোজা পথ বলে দেয়, এদিক



দিয়ে কোরআন সাধারণ লোকদের জন্য হিদায়ত এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত এই অর্থে যে, তাদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। কেউ কেউ কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করে না, এতে কোরআন উপদেশবাণী নয় বলে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কেননা) রাক্বুল আজামীন আজ্জাহর অভিজ্ঞায়ের বাইরে তোমরা অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না (অর্থাৎ এটা উপদেশবাণী ঠিকই কিন্তু এর কার্যকারিতা আজ্জাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যা কতকের জন্য হয় এবং কতকের জন্য রহস্যবশত হয় না)।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ—এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী

(র) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খালসাম (র) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উড়ানে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ বুখারীতে আবু হোরায়রা (রা)-র রেওয়াজে তক্রমে রসূলুজ্জাহ (সা) বলেন : কিস্বামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মসনদে আহমদে আছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই অর্থাৎ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিস্বামতের দিন আজ্জাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল ঝড়াস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরত্ববী)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ—এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীশ্লোক থেকে

এই তফসীরই বলিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়াজে তক্রমে এই বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ—আরবের স্নীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তরূপে একথা বলা

হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সতর্কতা করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিতনা এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا لِبَعَارُ سُجِّرَتْ—এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা।

হযরত ইবনে আক্বাস (রা) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে জোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে।— (মাযহারী)

وَأَذِ النَّفُّوسُ زُوجَاتٍ—অর্থাৎ যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন

দলে দলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফির এক জায়গায় ও মু'মিন এক জায়গায়। কাফির এবং মু'মিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফিরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মু'মিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়াজেত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদকারী গাঈগণ এক জায়গায় এবং সদকা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারিগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যাভিচারীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً—আম্নাতখানি পেশ করেন।

অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে—১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুল শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফির পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

وَأَذِ الْمَوءُودَ سَلْتٍ—এর অর্থ জীবন্ত প্রোধিত কন্যা।

মুখ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোধিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে। আম্নাতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোধিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদূর্ভেট জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহর কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোধিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো **يوم الحساب** (হিসাব দিবস), **يوم الدين** (বিচার দিবস) ও **يوم الجزاء** (প্রতিদান দিবস)।

এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ মুহূর্তে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এত গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোন বাদী নেই, বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কাল্পনিক হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে জানা হবে, যার কোন সাক্ষ্য নেই এবং কোন দাবীদার নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শাসিত : শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শাসিত। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারকতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোন জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়।—(মাযহারী)

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পছা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ্ (সা) একেও **وَاد خَفِي**—অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন।—

(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়াজে 'আহল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্ষ গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা) থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বলিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যন্নারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরীয়তে কোনক্রমেই এর অনুমতি নেই।

**وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ**—এর আভিধানিক অর্থ জ্বল চামড়া ধসানো।

বাহ্যত এটা প্রথম ফু'কের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিষ্কিন্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে **كُشِطَ**—শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তরুসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুলিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুলিয়ে নেওয়া হবে।

**عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخِّرَتْ**—অর্থাৎ কিয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে

প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম—সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে—আমজনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরাপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কল্পে একটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কোরআন সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে খুব হিফাযত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোন সম্প্রদায়ের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে **خمسة متنجير** -

(অজুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরাপ বলার কারণ এগুলোর অজুত গতিবিধি। কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনটিকে সমর্থন করে এবং কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কোরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহর অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

**إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ**—অর্থাৎ এই কোরআন একজন সম্মানিত

দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহর বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার আশংকা নেই। এখানে **رسول كريم** বলে বাহ্যত জিবরাঈল (জিব্রীল)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গাম্রগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (জিব্রীল)-এর জন্য বিনাবিধায় প্রযোজ্য।

তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : **عَلِمَ شَدِيدُ الْقُوَى** -

তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মিরাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুজ্জাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতা-তারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে **أمين**—তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনা-

সাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ **رسول أمين**—এর অর্থ নিয়েছেন, মুহাম্মদ (সা)। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সর্দর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য এবং কাফিরদের অলৌক অভিযোগের জওয়াব দেওয়া

হয়েছে। **وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ**—স্বারা রসূলুজ্জাহ্ (সা)-কে উদ্ভাদ বলত,

এতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। **وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُنْفِ الْمُبِينِ**—অর্থাৎ

তিনি জিবরাঈল (আ)-কে প্রকাশ্যদিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে: **فَأَسْتَوَىٰ وَهُوَ**

**بِالْأُنْفِ الْأَعْلَىٰ**—এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমন-

কারী জিবরাঈল (আ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসন্ন আকার-অবস্থিতিতেও দেখে-  
ছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

سورة الانفطار

## সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكُوْكُبُ اَنْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ اُنْفَجَرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ

بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ ۝ وَاَحْرَتْ ۝ بِاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَبَكَ

بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۝ الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ

رَبِّكَ ۝ كَلَّا بَلْ كُنَدِبُوْنَ بِالَّذِیْنِ ۝ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۝ كِرَامًا

كَاتِبِیْنَ ۝ یَعْلَمُوْنَ مَّا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۝ وَاِنَّ الْفٰجِرَ

لَفِیْ جَحِیْمٍ ۝ یَصْلُوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغٰیِبِیْنَ ۝ وَمَا

اَدْرٰكُ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۝ ثُمَّ مَّا اَدْرٰكُ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۝ یَوْمَ لَا تَمَلِكُ

نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَعِیًا ۝ وَاَلَا تُرٰوِیْءُ یَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ করে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিজ্ঞাত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুখম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিজ্ঞাত হনো না বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত আছে (১১) সম্প্রদিত জামল লেখকহন্দ। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সংকর্ষনীলগণ থাকবে জানাতে (১৪) এবং দুর্কর্মীরা থাকবে

জাহান্নামে, (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

স্বখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, স্বখন নক্ষত্রসমূহ (খসে) ঝরে পড়বে, স্বখন (মিঠা ও লোনা) সমুদ্র উদ্বেলিত হবে (এবং একাকার হয়ে যাবে, যেমন পূর্বের সূর্য্য বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনায় প্রথম ফুঁকের সময়কাল। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁকের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছেঃ) স্বখন কবরসমূহ উদ্বেলিত হবে (অর্থাৎ ভিত্তর থেকে মৃতরা বের হয়ে আসবে, তখন) প্রত্যেকেই তার আগে গিছের কর্ম জেনে নেবে। (এসব ঘটনার পরিলক্ষিত্তে মানুষের উচিত ছিল পাস্বিলন্তির নিদ্রা পরিহার করা। কিন্তু মানুষ ভা করেনি। তাই অতঃপর এ সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছেঃ) যে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব পালনকর্তা থেকে বিদ্রাভ করল, যিনি তোমাকে (মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাকে সুশ্রম করেছেন অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রেখেছেন) তিনি তোমাকে ইচ্ছামত আকৃতিতে পঠন করেছেন। কখনও বিদ্রাভ হওয়া উচিত নয়, (কিন্তু তোমরা বিরত হচ্ছে না) বরং (এতটুকু অগ্রসর হচ্ছে যে) তোমরা প্রতিদান ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছ। (অথচ এর মাধ্যমেই বিদ্রাভি দূর হতে পারত। তোমাদের এই মিথ্যা বলাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং আমার পক্ষ থেকে) তোমাদের উপর ভাবাব্যয়ক নিশ্চুত রয়েছে (তোমাদের ক্রিয়াকর্ম স্মরণ রাখার জন্য। তারা আমার কাছে) সম্মানিত, (তোমাদের কর্মসমূহ) লেখকরূপে। তোমরা স্বা কর, তারা তা জানে (এবং লেখে। সুতরাং ক্রিয়ামতে এসব কর্ম পেশ করা হবে—তোমাদের কুফর ও মিথ্যা মনে করাও এতে থাকবে। অতঃপর উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। ফলে) সৎকর্মশীলরা থাকবে জাহান্নামে এবং দুষ্কর্মীরা (অর্থাৎ কাফিররা) থাকবে জাহান্নামে। তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে (এবং প্রবেশ করে) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না (বরং চিরকাল থাকবে)। আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? অতঃপর (আবার বলি) আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? (এর উদ্দেশ্য ভয়া-বহতা প্রকাশ করা)। যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সব কর্তৃত্ব আল্লাহরই হবে।

### আনুশঙ্গিক ভাষ্য-মিশর

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ—অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্র-

সমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার ক্রিয়ামতের ঘটনা স্বখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি

অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিরম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সমস্ত পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, ষতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ্ লিখিত হতে থাকবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের উল্লেখ

কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ডুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রর করা হয়েছে: হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্‌র নাকরমানী শুরু করেছে?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَّلَكَ — অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, রন্ধা, অঙ্গ, পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুসম মেসাজ তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে

একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ



مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - হে অনবধান মনব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব

গুণ সম্বিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আজাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় এই বিস্ময় কিরূপে হল? এখানে **كريم** - শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আজাহর মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার ঝিঝিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিস্ময়িত করার হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশী আনুপত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : **كم من مفرور تحت الستر وهو** অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষগুলি ও গোনাহের উপর আজাহর তা'আলা পর্দা কেলো রেখেছেন, তাদেরকে লুক্কিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোঁকায় পড়ে গেছে।

عَلِمْتَ أَنْ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ - পূর্ববর্তী

نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ - অর্থাৎ যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য

আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জাহাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাস্তিকমানরা জাহামামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ - অর্থাৎ জাহামামীরা কোন সময় জাহামাম থেকে

لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ - পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্য চিরকালীন আত্মবের নির্দেশ আছে।

لِنَفْسٍ شَيْئًا - অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার

করতে পারবে না এবং কান্নাও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা, কান্নাও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আজাহর কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আজাহর তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَنیلُ لِلْمُطْفِیْنِ ۝ الذّٰنِ اِذَا التّٰوَا عَلَ النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا  
كَالُوْهُمْ اَوْ وُزْنُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ ۝ اَلَا یَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنْهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِیَوْمِ  
عَظِیْمٍ ۝ یَوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفِتْرِ  
لَفِیْ بَصِیْنٍ ۝ وَمَا اَدْرٰكُ مَا یَحْجِیْنُ ۝ كِتٰبٌ مُّزَقُوْمٌ ۝ وَنیلُ یَوْمِیْ  
لِلْمُكْذِبِیْنَ ۝ الذّٰنِ یَكْذِبُوْنَ بِیَوْمِ الذّٰنِ ۝ وَمَا یَكْذِبُ بِهٖ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ  
اِیْمٍ ۝ اِذَا تُنظَرُ عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا قَالِ اَسٰطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝ كَلَّا بَلْ سَمِعْنَا  
عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۝ كَلَّا اِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ یَوْمِیْ لَمَّحْجُوْبُوْنَ ۝  
ثُمَّ اَنَّهُمْ لَصٰلُو الْجَحِیْمِ ۝ ثُمَّ یَقَالُ هٰذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهٖ كٰذِبُوْنَ ۝  
كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرٰرِ لَفِیْ عِلٰیْنٍ ۝ وَمَا اَدْرٰكُ مَا عٰلَمِیْنَ ۝ كِتٰبٌ  
مُّزَقُوْمٌ ۝ یَشْهَدُ الْمُعْرَبُوْنَ ۝ اِنَّ الْاَبْرٰرِ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۝ عَلَ الْاَزٰبِ  
یَنْظُرُوْنَ ۝ تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النّٰعِیْمِ ۝ یُسْقَوْنَ مِنْ كَحِیْقٍ  
مَّخْتُوْمٍ ۝ عِنتُهُمْ مَّسْكُ رُحْمٍ ۝ ذٰلِكَ فَلَیْتَنَافِسِ التّٰنَافِیْسُوْنَ ۝ وَهَرٰجَةٌ مِنْ  
تَسْنِیْمٍ ۝ عِیْنًا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقْرَبُوْنَ ۝ اِنَّ الذّٰنِ اَجْرُمُوْا كَانُوْا مِنَ الذّٰنِ  
اٰمِنُوْا یَضْحَكُوْنَ ۝ وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغَامَزُوْنَ ۝ وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰی اٰهْلِیْهِمْ

انقلبوا فكهمين ۞ وَاذْأَرَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

حَفِظِينَ ۞ قَالِیَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى الْأَرَابِكِ ۞

يَنْظُرُونَ ۞ هَلْ ثَوَّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরাবৃত্ত হবে (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। (৭) এটা কিভাবেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীনে কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের, (১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করা হলে সে বলে : পুরাকালের উপকথা। (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধসিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবে : একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করত। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় সংলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিন্নীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিন্নীনে কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতগণ একে স্মৃত্যুক্ত করে। (২২) নিশ্চয় সংলোকগণ থাকবে পরম জারামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাক্ষরের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিগুচ্ছ শরীর পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কয়ুরি। এবিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্য-শীলগণ। (২৯) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত (৩০) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত : নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। (৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের তদ্ব্যবহারকরণে প্রেরিত হইনি। (৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

ভক্তসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মাগে কম করে, তাদের জন্য বড় দুর্ভোগ, তারা স্বখন লোকের কাছ থেকে (নিজদের প্রাপ্য) মাগে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং স্বখন লোকদেরকে মাগে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (অবশ্য লোকদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় নেওয়া নিষ্পনীয় নয় কিন্তু এ কাজের নিন্দা করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং কম দেওয়ার নিন্দাকে জোরদার করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কম দেওয়া যদিও এমনিতে নিষ্পনীয় কিন্তু এর সাথে অপরের এতটুকুও স্বাতির না করা আরও বেশী নিষ্পনীয়। যে অপরের স্বাতির করে, তার মধ্যে কম দেওয়ার দোষ থাকলেও একটি গুণও রয়েছে। তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির দোষ গুরুতর। এখানে আসল উদ্দেশ্য কম দেওয়ার নিন্দা করা, তাই মাগ ও ওজন উভয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ণমাত্রায় নেওয়া এমনিতে দৃষণীয় নয়, তাই এক্ষেত্রে মাগ ও ওজন উভয়টি উল্লেখ করা হয়নি বরং মাগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আরবে মাগের প্রচলনই বেশী ছিল, বিশেষত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হলে—যেমন, সাহল মা'আনী বর্ণনা করেছেন—এই কারণ, আরও সুস্পষ্ট। কেননা, মদীনায় মাগের প্রচলন মক্কায় চেয়ে বেশী ছিল; অতঃপর স্বায়া এরাপ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা এক মহাদিবসে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সব মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হবে? (অর্থাৎ সেদিনকে ভুল করা উচিত এবং মানুষের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই পুনরুত্থান ও প্রতিদানের কথা শুনে মুমিন-গণ ভীত হয়ে গেল এবং কাফিররা অস্বীকার করতে লাগল। অতঃপর কাফিরদেরকে হাশিমার করে উভয়পক্ষের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিররা যেমন প্রতিদান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে) কখনও (এরাপ) নয়; (বরং প্রতিদান ও শাস্তি অবশ্য-স্বাভাবী এবং যেসব কর্মের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি হবে তাও সুনির্দিষ্ট। এর বিষয়ণ এই যে) পাগচারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) আমলনামা সিদ্ধানে থাকবে [এটা সপ্তম স্বমীনে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটা কাফিরদের আস্থারও স্থান।—(ইবনে কাসীর, দুৱরে মনসূর) অতঃপর সতর্ক করার পর প্রহ করা হয়েছে:] আপনি জানেন সিদ্ধানে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা এক চিহ্নিত স্বাতি। [চিহ্নিত মানে মোহরকৃত—(দুৱরে মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সারকথা এই যে, কর্মসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হল যে, প্রতিদান সত্য। প্রতিদান এই যে] সেদিন (অর্থাৎ কিস্যামতের দিন) মিথ্যারোপকারীদের বড়ই দুর্ভোগ হবে। স্বায়া প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। একে তারাই মিথ্যারোপ করে, স্বায়া সীমালংঘনকারী পাগিষ্ঠ। তার কাছে স্বখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে: এগুলো সকালের উপকথা। (উদ্দেশ্য একথা বলা যে, যে ব্যক্তি কিস্যামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে, সে সীমালংঘনকারী, পাগিষ্ঠ এবং কোৱআন অস্বীকারকারী। তারা একে মিথ্যা বলছে) কখনও এরাপ নয়, (তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই) বরং (আসল কারণ এই যে) তারা স্বা করে, তাই তাদের হাদরে মরিচা ধরিয়েছে। (এর কারণে সত্য প্রথের স্বোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অস্বীকার করছে। তারা যেমন মনে করছে) কখনও এরাপ নয়। (তাদের দুর্ভোগ

এই মে) তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে ( শুধু ভাই নয়, বরং) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর তাদেরকে বলা হবে : একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করত। ( তারা নিজেদের শাস্তিকে স্বয়ং মিথ্যা মনে করত। তেমনি মু'মিন-গণের প্রতিদানকেও মিথ্যা মনে করত। ভাই হ'লিয়ার করা হয়েছে) কখনও এরা পন্নয়, ( বরং তাদের প্রতিদান অবশ্যই হবে। তা এরা পন্নয়) সংলোকদের আমলনামা ইল্লিয়ানে থাকবে। [এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এখানে মু'মিনগণের আত্মা থাকে।—(ইবনে কাসীর) অতঃপর বোঝাবার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে:] আপনি জানেন ইল্লিয়ানে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা একটা চিহ্নিত খাতা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে (অগ্রহভরে) দেখে। (এটা মু'মিনের বিরাট সন্মান। রাহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে স্বখন ফেরেশতাগণ মু'মিনদের রাহু কবজ করে নিয়ে যায়, তখন প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তার সাথী হয়ে যায়। অবশেষে সপ্তম আকাশে পৌঁছে রাহুটি রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার আমলনামা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর আমলনামা খুলে দেখানো হয়।) সংলোকগণ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। সিংহাসনে বসে- (জাম্বাতের দৃশ্যাবলী) অবলোকন করবে। (হে পাঠক) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরি। আকাঙ্ক্ষাকারীদের এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। (অর্থাৎ শরাব হোক কিংবা জাম্বাতের নিয়ামতরাজি হোক, আকাঙ্ক্ষা করার জিনিস এগুলোই—দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। সংকর্ম দ্বারাই সেসব নিয়ামত অর্জিত হয়। অতএব, এ ব্যাপারে চেষ্টিত হওয়া দরকার) এই শরাবের মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (আরবরা সাধারণত শরাবে পানি মিশিয়ে পান করত। জাম্বাতের শরাবে তসনীমের পানি মিশানো হবে)। তসনীম এমন একটি ঝরনা, যার পানি নৈকট্যশীলগণ পান করবে। [উদ্দেশ্য এই যে, নৈকট্যশীলগণ তো এর পানি পান করার জন্যই পাবে এবং আসহাবুল ইন্সামীন অর্থাৎ সংকর্মশীলগণ শরাবে মিলিত অবস্থায় এর পানি পাবে।—(দুররে মনসূর) শরাবে মোহর করা সন্মানের অলীমত। নতুবা জাম্বাতে এ ধরনের হিফাযতের প্রয়োজন নেই। জাম্বাতে শরাবের পানের মুখে গালায় পরিবর্তে কস্তুরি লাগিয়ে মোহর করা হবে। উত্তমপক্ষের পৃথক পৃথক প্রতিদান বর্ণনা করার পর এখন উত্তমপক্ষের মোটামুটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।] যারা অপরাধী (অর্থাৎ কাফির ছিল), তারা বিশ্বাসীদেরকে (দুনিয়াতে ঘৃণা প্রকাশার্থে) উপহাস করত এবং বিশ্বাসীরা স্বখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। স্বখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও উপহাস করতে করতে ফিরত। (উদ্দেশ্য এই যে, সামনে-পশ্চাতে সর্বাধিক ঠাট্টাবিদ্রুপই করত। তবে সামনে ইশারা করত এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাষায় বিদ্রুপ করত)। আর স্বখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত : নিশ্চিতই এরা পথভ্রষ্ট। (কারণ, কাফিররা ইসলামকে পথভ্রষ্টতা মনে করত)। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তদ্ভাবধায়করূপে প্রেরিত হলেনি। (অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা করাই তাদের কর্তব্য ছিল। তারা বিশ্বাসীদের চিন্তায় মগ্ন হলে কেন? অতএব তারা বিবিধ ভ্রান্তিতে পতিত ছিল—এক. সত্যপন্থীদেরকে উপহাস করা এবং দুই. ওলি

চিন্তা না করা।) অতএব, আজ হারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করবে, সিংহাসনে বসে তাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে।—[দুররে-মনসুরে কাতাাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনকোন খিড়কী ও জানালা দিয়ে আম্মাতীরা আহাম্মাদীদেরকে দেখতে পাবে। তারা তাদের দুর্দশা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণের ছলে তাদেরকে উপহাস করবে।] বাস্তবিকই কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেন্নে গেছে।

### মানুষজিক স্ত্রীত্ব বিষয়

সূরা তাৎফীফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাাদাহ্ (রা) মুকাতিল ও হুহুফাক (র)-এর মতে মদীনায়ায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায়ায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-করবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিস্থিতিতে সূরা তাৎফীফ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা) মদীনায়ায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওয়া নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাখিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।—(মাবহারী)

تَطْفِيفٌ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে

বলা হয় **مُطَفِّفٌ**-কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

**تَطْفِيفٌ**-কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোন ব্যাপারে

প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেওয়াও **تَطْفِيفٌ**-এর অন্তর্ভুক্ত : কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-করবার লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই নিশ্চিত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা **تَطْفِيفٌ**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুহাম্মাদ ইমাম মালেকের কাছে, হযরত উমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের রুকু-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বজলেন : **لَقَدْ طَفَّفْتَ**-অর্থাৎ তুমি আজ্জাহর প্রাপ্য আদায়ে **تَطْفِيفٌ** করেছ।

এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র) বলেন : **لكل عيلى و فاء و تظفیف** -

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামায ও অযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য হুক ও ইবাদতে এবং বাস্তার নির্দিষ্ট হুকুমাৎ ও কম করে, সেও **تظفیف** -এর অপরাধে অপরাধী। মদুর, কর্মচারী স্বতন্ত্র সমস্ত কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যান্য এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলান, কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অনবধানতা পরিলক্ষিত হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে হুকুমাৎ করাকে পাপই গণ্য করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

**خمس بنتس** -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি—১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার

ভঙ্গ করে, আল্লাহ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জম্মী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুসারী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অঙ্গীকারতা ও ব্যাভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. স্বারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. স্বারা স্বাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তাদেরকে হৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন।—(কুরতুবী)

তিব্বানীর এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) আরও বলেন : যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সূদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদের রিষিক বহু করে দেন, যে জাতিশ্রমের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবী ব্যাপক হয়ে যায় এবং স্বারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন।—(মাযহারী)

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিষিক বহু করার বিভিন্ন উপায় : হাদীসে বলিত রিষিক বহু করা কয়েক উপায়ে হতে পারে—১. রিষিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিষিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারেনা, শ্বেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হাতে পারে—১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুর্লভ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বলিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয় বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি স্বতবেশী মুখাপেক্ষী, সে ততবেশী দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকর্ষণ পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানূনের বেড়াডালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালোমী পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে

ক্রম করতে পারে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াভাঙ্গ এত বেশী যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অকস্মে স্বাভাৱ্যত এবং অকস্মার থেকে শুরু করে চাপরশীদের পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পর-মুখাপেক্ষিতারই তো অপন্ন নাম দারিদ্র্য। বলিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিচ্ছীন ও ইঞ্জিয়ীন : **سَجِينٌ ۝ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ رِ لَفِي سَجِينٍ**

এর অর্থ সংকীর্ণ জ্ঞানগায় বন্দী করা। কামুসে আছে— **سَجِينٌ**—এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, **سَجِينٌ**—এর একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফিরদের রাহ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এখানে এমন কোন খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফিরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এসম্পর্কে বারী ইবনে আশ্বের (রা)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সিচ্ছীন সপ্তম নিশ্ননস্তরে অবস্থিত এবং ইঞ্জিয়ীন সপ্তম আকাশে আশ্বের নিচে অবস্থিত।—(মাশহুরী) কোন কোন হাদীসে আরও আছে সিচ্ছীন কাফির ও পাপাচারীদের আশ্বার আবাসস্থল এবং ইঞ্জিয়ীন মুমিন-মুত্তাকীপের আশ্বার আবাসস্থল।

জাহাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল : বায়হাকী রেওয়াজেত করেন যে, জাহাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জরীর (র) রেওয়াজেত করেন, রসূলুল্লাহ (সা)-কে **وَجِئْتِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ** (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : জাহান্নামকে সপ্তম স্বমীনে থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম স্বমীনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্জলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অর্ন্তগতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়াজেতের মধ্যেও সম্ভব সম্মিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিচ্ছীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম।—(মাশহুরী)

**مُتَّخِذُونَ مَرَقَمًا ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ**—(মোহরকৃত)। ইমাম

বগভী ও ইবনে কাসীর (র) বলেন : এটা সিচ্ছীনের তফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী

**كِتَابَ الْفُجَارِ**—এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফির ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর

লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিচ্ছীন। এখানেই কাফিরদের রাহ জমা করা হবে।



থেকেই - رَيْنِ شَكْرِي - رَانَ - كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দে পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মু'মিন ব্যক্তি কোন গোনাহ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ করে যায়, তবে এই কাল দাগ তার সমস্ত অন্তরকে

আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে **رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ** - বলা হয়েছে। - (মায-

হারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফিররা কোরআনকে উপকথা বলে পরি-  
হাস করে। এই আয়াতের শুরুতে **كَلَّا** - বলে তাদেরকে শাসনো হয়েছে যে, তারা গোনাহের  
স্বপ্নে পড়ে অন্তরের সেই উজ্জ্বলতা ও যোগ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছে, যম্মারা সত্য ও মিথ্যার  
পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মনুষ্যের মজ্জায় পঙ্খিত রাখেন।  
উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারূপ কোন প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং  
এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফিররা  
أَنَّهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ أَوْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا -

তাদের পালনকর্তার স্মারক থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে।  
ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন : এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও  
ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার স্মারক লাভ করবে। নতুবা কাফিরদেরকে পর্দার অন্তরালে  
রাখার কোন উপকারিতা নেই।

জৈনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেন : এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক  
মনুষ্য প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফির  
ও মুশরিক স্বত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী  
সম্পর্কে স্বত দ্বন্দ্বিতা বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সবার  
অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি  
লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। দ্বন্দ্বিতা পথের কারণে তারা মন্থিলে মকসুদে পৌঁছতে  
না পারলেও অন্বেষণ সেই মন্থিলেরই করে। অলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়-  
মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে যদি আল্লাহর স্মারকতের আগ্রহ না থাকত, তবে শক্তি-  
স্বরূপ একথা বলা হত না যে, তারা আল্লাহর স্মারক থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, যে  
ব্যক্তি কারও স্মারকতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি বীতব্রহ্ম, তার জন্য তার স্মারকত  
থেকে বঞ্চিত করা কোন শক্তি নয়।

عَلَوْا عَلَيْهِمْ - শব্দটি - **إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي طَيِّبِينَ** - কারও কারও মতে

এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র)-র মতে এটা এক জাঙ্গাল নাম—বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আম্মেব (র)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়ান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রাস্তা ও আমল-নামা রাখা হয়। পরবর্তী **كِتَابٌ مَّرْقُومٌ** -বাক্যটিও ইল্লিয়ানের তফসীর নয়—

সংলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে **إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ** বাক্যে এই আমল-নামার উল্লেখ আছে।

شُهُودٌ - শব্দটি - **يَشْهَدُونَ** - থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত

হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সংকর্ম-শীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হিফাজত করবে।—

(কুরতুবী) **يَشْهَدُونَ** -এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে **يَشْهَدُونَ** -এর সর্বনাম

দ্বারা ইল্লিয়ান বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রাস্তা এই ইল্লিয়ান নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল, যেমন সিদ্ধীন কাফিরদের রাস্তার আবাসস্থল। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : শহীদগণের রাস্তা আন্নাহর সাল্মিথে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং আয়াতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে কুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রাস্তা আরশের নিচে থাকবে এবং আয়াতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাঈদার ঘটনায় বলা হয়েছে :

ع- **قِيلَ إِذْ خَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي**

থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাঈদার মৃত্যুর সাথে সাথে আয়াতে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রাস্তা আয়াতে থাকবে। সবগুলোর সাক্ষর্য এই যে, এসব রাস্তার আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। আয়াতের স্থানও এটাই। এসব রাস্তাকে আয়াতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও প্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রাস্তার আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

انما نسمة المرء من طائر يعلق في شجر الجنة حتى ترجع الى

جسد لا يوم القيامة — মু'মিনের রূহ পাখীর আকারে জাহান্নামের বৃক্ষে স্থলভূ

থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়াজে মসনদে আহমদ ও তিবরানীতে বর্ণিত হয়েছে।—( মাযহারী )

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? : এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বাহ্যত বিভিন্ন-রূপ। সিঙ্কীন ও ইল্লিয়ানের তক্ষসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা সিঙ্কীনে থাকে বা সপ্তম স্বমানে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়ানে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়াজে থেকে আরও জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জাহান্নামে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফির উভয় শ্রেণীর আত্মা তাদের কবরে থাকে। বার্না ইবনে আশ্বব (রা)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, স্বখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন অঞ্জা'হ বলেন : আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়ানে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুদ্ভিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফিরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রা) এই হাদীসকেই অপ্রাধিকার দিয়েছেন, স্বর মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফির সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়াজেতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোন বিরোধ নয়। কেননা, ইল্লিয়ানের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জাহান্নামের স্থানও সেখানেই। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে :

عَلِدُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى عِلْدُهَا جِلَّةُ الْمَأْوَى — এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়

যে, জাহান্নাম সিদরাতুল মুনতাহার সম্বন্ধে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়ান জাহান্নামের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জাহান্নামের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জাহান্নামও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফিরদের আত্মার স্থান সিঙ্কীন—সপ্তম স্বমানে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে, জাহান্নামও সপ্তম স্বমানে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উদ্ভাপ ও কষ্ট সিঙ্কীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফিরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম— একথা বলে দেওয়াও নিতুল। তবে যে রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়াজেত বাহ্যত উপরোক্ত দুই রেওয়াজেতের বিরোধী। প্রখ্যাত তক্ষসীরবিদ হযরত কাশী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তক্ষসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের





سورة الانشقاق

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ : ২৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝  
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ  
كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذًا فَمَا تُلقِيهِ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝  
فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ  
أُوْتِيَ كِتَابَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْطَلِ سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ  
كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ۝ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ  
بِهِ بَصِيرًا ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِالسَّفَاقِ ۝ وَالنَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا  
اتَّسَقَ ۝ لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ  
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الطَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকার্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপস্থিত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিষ্কাশ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার

পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পরিত্র পৌছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটেবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হস্তচিহ্নে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদিক থেকে দেওয়া হবে, (১১) সে যত্নকে আহ্বান করবে (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে জানপিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি লপথ করি সজ্জাকালীন মাল জাতার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান জানে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না। (২২) বরং কাকিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, জাহান্নাম তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (দ্বিতীয় ফু'কুর সময়) আকাশ বিদীর্ণ হবে (তাতে মেঘমান্নার ন্যায় ফেরেশতা-বাহী এক বস্তু অবতীর্ণ হয়।  $\text{يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ}$  আয়াতে এর উল্লেখ আছে)।

এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ বিদীর্ণ হওয়ার সৃষ্টিগত আদেশ পালন করার অর্থ, তা ঘটা)। এবং আকাশ (আজ্জাহর কুদরতের অধীন হওয়ার কারণে) এরই উপযুক্ত (যে, আজ্জাহর ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা অবশ্যই হবে) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (যেমন চামড়া অথবা রবারকে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে পৃথিবীর পরিধি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে, যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের তাতে স্থান সংকুলান হয়, দূররে মনসুরে বণিত এক হাদীসে আছে :

$\text{يَوْمَ تَمُدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْقِيَامَةِ مَدًّا لَدُنَّ}$  সুতরাং আকাশের বিদীর্ণ হওয়া

এবং পৃথিবীর সম্প্রসারণ উভয়টি হাশরের হিসাব-নিকাশের অন্যতম ভূমিকা)। এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত বস্তুসমূহকে (অর্থাৎ মৃতদেরকে) বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে এবং (সমস্ত মৃত থেকে) খালি হয়ে যাবে এবং সে (অর্থাৎ পৃথিবী) তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং সে এরই উপযুক্ত। (এর তফসীর পূর্বের ন্যায়। তখন মানুষ তার কৃতকর্ম-সমূহ দেখবে, যেমন ইরশাদ হয়েছে : ) হে মানুষ, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট পৌছা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত) চেষ্টা করে হাছ (অর্থাৎ কেউ সৎ কাজে এবং কেউ অসৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে), অতঃপর (কিয়ামতে) সেই চেষ্টার (প্রতিফলের) সাথে সাক্ষাৎ ঘটেবে। (তখন) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার কাছে থেকে

সহজ হিসাব নেওয়া হবে এবং সে (হিসাব শেষে) তার পরিবার-পরিজনের কাছে হাণ্ড-চিঙে ফিরে যাবে। (সহজ হিসাবের স্তর বিভিন্ন রূপ—এক. হিসাবের ফলে মোটেই আশাব হবে না। তারা কোনরূপ আশাব ব্যতিরেকেই মুক্তি পাবে। এবং দুই. হিসাবের ফলে চিরস্থায়ী আশাব হবে না। এটা সাধারণ মু'মিনদের জন্য হবে। এক্ষেত্রে অস্থায়ী আশাব হতে পারে। পক্ষান্তরে) স্বার আমলনামা (তার বাম হাতে) পিঠের পশ্চাদিক থেকে দেওয়া হবে [ অর্থাৎ কাফির। সে হস্ত আশ্লেষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে, ফলে বাম হাত পশ্চাতে থাকবে, না হস্ত মুজাহিদের উজ্জ্বল অনুসায়ী তার বাম হাত পৃষ্ঠদেশে করে দেওয়া হবে।—(দুররে-মনসূর), সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (স্বৈমন, বিপদে মৃত্যু কামনা করার অভ্যাস মানুষের আছে) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে (দুনিয়াতে) তার পরিবার-পরিজনের (ও চাকর-নকরের) মধ্যে আনন্দিত ছিল (এমনকি, আনন্দের আতিশয্যে পরকালকেও মিথ্যা মনে করত) সে মনে করত যে, সে কখনও (আজ্জাহর কাছে) ফিরে যাবে না। (অতঃপর এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে) কেন ফিরে যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে সম্যক দেখতেন (এবং তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তাই এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যজারী ছিল)। অতএব, আমি শপথ করছি, সজ্জাকালীন লাল আভার এবং রান্নির এবং রান্নি যা নিজের মধ্যে ধারণ করে তার (অর্থাৎ সৈসব প্রাণীর, স্বারা বিশ্রামের জন্য রান্নিতে নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে আসে) এবং চন্দ্রের স্বখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র হলে স্বায়, এসব জিনিসের শপথ করে বলছি) তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। এটা

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِحٌ

থেকে **صَلَاةٍ** পর্যন্ত বর্ণিত সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ। এসব অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুর অবস্থা,

বরষখের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একাধিক অবস্থা আছে। শপথের সাথে এগুলোর মিল এই যে, রান্নির অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়। প্রথমে পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা যায়, এরপর রান্নি গভীর হলে সব নিদ্রিত হয়ে যায়। চন্দ্রালোকের আধিক্য এবং স্বল্পতায়ও এক রান্নি অন্য রান্নি থেকে ভিন্ন রূপ হয়। এগুলো সব মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অনুরূপ। এছাড়া মৃত্যু পরকালের সূচনা, স্বৈন সজ্জাকালীন লাল আভা রান্নির সূচনা। অতঃপর বরষখের অবস্থান মানুষের নিদ্রিত থাকার অনুরূপ এবং ক্ষয়-প্রাপ্তির পর চন্দ্রের পূর্ণ রূপ লাভ করা সবকিছু ধ্বংসের পর কিয়ামতের পুনরুজ্জীবন লাভ করার সাথে সামঞ্জস্যশীল)। অতএব (ভীত হওয়ার ও ঈমান আনার এসব কারণ থাকা সত্ত্বেও) মানুষের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (তাদের হঠকারিতা এতদূর যে) স্বখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আজ্জাহর কাছে নত হয় না বরং (নত হওয়ার পরিবর্তে) কাফিররা (উল্টো) মিথ্যারোপ করে। তারা যা (অর্থাৎ কৃতকর্মের ভাঙার) সংরক্ষণ করে আজ্জাহ তা সবিশেষ জানেন। অতএব (এসব কৃষ্ণী কর্মের কারণে) আপনি তাদেরকে স্বল্পগদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন। কিন্তু স্বারা ঈমান



আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য ( পরকালে ) রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার, ( সৎ কর্ম শর্ত নহ্ন—কারণ ) ।

**আনুমানিক ভাষ্য বিষয়**

এ সূরার কিস্বামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুশকে তার সজ্ঞা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তস্বারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে স্বেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুশের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাসরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও রুকুলতা—পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, স্বাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুশ তাতে সমবেত হতে পারে! অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংস্বাজন এই যে, কিস্বামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তা'আলার

কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَإِذِ نَسْتَلِرُّ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ** —এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। **حَقَّتْ** —এর অর্থ **إِلَّا نَقِيَادَ حَقَّتْ** অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

**আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার :** এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দু' অর্থ হতে পারে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার—১. শরীয়ত-গত নির্দেশ, এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতিপক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে, স্বেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফির এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তকদীরগত নির্দেশ, এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাপ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে, জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন, কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

**زَوْءَةٌ رُوَةٌ دَهْرًا يَا بَسْتَةٌ تَقْدِيرُهُ  
زَنْءُءِى ُءِى خَوَابِى ُءِى جَامِى ُءِى تَقْدِيرُهُ**

এস্থলে এটা সন্তবপর যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসামাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে

সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোন দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর।

তবে **أَزِنْتُمْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ**—এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী।

দ্বিতীয় অর্থ ও রূপক হিসাবে হতে পারে।

**وَأِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ**—এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে

আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসঙ্গেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে।—(মাহহারী)

**وَالْقَتَمَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ**—অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগীরণ

করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

**كَدْحٍ—يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ**—এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি

ব্যয় করা। **إِلَىٰ رَبِّكَ**—অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্‌র দিকে চূড়ান্ত হবে।

**আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন :** এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সন্মোদন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফির-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে শ্রীম শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে শ্রীম উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেনা। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনমিল, যা সে অভ্যাসসারেই

অবাহিত রেখেছে। এই সফরের শেষ সীমা আল্লাহর সামনে উপস্থিতি অর্থাৎ মৃত্যু।

**الى ربك** বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একাটি অকাটা সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অগ্নির সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাবনিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যস্বাভাবী, স্বাভাবিক সৎ ও অসতের পরিণাম আল্লাদা আল্লাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র হোপাড়া করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোন সমস্যা না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও

ইনসাফের পরিপন্থী। অবশেষে বলা হয়েছে : **فَمَوْلَا قَوْمِكَ**—এর সর্বনাম দ্বারা **كُلِّدَح** ও

বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর গুণ্ড অথবা অন্তত পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা **رَبِّ**—ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফির মানুষের আল্লাদা আল্লাদা পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জাহাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেলো যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয় প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পৃথিবী জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আঁহা ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিথারী আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয় না। স্বাভাবিক দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জাহাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয় ?

**فَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا لَهَا نَسَبٌ وَمِنْ آلِهَا مَنْ أُرْسِلَ فِيهَا**

**وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهَا مُسْرُرًا**—এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের

আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জাহাতে সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হস্তচিহ্নে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **من حوسب يوم القيامة عذاب**—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন স্বার হিসাব নেওয়া হবে, সে আশাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) প্রমত্ত করলেন : কোরআনে কি **يُحَا سَبُّ حَسَابًا بِأَيِّسْرًا** বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এই আয়াতে থাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আলাহ রসূল আলামীর সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছে থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আশাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।—(বুখারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আলাহর সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হাটটিঙে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক পরিবার-পরিজনের অর্থ জাম্বাতের হরণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই। দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসাবের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুসারী সাফল্যের সুসংবাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তফসীরকারকগণ উত্তম অর্থ বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

**أِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا**—অর্থাৎ স্বার আমলনামা তার গিঠের দিক থেকে

বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আশাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন কাটান করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পাখিব জীবনে কখনও নিশ্চিত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কোরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে :

**أَنَا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ**—অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও

পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উত্তম দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। স্বারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অভিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আশাব এসেছে। পক্ষান্তরে স্বারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আশাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও ধুশী অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোন সময় কোন অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় না।

فَلَا أُقْسِمُ بِالَّذِي نَزَّلَ بِهِ الْقُرْآنَ—এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে

আবার **فَكَذَّبُوا إِلَىٰ رَبِّكَ** আয়াতে বর্ণিত বিশ্বাসের প্রতি মনোযোগী করেছেন।

শপথের জওন্নায়ে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিশ্ববস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে **نَفْسُكَ**-এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই জাতি আডা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিকতে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময়ে আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সম্রাজ্য চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সৈসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। **وَسُقَىٰ**-এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ

নেওলা হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, সৈসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে।

চতুর্থ শপথ হচ্ছে : **وَالتَّمْرِ إِذَا تَسَقَّىٰ** এটাও **وَسُقَىٰ** থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা।

চন্দের একত্র করার অর্থ তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, স্বয়ং চন্দ্র যোল কলার পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে গুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপস্থূ পরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : **لَتَرَكُنَّ طَبَقًا مِّنْ طَبَقٍ** উপরে নিচে

স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে **طَبَقٍ** বলা হয়। **رُكُوبٍ**-এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, যে মানুষ, ভোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থার স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের জীবনে অপরিণত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনস্কিন : সে বীর্ষ থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর পোশুতপিত হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর পোশুত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ স্থাপন

করার কলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পটা রক্ত। নর মাস পরে আল্লাহ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পটা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাভাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা-সহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেলে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিব্যারামির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চেতনা বাড়ল তখন শিকাদীকার শাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবন-সুজাত কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এবং এক স্নোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এল। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততার দিব্যারামি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আজিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনস্বিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অপূরণশী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনস্বিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পরগল্পরূপের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনস্বিল নয় বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনস্বিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাাম ও সুখের মনস্বিল হবে, না হয় অনন্ত আত্মা ও বিপদের মনস্বিল হবে। এই সর্বশেষ মনস্বিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি

পাবে। কোরআন পড়ক বলা হয়েছে **إِلَىٰ رَبِّكَ — إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ** এবং

**نَادِعٌ إِلَىٰ رَبِّكَ**—বলে এই বিষয়বস্তুই কর্তব্য করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ

মনস্বিল সম্পর্কে অবহিত করে হ'শিয়ার করেছে যে, বরস হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনস্বিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলারাকার, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট—সর্বাবস্থায় এই সফরের মনস্বিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনস্বিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাাম, না হয় আত্মবই আত্মা এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। অতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরী ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

**كُنْ فِي — الذَّنْبِ مَا نَكَّ شَرِيْبًا أَوْ حَابِرَ سَبِيْلٍ**—অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোন মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোন পথিক পথে

চমকে চমকে বিক্রামের জন্য খেমে স্বাস। উপরে বর্ণিত **طهقا عن طهق**—এর তফসীরের বিষয়বস্তু সহজিত একটি রেওয়াজেত আবু নাঈম (র) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)—র রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবু নাঈমের এবং ইবনে কাসীর (র) ইবনে আবী হাতেম (র)—এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উচ্ছ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফিল

জাতি ত্যাগ করেন না। তাই শেষে বলা হয়েছে : **فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**—অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হল যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না?

**وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ**—অর্থাৎ যখন তাদের সামনে

সুস্পষ্ট হিদায়তে পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহর দিকে নত হয় না।

**سَجِدُونَ وَ سَاجِدَةٌ**—এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য

ও ফরমানবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সিজদা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহর সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোন বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সিজদার নির্দেশ নেই বরং নির্দেশটি সমগ্র কোরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পারিভাষিক সিজদা অর্থ নেওয়া হলে কোরআনের প্রত্যেক আয়াতে সিজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে কিনা? বলা বাহুল্য, কিঞ্চিৎ সন্দেহের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোন কোন হানাফী ফিকাহবিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন : এখানে

**الْقُرْآنِ** বলে সমগ্র কোরআন বোঝানো হয়নি বরং **الف لام مهدي** হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সন্দেহই, যাকে সন্তান-নার পর্ষায় শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষ্যদ্রুটে এটা অবশ্যের মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফরাসা হাদীস এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তিজাওয়াজের সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইয়াম আশম আবু হানীফা (র)—র মতে এই আয়াতেও সিজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীস-সমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন :

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত আবু রাস্ক (রা) বলেন : আমি একদিন ইশার নামায হযরত আবু হুরায়রার পিছনে পড়লাম। তিনি নামাযে সূরা ইনশিকাক পাঠ

করলেন এবং এই আয়াতে সিজদা করলেন। নামাযাতে আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : এ কেমন সিজদা? তিনি বজলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পশ্চাতে এই আয়াতে সিজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা করে থাকি। সহীহ মুসলিম আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা ইকরাস সিজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র) বলেন : এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সিজদার আয়াত। যে এই আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সিজদা ওরাজিব।—(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সিজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হযরত এমর ইমামের মুকাদ্দিম (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সিজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র) বলেন : আমি বখন কোথাও ইমাম হয়ে নামায পড়াতাম শুধু সূরা ইনশিকাক পাঠ করতাম না। কবিল, আমার মতে এই সূরায় সিজদা ওরাজিব। কাজেই যদি সিজদা না করি, তবে সোনাহ্‌গার হবে। অন্য যদি করি, তবে সেটা জামাআত আমার এই কাজকে অগত্যা করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।



## سورة البروج

### সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ২২ ॥

#### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝ قُتِلَ

أَصْحَابُ الْأَخْذِ وَدِرَّةِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ

مَا يَفْعَلُونَ ۝ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا

بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ

جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَدَّتْ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ فُذِّكَ الْفُؤْرُ الْكَبِیْرُ ۝ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوُدُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝ بَلِ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِیْبٍ ۝ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِیْطٌ ۝ بَلِ هُوَ قُرْآنٌ

مَجِيدٌ ۝ فِي كُوفٍ مَّحْفُوظٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নব্বই বর্ষ-নক্ষত্র পোড়িত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়, (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ভ ও স্তন্য-দ্বারা অর্থাৎ অনেক ইচ্ছার অধিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসে-ছিল, (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্সণ করছি। (৮) তারা

তাদেরকে শান্তি দিয়েছিল শুধু একারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত জাহাঙ্গীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল; (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, জাহাঙ্গীর সামনে রয়েছে সব কিছু। (১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামে শান্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জাহান্নাম, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নিষ্কারিশী-সমূহ। এটাই মহাসাক্ষ্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই স্রষ্টাঘবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। (১৪) তিনি ক্ষমশীল, প্রেমময়, (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি স্বাচান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইত্তিহাদ পৌছেছে কি, (১৮) কিরাউনের এবং সামুদের? (১৯) বরং যারা কাফির, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (২০) জাহাঙ্গীর তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে মাহ ফুযে লিগিবক।

### ভক্তসীরের সার-সংক্ষেপ

শামে নুমুল : এই সূরার একটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত এই কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই যে, জনৈক বাদশাহর দরবারে একজন অভী-স্ত্রিয়বাদী থাকত। (যে ব্যক্তি শরতানদের সাহায্যে অথবা নকুলের লক্ষণাদির মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের খবরাদি বলে, তাকে অভীস্ত্রিয়বাদী বলা হয়)। সে একদিন বাদশাহ্বে বজল : আমাকে একটি চালাক-চতুর বাজক দিলে আমি তাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য একটি বাজককে মনোনীত করা হল। এই বাজকের আসা-স্বাওয়ার পথে জনৈক ষুস্তান পাত্রী বসবাস করত। সে যুগে ষুস্তিধর্মই ছিল সত্যধর্ম। পাত্রী অধিকাংশ সময়েই ইবাদতে মগ্ন থাকত। বাজকটি তার কাছে আসা-স্বাওয়া করত এবং সেগোপনে ষুস্তিধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। একদিন বাজকটি দেখল যে, একটি সিংহ পথ আটকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভয়ে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বাজকটি এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দোয়া করল : হে আল্লাহ, যদি পাত্রীর ধর্ম সত্য হয়, তবে এই সিংহ আমার প্রস্তরাঘাতে মারা যাক, আর যদি অভীস্ত্রিয়বাদী সত্য হয়, তবে না মরুক। একথা বলে সে পাথর নিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে লাগল এবং সিংহ মারা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, এই বাজক এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে। জনৈক অন্ধ একথা শুনে এসে বজল : আমার অন্ধত্ব মোচন করে দিন। বাজক বজল : তুমি আল্লাহর সত্যধর্ম কবুল করলে আমি চেষ্টা করে দেখব। অন্ধ এই শর্ত মেনে নিল। সেমতে বাজকটি দোয়া করতেই অন্ধ তার চক্ষু ফিরে গেল এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করল। এসব সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছেলে সে পাত্রী এবং বাজক ও অন্ধকে প্রেক্ষতার করিয়ে দরবারে আনল। অতঃপর সে পাত্রী ও অন্ধকে হত্যা করল এবং বাজকের ব্যাপারে আদেশ দিল যে, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু যারা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হল এবং বাজক নিরাপদে

ফিরে এল। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার আদেশ দিল। সে এবারও বেঁচে গেল এবং স্বারা তাকে নিয়ে ঘিরেছিল, তারা সজিলসমাধি দ্রাভ করল। অতঃপর বাজকাটি স্বয়ং বাদশাহ্কে ফেলল : বিস্মিত্তাহ্ বলে তাঁর নিক্ষেপ করলে আমি মারা যাব। সেমতে তাই করা হল এবং বাজকাটি মারা গেল। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে অকস্মাৎ সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত হল : আমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বাদশাহ্ খুবই অস্থির হল এবং সন্তাসদদের পরামর্শক্রমে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করিয়ে সেগুলো অগ্নিতে ভর্তি করে ঘোষণা দিল : স্বারা নতুন ধর্ম পরিচালনা করবেনা তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। সেমতে বহু লোক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হল। এরপর বাদশাহ্ ও তার সন্তাসদদের উপর আল্লাহ্‌র গম্বনাবিল হওয়ার বর্ণনা শপথ সহকারে এই সূরায় আছে।

শপথ প্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের) এবং শপথ উপস্থিত দিনের এবং শপথ সেদিনের হাতে লোকেরা উপস্থিত হবে। (তিরমিযীর হাদীসে আছে يوم موعود কিয়ামতের দিন شهود শুক্রবার দিন এবং مشهود আরাকাতের দিন। এক দিনকে شاهد এবং এক দিনকে مشهود বলার কারণ সম্ভবত এই যে, শুক্রবার দিন সব মানুষ নিজ নিজ জায়গার থাকে। তাই দিনটি যেন নিজেই উপস্থিত এবং আরাকাতের দিন হাজীগণ নিজ নিজ জায়গা থেকে সফর করে আরাকাতের ময়দানে এই দিনের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তাই দিন যেন উদ্ভিষ্ট এবং উপস্থিতির কাল এবং লোকেরা উপস্থিত। শপথের জওয়াব এই :) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইহুদের অগ্নি সংযোগকারীরা স্বয়ং তারা সেই অগ্নির আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে যে জুলুম করছিল, তাতেই স্বাধিছিল। (বলা বাহুল্য, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার সংবাদে মু'মিনগণ আশ্বস্ত হবে। কারণ, এতে বোঝা যায় যে, বর্তমানে যেসব কাফির মুসলমানদের উপর জুলুম করেছে, তারাও অভিশপ্ত হবে। এর প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও প্রকাশ পেতে পারে। যেমন বদর মুক্তে আলিমরা নিহত ও দাহিত হয়েছে কিংবা শুধু পরকালে প্রকাশ পাবে, যেমন সাধারণ কাফিরদের জন্য এটা নিশ্চিত। তারা জুলুমের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল।

شاهد শব্দের মধ্যে তত্ত্বাবধান ছাড়াও তাদের নিহুরতার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। দেখে শুনেও তাদের মনে দরার উপক্রম হত না। অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাগারে এ বিষয়টির বিশেষ প্রভাব আছে। কাফিররা মু'মিনদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেছিল, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বের মালিক। (অর্থাৎ ঈমান আনার অপরাধে এই ব্যবহার করেছে। ঈমান আনা আসলে কোন অপরাধ নয়। সুতরাং নিরপরাধ লোকদের উপর তারা জুলুম করেছে। তাই তারা অভিশপ্ত হয়েছে। অতঃপর আলিমদের জন্য সাধারণ শাস্তিবাণী এবং মজলুমদের জন্য সাধারণ ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে।) আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফ। (মজলুমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে সাহায্য করবেন এবং আলিমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে শাস্তি দিবেন ইহকালে অথবা পরকালে) স্বারা মুসলমান নয় ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি,

তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর (জাহান্নামের বিশেষভাবে) তাদের জন্য আছে দহন সন্ত্রপা। (আস্বাবে সর্প, বিচ্ছু, বেড়ী, শিকল, ফুটন্ত পানি, পূঁজ ইত্যাদি সবরকম কষ্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি দহন সন্ত্রপা আছে। তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মজলুমসহ মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:) নিশ্চয় হারাঈমান জানে ও সংকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জাহ্নাত, হারি তলদেশে নির্বাঙ্গিগাসমূহ প্রবাহিত। এটা মহাসাফল্য। আপনীর পালনকর্তার পক্ষড়াও অত্যন্ত কঠোর। (কাজেই বোঝা যায় যে, তিনি কাফিরদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন)। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় কিয়ামতেও সৃষ্টি করবেন। (সুতরাং পাকড়াওয়ের সময় যে কিয়ামত, তা সংঘটিত না হওয়ার সম্ভেহ রইল না)। তিনি ক্রমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি ও মহান। (সুতরাং মু'মিনদের গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে প্রিয় করে নিবেন। আরশের অধিপতি হওয়া ও মহত্ত্ব থেকে আযাব দেওয়া এবং সওয়াব দেওয়া উভয়টি বোঝা যায় কিন্তু এখানে মুকাবিলায় ইস্তিতে একথা বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, তিনি সওয়াব দিতে সক্ষম। অতঃপর আযাবদান ও সওয়াবদান উভয়টি প্রমাণ করার জন্য একটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে) তিনি স্বা চান, তাই করেন। (অতঃপর মু'মিনদেরকে আরও সাশ্রুনা এবং কাফিরদেরকে আরও হাশিমার করার জন্য কতক বিশেষ অভিশ্রুতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) আপনীর কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিহাস পৌঁছেছে কি অর্থাৎ ফিরাতুন (ও ফিরাতুন বংশধর) এবং সামুদের? (তারা কিভাবে কুফর করেছে এবং কিভাবে আস্বাবে প্রেরিত হলে? এতে মু'মিনদের আশ্রুত এবং কাফিরদের ভীত হওয়া উচিত। কিন্তু কাফিররা মোটেই ভীত হয় না) বরং তারা (কোরআনের) মিথ্যারোপে রত আছে। (পরিণামে তারা এর শাস্তি ভোগ করবে। কেননা) আস্বাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (অতঃপর তার কুদরত ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেনা। তারাযে কোরআনকে মিথ্যারোপ করে এটা এক নিবুদ্ধিতা। কেননা, কোরআন মিথ্যারোপের স্রোগ্যনয়) বরং এটা মহান কোরআন—সুওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ। (এতে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সেখান থেকে কড়া প্রহরধীনে পন্নসম্বরের কাছে পৌঁছানো হয়; যেমন সূরা জিনে আছে—

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

সুতরাং কোরআনকে মিথ্যারোপ করা নিঃসন্দেহে মূর্খতা ও শাস্তির কারণ)।

আনুশঙ্গিক ভাষ্য বিষয়

بروج—এক বহুবচন। অর্থ বড়  
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

এসদি ও দুর্গ। অন্য জায়গাতে আছে  
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرُوجٍ مُشِيدَةٍ

অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু  
برج—এক অস্তিত্বানিক অর্থ কাফির হওয়া

وَلَا تَهْرَجُنَّ — এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে

تَهْرَجَ الْجَا هَلِيَّةَ الْأَوْثَى — অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে

تَهْرَجَ — এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এখানে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিশ্রমায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশ-মণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে تَهْرَجَ — বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে; স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব تَهْرَجَ — এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব تَهْرَجَ — এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়্যাসীনে আছে :  
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ — একপে ফলক — এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ — তফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিষীর

হাদীসের বরাতে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شاهد — এর অর্থ গুরুবার দিন এবং مشهود — এর অর্থ আরাফাতের দিন। আলোচ্য আয়াতে আলাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। এক বুরাজবিশিষ্ট আকাশের, দুই, কিয়ামত দিবসের, তিন গুরুবারের এবং চার আরাফাতের দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আলাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। গুরুবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পূঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফিরদেরকে অভিলাপ করা হয়েছে, স্বারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে-মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পর-কালীন মর্হাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

পঠওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ : এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ঘটনাটির সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজেতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে হাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ ছিল ইয়্যামেন দেশের বাদশাহ্-ই হক্কত-ই হক্কিন আব্বাস (রা) — এর রেওয়াজেতে মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ বুনওয়াল'। তার সময় ছিল রসুলে করীম (সা) — এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বাজককে অতীন্দ্রিয়বাদী জঘন্য হাদুকরর কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ অভিলাপ

করেছিল, তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে ভায়েস। পাদ্রী খৃস্টধর্মের আবেদন ও আহ্বান ছিল। তখন খৃস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খ্রীষ্টি-মুসলমান ছিল। বাজকটি পশ্চিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেনে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হত এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পশ্চিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা স্নায়ুকের কাছে বিলম্ব পৌছান কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পৌছাতে বিলম্ব হত এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোন কিছু পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে হাতারাত অব্যাহত রাখত। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্বোক্তিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভতি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল : ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হল না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ারকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল : আশ্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রবলিত আঙনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিলেছিল, তাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়াজেতে বার হাজার এবং কোন কোন রেওয়াজেতে আরও বেশী বলিত আছে।

বাজক নিজেই বাদশাহ্কে বলেছিল : আপনি আমার তুন থেকে একটি তীর নিন এবং 'রিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ প্রস্তাবে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশাহ্কে গোটা সম্প্রদায় আল্লাহ্ আকবার ধর্মি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফির বাদশাহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়াজেতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই রাজকের স্মৃতি ছিল, ঘটনাক্রমে কোন প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত উমর (রা)-এর খলীফার কাছে খনন করানো হলে তাকে মৃত সঙ্গী সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপস্থিত অবস্থায় ছিল এবং রাজ্য কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহ্কে তীর সেখানেই দেয়া গেল। কোন একজন দর্শক তার হাতটি সন্নিবে দিলে কতখান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে **الله** (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গভর্নর খলীফা হযরত উমর (রা)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে গিয়ে পাঠালেন : তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও।- (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাভেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন : অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর

ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন—এক. ইয়ামেনের অগ্নিকুণ্ড, যার ঘটনা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন. পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরার বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজরানে ছিল।

انَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ —এখানে অভিচারী কাফিরদের শাস্তি বর্ণিত

হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক **وَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ** অর্থাৎ তাদের

অন্য পরকালে জাহান্নামের আশাব রয়েছে, দুই. **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** অর্থাৎ

তাদের অন্য দহন স্বত্ব রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেহেতু তারা চিরকাল দহন স্বত্বা ভোগ করবে। এটাও সত্ত্ববপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের রাহু কবজ করেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন স্বত্বা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রকলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তাহাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ্ 'ইউসুফ মুনওয়ারস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে বাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে।—(মাহফলী)

কাফিরদের জাহান্নামের আশাব ও দহন স্বত্বার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কোরআন

বলেছে : **ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا**—অর্থাৎ এই আশাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই

দুর্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাঁদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। ইব্রাহীম হারান বসরী (র) বলেন : বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন সীমালীনেই। তাঁরা তো আল্লাহ্‌র ওয়ালীপকে জীবিত দগ্ধ করে তাহাশা দেখেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও তাঁদেরকে তওবা ও মালফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।—(ইবনে কাসীর)

## سورة الطارق

### সূরা তারেক

মক্কায় অবতীর্ণ : ১৭ আয়াত ॥

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلَّ  
نَفْسٍ لَنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ  
دَافِقٍ ۝ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝  
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غُرْبًا وَكُنُوزٌ ۝ وَأَنفُسٌ كَافِرَةٌ ۝ ذَاتِ الرُّجُومِ ۝  
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدُوعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۝ وَمَا هُوَ بِالْمَزَلِ ۝ إِنَّهُمْ  
يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَآكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ ذُرِّيَّةً ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর! (২) আপনি জানেন যে রাত্রিতে আসে, সে কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃষ্টিত হয়েছে। (৬) সে সৃষ্টিত হয়েছে সর্বদেহ সঞ্চলিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপঞ্জরের মধ্য থেকে (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে কিরিলে নিরত সক্ষম! (৯) যেদিনগোপন বিকস্মাদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্রশীল আকাশের (১২) এবং বিদারণশীল গৃধিবীর! (১৩) নিশ্চয় কেবলজান সত্য-মিথ্যার ফরসাতা (১৪) এবং এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রবর্ত্ত করেন, (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আকাশের এবং সেই বস্তু, যা রাত্রিতে আবির্ভূত হয়। আপনি জানেন



রাহিত্তে কি আবির্ভূত হয় ? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) প্রত্যেকের উপর একজন কর্মসংরক্ষককারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, (যেমন অন্য

আয়াতে আছে : **وَإِن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ**

উদ্দেশ্য এই যে, কাজকর্মের হিসাব হবে। উদ্দেশ্যের সাথে শপথের মিল এই যে, আকাশে নক্ষত্র যেমন সর্বদা সংরক্ষিত থাকে এবং বিশেষ করে রাহিত্তে প্রকাশ পায় তেমনিভাবে কাজকর্ম আমলনামার সব সমস্ত সংরক্ষিত আছে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে)। অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবগে সঞ্চিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের (অর্থাৎ সমগ্র দেহের) মধ্য থেকে নির্গত হয়। (এখানে পানি বলে বীর্ষ বোঝানো হয়েছে—ওষু পুরুষের কিংবা নারী-পুরুষ উভয়ের। পুরুষের তুলনায় কম হলেও নারীর বীর্ষও সবগে সঞ্চিত হয়। পানির অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্ষ হলে **لَا** শব্দটি একবচনে আনার কারণ এই যে,

উভয়ের বীর্ষ মিশ্রিত হয়ে এক বস্তুর মত হয়ে যায়। পৃষ্ঠ ও বক্ষ দেহের দুই পাশ। তাই সমগ্র দেহ অর্থ নেওয়া যায়। সারকথা এই যে, বীর্ষ থেকে মানুষ সৃষ্টি করা পুনর্বীর সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক কাজ। তিনি স্বধন এটাই করতে সক্ষম, তখন প্রমাণিত হয় যে) তিনি তাকে পুনর্বীর সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। (সুতরাং কিয়ামত না হওয়ার সম্পর্কে দূর হয়ে গেল। এই পুনঃ সৃষ্টি সৈদিন হবে, যেদিন সবার ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতিল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত নিয়ত ইত্যাদি সব গোপন বিশ্বাস বাহির হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যেমন সমস্তমত অপরাধ অস্বীকার করা এবং তা গোপনে করা হয়, সেখানে এরূপ সম্ভবপর হবে না)। তখন তাঁর কোন প্রতিরোধ শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারী-হবে না (যে, আত্মা হাট্টিয়ে দিবে। কিয়ামতের বাস্তবতা যেহেতু কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, তাই অতঃপর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে : ) শপথ আকাশের স্বাক্ষর থেকে পরক্ষ্যে সৃষ্টিপাত হয় এবং পৃথিবীর, যা (বীজের অল্পরোদগমের সমস্ত) বিদীর্ণ হয়। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) নিশ্চয় কোরআন সত্যমিথ্যার সঙ্কসঙ্কট। এটা অর্মান্ব কল্যাণ নয়। (এতে কোরআন যে আলাহুর সিদ্দেকোয়ায়, একথা-প্রমাণিত হয়। কিন্তু এজন্যসত্ত্বেও তাদের অবস্থা এই যে,) তারা (সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য) কখনো অপ্রকৌশল করছেন-কর্ম আমি (তাদেরকে কার্য ও পণ্য দেওয়ার জন্য) নাশ্র কৌশল করে রাখছি। (বলা বাহুল্য, আবার কৌশল প্রবল হচ্ছে। অগণিকাধন আয়ার-কৌশলের কথা শুনগেন) অতএব আপনি কাফিরদেরকে (ভয় করবেন না এবং তাদের দ্রুত দ্বাধাবে কামনা করবেন না, বরং তাদেরকে) অবকাশ দিন (কোনদিন নক্ষত্র) তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু দিনের জন্য। (এরপর যুত্বার আসে অথবা পরে আমি তাদের উপর আত্মা নাশ্র করব। শেষ শপথের শেষ বিষয়বস্তুর সাথে মিল এই যে, কোরআন আকাশ থেকে আসে এবং স্বার মধ্যে স্রোগাতা থাকে, তাকে ধন্য করে। যেমন সৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে উর্বর জমিকে সমৃদ্ধ করে।)

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গম্ভীর হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শরতান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন জপু, কপা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃষ্টিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কপাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, প্রোতা ও প্রস্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অব্যাহত সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আত্মা আসে না—কাফিরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طَارِق শব্দ হোস করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাত্রে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طَارِق বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রায় রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে

أَلَلَّجْمُ الثَّاقِبُ — অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

তাই যে কোন নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তমিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نَجْم বলা হয়ে থাকে।

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ — এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ প্রত্যেক

মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حَافِظ শব্দ এক বচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত

থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ

حَافِظ — এর অর্থ আপদবিপদ থেকে হিফায়তকারীও হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হিফায়তের জম্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হিফায়তে নিয়োজিত থাকে। শুধু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অন্য যে বিপদ অর্থায়িত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হিফায়ত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে

বর্ণিত হয়েছে : **لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ**

অর্থাৎ মানুষের জন্য পাল্লাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আঞ্জার আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাজত করে।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন—প্রত্যেক মু'মিনের উপর আঞ্জাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হিফাজতের জন্য তিন শ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হিফাজত করে। শুশ্রূষা সাভজন ফেরেশতা কেবল চোখের হিফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়—এমন প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে এভাবে মানুষের হিফাজত করে, যেমন মধুর পাশে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত।—(কুরতুবী)

**خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَاْفِقٍ**—অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেসে স্থলিত পানি

থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তফসীর-বিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্ষ পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষত্ব চিকিৎসকগণের সূচিকৃত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্ষ প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্ষ দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেষ্টা বেশী প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, স্ত্রী অভিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সূচিকৃত অভিমত এই যে, বীর্ষ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্থলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণুকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিগুহ্ব হলে তফসীরবিদগণের উপরোক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্ষ উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণুকোষে পৌঁছেছোঁ। এরই কিছু উপালিরা বক্ষের অস্থি-পিঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্ষে বক্ষপিঁজর থেকে আগত বীর্ষের এবং পুরুষের বীর্ষে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্ষের প্রভাব বেশী।—(বায়হাজী)

কোরআন পাকের ভাষায় দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোন বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্ষ নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাতভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

رَجِعَ — اِنَّا عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ — এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্ততা প্রথমবার মানুষকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

تَمَلٰى — يَوْمَ تَمَلٰى السَّوَابِرُ — এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মমন ও স্বপ্নকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলোমত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَرَجِعَ — وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ — এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

اِنَّا لَقَوْلُ فَصْلٍ — অর্থাৎ কোরআন সত্য ও মিথ্যার স্বয়ংসাক্ষ্য করে, এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত আলী (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি :

كُنَّا بِفِيهِ خَيْرٍ مَا قَهْلُكُمْ وَحُكْمٌ مَا بَعْدَكُمْ وَهُوَ الْغُصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উল্লেখিতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি, আমার মুখের কথা নয়।

سورة الاعلى

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ: ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝ الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوٰی ۝ وَالَّذِیْ قَدَرَفَهْدٰی ۝ وَالَّذِیْ

اٰخَرَمَ الْمَرْحٰی ۝ فَجَعَلَهُ غُثًا اٰخُوۡی ۝ سَقَرْتٰنِ ۝ فَلَا تَنْسٰی ۝ اِلَّا مَا

شَاءَ اللّٰهُ دٰرٰتُهُ ۝ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفٰی ۝ وَنَبِیْرٰکَ لِیُبْسِرَی ۝ فَذٰکُرْ

اِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرٰی ۝ سَیِّدُ کَرَمٰنٍ یُّخَشٰی ۝ وَ یَجْتَنِبُهَا الْاَشْقٰی ۝

الَّذِیْ یُضَلِّی النَّارَ الْکَبِیْرٰی ۝ ثُمَّ لَا یَمُوْتُ فِیْهَا وَلَا یَخِیْبِی ۝ قَدْ اَفْلَحَ

مَنْ تَزَكٰی ۝ وَوَدَّ کَرِیْمٌ رَبِّهٖ فَصَلِّ ۝ بَلْ تُكٰثِرُوْنَ الْحَیٰوَةَ الدُّنْیَا ۝ وَالْاٰخِرَةَ

خَیْرًا وَّ اَنْتُمْ ۝ اِنَّ هٰذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ ۝ صُحُفِ اِبْرٰهِیْمَ وَ مُوْسٰی ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের গম্বীর্ণতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তুগাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) জতঃপন্ন করেছেন তাকে কল আবর্তনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতো থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না— (৭) আল্লাহ্, যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়াত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ কলত্রসু হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) জতঃপন্ন সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাক্ষ্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, জতঃপন্ন নামায আদায় করে। (১৬) বস্তুত তোমরা গাধিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। (১৭) অথচ পরকালের

জীবন উৎকৃষ্ট ও স্বামী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (১৯) ইবরাহীম ও মুসার কিতাবসমূহে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে পরমেশ্বর) আপনি (এবং স্বারা আপনার সঙ্গে রয়েছে, সম্মুখেই) আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যিনি (স্বাভাবিক বস্তুনিচরূপে) সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু উপযুক্তরূপে সৃষ্টি করেছেন) এবং যিনি (প্রাণীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বস্তু) নির্গম করেছেন, অতঃপর (তাদেরকে সেসব বস্তুর দিকে) পথ প্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ তাদের মনে সেসব বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন) এবং যিনি (সবুজ সদৃশ) ভূধারি ( মাটি থেকে) উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর করেছেন তাকে কাল আর্জনা। ( প্রথমে সাধারণ সৃষ্টিকর্ম, প্রাণী সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, অনুগত্যের মাধ্যমে পরকালের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। সেখানে কাজকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি হবে। এই আশুগত্যের পছা বলায় জনাই আমি কোরআন নাখিল করেছি এবং আপনাকে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব এই কোরআন সম্পর্কে আমার প্রতিশ্রুতি এই যে) আমি (সতটুকু) কোরআন (নাখিল করব, ততটুকু) আপনাকে পাঠ করাতে থাকব (অর্থাৎ মুখস্থ করিয়ে দিব) ফলে আপনি ( তার কোন অংশ) বিস্মৃত হবেন না আলাহ্ সতটুকু (বিস্মৃত করতে) চান, ততটুকু ব্যতীত। (কারণ, এটাও রহিত করার এক পছা। আলাহ্

বলেন : **مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا** এরাপ অংশ আপনার সবার মন থেকে

ভুলিয়ে দেওয়া হবে। এই মুখস্থ করানো ও বিস্মৃত করানো সবই রহস্যোপযোগী হবে। কেননা) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন। (তাই কোনকিছুর উপযোগিতা তাঁর কাছে গোপন নয়। যখন যে বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা উপযুক্ত মনে করেন, সংরক্ষিত রাখেন এবং যখন বিস্মৃত করা উপযুক্ত মনে করেন, বিস্মৃত করে দেন। আমি যেমন আপনার জন্য কোরআনকে সহজ করে দেব, তেমনি) আমি আপনাকে সহজ শরীয়তের জন্য (অর্থাৎ শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী চলার জন্য) সুবিধা দান করব। (অর্থাৎ সহজে বোঝাতে পারবেন, সহজে আমল করতে পারবেন এবং সহজে প্রচার করতে পারবেন। সকল বাধাবিপত্তি অপসারিত করে দেব। শরীয়তকে প্রশংসার্থে সহজ বলা হয়েছে অথবা এ কারণে যে, এটা সহজ হওয়ার কারণ। ওহী সম্পর্কিত প্রত্যেক কাজ যখন সহজ করার ওয়াদা আমি করছি, তখন) আপনি (নিজে যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করেন তেমনি অপরকেও) উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (বলা বাহুল্য, উপদেশ উপ-

কারীই হয়ে থাকে। যেমন আলাহ্ বলেন : **فَإِنِ الذِّكْرَى نَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ** —

কাজেই আপনি সময়ে উপদেশ দিন। এতদসত্ত্বেও উপদেশ সবার জন্যই উপকারী নয়,

বরং) উপদেশ সে ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে (আল্লাহকে) ভয় করে। (পক্ষান্তরে) যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করে। (ফলে) সে (অবশেষে) মহা অগ্নিতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করবে; অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং (সুখে) জীবিতও থাকবে না। (অর্থাৎ সেখানে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, সেখানে উপদেশ ব্যর্থ হলেও উপদেশ স্বততই উপকারী বাটে। উপদেশ দান আপনার দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত সাক্ষরমর্ম এই যে, আপনি নিজেও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং অপরের কাছেও প্রচার করুন। আমি আপনার সহায়। কোরআন শুনে বিভিন্ন বিশ্বাস ও হীন চরিত্র থেকে) সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছে শুদ্ধ হয় এবং তার পালন-কর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (কিন্তু যে অবিশ্বাসীরা, তোমরা কোরআন শুনে কোরআনকে মান্য কর না এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ কর না; বস্তুত তোমরা পৃথিবী জীবনকে অপ্রাধিকার দাও, অথচ পরকাল দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (এই বিষয়টি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় বরং) এটা (অর্থাৎ এই বিষয়টি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও (লিখিত) রয়েছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মুসা (আ)-র কিতাবসমূহে।—[রহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দশটি সহীফা এবং মুসা (আ)-র প্রতি তওরাত অবতরণের পূর্বে দশটি সহীফা তথা ছোট কিতাব নাখিল হয়েছিল ]।

### জানুয়ারি কিতাব বিষয়

মাস'আলা : আলিমগণ বলেন : নামাযের বাইরে **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى**

তিনাওয়ারত করলে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** বলা মুস্তাহাব। সাহাবান্নে কিরাম এই

সূরা তিনাওয়ারত শুরু করলে এরূপ বলতেন।—(কুরতুবী)

০ ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাখিল

হয়, তখন রসুলুল্লাহ (সা) বলতেন : **اجْعَلُوا فِي سُبْحَانِكُمْ**—অর্থাৎ তোমরা

**سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** কালেমাটি সিজদায় পাঠ কর। **تَسْبِيح** শব্দের অর্থ পবিত্র

রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ**—এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার

নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নরতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত

নয়—এমন স্বাভাবিক বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আলাহ্ স্বয়ং নিজের স্বেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্যকোন নামে তাঁকে ডাকা জায়ের নয়।

০ এর অপরা অর্থ এই যে, স্বেসব নাম আলাহ্‌র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোন মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থী, তাই নাজায়ের। যেমন রহমান, রাহ্মাক, গাফ্ফার, কুদ্দুস ইত্যাদি।—(কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলক্রমে আবদুর রহমানকে রহমান, আবদুর রাহ্মাককে রাহ্মাক এবং আবদুর গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহ্‌গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্‌ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اسم—এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার সত্তা। আরবী ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কোরআন পাকেও اسم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে কালেমাটি নামাশের সিজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى نَبِّرَ سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّي الْأَعْلَى  
—এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য।  
—(কুরতুবী)

الَّذِي خَلَقَ فَسْرَىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ :

—এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আলাহ্‌র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলী। প্রথম গুণ خلق—এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনিয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই, একমাত্র আলাহ্‌ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে স্বখন ইচ্ছা, স্বাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনিয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسْرَىٰ এটা থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ تَقْدِيرٌ—এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি



করা। শব্দটি ফয়সালার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালার। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়—সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে আছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, রুষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায় : **ابرو باد و مة خورشيد**

**و فلک رکاد وند** —মাওলানা রুমী বলেছেন :

**خاک و باد و آب و آتش بنده اند  
بامی و تو مرده با حق زنده اند**

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে আছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে :

**هریکه را نهر کارے ساختند  
میل اور ادر دلس انداختند**

চতুর্থ গুণ **فهدی**—অর্থাৎ প্রল্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে

সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর স্বাভাবিক সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিশ্চিন্তের। অন্য আয়াতে

আছে : **اعطی کل شیء خلقه ثم هدی**—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে

সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরূপ ছুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণী বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনশীল জীব মানুষের কথা বাদ

দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন—প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাঙ্গি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোন স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহর পথনির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা **أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ**

قَدْ رَهَدَىٰ —এবং এই সূরার **قَدْ رَهَدَىٰ** আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সূতীক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। এ জ্ঞান ও নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাতো এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ তা'আলাই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহর সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে লিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিতাই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআনের একটি মাত্র শব্দ **فَهْدَىٰ**-এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

চারণ ভূমি এবং **غُثَاءً** শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে।

أَحْوَى শব্দের অর্থ কৃপাভাগ পাচ সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্ঘ্য আল্লাহ্ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই মিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۗ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা

স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবয়ুগের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিস্মৃতিরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে

فَلَا تَنسَىٰ ۗ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—অর্থাৎ আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ

ব্যতীত যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পল্লিঙ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ (সা) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া।

এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ۗ

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—অর্থাৎ আমরা কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ

ع—এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপযোগিতা বশত কোন আয়াত

সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : মনসুখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَفُهِرِكَ لِلْمُهْرِي —এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে সহজ

করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। একেলে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذِكْرَانِ تَفَعَّلْتَ الذِّكْرِي —পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে

আল্লাহ্ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

زَكَوَةٌ —এর আমল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের

যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে **زَكَوَةٌ** - শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى —অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং

নামায আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ

ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে शामिल।

بَلْ تُؤْثِرُونَ

الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا —হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : সাধারণ মানুষের মধ্যে

ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর

প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কিতাবও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাস্থ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে :

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ

অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও,

একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ডিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট—দুনিয়ার কোন নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন

তুলনা হয় না। তদুপরি তা **أَبْقَىٰ** অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয়—তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা স্বাভাবিক বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কঁড়েঘর, যাতে কোন সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো প্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য—এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কঁড়েঘর প্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিশ্চিন্তেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অপ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মুকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

—**إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفٍ آتْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ** ۖ

অর্থাৎ

এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহীফাসমূহে। হযরত মুসা (আ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

**ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু :** হযরত আবুযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ডুইকোঁড় গবিত, বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশ্বৰ্য

জুপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনকৃত্যতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌঁছতে না পাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সত্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে ভিনভাবে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আত্মাহ্নর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিতবার হিফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

মূসা (আ)-র সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবু যর (রা) বলেন : অতঃপর আমি মূসা (আ)-র সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্রণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃষ্ট বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, সে বিশির্গিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতৌদাম ও চিন্তামুক্ত হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উপান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবু যর (রা) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনাদের কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন : হে

আবু যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (কুরত্ববী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُوهُ يُومِئِدُ خَاشِعَةً ۝ عَامِلَةٌ تَأْتِبُهُ ۝  
 تَضِيءُ نَارًا حَامِيَةً ۝ تَسْفِي مِنْ عَيْنِ اٰنِيَةٍ ۝ كَيْسَ لَكُمْ طَعَامُ الْاٰمِنِ  
 ضَرِيْعٍ ۝ لَا يَسْمُنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُوهُ يُومِئِدُ تَائِعَةً ۝  
 لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ  
 جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝ وَنَوْمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ  
 ۝ وَرَّرَائِي مَبْنُوْنَةٌ ۝ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَ اِلَى  
 السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَ اِلَى الْاَرْضِ  
 كَيْفَ مُطِطَتْ ۝ فَذٰكِرْتُمْ اِنَّمَا اَنْتُمْ مُذٰكِرُوْنَ ۝ اَسْتَعْظِمُ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِي ۝  
 اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝ اِنَّ  
 الْيَنَّا اِيَّا بَهُمْ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) আপনার কাছে আত্মহকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (২) অনেক মুখ-মণ্ডল সেদিন হবে লালিত, (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। (৪) তারা হলন্ত আশ্রনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কষ্টকর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্টি করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না। (৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব। (৯) তাদের কর্মের কারণে সম্ভলট। (১০) তারা

থাকবে সুউচ্চ জাম্বাতে (১১) তথায় গুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরনা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গাজিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উল্টোর প্রতি লক্ষ্য করে না যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফির হয়ে যায়, (২৪) আমরা তাকে মহা আযাব দেবন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে সব কিছুকে আচ্ছন্নকারী সে ঘটনার কিছু সংবাদ পৌঁছেছে কি? (অর্থাৎ কিয়ামতের। তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বকে গ্রাস করবে। প্রবলের উদ্দেশ্য, পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। অতঃপর জওয়ারের আকারে সংবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন লালিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (অর্থাৎ তাতে খাদ্য হওয়ার এবং ক্ষুধা দূর করার যোগ্যতা নেই। ক্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হাশরে অস্থির হয়ে ঘোরাকেরা করা, জাহান্নামে শিকল ও বেড়ী টানা এবং পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করা। ফুটন্ত ঝরনাকেই অন্য জাম্বাতে  বলা হয়েছে। এ জাম্বাত থেকে জানা গেল যে, জাহান্নামে ফুটন্ত পানিরও ঝরনা হবে। ঘরী ব্যতীত খাদ্য হবে না। এর অর্থ সুন্দাদু খাদ্য হবে না। সুতরাং সাক্কুম, গিসলীন ইত্যাদি খাদ্য থাকা এর পরিগৃহীত নয়। মুখমণ্ডল বলে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে : ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল এবং তাদের সৎ কর্মের কারণে প্রফুল্ল হবে। তারা সুউচ্চ জাম্বাতে থাকবে। তথায় তারা কোন অসার কথা গুনবে না। তথায় প্রবাহিত ঝরনা থাকবে। জাম্বাতে উচ্চ উচ্চ আসন বিছানো আছে এবং রক্ষিত পানপাত্র আছে। (অর্থাৎ এসব সাজ-সরঞ্জাম সামনেই উপস্থিত থাকবে, যাতে পাওয়ার ইচ্ছা হলে পেতে দেবী না হয়)। সারি সারি গাজিচা আছে এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট আছে। (ফলে যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই আরাম করতে পারবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও হবে না। এসব বিষয়বস্তু গুনে যারা কিয়ামত অস্বীকার করে তারা ভুল করে। কেননা) তারা কি উল্টের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে (এর আকৃতি ও স্বভাব অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় আশ্চর্যজনক) এবং আকাশের দিকে যে কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে কিভাবে



তা স্থাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? (অর্থাৎ এসব বস্তু দেখে আল্লাহর কুদরত বোঝে না কেন যাতে কিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতাও বুঝতে পারত। বিশেষভাবে এই চারটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা প্রায়ই প্রান্তরে চলাফেরা করত। তখন তাদের সামনে উট, উপরে-আকাশ, নিচে ভূমি এবং চারদিকে পাহাড়-পর্বত থাকত। তাই এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। প্রমাণাদি দেখা সত্ত্বেও তারা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের চিন্তাম পড়বেন না। - রৱৎ) উপদেশ দিন। কেননা আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন—(যে, বেশী চিন্তা করতে হবে)। কিন্তু যে মুখ কিরিয়ে নেয় ও কুফর করে, আল্লাহ তাকে পরকালে মহাশাস্তি দেবেন। কেননা, আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশও আমারই কাজ। (কাজেই আপনি অধিক চিন্তিত হবেন না)।

আনুশঙ্গিক ভাৱব্য বিষয়

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ خَا شِعَةَ آءَا مَلَأْنَا مِصْبَةَ —কিয়ামতে মু'মিন ও কাফির আলাদা

আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা খা শিعة অর্থাৎ ছেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাজ্বিত হওয়া। নামাযে ঋণ্ডর অর্থ আল্লাহর সামনে নত হওয়া, ছেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে ঋণ্ড অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাজ্বিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে : نَا مِصْبَةَ —عَا مَلَأْنَا —বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের

কারণে পরিব্রান্ত ব্যক্তিকে عَا مَلَأْنَا এবং ক্লাস্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَا مِصْبَةَ- বলা বাহুল্য, কাফিরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাজ্বিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফিরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফির দুনিয়াতে মূশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও ঋণ্টান পাত্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মূশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লাস্ত-পরিব্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাজ্বিত ও অপমানের অঙ্ককার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) যখন

শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খৃস্টান বৃদ্ধ পাত্রী তাঁর কাছে আসমন করে। সে তাঁর ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন : এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তাঁর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সম্ভূতি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত উমর (রা) **وَجُودَ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً**

**عَا مَلَّةً نَأْمِيَةً** —আয়াত তিলাওলাত করলেন।—(কুরতুবী)

**حَامِيَةً نَأْمِيَةً** শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্ফটাবতই উত্তপ্ত।

এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উতাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

**لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ** —অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোন

খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই হড়ায়। দুর্গন্ধমুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর খারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে? এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জওয়ার এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা জালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম, ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কোরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কুম ও গিসলীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মত কণ্টকায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কুম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেন : সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে—কোথাও যরী, কোথাও যাক্কুম এবং কোথাও গিসলীন।

**لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ** —জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী—একথা শুনে

কোন কোন কাফির বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাভাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝান

চেষ্টা করো না। জাহান্নামের স্বরী খেয়ে কেউ মোটাভাঙ্গা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ لَهَا لَا غِنَىٰ—অর্থাৎ জাহান্নাতে জাহান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মস্বদ

কথাবার্তা শুনেতে পাবে না। মিথ্যা, কুকরী কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمُ

দোষারোপের কথা শুনেবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জাহান্নাতীদের অবস্থার একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক নীতিমীতি : وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوءَةٌ

কুব—এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। مَوْضُوءَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সম্মিলকে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু—যেমন বদনা, গ্লাস, ভোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জাহান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে—একথা উল্লেখ করে আয়াহ্ তা'আলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آلِ بِلِّ كَيْفَ خُلِقَتْ

কাকিরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিবাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আয়াহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আয়াহ্ কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামাজ্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্ন-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে আয়াহ্ অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

জন্মের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের

জন্য আলাহ্ তা'আলাহ্ হিকমত ও কুদরতের দর্শন হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহা-  
বয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আলাহ্  
তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজগত্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও  
দরিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না।  
কারণ, একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু রুকের পাতা  
হাঁড়ে দেওয়ার কল্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই রুকের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতি-  
পাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুমু'ল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের  
প্রান্তরে পানি খুবই দৃশ্যপ্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আলাহ্ তা'আলা উটের  
পেটে একটি রিজার্ভ ট্যাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান  
করে এক ট্যাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যর করে।  
এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু  
আলাহ্ তা'আলা তার পা তিন ডাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে  
হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু পেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া  
ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিপ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক बोখা  
বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে সিঁড়িভাগে  
সফর করা অভ্যস্ত দুর্লভ কাজ। আলাহ্ তা'আলা এই জীবকে সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত  
করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকারশি ধরে  
যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আলাহ্ কুদরতের সবক'দেয় এমন আরও বহু  
বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূর্য্যর উপসংহারে রসুলুলাহ্ (সা)-র সাম্বন্ধন্য জন্য বলা

হয়েছে : **لَمَسَتْ عَلَيْهِمْ بِمِصْطَرٍ** — অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে

মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই  
আপনি নিশ্চিত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

سورة الفجر

সূরা ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ : ৩০ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْيَلِّ إِذَا يُسْرٍ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ

كَمٌ لِّذِي حَمْرِهُ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفِسَادَ ۝

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْبِرِّصَادِ ۝ فَأَمَّا

إِنْسَانٌ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ۝ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا بَلْ

لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ

الْثَرَائِثَ الْكَلِيلَةَ ۝ وَالْمُحْسِنُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا

دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ

يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ۝ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ رِحَابِي ۝

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝ وَلَا يُؤْتِيهِمْ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝ يَا أَيُّهَا

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝ فَأَدْخِلِي فِي

عِبْدِي ۝ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে, (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কৌলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, (১১) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিশ্বের জনাতি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সন্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে সন্মান দান করেছেন (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর ত্রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (১৭) এটা অমূলক বরণ তোমরা এতীমকে সন্মান কর না (১৮) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না (১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণতরে ডাল-বাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহান্নামকে জানা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবে : হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! (২৫) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না (২৬) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জায়গাতে প্রবেশ কর।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ফজরের সময়ের এবং (যিলহজ্জের) দশ রাত্রির (অর্থাৎ দশদিনের। এই দিনগুলোর ফরীজাত অনেক)। শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড়। (জোড় বলে যিলহজ্জের দশম তারিখ এবং বেজোড় বলে নবম তারিখ বোঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, এর অর্থ নামায। কোন নামাযের রাক'আত জোড় এবং কোন নামাযের রাক'আত বেজোড়। প্রথম রেওয়াজটিকে বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অধিক সহীহ বলা হয়েছে। কারণ, এই সূরার সময়েরই শপথ করা হয়েছে। সুতরাং জোড় ও বেজোড়ও সময়েরই শপথ হওয়া সম্ভব। এরূপও বলা যায় যে, জোড় ও বেজোড় বলে যা যা সন্মানার্থ, তাই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত এবং নামাযের রাক'আতও

দাখিল)। শপথ রাক্বির, যখন তা গত হতে থাকে (যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاللَّيْلِ

إِذَا أَنْهَرُ — অতঃপর এই শপথটি যে মহান, মধ্যবর্তী বাক্যে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে)

এর মধ্যে তানী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট শপথ আছে কি? [এ প্রশ্নের অর্থ আনুও জোরদার করা অর্থাৎ উল্লিখিত শপথগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শপথ ব্যক্তব্যকে জোরদার করার জন্য যথেষ্ট। কোরআনে উল্লিখিত সব শপথই এ ধরনের কিন্তু শুক্কত্ব বোঝাবার জন্য এ শপথের

যথেষ্টতা পরিকার বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ

لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ শপথের উহা জওয়ার এই যে, কাফিরদের অবশ্যই শাস্তি হবে।

পরবর্তী শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত থেকে একথা বোঝা যায়।—(জালালাইন) ] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন শুভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং সারা বিশ্বের শহরসমূহে শক্তি ও বলবীর্ষে যাদের সমান কোন লোক সৃজিত হয়নি? [এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আ'দ আসের, আস ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুত্র। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আ'দ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামুদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আ'দ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামুদ আ'বেরের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আ'দের সাথে ইরামকে যুক্ত করার কারণ এই যে, আ'দ বংশের দুটি স্তর রয়েছে—পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে পেল যে, এখানে প্রথম আ'দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, কম মধ্যস্থতায় কারণে ইরাম শব্দের অর্থ প্রথম আ'দই হয়ে থাকে—(রাহল মা'আনী) অতঃপর অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতের কথা বলা হয়েছে যে, আপনি কি লক্ষ্য করেননি]—সামুদ গোত্রের সাথে (কি আচরণ করেছেন) যারা কোরা উপত্যকায় (পাহাড়ের) পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ('ওয়াদিউল কোরা' তাদের একটি শহরের নাম, যেমন অপর এক শহরের নাম ছিল 'হিজর'। এগুলো সবই হেজাজ ও শামের মধ্যস্থলে অবস্থিত সামুদ গোত্রের বাসস্থান)। এবং কীলকের অধিপতি ফির্রাউনের সাথে।—(দূররে মনসূরে বর্ণিত আছে ফির্রাউন যাকে শাস্তি দিত তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিয়ে শাস্তি দিত। অতঃপর সব সম্প্রদায়ের অভিন্ন অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে—) যারা শহরসমূহে পবিত্র মস্কক উঁচু করে রেখেছিল এবং তথায় বিস্তার অশান্তি বিরাজ করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (অর্থাৎ আঘাত নাশিল করলেন। এখানে আঘাতকে চাবুকের সাথে এবং নাশিল করাকে আঘাত করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর এই শাস্তির

কারণ এবং উপস্থিত কাফিরদের শিক্ষার জন্য ইরশাদ হচ্ছে : ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (অবাধ্যদের প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (কলে উল্লিখিত সম্প্রদায়গণকে চোখ ধাক্কা করে দিয়েছেন এবং বর্তমান লোকদেরকেও অস্বাভাব দেখেন)। অতঃপর (এক পরিশ্রমিত বর্তমান কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আশাব ফেঁকে আনে, এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল কিন্তু কাফির) মানুষ যে, (যে কর্মই তারা অবলম্বন করে সেগুলোর উৎস দুনিয়াপ্রীতি, সেমতে তাকে তার পালনকর্তা পরীক্ষা করেন, অতঃপর সন্মান ও অনুগ্রহ দান করেন (যেমন, ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেন, যার উদ্দেশ্য তার কৃতজ্ঞতা যাচাই করা) তখন সে (একে তার প্রাপ্য বলে মনে করে গর্বে ও অহংকারভরে) বলে, আমার পালনকর্তা আমার সন্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি তাঁর প্রিয়পাত্র বলেই আমাকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন)। এবং যখন তাকে (অস্বাভাবে) পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, (যার উদ্দেশ্য তার সর্বর ও সন্তুষ্টি যাচাই করা) তখন সে (অভিযোগের সুরে) বলে : আমার পালনকর্তা আমার সন্মান হ্রাস করেছেন। (অর্থাৎ আমি সন্মানের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইমানিং আমাকে হের করে রেখেছেন। কলে পাখিব নিয়ামতও হ্রাস পেয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাফির দুনিয়াকেই মূল লক্ষ্য মনে করে। কলে এর স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ এবং নিজেকে এর যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে এর দুঃখকষ্টকে বিভাড়িত হওয়ার দলীল এবং নিজেকে এর পাত্র নয় বলে মনে করে। সূতরাং কাফির ব্যক্তি দুটি ভুল করে—এক. দুনিয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। এথেকে পরকালে অবিশ্বাস জন্মলাভ করে। দুই. যোগ্যপাত্র হওয়ার দাবী করা। এথেকে গর্ব, অহংকার অকৃতজ্ঞতা, বিগর্সে হতাশা এবং ধৈর্যহীনতা জন্মলাভ করে। এগুলো সব অবহিকার কারণ)। কখনই এরাস নর। (অর্থাৎ দুনিয়া মুক্ত হক্কান নয় এবং দুনিয়া থাকে না থাকে প্রিয়পাত্র অথবা অপ্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল নয়। কেউ ফকান সন্মানের যোগ্য নয় এবং সর্বর ও কৃতজ্ঞতা ওয়াজিব হওয়ার পত্তি থেকে কেউ মুক্ত নয়। অতঃপর বজা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেবল এসম কর্মই আশাবের কারণ নয়) বরং (তোমাদের মধ্যে আরও অনেক কর্ম নিন্দনীয়, অগহন্দনীয় ও আশাবের কারণ রয়েছে। সেমতে) তোমরা এতীমকে সন্মান কর, না (অর্থাৎ এতীমকে লাহিত কর এবং জুলুম করে তার ধনসম্পদ কুচিগত করে ফেল) এবং ঈমানীদেরকে অস্বাদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (অর্থাৎ অপরের প্রাপ্য নিজে-রাও পরিশোধ কর না এবং অপরকেও পরিশোধ করতে বজ না। বস্ত ওয়াজিব কাজ না করা কাফিরের জন্ম আশাব বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। তবে কুফর ও শিরক আসল আশাবের ভিত্তি হয়ে থাকে)। তোমরা মুত্তের ত্যাজ সন্ততি সম্পূর্ণ কুচিগত করে ফেল। (অর্থাৎ অপরের হকও চেয়ে ফেল। বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী তখন উত্তরাধিকার প্রমাণ প্রচলিত না থাকলে ইবরাহিমী এবং ইসমাইলী শরীরতের উত্তরাধিকার প্রমাণ মতায় বিদ্যমান ছিল। সেমতে সূর্যভাষুমে শিশু ও সন্দ্যদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্য মনে না করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, উত্তরাধিকার প্রমাণ পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। সূত্রা-সিদ্ধান্ত এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং তোমরা ধনসম্পদকে খুঁটাই ডাকবা। (উল্লিখিত



কুর্কর্মসমূহ এরই ফলশ্রুতি। কেননা, দুনিয়াপ্রীতিই সব পাপের মূল কারণ। সারকথা, এসব ক্রিয়াকর্মই শাস্তির কারণ। অতঃপর যারা এসব কর্মকে শাস্তির কারণ মনে করেন না, তাঁদেরকে শাসানো হয়েছে—) কখনও এরূপ নয়। (এসব কর্ম শাস্তির কারণ অবশ্যই হবে। অতঃপর শাস্তি ও প্রতিদানের সময় বর্ণনা করা হয়েছে—) যখন পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর সুউচ্চ অংশ, যথা পাহাড়-শিখর ইত্যাদি) চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (ফলে ভূপৃষ্ঠ সমান্তরাল হয়ে পাবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে ( لَا تَرَىٰ فِيهَا مَوْجًا وَلَا آَمْتًا ) এবং আগ্নার

পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। (হিসাব-নিকালের সময় এটা হবে। আলাহ তা'আলার উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি আলাহ ব্যতীত কেউ জ্ঞেয় না)। এবং সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ বুঝবে এবং এই বোঝা তার কি কাজে আসবে? (অর্থাৎ এখন বুঝলে তার কোন উপকার হবে না। কারণ, সেটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়)। সে বলবে: হায়, এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অল্প প্রেরণ করতাম। সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দেবে না এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (অর্থাৎ এমন কঠোর শাস্তি ও বন্ধন দেবেন, যা দুনিয়াতে কেউ কাউকে দেয়নি। অতঃপর আলাহর বাধ্য বাস্বাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) হে প্রণাত্ত রাহ, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যে বিশ্বাসী ছিল এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও অস্বীকার করত না। রাহ সেরা অল্প, তাই রাহ বলে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে)। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আলাহর বাস্বাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (طَوَّانَةً)

শব্দের মাঝে ঠাঁদের সংকর্মসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সংকর্মের প্রতি ইঙ্গিত এবং শাস্তির কর্মসমূহের বিবরণ দানের কারণে সম্ভবত এই হচ্ছে, এখানে মক্কাবাসীদেরকে সেরানো সেই প্রকায় উদ্দেশ্য। (প্রথম মক্কাবাসীদের কর্মের জোক বেশী ছিল)।

অনুযায়িক ভাষ্য: বিয়র

এই আয়াতে বর্ণিত বিয়র-  
 ان ربي لجالمرطان  
 আয়াতে বর্ণিত বিয়র-  
 বন্ধনকে ছাড়ানোর কথা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করছ, তাঁর শাস্তি ও প্রতিদান অপেক্ষায় ক্ষুণ্ণ নিশ্চিত। তেমতসেই পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট দৃষ্টি রাখছেন।

শব্দের দীর্ঘতা বিয়রের মাধ্যমে প্রথম বিয়র হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উচ্চতম হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশেষ এক মহাবিশিষ্ট জ্ঞানকর করে এবং আলাহ তা'আলার অগার কুর্কর্মতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী ক্বমরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মুবারক (রা) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক

রেওয়ানেতে ও হযরত কাতাাদাহ (রা) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররুম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র) ও ইকরিমা (রা)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নহর' তথা মিলহজ্জের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোনো রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাত্রি এদিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌঁছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি—একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।—(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাাদাহ এবং মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এতে মিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রাত্রির ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : ইবাদত করার জন্য আল্লাহর কাছে মিলহজ্জের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছর রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।—(মাযহারী) হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা)

স্বয়ং **وَالْفَجْرِ وَلَيْلٍ عَشْرٍ**—এর তফসীর করেছেন, মিলহজ্জের দশদিন। হযরত

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : হযরত মুসা (আ)-র কাহিনীতে **وَآتَمَمْنَاَهَا بِعَشْرِ** বলে

এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন : হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, মিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মুসা (আ)-র জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

**وَالشَّعْرِ وَالْوَتْرِ**—এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও

'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় শব্দে অঙ্গুলি থেকে বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্ট ভাবে তর্জিহ করা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারকগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

**وَتَرٍ**—এর অর্থ আরাফা **الْوَتْرِ يَوْمِ الشَّعْرِ**—অর্থাৎ **وَالشَّعْرِ يَوْمِ التَّعْرِ** এবং **شَعْرٍ**—এর অর্থ ইয়াওমুন্নহর (মিলহজ্জের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হসাইন (রা) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ — অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

করেছি, যথা কুফর ও ইমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সত্তার—**هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ**

يُسرَى — অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে

থাকে তথা শতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফিল

মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেন : **حَجْرَهُمْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَبْرٍ**

-এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও কৃতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই **حَجْرٍ** -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো

হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসুয শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তাঁর নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তাঁর শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জওরায় পরিকল্পিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাগর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাকিরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও সোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো দ্বিগুণিত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুমিরাতেও তাদের প্রতি আযাব ফেরাস করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি আয়াতের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এক. আদ বংশ, দুই. সামুদ গোত্র এবং তিন. ফিরআউন সম্প্রদায়। আদ ও সামুদ জাতিবন্দের বংশদ্ভাবিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আদ ও সামুদ উভয়ের বেলান প্রযোজ্য। এখানে শুধু আদ-এর সাথে ইরাম উল্লেখ করার কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

— **أَرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ** — এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী

বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তাদেরকেই এখানে **عَادِ الْأُولَى** শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজ্‌মে **عَادِ الْأُولَى** শব্দ দ্বারা বর্ণনা

করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে : **عَادِ ذَاتِ الْعِمَادِ** শব্দের

অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে **ذَاتِ الْعِمَادِ** বলা হয়েছে।

এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন

পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন : **لَمْ يَخْلُقْ**

**مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ** অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি।

এতদসঙ্গেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলী রেওন্নারেতসমূহে জাতির দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অজুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হয়রত ইবনে আক্বাস (রা) ও মুকাতিল (র) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওন্নারেতদুট্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নিমিত্ত বেহেশতের নাম।

এরই বিশেষণ **ذَاتِ الْعِمَادِ**—কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তরের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নিমিত্ত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগর বেহেশতকে পছন্দ করে নেন্ন। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আত্মাহুঁর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নিমিত্ত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

— **وَتَادُوا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ** — এর বহুবচন। এর

অর্থ কীলক। ফিরাউনকে কীলকওলাভা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার তুল্য-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফিরাউন তার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা তার হাতপায় কীলক স্নেহের রৌদ্রে শুইয়ে

দিত এবং তার দেহে সর্প, বিষ্ণু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিমার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—( মাযহারী )

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ—আ'দ, সামুদ ও ফিরাউন গোত্রের

অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

مرصد و مرصاد—ان رَبَّكَ لَبِاْئِمْرًا—শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার

ঘাঁটি, যাকোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বাভাস শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহ্যিক ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত

হওয়ার আলামত নয় :

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ—আয়াতে আসলে কাফির ইনসান

বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিশ্চরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়—এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অকণ্যাভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সম্ভব। আমি এর ধোঁগোপাত্র। দুই. আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-জনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দমীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে কুদ্বন্দ্ব হস্ত দেয়, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাজিত ও হের করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন : كَلَّا—অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সাং ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-জনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাজিত হওয়ার দমীল নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। ছোদারী দাবী করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনদিন

মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পল্পগম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দিখন্তিত করে দিয়েছে। রসুলে করীম (সঃ) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে আত্মা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জালাতে যাবে।— (মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা যে ব্যন্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।— (মাযহারী)

ইয়াতীমের জন্য ব্যয় করাই যাচ্ছেট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরী : এরপর

কাফিরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। **لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ**—অর্থাৎ

তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে, নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেস মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অজ্ঞাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায়

কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল : **وَلَا تَصُومُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ**

অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো পরীব-মিসকীনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ ধাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিভ্রাঙ্গীদের উপর কেমন পরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি স্বারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপর হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, **وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا مَّاءً**—অর্থাৎ

তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম ওয়ারিশী সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েয কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সত্ত্ব-বত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীকতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক হুভভোজী জন্তুদের মতই অকিয়ে থাকে, কমে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং হুভদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

وَتَعْشَبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًّا—অর্থাৎ তোমরা ধন-

সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলান্ন মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভাল-  
বাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত ভাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া  
এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফিরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর  
আবার আসল বিষয়বস্তু পরকাজের প্রতিদান ও শান্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে  
কিন্দামত আদমনের কথা বলা হয়েছে।

دَكَ—এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত

করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিন্দামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে  
চূর্ণকার করে দেবে। دَكَ دَكَ বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিন্দামতের ভূকম্পন  
একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلِكُ صَفًا—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ

সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আগমন  
করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِئُوا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ—অর্থাৎ সেদিন

জাহান্নামকে জানা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে  
জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে জানা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে  
বাহ্যত বোঝা যায় যে, সন্তন পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে  
উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের  
আতিনায় সবায় সামনে এসে যাবে।

تَذَكَّرَ—এর অর্থ এখানে

বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফির মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত  
ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্ম-  
জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يَا لَهَيْتُنِي قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي বলে আকাঙ্ক্ষা

বাক্য করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সংকর্ষ করতাম! কিন্তু কৃকর ও শিরকের  
শক্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াও-  
য়ের সময়। আল্লাহ তা'আলার পাকড়াওয়ের মত কঠিন পাকড়াও কারও হাতে পায় না।  
অতঃপর মু'মিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

نَفْسٍ مَطْمَئِنَةٍ — এখানে মু'মিনদের রাহকে **نَفْسٍ مَطْمَئِنَةٍ** (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহর আনুগত্য, বিকির ও শরীয়াত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে

বলা হয়েছে : **ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** — অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও।

ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়ানে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

**رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً** — অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহর প্রতি তাঁর সন্তুষ্টিগত ও আইনগত

বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বাস্তব সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বাস্তব আল্লাহর ফরসাজার সন্তুষ্ট হওয়ার সুযোগ কই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুবলে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। পছন্দ করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আল্লাহর সাথে সাক্ষাত তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারও পছন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জাহ্নামের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফিরের সামনে আযাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোন বিষয় মনে হয় না।— (মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমানুষই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। **رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً** — এর মর্ম তাই।



فَادْخُلِي فِي عِبَادِي—প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার

বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জাম্মাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাম্মাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জাম্মাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জাম্মাতে যাবে, এটা তারাই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمَالِحِينَ এবং ইউসুফ

(আ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَالْحِثْنِي بِالْمَالِحِينَ এতে বোঝা

গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পরমস্বপ্নগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَأَدْخَلْنِي جَنَّتِي—এতে আল্লাহ তা'আলা জাম্মাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ

‘আমার জাম্মাত’ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাম্মাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির অষ্টমাসফলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-বিব্রাকালের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাঙ্গের বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ, পূর্বাঙ্গিষ্ঠিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন : এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেন : উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে—মৃত্যুর সময়ও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বাঙ্গিষ্ঠিত ওয়াদা ইবনে সামিত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে

أَخْرَجِي رَأْسِيَّةَ مَرْضِيَّةٍ إِلَى رُوحِ اللَّهِ وَرِيحَانَ اللَّهِ

অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট—এমতাবস্থায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহর রহমত এবং জাম্মাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন :

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

আমি একদিন রসূলুল্লাহ (স)-র সামনে

পাঠ করলাম। হযরত আবু বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ইন্না রসূলুল্লাহ্ ! এটা কি চমৎকার সন্নোধান ও সন্মান প্রদর্শন ! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সন্নোধান করবে।—( ইবনে কাসীর )

করেকাটি আশ্চর্যজনক ঘটনা : হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেন : তারেক নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)—এর ইত্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হল যার অনুরূপ পাখী কখনও দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শব্দাধারে টুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ

المطمئنة—আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই জালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোন হদিস পাওয়া গেল না।—( ইবনে কাসীর )

ইসলাম হাফেয তিবরানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাডান ইবনে রুয়াইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাডান ইবনে রুয়াইন বলেন : একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার ক্রাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাকির বাদশাহ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বলল : যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান কেটে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হল। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপরে স্বেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রভেৎকর নাম নিয়ে বক্তৃত্তে লাগল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ

رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খৃস্টানরা এ ঘটনা দেখে-শ্রদ্ধায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্ম-ত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবু জাফর মনসুর আমাদেরকে বাদশাহের কবল থেকে মুক্ত করে আনেন।—( ইবনে কাসীর )

سورة البلد

अर्रा बालाद

मकार अवतीर्णः २० आयात।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَأَلْبَدَا ۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ

عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ

الْعُقْبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۝ فَكُ رَقَبَتُهُ ۝ أَوْ اطَّعِمَ فِي يَوْمِ

رُؤْيَى مَسْغَبَتُهُ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ سَكِنَا ذَا مَثْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ

مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ أُولَئِكَ

أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ۝

पठन करणायर ७ असम दरानु आलाहर नामे उर

(१) आमि एह नगरर शपथ करि (२) एबं एह नगररते आपनार उगर कान प्रतिबन्धकता नेह। (३) शपथ जनकेर ७ हा अर देर, (४) निरतर आमि मानुके प्रम-निर्भररूपे सृष्टि करेहि। (५) से कि मने करे ये, तार उगर केउ क्रमतावान हब ना? (६) से बले : आमि अरुंर धनसम्पद बार करेहि। (७) से कि मने करे ये, ताके केउ सेधेनि? (८) आमि कि ताके देहिनि चक्रुधर, (९) जिहण ७ उरुठकर? (१०) बन्धत आमि ताके सृष्टि गध प्रदर्शन करेहि। (११) अतःपर से धरुंर सृष्टिते प्ररुष करेनि। (१२) आपनि जानेन, से सृष्टि कि? (१३) ता हरेह दासमुक्ति

(১৪) অথবা দু'তিনের দিনে অন্নদান (১৫) এতীম আত্মীয়কে (১৬) অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ইমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবারের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আরাতিসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা অগ্নিশরিবশিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

### তাকসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই (মক্কা) নগরীর শপথ করি এবং [ শপথের জওয়াব বলায় পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে যে ] আপনায় জন্য এ নগরীতে মুছবিয়হর জায়গা হবে। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জন্য মুছ হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। হেরেমের বিধানাবলী অগ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকের এবং যা জন্ম দেয় তাঁর। [ সমস্ত সন্তানের পিতা আদম (আ)। অতএব এভাবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে ] আমি মানুষকে খুব শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, কষ্টে ও চিন্তাভাবনায় অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফলে তার মধ্যে অজ্ঞমতা ও অপারক মনোভাব থাকা উচিত ছিল। সে নিজেকে বিধি-সিপি়র বেড়াড়ালে আবদ্ধ মনে করত এবং আজাহর জাদেশের অনুসারী হত। কিন্তু কাকির মানুষ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। অতএব) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্রমভাবান হবে না? ( অর্থাৎ সে কি নিজেকে আজাহর কুদরতের বাইরে মনে করেই এমন ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে? ) সে বলে : আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। ( অর্থাৎ একে তাঁর স্পর্ধা দেখায়, তার উপর রসূলের শত্রুতা ও ইসলামের বিরোধিতার ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। এরপর প্রচুর ধনসম্পদের ব্যয়-মিথ্যাও বলে )। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? [ অর্থাৎ আজাহর অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি জানেন যে, পাপ কাজে ব্যয় করেছে। সুতরাং এজন্য শাস্তি-দেবেন। এছাড়া পরিমাণও দেখেছেন যে, প্রচুর নয়। এটা যেকোন কাকিরের অবস্থা। তখন রসূলুল্লাহ (সা)-র শত্রুতা তাই বজত এবং করতা মোট কথা, কাকির রাজি দুঃখ-কষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি এবং অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দ্বারাও হয়নি, যা অতঃপর বণিত হয়েছে ]। আমি কি তাকে চক্ষুঘর, জিহ্বা ও গুহঠকর দেইনি? অতঃপর তাকে জ্ঞান ও যশ দু'টি পথই বলে দিয়েছি যাতে কতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং লাভের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আজাহর বিধানাবলীর অনুসারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে'খমের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। ( খমের কাজ কষ্ট-স্বাধ্যাধ্যায় একে ঘাঁটি বলা হয়েছে )। আপনি কি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে-দাস-মুক্তি-করক দু'তিনের দিনে অন্নদান, কোন আত্মীয় এতীমকে অথবা কোন ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে। ( অর্থাৎ আজাহর এসব-বিধান মেনে চলা উচিত ছিল )। অতঃপর ( স্বর্ধা-পরি-তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল ) যারা ইমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবারের এবং ( উপদেশ দেয় ) দয়ার। ( অর্থাৎ জুলুম না করার। ইমান সবার অগ্র, এরপর

সবরের উপদেশ উত্তম, এরপর জুলুম থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, এরপর আসে **قَاتِلُوا** থেকে **مَثَرَةً** পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াদির স্তর। অতএব **مَثَرَةً** শব্দটি এখানে মর্যাদার উচ্চতা

বোঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখাগুলো যেনে চলা উচিত ছিল। অতঃপর মু'মিনদের প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তালাই তান-দিকহ লোক। (এর তফসীর সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বস্তরের মু'মিনই অন্তর্ভুক্ত)। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে (অর্থাৎ শাখা তো দূরের কথা মূলনীতিই মানে না)। তালাই বামপাশ লোক। তারা অল্পিপরবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ভর্তি করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে চিরকাল সেখানে থাকবে এবং বের হতে পারবে না।)

**আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিষয়**

**لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ** — এখানে **لَا** অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে

এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অর্থিক বিস্তৃতি উক্তি এই যে; প্রতিপক্ষের দ্রাঘত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই **لَا** শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। **البلد** (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা স্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে **البلد** বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ কী কথা ভাবন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা আঁতড়াও ও সেরা নগরী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সোধর্ষন করে বলেছিলেন: আজাহর কিসম, তুমি গোটা জুগুষ্ঠে আজাহর কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হত, তবে আমি তোমাকে পঙ্গিত্যগ করতাম না।—(মাহহারী)

**وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ** — শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—এক. এটা **حلول**

থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুরে অবস্থান নেওয়া, থাকার ও প্রবর্তনা করা। অতএব, **حلول** এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কা নগরী হিজরত সন্ধানিষ্ঠ ও পবিত্র, বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর প্রের্ত্বের দরুনও বসবাসনের প্রের্ত্ব হ'বে যার। কসবেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সন্মান বিস্তৃত হয়ে গেছে। দুই. এটা **حلت** থেকে উদ্ভূত। অর্থ হাজাল হওয়া। প্রদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফিররা হাজাল মনে করে রেখেছে

এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারিকেই হালিাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রসূলের হত্যাকে হালিাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কাই হেরিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালিাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সাধু-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মামহারীতে সত্তাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدًا وَمَا وَلَدٌ—এখানে وَالِدٌ বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ) আর

وَالِدٌ বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অস্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে :

كَيْدٌ—لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيْدٍ—এর শাব্দিক অর্থ প্রম ও কল্ট। অর্থাৎ

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন প্রম ও কল্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জন্মলগ্নে প্রম ও কল্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননার দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর প্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কল্ট, বার্তাকার কল্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশির এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি—এসমূহ প্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অভিবাহিত হয়। এ প্রম ও কল্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও উল্লভ শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সর্ব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপজর্ষিত্ব অধিকারী। পরিশ্রমের কল্ট চেতনাভেদে কর্ম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববহৎ প্রম হচ্ছে হাশিরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের কীবোলায় নেই।

কোন কোন আলিম বলেন : মানুষের ন্যায় অন্য কোন সৃষ্টিজীব কল্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তি অত্যন্ত বেশী। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কল্ট ও প্রমনির্ভরশরীকরাগেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিশ্বয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনআপনি সৃষ্টিত হয়নি অথবা অন্য কোন মানুষ তাকে জন্ম দিয়েনি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টিজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানুষের কোন প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্ম কখনও এরূপ প্রম ও কল্ট পছন্দ করত না।—(কুরতুবী)

কল্ট স্বীকারের জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত : এ শপথ ও তার জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে জনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোন কল্টের

সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদের এই কামনা একটি দুঃখ, যা কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুঝিমানের কাজ হক, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিদ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খভাসুলও অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

—أَرَأَيْتُمْ أَن تَمُوتَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ—

এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুর্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

— أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا —

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির করেকটি রহস্য :— وَشَفَقَيْنِ وَهَدَيْنَاكَ النَّجْدَ بَيْنَ—

এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এ পথ দুষ্টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিশ্চয় ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলারও কোন ক্রমজ নেই এবং তার দুর্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যোই নিরীকণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তাঁর অবস্থার ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক জল। এর হিকমতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিস্থিতি মধ্যোই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্যা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মত কোন ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূম্রাবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রুর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রুর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদেশের শক্ত হাড় রয়েছে। কলে মানুষ যদি কোথাও উগুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোন কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যময় স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন— মনের মাঝে কোন একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিলে, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা স্তরী করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাঙ্ক্ষা অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। কলে প্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্বায় এসেছে। জিহ্বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই আওয়াজ ও

অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ, সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহ্বাফে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যান্য ক্রমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ক্ষয়সকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠঘয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠঘয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠঘয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দেয় পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখে-

ছেন। যেমন এক আয়াতে আছে **لَهُمَّا فُجُورٌ هَا وَتَقْوَاهَا** অর্থাৎ মানুষের নফসের

মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপচারণ ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গম্বরগণ-ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ্র কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্র-রক্ষা করা, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধ-নের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই অঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ উল্লিখে বর্ণনা করা হয়েছে।

عَقِبَةٌ—فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে



আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এখানে আল্লাহর ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আশা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে **فَكَرْبَةً** অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা শুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা সওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোন কোন বিশেষ প্রণীর লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

**يَتِيْمًا زَا مَقْرَبَةً اَوْ مَسْكِيْنًا زَا مَثْرَبَةً** — অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয়

ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। **فِي يَوْمِ زِي مَسْغَبَةٍ** — অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুপ্তিত মিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃশ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এক্ষণ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবী : **ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ**

**اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِاَلْمَرْحَمَةِ** এ আয়াতে ঈমানের পর

মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ডাইকে সবার ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবারের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। **مَرْحَمَةٍ** -এর অর্থ অপরের প্রতি দয়াল্প হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

سورة الشمس

সূরা শামস

মক্কায় অবতীর্ণ : ১৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلِ  
إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَّهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۝ وَنَفْسٍ  
وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَالْهَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا ۝ وَقَدْ  
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝  
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝  
فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্ড্রের যখন তা সূর্যের গণ্ডাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার, (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে গুহু করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোগ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহর উক্ত্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোগ করেছিল এবং উক্ত্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাশিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের ( অস্ত যাওয়ার ) পেছনে আসে ( অর্থাৎ উদিত হয় । এখানে মধ্য-মাসের কয়েক রাত্রির চাঁদ বোঝানো হয়েছে । এ সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চন্দ্র উদিত হয় । একথা যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নূরের সময়, যেমন **لَمَّا جَاءَ سُوْرَةُ** বলে সূর্যের পরিপূর্ণ নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । অথবা এ সময় কুদরতের দু'টি নিদর্শন সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায় ) । শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে ( ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণরূপে ) আচ্ছাদিত করে । ( অর্থাৎ রাত্রি গভীর হয়ে যায়, তখন সূর্যের কোন প্রভাব অবলিষ্ট থাকে না । পরিপূর্ণ অবস্থার শপথ করার জন্য প্রত্যেকটির সাথে 'যখন কথাটি বারবার' যোগ করা হয়েছে ) । শপথ আকাশের এবং তার, যিনি তাকে নির্মাণ করেছেন ( অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার । এমনিভাবে **مَا طَعْنَاهَا** ও

**مَا سَوَّاهَا** এর মধ্যেও বুঝতে হবে । সৃষ্টির শপথকে স্রষ্টার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার

কারণ এরূপ হতে পারে যে, এখানে চিন্তাকে প্রমাণ থেকে দাবীর দিকে স্থানান্তর করা উদ্দেশ্য । স্রষ্টা দাবী এবং সৃষ্টি তার প্রমাণ । সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে ) । শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিস্তৃত করেছেন । শপথ ( মানুষের ) প্রাণের এবং তার, যিনি একে ( সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ) সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের ( উভয়ের ) জানদান করেছেন । ( অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা । অতঃপর অসৎ কর্মী ও সৎ কর্মীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে ) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় ( অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে ) । এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয় । ( এরপর শপথের জওয়াব উহ্য আছে । অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিপ্ত রয়েছ, তখন অবশ্যই গযব ও ধ্বংসে পতিত হবে । পরকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে, যেমন সামুদ গোত্র এই অসৎ কর্মের কারণে আল্লাহ্র গযব ও আযাবে পতিত হয়েছে । তাদের ঘটনা এই : ) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা-বশত ( সালেহ্ পয়গম্বরের প্রতি ) মিথ্যারোপ করেছিল, ( এটা তখনকার ঘটনা ) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি ( উক্কী হত্যায় ) তৎপর হয়ে উঠেছিল । ( তার সাথে অন্যান্য লোকও শরীক ছিল ) । অতঃপর আল্লাহ্র রসূল [ সালেহ্ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল্প জানতে পারেন, তখন ] তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহ্র উক্কী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক ( অর্থাৎ উক্কীকে হত্যা করো না এবং তার পানি বন্ধ করো না । হত্যা সংকল্পের আসল কারণও ছিল পানির পালা, তাই একে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে । 'আল্লাহ্র উক্কী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকরূপে একে সৃষ্টি করে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে কালেম করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী করে দিয়েছিলেন ) ।

অন্তঃপর তারা তাকে ( অর্থাৎ নবুয়্যতের উক্তীরূপী প্রমাণকে ) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ( কেননা তারা তাঁকে রসূল গণ্য করত না ) এবং উক্তীকে হত্যা করেছিল। অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে সেই ধ্বংসকে ( সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য ) ব্যাপক করে দিলেন। আলাহ্ তা'আলা ( কারও পক্ষ থেকে ) এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না ( যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণআন্দোলনের আশংকা করে থাকেন। সামুদ সম্প্রদায় ও উক্তীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাকে বর্ণিত হয়েছে )।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ **وَالشَّمْسِ**

এখানে **ضَحَى** শব্দটি অর্থগতভাবে **شَمَسَ**-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্ব উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে **ضَحَى** বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ **وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا**— অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে

আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ **وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا**

এখানে **جَلَّهَا**-এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—মাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ **وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا**—অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত

করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ **مصدرية** অর্থাৎ **مَا** অব্যয়কে **وَمَا بَنَاهَا** ধরে এই

অর্থ নেওয়া সম্পূর্ণ যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে **بِمَا غَفَر لِي رَبِّي** এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ **وَمَا طَعَهَا** অব্যয়ের **وَالْأَرْضِ** অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে **مَا** অব্যয়কে **س**-এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্য বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যটির অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে ষষ্ঠীর শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খিলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ ষষ্ঠীর শপথের অগ্রে বর্ণিত হলে কেন ?

সপ্তম শপথ : **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا**—এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক.

শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

**فَجُورًا**—এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং **وَتَقْرَاهَا**

শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পূর্ণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাহিত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলা র অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর পৃথীত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন,

কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই আয়াত তিলাওলাত করতেন, তখন উদ্দেশ্যে নিশ্চিন্ত দোয়া পাঠ করতেন :

—اللَّهُمَّ اِنِّ نَفْسِي تَقْوَاهَا اَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

—অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুক্কাবী ও পৃষ্টপোষক।

قَدْ اَنْلَمَ مِنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ : সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে :

لَسِيَّهَا — অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تزكئة শব্দের

প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পক্ষিলে নিমজ্জিত করে দেয়। لَس —এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা, যেমন

এক আয়াতে আছে : اَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ —কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের

অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয় ; যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামুদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

لَسِيَّهَا — فَدَمَ عَلَيْهِم رِيحٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَذَنَّبَهُمْ فَسَوْهَا

শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বাবরবার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। لَس —এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আয়াত জাতির আবাল-বৃদ্ধ

বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার

শাস্তিদান ও কোন জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করেনা। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে

ধ্বংসাত্মক পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতি-  
শোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা  
করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ  
করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন।  
কারণ পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

---

سورة الليل

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ : ২১ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَٱلَّیْلِ إِذَا یَغْشَىٰ ۝ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۝ إِنَّ

سَعِیْكُمْ لَشَىٰ ۝ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنبَرُهُ

لِلْیُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنَبَرُهُ

لِلْعُسْرَىٰ ۝ وَمَا یُعْطَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝ إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَىٰ ۝

وَإِن كُنَّا لَلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۝ فَأَنذَرْنَاكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝ لَا یَصْلُهَا إِلَّا

ٱلْأَشْقَى ۝ ٱلَّذِی كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ وَسَیَجْزِیْهَا ٱلْأَتْقَى ۝ ٱلَّذِی یُؤْتِی

مَالَهُ یَتْرُكْهُ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا

ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۝ وَكَسُوفَ یَرْضَىٰ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহ্‌তীরা হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অর্থঃ-পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দারিদ্র পথ-প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব,





অবলম্বন করে এ অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর এবং কুফর ও গোনাহ্ অবলম্বন করে জাহান্নামে না যাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে— এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে ( সত্য ধর্মের প্রতি ) মিথ্যারোপ করে এবং ( তা থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, যে ( কেবল ) আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে ( অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই যার কাম্য হয় )। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অপ্বেষণ ব্যতীত ( কারণ, এটাই তার লক্ষ্য। এতে আন্তরিকতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়াও মোস্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক অনুগ্রহের সমান শ্রেষ্ঠ নয়। এ ব্যক্তি প্রাথমিক অনুগ্রহ করে। তাই তার দান রিয়া, গোনাহ্ ইত্যাদির আশংকা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা )। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। ( উপরে শুধু বলা হয়েছিল যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে )।

আনুশঙ্গিক ভাষ্য বিষয়

اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ —এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের

كَدَّحًا বাক্যের অনুরূপ যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রম করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাছোখান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল : অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে —প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰ

وَأَتَّقٰ وَوَدَّقَ بِالْحَسَنٰی —অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা' বলে কলেমায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে আব্বাস, যাহ্‌হাক) এই কলেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাপ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহিলা, এই উভয় কাজে কোন শারীরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে : **وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ**

**وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ**—অর্থাৎ যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহ্‌কে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে **يَسْرَىٰ—فَسُنِّسِرَ لِّلْهَيْسِرِ**—এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক

বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জাম্মাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : **عَسْرَىٰ—فَسُنِّسِرَ لِّلْعَسْرَىٰ**—এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক

বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জাহান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরাপ বলা সম্ভব ছিল যে, আমি তাদের জন্য জাহান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জাহান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

**اعملوا فكل مهسر لها خلق له ا ما من كان من اهل السعان ة فسُنِّسِرَ**

## لَعْمَلِ السَّعَادَةِ وَ أَمَا مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَسِيرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ - ৯

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ্‌প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আযাব ও সওবাব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগা জাহান্নামী দলকে হাশিয়ান করা হয়েছে :

وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى — অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ

হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও রূপগতা করত, সে ধনসম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। **تَرَدَّى** -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى — অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিভাত

হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফিরেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তফসীরে মামহারীতে আছে যে, আয়াতে **الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى** শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত : কারণ, প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্

খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরীভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ অনা-রাসেই মাক্ হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : **إِنَّ الْكَسَنَاتِ يُذِّ**

**هَبْنِ السَّيِّئَاتِ** অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বৃষ্টিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **هَمْ قَوْمٌ لَا يَغْفِرُ جَلِيْسَهُمْ وَلَا يَخَافُ اَنْفُسَهُمْ** অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পারে না।—( বুখারী, মুসলিম ) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরুল শিরোমণি মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-র সহচর হবে, সে কিরাপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিক্রম বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নামের আশাব থেকে মুক্ত। ছোদ কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَلَا وَعَدَ اللهُ الْعَسْنَى** —অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাহ্ তা'আলা

হসনা অর্থাৎ জামাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : **إِنَّ الدِّئِينَ**

**سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْعَسْنَى أُولَئِكَ عَلَيْهَا يُعَذَّبُونَ** —অর্থাৎ যাদের

জন্য আমার পক্ষ থেকে হসনা ( জামাত ) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে।—( তিরমিহী )

**وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُرْتَى مَالَهُ يَتَزَكَّى** —এতে সৌভাগ্যশালী

আলাহ্‌জীকদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলাহ্‌র আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে গুচ্ছ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আলাহ্‌র পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুশুল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে **اتقى** বলে হযরত আবু বকর

সিন্দীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অক্ষয় নির্মাতন চালাত। হযরত আবু বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয়।—( মাযহারী )

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : **وَمَا لَاحِدٌ عِنْدَا**

**مِنْ نِّعْمَةٍ تَجْزَى**—অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবু বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরাপ করা যেত, বরং **أَلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهٍ رَبِّهِ الْأَعْلَى**—তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সম্বলিষ্ট অবেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুন্সাদরাক হাকিমের হযরত সুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবু কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হিফাজত করতে পারে। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সম্বলিষ্ট লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি।—( মাযহারী )

**وَلَسَوْفَ يَرْضَى**—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বলিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পাখির উপকার চায়নি, আল্লাহ তা'আলাও পরকালে তাকে সম্বলিষ্ট করবেন এবং জাহ্নামের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সম্বলিষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

## سورة الضحى

### সূরা ভোহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَلَكًا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۝  
مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝  
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا  
تَقْهَرُ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালন-কর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃশ্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সূতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে— এক. আক্ষরিক অর্থাৎ পুরোপুরি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। কেননা, রাত্রিতে অন্ধকার আস্তে আস্তে বাড়ে এবং কিছু রাত্রি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দুই. রূপক অর্থাৎ প্রানীকুলের নিদ্রামগ্ন হয়ে যাওয়া এবং চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়াজ থেমে যাওয়া। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে) আপনার পালনকর্তা

আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি। (কেননা, প্রথমত আপনি এরূপ কোন কাজ করেন নি। দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ আচরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আপনি কাফিরদের বাজে কথায় ব্যথিত হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে শুরু করেছে : আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রজাপোক্তির মুকাবিলায় আপনি পূর্ববৎ ওহীর সম্মান দ্বারা ভূষিত হবেন। এ সম্মান তো আপনার জন্য ইহকালে) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (সুতরাং সেখানে আপনি আরও বেশী সম্মান ও নিয়ামত পাবেন)। আপনার পালনকর্তা সত্ত্বরই আপনাকে (পরকালে প্রচুর নিয়ামত) দান করবেন, অতঃপর আপনি (এ দান পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন। [শপথের বিষয়বস্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন বাহ্যত দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন এনে তাঁর কুদরত ও হিকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও তেমনি বুঝতে হবে। সূর্য-কিরণের পর রাত্রির আগমন যদি আল্লাহ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির দলীল না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবালোক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বন্ধ থাকলে এটা কিরূপে বোঝা যায় যে, আজকাল আল্লাহ তাঁর মনোনীত পয়গম্বরের প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। ফলে ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন? এরূপ বলার অর্থ আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও জগার রহস্য সম্পর্কে আপত্তি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোনীত পয়গম্বরের ভবিষ্যতে অযোগ্য প্রমাণিত হবে (নাউমু-বিলাহ)। অতঃপর কতক নিয়ামত দ্বারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পান নি? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। [মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ (সা) পিতৃহীন হয়ে যান। এরপর আল্লাহ তা'আলা দাদাকে দিয়ে তাঁর লালন-পালন করান। আট বছর বয়সে মাতারও ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের লালন-পালনে আসেন। আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এটাই]। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান, অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

—مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (যেমন অন্য আয়াতে আছে :

পূর্বেশরীয়তের উফসীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আপনাকে নিঃস্বপ্নেছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [খাদীজা (রা)-র অর্থ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি শুরু থেকেই নিয়ামত-প্রাপ্ত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়ামত আপনাকে দিয়েছি, তখন] আপনি (এর কৃতজ্ঞতায়) ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না (এটা কার্যগত কৃতজ্ঞতা)। এবং আপনার পালনকর্তার (উপরোক্ত) নিয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।



### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসজিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে অবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি অংগুলাতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

أَنْتِ إِلَّا أَصْبَعٌ وَ مَهْتٌ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقِيتِ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলাই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কণ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। ( কাজেই দুঃখ কিসের )। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রক্ত পড়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রা)-এর রোগ্নায়তে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে—ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রোগ্নায়তে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রোগ্নায়তে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাত-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে রাহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়ার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

أُولَىٰ وَ آخِرَةٌ—এখানে وَ آخِرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ শব্দটির

প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনাদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নিয়ামত দান করা হবে। এখানে آخِرَةٌ কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা, যেমন أُولَىٰ শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে

ভানপরিমা ও আলাহ্‌র নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পাখিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ — অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে

এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুরই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসুলুল্লাহ (সা)-র কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে পর রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : তাহলে আমি ততরূপ সন্তুষ্ট হব না, যতরূপ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহামামে থাকবে।—(কুরতুবী) হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : আলাহ্‌ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বললেন : رَضِيْتُ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আশ্বস্ত করব : يَا رَبِّ رَضِيْتُ হে আমার পরওয়ানদিগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন রসুলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ — অতঃপর হযরত

ইসা (আ)-র উক্তি সম্বন্ধিত অপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন : اِنْ تَعَدَّ بِهٖم

فَاِنَّهُمْ مَبَٰرِئٌ — এরপর তিনি দু'হাত তুলে কাম্য বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন :

اللَّهُمَّ اُمَّتِي اُمَّتِي — আলাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈলকে কাম্য কারণ জিজ্ঞাসা করতে

প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জওয়াবে তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের মাগফিরাত চাই। আলাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আলাহ্‌ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফিরদের বলাবলির জওয়াবে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি ইহকালে ও পরকালে আলাহ্‌র নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর ক্বিক্বিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে : اَلَمْ يَجِدْ يٰٓيٰٓهُمَا قَاۗوِي — এটা প্রথম নিয়ামত।

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করে-ছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যশ্বারা আপনার লাজন-পালন হতে পায়ত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবু তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অসগধ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লাজন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত : **فَالْوَجْدَكَ مَا لَا نَهْدِي** শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয়

এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নব্বয়ত লাভের পূর্বে তিনি আচ্ছাহ্নর বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নব্বয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : **وَوَجْدَكَ مَا ثَلَاثًا غَنِي** অর্থাৎ আচ্ছাহ্ন তা'আলা

আপনাকে নিঃস্ব ও রিজহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারাবার করার মাধ্যমে এক সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ **فَأَمَّا الْبَيْتِمْ فَلَا تَقْرَهُ** শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলক-

ভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ালিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একা-রূপেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াতীমের সাথে সহাদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্যবহার করা হয়।— (মাযহারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ : **نَهْرًا مَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ** শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং

সائل-এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কর্তোয়তা ও দুর্বাবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ : **تَحْدِيثًا—وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** শব্দের অর্থ কথা

বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌ তা'আলারও শোকর আদায় করে না।—( মাযহারী )

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা, যে জনসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হুক আদায় করে দেয়।—( মাযহারী )

মাস'আলা : সর্বরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর হল শারীরিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র ফরয কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হল অপরকে তা শিখা দেওয়া।—( মাযহারী )

○ সূরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শামেখ সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**

—( মাযহারী )

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগড়া (র) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।—( মাযহারী ) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিসামত ও তাঁর অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু ছাড়াই কোরআন পাক গুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাদ্ম্য বর্ণনা ছাড়া শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

## سورة الانشراح

### সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ : ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُنشَرِّمْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِي اَنْقَضَ

ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

يُسْرًا ۙ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি কি আপনার বকু উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমূচ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অন্তএব, যখন অবসর পান, পরিত্রয় করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি কি আপনার খাতিরে আপনার বকু (জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা দ্বারা) প্রশস্ত করে দেইনি? (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিস্তৃতি দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শত্রুদের বাধা দানের কারণে যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি।—দুরের-মনসুর) আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। [‘বোঝা’ বলে এখানে সেসব বৈধ বিষয় বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রহস্য ও উপযোগিতাবশত রসুলুল্লাহ (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রমাণিত হত যে, এটা উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী। এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিন্তিত হতেন, যেন কোন গোনাহ করে ফেলেছেন। আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পাকড়াও করা হবে না বলে সুসংবাদ রয়েছে। এরূপ সুসংবাদ তাঁকে দু’বার দেওয়া হয়েছে—একবার মক্কায় এই সূরার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার মদীনায় সূরা ফাত্হের মাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবাদের তাক্বীদ নবায়ন

ও তফসীল করা হয়েছে ]। আমি আপনাকে আলোচনাকে সমুদ্রে স্থাপন করেছি। ( অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ জাম্বায় আল্লাহ্ নামের সাথে আপনাকে নাম যুক্ত হয়েছে। এক হাদীসে-কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন : **اِذَا ذَكَرْتَ ذِكْرَ مَعِي** অর্থাৎ যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনাকে আলোচনাও হবে। যেমন, খোতবায়, তাশাহ্-হুদে, আমানে ও ইকামতে। আল্লাহ্ নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্ নামের সাথে যুক্ত নামও উচ্চ ও সুখ্যাত হবে। মজায় তিনি ও মু'মিনগণ নানারকম কষ্ট ও বিপদাপদে প্রেফতার ছিলেন। তাই অতঃপর সেসব কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আশ্বিক সুখ দিয়েছি এবং আশ্বিক কষ্ট দূর করে দিয়েছি, তখন পাখিব সুখ ও শ্রমের ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত। সেমতে আমি ওয়াদা করছি) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে (অর্থাৎ সত্ত্বরই) স্বস্তি হবে। (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল। তাই তাকীদের জন্য পুনশ্চ ওয়াদা করা হচ্ছে) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে স্বস্তি হবে। (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যায়। অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকের আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আমি যখন এসব নিয়ামত দিলাম, তখন) আপনি যখন (প্রচারকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিশ্রম করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন। এটাই আপনার শানের উপ-যুক্ত) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন। (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান। এতেও কষ্ট দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারান্তরে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ)।

### আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যোহর শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইন্শিরাহ্ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহর ন্যায় জিভাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

**الْمَ نَشْرَحُ لَكَ مَدْرَى** شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা

ও উত্তম চরিত্রের জন্য বন্ধকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বন্ধ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে : **فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ مَدْرَهُ لِلَّهِ سَلَامٌ**

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র বন্ধকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে

কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আলাহ্ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফিরিশতাগণ আলাহ্‌র আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বন্ধ বিদারণ করে পরিকার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বন্ধ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বন্ধ বিদারণই নিয়েছেন। —(ইবনে কাসীর)

وزر—وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَی

অর্থ বোঝা আর **ظهر** —এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রসুলুল্লাহ্ (সা) তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং তিনি আলাহ্‌র নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আলাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিরোধ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ

ছিল : **فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ** —অর্থাৎ আপনি আলাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী সরলপথে

অটল থাকুন। রসুলুল্লাহ্ (সা) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বলতেন : **فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ** —

এই আয়াত আমাকে বুড়া করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পছা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কণ্ঠের পর স্বস্তি আসবে। আলাহ্ তা'আলা বন্ধ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِي —রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আলোচনা উন্নত করা এই যে,

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সার্বিক বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে ‘আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহুহু’র সাথে সাথে ‘আশহাদু আল্লা মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্’ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোমল জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সন্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে— **شرح صدر** (বক্ষ উন্মোচন) **رفع ذكر** (আলোচনা উন্নতকরণ) ও **رفع وزر** (বোঝা লাঘবকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে **لَكَ** অথবা **عَنْكَ** ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا —আরবী ভাষার একটি নীতি

এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে **العسر** শব্দটি যখন পুনরায় **العسر** উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই **عسر** অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পরবর্ত্তরে **يسرا** শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় **يسر** তথা স্বস্তি প্রথম **يسر** তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** —এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু’টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু’-এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু’-এর সংখ্যা নয়, বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সার্বকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে এই আয়াত থেকে দু’টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন,

**لَنْ يَغْلِبَ عَسْرُ يَسْرَيْنِ** অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে

না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাতে গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।



শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে যিকর ও আল্লাহর দিকে

মনোনিবেশ করা জরুরী : **فَاذْفَرَعْتَا فَاَنْصَبْ وَآلِي رَبِّكَ فَاَرْغَبْ**

অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আল্লাহর যিকর, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসূলুল্লাহ (স)-র সর্ব্ব্বহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টিজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহর যিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্ব্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহর যিকর ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরাপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না।

**فَاَنْصَبْ** শব্দটি **نصب**

থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লাস্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লাস্তি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিফা কিংবা নিয়মমেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লাস্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

سورة التين

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ : ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّتِیْنِ وَالزَّیْتُونِ ۝ وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝ لَقَدْ

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ ۝

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا

یَكْذِبُكَ بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلْیَسَّ ۝ اَللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ আঞ্জীর ফল (তথা ডুমুর) ও যম্বত্বনের, (২) এবং তুরে সিনীনের (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে প্রের্ততম বিচারক নন?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) বৃক্ষের, যম্বত্বন বৃক্ষের, তুরে সিনীনের এবং এই নিরাপদ নগরীর (অর্থাৎ মক্কা মোম্বায়মমার)। আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর (তাদের মধ্যে যে লোক বৃদ্ধ হয়ে যায়) তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতর করে দেই। (অর্থাৎ সৌন্দর্য কদাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়)। ফলে সে হীন থেকে হীনতর হয়ে যায়। (এতে পূর্ণ মন্দতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর ফলে আল্লাহ যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফুটে উঠে। অন্য এক আয়াতে

আছে **اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ** — আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি

করতে ও জীবিত করতে সক্ষম—একথা সপ্রমাণ করাই এ সূরার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بَالِدَيْنِ -বাক্যে এরাই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের

ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব রুদ্ধই বিস্ত্রী ও হীন হয়ে যায়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'মিন সৎকর্ম রুদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল অবস্থায়ই থাকে, বরং তাদের ইয়যত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিশ্বাসী করে? (অর্থাৎ কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর? ) আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? (পাথিবী কাজকারবারে ও তন্মধ্যে মানবসৃষ্টি ও বার্বাকো তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও—তন্মধ্যে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যতম)।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالْتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ—এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন

অর্থাৎ আজীর তথা ডুমুর রুদ্ধ। দুই. যয়তুন রুদ্ধ। তিন. তুরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররম। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তুর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন রুদ্ধও বহল উপকারী। এটাও সন্তবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ রুদ্ধ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তুর পর্বত মুসা (আ)-র আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষ নবী (সা)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ : শপথের পর বলা হয়েছে :

—এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছু'র অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

—এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্টি

জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন : আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জানী, শক্তিমান, বজ্রা, প্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে : **ان الله خلق ادم على صورته** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

মানব সৌন্দর্যের একটি জ্ঞাতাবনীয় ঘটনা : কুরতুবী এখানে বর্ণনা করেন, ইসা ইবনে মুসা হাশেমী খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্তিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার হলে বলে ফেললেন : **انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر** অর্থাৎ তুমি তিন ভালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বলল : আপনি আমাকে ভালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার ভালাক শব্দ হাসি তামাশার হলে উচ্চারণ করলেও ভালাক হয়ে যায়। ইসা ইবনে মুসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্তি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যয়ে খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত রুডান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়ামবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, ভালাক হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাটিরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা ভালাক হযনি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর—রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন জ্ঞান কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে—মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নানুক, সূক্ষ্ম ও সনৎক্লিন্স মেশিন চালু রয়েছে। তার বন্ধ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন : মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে।—(কুরতুবী)

সূফী বুয়ুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَدْنَا نَّاهُ اسْفَلَ سَافِلِينَ — পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে

সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রায়শ্বে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অন্তিমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাশ্চ দেয়। সে কৃত্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্রমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্রম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দূশ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্রম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সার কথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈশ্বিক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত হাফ্ফাহক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে।—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্রম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈশ্বিক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈশ্বিক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারকতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্য-জনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাকে।—(বুখারী) এছাড়া এখানে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জামাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার

পরিবর্তে বলা হয়েছে : لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ — অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন

ও কতিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈশ্বিক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আশ্বিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবায় প্রবৃত্ত করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈশ্বিক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ অজোচ্য

আল্লাহের এরূপ তফসীর করেছেন যে, **رَدُّ نَاةٍ أَسْفَلَ سَافِلِينَ**—সাধারণ

মানুষের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাদুস্বাদের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এমতাবস্থায় **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا** বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ

যারা মু'মিন ও সৎকর্মা, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুণ্যকার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—( মাযহারী )

**فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِلَدِّينِ**—এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হ'শিয়ার করা

হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন ?

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র র়েওয়ানেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা

তীনের **وَأَنَا عَلَى** **اللَّهِ بِأَحْكَمِ الْعَالَمِينَ** পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত

**ذُكِرَ مِنَ الشَّاهِدِينَ** বলা। সেমতে ফিকাহবিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ

করা মোস্তাহাব।

سورة العلق

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلْ ۝ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي رَجُلٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

يَنْهَى ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝ أَوْ أَمَرَ

بِالتَّقْوَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝ كَلَّا لَئِنْ

لَمْ يَنْتَهَ ۝ لَسَفَعْنَا بِالنَّاصِيَةِ ۝ النَّاصِيَةِ ۝ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فُلْيُدْ ۝ نَادِيَةٍ ۝

سَنَدُّ ۝ الزَّبَانِيَةِ ۝ كَلَّا لَا تَطَعُهُ ۝ وَأَسْجُدْ ۝ وَقُتِرْ ۝ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে অজাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) অথবা আল্লাহ্‌তীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই—(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। (১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের

প্রহরীদেরকে। (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(مَا لَمْ يَعْلَمْ اَقْرَأْ) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের মাধ্যমে নবুয়তের

সূচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াজেতে এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নবুয়ত লাভের কিছু দিন পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) আপনাপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিগুহায় গমন করে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাৎ জিবরাঈল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : اَقْرَأْ অর্থাৎ পাঠ করুন। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

مَا اَنَا بِقَارِیْ অর্থাৎ আমি যে পড়তে জানি না। জিবরাঈল তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন।

অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন : اَقْرَأْ পাঠ করুন। তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন।

এমনিভাবে তিন বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন : اَقْرَأْ থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত )

হে পয়গম্বর ( এ সময়কার আয়াতগুলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা ) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [ অর্থাৎ যখন পাঠ করেন,

তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক অম্মাতে اِذَا قَرَأْتَ

اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ বলে কোরআন পাঠের সাথে আউযুবিল্লাহ পড়ার আদেশ করা

হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা মনে মনে বলা ওয়াজিব এবং মুখে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র বিসমিল্লাহ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন কোন রেওয়াজেতে এ সূরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বর্ণিত আছে।

اٰخِرُ جِهَةِ الْوَاحِدِیْ عَنْ عِكْرَمَةَ وَالْحَسَنِ اِنَّهُمَا قَالَا اَوَّلُ مَا نَزَلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاَوَّلُ سُوْرَةٍ اِقْرَأْ وَاٰخِرُ جِهَةِ الْوَاحِدِیْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ قَالَ اَوَّلُ مَا نَزَلَ جِبْرًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰی النَّبِیِّ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَعِذْ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - كَذَا فِی رُوْحِ الْمَعٰنِیْ -



আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে স্বয়ং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি শুন। এতে স্বয়ং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বক্তার উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করুন অথবা পরে যেসব আয়াত নাযিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবগুলোর পাঠই আল্লাহর নামে হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভীতির কারণে তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল মানসিক শান্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরম্ভ করার সময় বলেন : পড়। একে কেউ অসাধ্য কাজের আদেশ বলে না। রসূলুল্লাহ (সা)-র ওয়র করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা পয়গম্বরের শানের খেলাফ হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় লিখিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহৃত নয়। তাঁর যেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই এই ওয়র করেছেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্ভবত জিবরাঈল তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। (رب) **والله اعلم**

শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষভাবে এ গুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাগ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া সৃষ্টিকর্ম স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য কাজ। ব্যাপক সৃষ্টির কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে—) যিনি (সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে) মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিরূপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ সৃষ্টি বস্তুর তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উন্নত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোকর ও যিকর করা উচিত। বিশেষভাবে জমাট রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা একটা বরমখী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বীর্ষ, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিণ্ড, অস্থি গঠন ও আত্মাদান। সুতরাং জমাট রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা-সমূহের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত করার জন্য বলা হয়েছে : ) আপনি কোরআন পাঠ করুন। (অর্থাৎ প্রথম আদেশ

**اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ** থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলীগের উপায় এবং পয়গম্বরের

আসল কাজই তবলীগ। সুতরাং এই পুনরুজ্জ্বলিত দ্বারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর সে ওয়র দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাঈলের কাছে পেশ করেছিলেন যে, তিনি পড়া জানেন না ; বলা হয়েছে : ) আপনার পালনকর্তা দয়ালু ( যা ইচ্ছা দান করেন ) যিনি ( লেখাপড়া জানাদেরকে ) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন ( এবং সাধারণভাবে ) মানুষকে ( অন্যান্য উপায়ে ) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না । [ অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়—অন্যান্য উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায় । দ্বিতীয়ত উপায়াদি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল নয়—প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি । সুতরাং আপনি লেখা না জানলেও আমি অন্য উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওয়র-জান সংরক্ষণের শক্তি দান করব । কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ দিয়েছি । বাস্তবেও তাই হয়েছিল । সুতরাং এ আয়াতসমূহে নবুয়ত ও তার ভূমিকা এবং পল্লিপুরুষ বিষয়াদির বর্ণনা হয়ে গেছে । যেহেতু পয়গম্বরের বিরোধিতা চরম গোনাহ্ ও গহিত কাজ, তাই অনেক পরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশিষ্টা বিরোধিতাকারী আবু জাহলের নিন্দা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে । ফলে অন্যান্য বিরোধিতা-কারীও এতে শামিল হয়ে গেছে । এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবু জাহল রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায় পড়তে দেখে বলল : আমি আপনাকে নামায় পড়তে বারবার নিষেধ করেছি । রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলে সে বলল : মক্কার অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রয়েছে । যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায় পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাড়ে পা রেখে দেব ( নাউযুবিল্লাহ্ ) । সেমতে সে একবার নামায় পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্তু হযর (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সরতে লাগল । পরে এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলল : আমি সামনে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিষ্ট কিছু বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছে । রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বলেন : তারা ছিল ফেরেশতা । যদি আবু জাহল আরও সামনে এগোত, তবে ফেরেশ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত । এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে । বলা হয়েছে ] সত্য সত্যি ( কাফির ) মানুষ সীমানংঘন করে । কারণ, সে নিজেকে

( অন্যদের থেকে ) অমুখাপেক্ষী মনে করে । ( অন্য আয়াতে আছে : **وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ** —

**الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبِغْوًا** — অর্থাৎ এই অমুখাপেক্ষিতার কারণে অবাধ্যতা করা নির্ব-

দ্ধিতা । কেননা, কেউ যদি সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু স্রষ্টার প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না । এমনকি পরিশেষে হে মানুষ ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে । ( কখনও জীবদ্দশার ন্যায় তাঁর কুদরত দ্বারা বেষ্টিত হবে এবং তখন অবাধ্যতার যে শাস্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পাল্লাতে পারবে না । সুতরাং অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতএব নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করি এবং তজ্জন্য অবাধ্যতা করা বোকামিই বটে । অতঃপর জিজ্ঞাসার আকারে অবাধ্যতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে— ) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে ( আমার ) এক বান্দাকে নামাম পড়তে বারণ করে ? ( অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই । নামামীকে নামাম পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিস্ময়কর বিষয় । অতঃপর অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ) হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে বান্দা ( যাকে বারণ করা হয়েছে ) সৎ পথে থাকে ( যা নিজস্ব গুণ ) অথবা অপরকে আল্লাহ্‌জীতি শিক্ষা দেয় ( যা পরোপকার । 'অথবা' বলে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দু'টি গুণের মধ্যে একটি থাকলেও নিষেধকারীর নিন্দার জন্য যথেষ্ট হত । আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে ) । হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে ( নিষেধকারী ) বান্দা মিথ্যারোপ করে এবং ( সত্যধর্ম থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নেয় ( অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে ) প্রথমে দেখ যে, নামাম পড়তে স্বাক্ষর করা কত মন্দ ! এরপর লক্ষ্য কর, বারণকারী একজন পথভ্রষ্ট এবং যাকে বারণ করেছে সে একজন সৎ পথপ্রাপ্ত । সুতরাং এটা কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার ! অতঃপর বারণকারীর উদ্দেশ্যে শাস্তিবাকী উচ্চারণিত হয়েছে—) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা ( তার অবাধ্যতা এবং তা থেকে উৎপন্ন কার্যকলাপ ) দেখছেন ( এর জন্য ) ত্রিনি শাস্তি দেবেন ? ( তার কখনও এরূপ করা উচিত নয় ) । যদি সে ( এই কর্মকাণ্ড থেকে ) বিরত না হয়, তবে আমি ( তাকে ) মস্তকেশর সামনের কেশগুচ্ছ ধরে মা, মিথ্যা ও পাপে আপ্রত কেশগুচ্ছ ( জাহান্নামের দিকে ) হেঁচড়াবই । ( সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গম্বরকে হমকি দেয়—) অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক, ( সে এরূপ করলে ) আশিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব । [ সে আহ্বান করেনি বলে আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাগণকে আহ্বান করেন নি । এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আবু জাহ্ল এরূপ করলে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করত ] । কখনও তার এরূপ করা উচিত নয় । আপনি ( এই নালায়কের কোষ পরওয়া করবেন না এবং ) তার কথা মেনে চলবেন না ( যেমন এ পর্যন্ত মেনে চলেন নি ) এবং ( পূর্ববৎ ) সিজদা করুন এবং আমার নৈকটা অর্জন করুন । [ এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন ] ।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়াজ থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে,

সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত ( **مَا لَمْ يَعْلَم**

পর্যন্ত ) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে । কেউ কেউ সূরা মুদাস্সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন । ইমাম বগভী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিগ্ধ বলেছেন । সূরা মুদাস্সিরকে প্রথম সূরা বলার ফারস এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নামিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন । এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আ) সামল আসেন

একং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—( মাযহারী )  
বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মত সামনে এসে যেত।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জায়াতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালুমুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার-পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথের শেষ হয়ে গেলে তিনি পত্নী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথের নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াজেতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমযান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র) বলেন : এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়াজেতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামায ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সূতরাং হেরা গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেন : তিনি নুহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আ)-র শরীয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়াজেতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরঙ্কর ছিলেন বিধায় একে বিস্কৃতও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।—( মাযহারী )

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করে বললেন : **اقْرَأْ** ( পাঠ করুন )। তিনি বলেন :

**ما انا بقارى** আমি পড়া জানি না। [ কারণ, তিনি উম্মী ছিলেন। জিবরাঈল (আ)-

এর উদ্দেশ্য, কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। তাই ওষর পেশ করেছেন। ] রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার এ জওয়াব শুনে জিবরাঈল (আ) আমাকে বুক জড়িয়ে

ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : **اقْرَأْ** ( পাঠ করুন )। আমি আবার পূর্ববৎ জওয়াব দিলাম।

এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মত পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জওয়াব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

**اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝**

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে গৌঁছে বললেন : **زملونى زملونى** আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদীজা (রা) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হল। এ ভাবান্তর ও কম্পন জিবরাঈল (আ)-এর ডয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক উর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল অকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : সম্পূর্ণ সৃষ্টি হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা গুহার সমুদয় বস্তান্ত গুনিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা) বললেন : না, এরূপ কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাকৃষ্টি লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আস-নানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত চরিত্র-গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনও ব্যর্থ ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকাহ ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াত যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিশ্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিশ্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইজীল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি

তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ান্নাকার জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা ওহার সমুদয় ব্রহ্মান্ত বলে শোনালেন। শোনাযাত্রই ওয়ান্নাকা বলে উঠলেন : ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসা (আ)-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম। হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কণ্ঠম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ান্নাকা বললেন : অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কণ্ঠম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ান্নাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়।—( বুখারী, মুসলিম ) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোন কোন রেওয়াজেতে তিন বছরও আছে।—( মাযহারী )

أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ—এখানে اسم-শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে

যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিসম্বিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পেশকৃত ওয়বের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী, লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিস্ময়তা ও প্রাজ্ঞতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় গণিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—( মাযহারী ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর গণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সন্দেহত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে বাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য **خلق**-ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ—পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্ঘাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ ; **عَلَق**-শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। সৃষ্টিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা

হয়, এরপর বীর্ষ ও এরপর জমাট রক্তের পাল্লা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাঙ্গের অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ—এখানে **اقْرَأْ**—আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর

এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-র পাঠ করার জন্য প্রথম **اقْرَأْ** বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় **اقْرَأْ** তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। **الكرم** বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পল্লিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্যভাবে সৃষ্টি-জগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ—মানব সৃষ্টির পর মানব-শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ,

শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত তিনবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে **اقْرَأْ**—শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্র বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র এক রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عندة فوق العرش ان  
رحمتي غلبت غضبي—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি

করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم  
القيامة فهو عندة في الفخر فوق عرشه -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

কলম তিন প্রকার : আলিমগণ বলেন : জগতে তিনটি কলম আছে : এক. আল্লাহ তা'আলার স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাঁকে তিনি তবদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতগণের কলম, যাহারা তাঁরা ভবিষ্যৎ ঘটনা, তাঁর পরিমাণ এবং মানুষের

আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিন সাধারণ মানুষের কলম, যম্বারা তারা তাদের কথা-বার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ।—(কুরতুবী) তফসীরবিদ মুজাহিদ আবু আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু সহস্র হুটি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই : কলম, আরাশ, প্লাষাতে আদন ও আদম (আ)।

লিখন জান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় : কেউ কেউ বলেন—সর্বপ্রথম এই জান মানবপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।—(কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ)—ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।—(যাহ্‌হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত : হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, কলম আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না। হযরত আলী (রা) বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বড় রূপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজাত বিষয়-সমূহের জান-দান করেছেন এবং তাদেরকে মুখতার অঙ্ককার থেকে জানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা, এর উপকারিতা অপরিমিত। আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাবতীয় জান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিভাগের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উপাসনাতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)—কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী (সা)—র মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জান-গরিমার পাঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ



কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফলশুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিস্ময়জনক ও প্রাজ্ঞতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মো'জেহাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।—(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ —পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের

বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত—শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষা-মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান-লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও

অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمُ (যা

সে জানত না) বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ, শিক্ষা স্বভাবত অজানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না; যেমন এক

আয়াতে বলা হয়েছে : **اٰخِرَٰتِكُمْ مِّنۢ بَطْنِ اِمۡهَاتِكُمْ لَا تَعۡلَمُوۡنَ شَيْۡئًا**

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং শ্রুষ্টি ও প্রভু আল্লাহ তা'আলারই দান।—(মায়হারী) কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ) অথবা রসূলে করীম (সা)। হযরত আদমকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে :

**وَعَلَّمَ اٰدَمَ اَسۡمَآءَ كَلِمٰتِهَا**—এবং নবী করীম (সা)-ই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার

শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা शामिल রয়েছে। বলা হয়েছে :

**وَمِنۡ عِلۡمِ مَكِّ اِلٰهٍ وَّالۡلٰوۡحِ وَّالۡقَلَمِ**

সূরা ইকরার উপরোক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াত-সমূহ আবু জাহলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রসূলুল্লাহ (সা)-র কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবু জাহলের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ (সা) নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাযের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

**كَلَّا اِنَّ الْاِنۡسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلۡاٰفۡسُفِۦٓ اِنَّ اِلٰهَآ اَسۡتَغۡنٰی**—আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-র

প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্রমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা, বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবু জাহলের অবস্থাও ছিল তেঁথবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোরু এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাঁকে সম্বাহ করত। সে এমনই অহংকারে ভুগত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম (সা)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল।

পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنِّى رِبِّكَ الرَّجِىُّ — অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে

হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গবিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বৈচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখে মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এরহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রভাবে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি করার মধ্যেই সমৃদ্ধি দান করেছেন এবং কাউকে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন স্রষ্টা আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা

সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অরশ্যস্তাবী পরিণতি এই যে **إِنِّى رِبِّكَ الرَّجِىُّ**

অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহর কুদরত ও প্রভার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى — এখান থেকে সূরার শেষ পর্ষভ

একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নব্বাম্বের আদেশ লাভ করার পর যখন রসূলুল্লাহ (সা) প্রনাযয পড়া শুরু করেন, তখন অবিজ্ঞান তাঁকে নামায পড়তে বাধা করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও সিজদা করলে সে তাঁর হাড়

পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : **لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ** — অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন?

কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অজ্ঞের ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

**سَفَعْنَا لِنَأْتِيَهُ** — এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। **نَامِيَةً** শব্দের

অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশশূন্য। যার এই কেশশূন্য অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

**فَلَا تَطْعَمُ وَلَا يَشْرَبُ** — এতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ করা

হয়েছে যে, আবু-জাহলের কথায় কর্নপাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সিজদায় দোয়া কবুল হয় : আবু দাউদে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজ-য়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

**أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ**

**سَاجِدٌ** অর্থাৎ বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

**فَإِنَّهُ فَمَنْ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ** — অর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল

হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়াজেতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামায-সমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন।

## سورة القدر

### সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا يُنزِلُ رَبُّهُم مِّن كُلِّ امْرٍ ۖ سَلَامٌ تَهَيَّ

حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۖ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি একে (কোরআনকে) নাযিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা দোখান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে : ) আপনি কি জানেন শবে-কদর কি? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে : ) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।—(খাযেন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে (এবং এ রাত) আদ্যোপান্ত শান্তিময়। [ হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত-আছে, শবে-কদরে হযরত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে ব্যক্তিকে নামায ও যিকিরে মশগুল দেখেন, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। কোর-

আনে একেই **سلام** বলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়াজেত-

সমূহে এ রাত্রিতে তওবা কবুল হওয়া, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মু'মিনকে

ফেরেশতাগণের সালাম করার কথাও বর্ণিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবা **سورة**-এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সূরা দোখানে **سورة** বলে বোঝানো হয়েছে। এ রাত্তিতে সেসব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শবে-কদর (এ সওয়াব ও বরকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বরকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—এমন নয়)।

### অনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**শানে-নুহুল :** ইবনে আবী হাতেম (রা)-র রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স) একবার বনী ইসরাইলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অন্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উশ্মতের জন্য শুধু-এক রাত্তির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্তির ইবাদতে মগ্ন থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা সূরা-কদর নামিল করে এ উশ্মতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীক্ষমান হয় যে, শবে-কদর উশ্মতে মুহাম্মদীয়ই বৈশিষ্ট্য।—(মাম্বহারী)

ইবনে কাসীর ইমাম মালিকের এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মযহাব বলেছেন। খান্ডাবী এর উপর ইজমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

**লায়লাতুল কদরের অর্থ :** কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সন্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সন্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমাম্বিত রাত বলা হয়। আবু বকর ওয়াররাক বলেন : এ রাত্তিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সন্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাত্তিতে তওবা-ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সন্মানিত ও মহিমাম্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্তিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিগণি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, দ্বিগিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতা-গণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হয়রত ইবনে আক্বাস (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন—ইসরাফীল, মীকায়ীল, আমরায়ীল ও জিবরায়ীল (আ)।—(কুরতুবী)

সূরা দোখানে বলা হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ ۗ نَاكُفًا مُّذْرِبِیْنَ ۝ فِیْهَا یَغْرُقُ كُلُّ اَمْرٍ  
حَكِیْمٍ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۔

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তফসীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **لَيْلَةَ مَبَارَكَةٍ**-এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাতি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তফসীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগদীর রেওয়াজেতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছরের তফসীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা-শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাপনের কাছে সোপর্দ করা হয়।—(মায়হারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাত্তিতে তফসীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিশ্চয় হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফুয থেকে নকল করে ফেরেশতাপনের কাছে সোপর্দ করা। মতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন রাত্তি : কোরআন পাকের সূক্ষ্ম বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন রাত্তিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিত হওয়া হয়। সহীহ হাদীসদুশ্চে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্তিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্তিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীস-সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

تَحْرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ : সহীহ বুখারীর এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :  
فِي الْعِشْرَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ رَمَضَانَ—অর্থাৎ রমযানের শেষ দশকে শবে-কদর অবশেষণ করা। সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে আছে :  
فَاَطْلُبُوْهَا فِي الرَّتْرِ مِنْهَا—অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্তিগুলোতে তালাশ কর।—(মায়হারী)

শবে-কদরের কতক ফযীলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া : এ রাত্তির সর্ববৃহৎ ফযীলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্তির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরিশি বছরের কিছু বেশী হয়। এই প্রার্থন কতগুণ, তার কোন সীমা নেই। অতএব ষ্টিগণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইবাদতে দস্তাম্মান থাকে, তার অতীত সব পোনাহ মাক্ক হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : শবে-কদরে সিদরাতুল-মুত্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রসুলে করীম (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা) একবার রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া করব? উত্তরে তিনি বললেন : এই দোয়া করো : **اللَّهُمَّ**

**اِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي** হে আল্লাহ, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহসমূহ মার্জনা করুন।—(কুরতুবী)

**اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**—এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে,

কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে-মাহফূয থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হযরত আবু যর গিফারী (রা) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং যবুর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মুবারকে নাযিল হয়েছে।—(মাহহারী)

**رُوحٌ—تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ**—বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে।

হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ



করেন এবং যত নারী-পুরুষ নাম্নায় জখবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।— (মাযহারী)

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ—অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনা-

বলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে سلام—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।—(ইবনে কাসীর)

سَلَامٌ—অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই।

(কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ—এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন—ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।—(মাযহারী)

هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ—অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোন

বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জাভাবা : এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা স্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে, যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোন অসুবিধা নেই।—(ইবনে কাসীর)

উদয়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামাজ জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রাত্রির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ইবাদত করবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্থ রাত্রির সওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাজ ও জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের সওয়াব হাসিল করে।

## سورة البينة

### সূরা বাইয়িনাছ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ عَنْهُ تَأْيِيدُهُمُ الْبَيْتَةَ ۝

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْتَةُ ۝ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاءُؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে হারা কাফির ছিল, তারা প্রত্যাঘর্ষণ করত না, যতরূপ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আহ্বতি করতেন পবিত্র সর্হীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কয়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে হারা কাফির, তারা আহ্লামের সাজনে স্থারীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (৭) হারা ঈমান আনে ও সংকর্ম

করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জাহান্নাত, যার তলদেশে নিরীক্ষণীয় প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

### তরুসীরের সার সংক্ষেপ

কিতাবখারী ও মুশরিকদের মধ্যে হারী ( পরগছরের আবির্ভাবের পূর্বে ) কাফির ছিল, তারা ( তাদের কুফর থেকে কখনও ) বিরত হত না, স্বতন্ত্র না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত, ( অর্থাৎ ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি ( তাদেরকে ) পবিত্র সহীফা পাঠ করে শোনাতেন, যাতে আছে সঠিক বিষয়বস্তু। ( অর্থাৎ কোরআন। উদ্দেশ্য এই যে, এই কাফিরদের কুফর এমন শক্ত ছিল এবং তারা এমন কঠিন মূর্খতার লিপ্ত ছিল যে, কোন রসূল ব্যতীত তাদের পথে আসা ছিল সুদূরপর্যায়ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য আপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত ছিল একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ) আর হারী কিতাব-প্রাপ্ত ছিল, ( হারী কিতাবপ্রাপ্ত নয়, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য ) তারা যে বিভ্রান্ত হয়েছে ( দীনের ব্যাপারে ) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। ( অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতানৈক্য করেছে এবং পূর্বে থেকে যে পরিস্পরিক মতানৈক্য ছিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে দূর করেনি। মুশরিকদের কথা না বলার কারণ এই যে, তাদের কাছে তো পূর্বে থেকেও কোন ঐশী জান ছিল না। ) অথচ তাদেরকে ( পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ) এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ( মিছামিছি কাউকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করবে না। ) নামায কামেম করবে এবং হাকিত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [ সারকথা, আহুন্নে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

فِيهَا كُتِبَ قَوْمًا

বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে অমান্য করার কারণে তাদের কিতাবেরও বিরোধিতা হয়ে গেছে। এ হচ্ছে আহুন্নে কিতাবদের দোষ। মুশরিকরা পূর্ববর্তী কিতাব না মানলেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা যে সত্য, তা স্বীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ইবরাহীম (আ) শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। সুতরাং মুশরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে বিভক্ত ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, হারী ইমান আনেনি। এ থেকে জানা গেল যে, হারী বিভেদ ও বিরোধিতা করেনি, তারা ইমানদার। অতঃপর আহুন্নে-কিতাব, মুশরিক ও মু'মিনদের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে— ] নিশ্চয় আহুন্নে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে হারী কাফির, তারা আহুন্নে-কিতাবের আন্তনে স্বামীভাবে থাকবে, আর তারাই হল সৃষ্টির অধম। নিশ্চয় হারী ইমান আনে ও সং কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জাহান্নাত, যার তলদেশে নিরীক্ষণীয় প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের

প্রতি সম্ভ্রুত থাকবেন এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সম্ভ্রুত থাকবে ( অর্থাৎ তারাও কোন গোনাহ্‌ করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অপ্রিয় ব্যবহার করা হবে না )। এটা ( অর্থাৎ জামাত ও সম্ভ্রুতি ) তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহ্‌কে ভয় করলেই ঈমান ও সৎ কর্ম সম্পাদিত হয়, যা জামাত ও সম্ভ্রুতি লাভের চাবিকাঠি।

### আনুখ্যিক ভাষ্য বিষয়

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্থতার যোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এয়েন সর্বপ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পান্দসর্দী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তাস্ত প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপর্যায় হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পান্দসর্দী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অভিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ্‌' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল—এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাত অনর্থ এবং মূর্থতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রসূলুল্লাহ্‌ (সা) মহান মর্ষাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرًا فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ থেকে উদ্ভূত।

এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোন পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তিলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صُحُفًا শব্দটি مَصْهُفَةٌ-এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كُتِبَ শব্দটি كَتَبَ-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সমস্ত আদেশও হয়ে থাকে।

হেমান, এক আয়াতে আছে لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَهَّلَ—এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় فِيهَا বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথপ্রলুপ্ততা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত

করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সহীফা থেকে নয়—স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতে। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরস্থান বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ

-এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ও ইজীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ সমান্ন মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরিকদেরকে বলত : তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

সত্য ধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশচর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না, সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আয়াতে উত্তরকেই অজ্ঞান করে

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ বলা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব—উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তফসীর করা হয়েছে।

وَأُولَٰئِكَ دِينُ الْقِيمَةِ—অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ

করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, নামায কায়েম করতে ও ঝাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলা বাহুল্য,

কিতাব শব্দটি কিতাব—এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়াত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হব্ব তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ—এ আয়াতে জায়াতীদের প্রতি সর্ব্বহৃৎ নিম্না-

মত আল্লাহ্‌র সম্বলিতর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু সায়্যিদ খুদরী (রা) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা জায়াতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

لبيك ربنا وسعديك (হে জায়াতীগণ)। তখন তারা জওয়াব দিবে

والخير كل في يدك (হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনু-গত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

তোমরা কি সম্বলিত? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ালদিগার! এখনও সম্বলিত না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সম্বলিত নাহিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসম্বলিত হব না।—( বুখারী, মুসলিম )

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জায়াতীরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বলিত হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সম্বলিত হওয়া ছাড়া কেউ জায়াতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জায়াতীদের সম্বলিত উল্লেখ করার

তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সম্ভূতির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সম্ভূতি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে।

উদাহরণত সূরা যোহান্ন রসূলুন্নাহ্ (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : **وَلَسَوْفَ**

**يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** অর্থাৎ সত্ত্বাই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন,

স্বাভে আপনি সম্ভূত হলে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুন্নাহ্ (স) বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সম্ভূত হব না, যতক্ষণ আমার একটি উশ্মতও জাহান্নামে থাকবে।—( মাযহারী )

**ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ** —সূরার উপসংহারে আল্লাহ্‌র ভয়কে সমস্ত ধর্মীয়

উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শয়খ্, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে **خَشِيَةً** বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই **خَشِيَةً** বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সম্ভূতি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসম্ভূতির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

## سورة الزلزال

### সূরা বিলাহাল

মদীনার অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْثَالَهَا ۝ وَقَالَ

الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

يَوْمَئِذٍ يَصُدِّرُ النَّاسَ اِشْتَاتًا ۝ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

حَيْرَانًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু জালাহুর নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার কৃত্যের বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আগনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে; যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

#### তুঙ্গসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন পৃথিবী তার কঠিন কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী তার বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, (বোঝা বলে তুঙ্গসীর ধন-ভাণ্ডার ও স্তম্ভদেরকে বোঝানো হয়েছে)। কোন-কোন রেওয়াজের থেকে জানা যায় যে, পূর্বেও তুঙ্গসীর অনেক কিছু বাইরে চলে আসবে। কিস্যামতের পূর্বে যেসব তুঙ্গসীর সম্পদ বাইরে আসবে, সেগুলো সম্ভবত কালক্রমে আশ্চর্য আট্টির নিচে চাপা পড়ে যাবে এবং কিস্যামতের দিন আবার বের হবে। তুঙ্গসীর ধনসম্পদ বাইরে চলে আসার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, যারা ধনসম্পদের অত্যধিক ভালবাসে, তারা যাতে সচক্ষে ধনসম্পদের অসারতা প্রত্যক্ষ করে নেন। এবং (এই পরিস্থিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি



হল (যে, এভাবে প্রকল্পিত হচ্ছে এবং সব গুণ্ডিত ভাণ্ডার বাইরে চলে আসছে) ? সেদিন পৃথিবী তার (ভাল-মন্দ) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পাপনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (হাদীসে এর তক্ষসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কর্ম করবে ভাল অথবা মন্দ—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাক্ষ্য)। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে (হিসাবের ময়দান থেকে) ফিরবে (অর্থাৎ স্বাদের হিসাব সমাপ্ত হবে, তারা জান্নাতী ও জাহান্নামী দলে বিভক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হবে) স্বাতে তারা তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেয়। অতএব যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (হাদি সৎ-অসৎ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। নতুবা হাদি কুফরের কারণে সৎ কর্ম ধ্বংস হয়ে স্বাম্ম অথবা ঈমান ও তওবার কারণে অসৎ কর্ম মিটে স্বাম্ম, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা যাবে না। কেননা, তখন সেই সৎ কর্ম সৎ কর্ম নয় এবং অসৎ কর্ম অসৎ কর্ম নয়। তাই সামনে আসবে না)।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—**إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا**—জান্নাতে প্রথম শিংগা ফুৎকার পূর্বেকার

ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়াজে ও তক্ষসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, অলোচ্য জান্নাতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাম্বহারী)

—**وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا**—এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা)

বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতকড় অপরাধ করেছিলাম ? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে অন্যায়দের সাথে সম্পর্ক-ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম ? চুরির কারণে স্বাম্ম হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম ? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।—(মুসলিম)

—**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ**—জান্নাতে **خير** বলে শরীয়তসম্মত

সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে, যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত

কোন সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্ভব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, হার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া অসম্ভব। কোন সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি স্বত বড় গোনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানেরও অভাবে তা পণ্ড্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎ কাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ—জীবদ্দশায় তওবা করেনি—এখানে

এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসে অকাটা প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাক্ফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সা) হযরত আশ্শেয়া (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আশ্চর্যকর সচেপ্ট হও, স্বাক্ষে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে মাছা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) এ আয়াতকে **الغازة الجامعة**—অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আক্বাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) সূরা ঝিলখালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরানকে কোরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন।—(মাযহারী)

سورة العاديات

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعِدِيَّتِ صَبِيحًا ۝ وَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝ فَأَثَرْنَ بِهِ

نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ أَفَلَا

يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمًا فِي الْقُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ উর্ধ্ব্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিনির্গত-কারী অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে খুলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে—(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই খনসম্পদের ভালবাসায় মত্ত (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উন্মিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ উর্ধ্ব্বাসে খাবমান অশ্বসমূহের, অতঃপর যারা (প্রস্তরে) ক্ষুরাঘাতে অগ্নি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে খুলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, (এখানে যুদ্ধের অশ্বসমূহ বোঝানো হয়েছে। আরব দুর্ধর্ষ জাতি বিখ্যাত যুদ্ধের জন্য অশ্ব পালন করত। অশ্বের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে সাময়িক অশ্বের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হচ্ছেঃ) নিশ্চয়

(স্বেসব) মানুষ (কাফির) তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। সে নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত (কখনও প্রথমেই এবং কখনও চিন্তাভাবনার পর অকৃতজ্ঞতা অনুভব করে।) সে অশ্বশাই খন-সম্পদের ভাগবাসায় মত্ত। (এটাই তার অকৃতজ্ঞতার কারণ। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাদী উচ্চারণ করা হয়েছেঃ) সে কি জানে না, স্বধন কবলে স্বা আছে, তা উদ্ভিত হবে এবং অন্তরে স্বা আছে, তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ অবহিত। (ফলে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। মোট কথা, মানুষ যদি সেই সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি ভািত হত, তবে অকৃতজ্ঞতা ও ধনসম্পদের লালসা থেকে অবশ্যই বিরত হত)।

### জানুহনিক ভািতব্য বিষয়

সূরা আদিনাভ হযরত ইবনে মসউদ, জাবের হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা) প্রমুখের মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আক্বাস, অনাস (রা), ইমাম মালিক ও কাভাদাহ্ (র) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

এ সূরায় আদ্বাহ্ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বণিত হয়েছে যে, আদ্বাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আদ্বাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর শেদমতই না আনিজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আদ্বাহ্ তা'আলার সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কণ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আদ্বাহ্ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন—عَادِيَاتٍ শব্দটি عَدُوٍّ থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। مُبِيحَاتٍ—যোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। مَوْرِيَاتٍ শব্দটি مَرِيٍّ থেকে উদ্ভূত।

অর্থ অগ্নি নির্গত করা, যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। **قَدَح**-এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। নৌহত্বতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তুতময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্থলিজ নির্গত হয় **مُفِيرَات** শব্দটি **غَارَةٌ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। **مِبْحَا** আরবদের অভ্যাস হিসাবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দৃশ্যীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। **أَثْرُن** শব্দটি **أَثَار** থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। **نَقَعَ** ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অল্পসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত শ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক শ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

**فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا**—অর্থাৎ এসব অল্প শব্দ দলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে।

**كَنُود** হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসেতা (র) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে **كَنُود** বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

**وَإِنَّهُ لَحَبَابُ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ**—**خَيْر**-এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধন-

সম্পদকেও **خَيْر** বলে ব্যক্ত করা হয়; যেমন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনসম্পদের পরিশোধ তাই হবে, দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে

**— إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে

উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে— এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনমাত্মক ফরম্বও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন

ভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়ানা না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাত্ৰিক সঞ্চয় করা তো নিষ্পনীয় নয়, বরং ফরয। কিন্তু একে ভালাবাসা নিষ্পনীয়। কেননা, ভালাবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাত্ৰিক অর্জন করা এবং তদ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরয ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহক্বত হওয়া নিষ্পনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রত্নাব পালাখানার প্রয়োজন মিটার, এজন্য স্বল্পবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহক্বত থাকে না। অনুহ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহক্বত থাকে না বরং অপারক অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরাপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাত্ৰিক অর্থাপার্জন করবে, তার হিফাযত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহক্বতে মশগুল করবে না। মওলানা রাসী অত্যন্ত সাযলীল ভঙ্গিতে বিবরণটি বর্ণনা করেছেন :

آب آندرزیر کشتی پشتی آست آب در کشتی هلاک کشتی آست

অর্থাৎ পানি হতরূপ নৌকার নীচে থাকে, ততরূপ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এই পানিই স্বখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনিভাবে ধনসম্পদ হতরূপ নৌকারাণী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততরূপই তা উপকারী থাকে। কিন্তু স্বখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি হুণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী গুনানো হয়েছে।

—أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

কিন্নামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উদ্ধিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুসারী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতভতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

ভাষ্য : আলোচ্য সূরায় মানুষ মাল্লেরই দু'টি হুণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যারা এ হুণ্য স্বভাবের থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্‌র কৃতভ বান্দা। তারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ ক্ষেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাল্লেরই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরাপ হওয়া জরুরী হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফির মানুষ বুদ্ধিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই করা হয়েছে। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ হুণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের স্বভাব। আল্লাহ্‌ না করুন, যদি কোন মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

## سورة القارعة

### সূরা কারেয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত

#### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَُوْمَ يَكُونُ النَّاسُ  
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ  
مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ  
هَٰوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত। (৬) জ্বলন্ত আর যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়ার। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রকল্পিত জগ্নি।

#### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (অর্থাৎ কিয়ামত, যে অন্তরকে ভীতি এবং কানকে ভীষণ শব্দে আঘাত করবে, আর এ অবস্থা সেদিন হবে,) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (কয়েকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে—এক. সংখ্যাধিক্যের জন্য সেদিন বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। দুই. দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার জন্য। কারণ, সব মানুষ তখন পতংগের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দুটি কারণ হাশরের সব মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব মানুষ জ্বলন্ত ও ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক ছুটছুটি করবে, যা পতংগদের বেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এ অবস্থা মু'মিনদের বেলায় হবে না। তারা প্রশান্ত মনে কবর থেকে উদ্ধৃত হবে)। এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রূপ। যেহেতু এগুলো সেদিন উড়তে থাকবে, ফলে বিভিন্ন রঙ-এর পশমের মত দেখা যাবে। সেদিন মানুষের কর্ম ওজন করা হবে) অতএব হার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন স্থাপন করবে (সে হবে মু'মিন। সে মুক্তিপেয়ে জাহাতে যাবে) এবং হার (ইমানের) পাল্লা হালকা হবে (অর্থাৎ কাফির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা (অর্থাৎ হাবিয়া) কি? (সেটা) এক প্রখরিত অগ্নি।

### আমূল্যিক ভাষ্য বিষয়

এ সূরার আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহাতিম অর্থাৎ জাহাতিম লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাকের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সম্বন্ধ সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পক্ষা ভারী ও কাফিরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরার বাহ্যত প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ইমানের কারণে ভারী হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফিরের পাল্লা ইমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তুরসীরে মামহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাফির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে হারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-প্রদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে—গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুলভের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। হার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুলভের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যান্বয় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যান্বয় তো নামায, রোযা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুলভের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।



سورة التكاثر

সূরা তাক্ব্বুর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْهٰمِكُمُ التَّكٰثُرُ ۝ ۱ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ۲ ۝ ثُمَّ كَلَّا

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ۳ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۝ ۴ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۝

۵ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنِ الْیَقِیْنِ ۝ ۬ ۝ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পাখিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও [অর্থাৎ মরে যাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পাখিব সম্পদ বড়াই করার যোগ্য নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিসৃদ্ধ প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে। কেননা, এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না, স্বাভাবিক প্রত্যয় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষুষ দেখাকে এখানে দিব্য প্রত্যয়ে দেখা বলা হয়েছে)। অতঃপর (আবার শুন) তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করেছ কিনা—এ প্রশ্ন করা হবে)।

মানুষজিক জাতব্য বিষয়

ثَوْرًا نَوْرًا فَتَوْرًا ৷ অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ

সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (র) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।—(কুরতুবী)

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ৷—এখানে কবরস্থান ভ্রমারত করার অর্থ মরে কবরে

পৌছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন : حَتَّى يَا تَوَكُّم

الموت—(ইবনে কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সম্মান-সম্মতি ও বংশ-সৌন্দর্য বড়াই তোমাদেরকে গাফিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিপতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আত্মাবে প্রেক্ষণীয় হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, স্বারা ধনসম্পদ ও সম্মান-সম্মতির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার কুরসতই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর (রা) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ তিলাওয়াত করে বলছিলেন :

يقول ابن آدم مالى مالى لك من مالى الا ما اكلت فافهت او لبست فابلهت او تصدقت فامضهت وفي رواية لمسلم وما سوى ذ لك فذاهب و تاركة للناس -

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ভুতটুকুই, স্বতটুকু ভূমি ছেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া স্বা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে—ভূমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর, তিরমিধী, আহম্মদ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لو كان لابن آدم واديا من ذهب لاحتب ان يكون له واديا ولن يملأها الا التراب ويتوب الله على من تاب -

আদম সন্তানের যদি স্বর্গে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (স্বর্গতেই সমস্ত হবে না, বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ ভোঁ (বাবরের) মণি বাতীত অন্য কিছু ঘারা ভতি করা সম্ভব নয়। যে আত্মহির দিকে কবুল করে, আত্মাহ তা তওবা কবুল করেন—(বুখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন : আমরা সূরা তাক্বীর নাযিল হওয়া পৰ্বত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হর—রসূলুল্লাহ্ (সা) **لَهُمُ التَّكْوِيرُ**

পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। কয়েক প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

**لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ**—এর অন্তর্ভাব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ

উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হত, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

**مِنَ الْيَقِينِ**—এর অর্থ সে উপরে বলা হয়েছে **ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ**

প্রত্যক্ষ, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অজিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মুসা (আ) যখন তুর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আত্মাহ তাঁর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজার মিলিত হয়েছে। কিন্তু মুসা (আ)-র মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার কালে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিশুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।—(মাযহরী)

**ثُمَّ لَتُنصَلْنَ يَوْمَئِذٍ مِنَ النَّعِيمِ**—অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন

আত্মাহপ্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর অর্পণ করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে : **— اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ**

**وَالْغُرَاْنَ كُلُّْ اَوْ لَاتِكَ اَنَّ مَعَهُ مَسْجُوْلًا** এতে মানুষের ব্রহ্মশক্তি হাদয় সম্পর্কিত মাথো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি?—(ভিক্সরিস্বী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না—এক. সে তার জীবনের দিন-শুভো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার সৌজন্যকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ. আল্লাহ প্রদত্ত ইল্ম অনু-স্বায়ীসে কতটুকু আমল করেছে?—(বুখারী)

ভূকসীপুরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন : কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পান্যাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক কিংবা সন্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক।—কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা একান্ত মথার্থ যে, কোন বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

সূরা ভাষ্যছুরের বিশেষ ফসীখত : রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন : হ্যাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কল্পজনের আছে! তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কি সূরা ভাষ্যছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।—(মাব্বহারী)

سورة العنبر

সূরা আছর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَفْعِ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম যুগের (যাতে দুঃখ ও ক্ষতি সাধিত হয়), মানুষ (তার জীবনের দিনগুলো বিনষ্ট করার কারণে) খুবই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে (যা আত্মগুণ) এবং পরস্পরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাকীদ দেয় এবং তাকীদ দেয় সৎ কর্মে অটল থাকার। (এটা পরোপকার গুণ। মোটকথা, যারা এ আত্মগুণ অর্জন করে এবং অপরকেও গুণান্বিত করে, তারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয় বরং লাভবান)।

আনুষ্ঠানিক জাভাব্য বিষয়

সূরা আছরের বিশেষ ক্ষয়ীলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিসন (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা)-র সাহাবীগণের মধ্যে দু'বাক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্য-জনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। —(তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাঁদের জন্য মথেষ্ট ছিল। —(ইবনে কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র)-র ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে

তাদের ইচ্ছাকাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য ঋতুচক্রেট হয়ে যায়। এ সূর্য্যর আঞ্জাহ্ তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তরাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নির্ভার সাথে পালন করে—ঈমান, সৎ কর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রাথমিকশোধ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মাঝেই সংঘটিত হয়। সূর্য্যর যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগকালেরই দিবারাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আম্মুছকালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পূঁজি, যার সাহায্যেই ইচ্ছাকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাজাত ও অর্জন করতে পারে এবং প্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন :

حواك | نفاس تعد فلما + مضى نفس منها انقصت به جز ۱=

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় গুণাওন্তি যাস-প্রবাসের নাম। যখন একটি যাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আঞ্জাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আম্মুছকালের অমূল্য পূঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে এ পূঁজিকে খাঁটি লাভদায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পূঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাজাত কোন অস্ত্র থেকে না। গুরুত্বের যদি সে এই পূঁজি কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাজাত দূরের কথা, পূঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাজাত ও পূঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অশুভাধার শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পূঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোন কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতিভো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাজাত ও পূঁজি উভয়ই বিনষ্ট হল। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

كل يغدو فناك نفسة لمعتها أو سوتها

প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পূঁজি ব্যবসায় নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পূঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদ কোরআনও ঈমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসায়রূপে বাজ্ঞ করেছে। বলা

হয়েছে : **هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ** —আয়তান

যখন পুঁজি আঁর মানুষ হল ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পূর্ণ। কেননা, এই বেচারীর পুঁজি কোন আড়লট পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিম্নত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সূচত্বর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বুয়ুর্গ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আছরের যথার্থ তফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আশ্রয়ার্থে বস্ত্র চতুর্ভুজ সমন্বিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কাজেও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস, এতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরোক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম—আশ্র-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সর্বের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। **تَوَاصَى** শব্দটি

থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ডাঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম ওসীয়াত। এ কারণেই মরশোম্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়াত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়াতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সর্বের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে—এক: সত্যের অর্থ বিপুল বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আশ্র সর্বের অর্থ ষাঠীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিল মারাক' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নিহী আনিব্ব মুন্কার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেওয়া। দুই: সত্যের অর্থ বিপুল বিশ্বাস এবং সর্বের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সর্বের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী

করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

হাকেম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন : দু'টি বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্ভাব্য বাধা দেয়—এক, সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্বারা বিশ্বাসই বিঘ্নিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে হ্রুটি হুকে পড়লে কর্ম হ্রুটিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দুই, খেয়ালখুশী, যা মানুষকে কোন সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুগ্ধ করে দেয় এবং কোন সময় মন্দ কাজে লিপ্ত করে দেয়, যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করায় এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করায় এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশী ত্যাগ করে সৎ কাজ প্রবলনের নির্দেশ দেওয়া বোঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মগত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের ঠিকাতাও জরুরী : এ সূরার মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সূরার অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন বন্ধ-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সে দিকে জাফেপও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন ॥



## سورة الهزلة

### সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ : ৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبِئْسَ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُّزُومٌ ۚ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ اَنْ مَّالَهُ أَخْلَدَهُ ۗ

كَلَّا لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ نَارُ اللّٰهِ

الْمُوقَدَةُ ۗ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْقِ ۗ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۗ

فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۗ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিষ্কিন্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহর প্রস্বলিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, (৯) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

#### ভক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে (লালসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি মহব্বত ও গর্বের কারণে) তা বার বার গণনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে (অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিপ্সা রাখে যে, সে যেন বিশ্বাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে) না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশ্যই নিষ্কিন্ত হবে এমন অগ্নিতে যা সবকিছুকে পিষ্ট করে দেয়, সেটা আল্লাহর অগ্নি, যা (আল্লাহর আদেশে) প্রস্বলিত, (আল্লাহর অগ্নি; বলান মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অগ্নি অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ হবে) যা (শরীরে লাগা মাত্রই) হৃদয় পর্যন্ত

পৌছবে। সেই অগ্নি তাদের উপর অবিস্তার করে দেওয়া হবে (এভাবে যে, তারা অগ্নির) বড় লম্বা লম্বা স্তম্ভে পরিবেষ্টিত থাকবে, যেমন কাউকে অগ্নির সিন্দুক পুরে দেওয়া হয়)।

### জানুয়ারিক আতব্য বিষয়

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ তিনটি হচ্ছে **جمع مال و لمز - همز** প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারকের মতে **همز**-এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং **لمز**-এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ রূহৎ থেকে রূহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সন্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা একারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে **لمز** তথা সন্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্চিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

شراء عباد الله تعالى المشاء ون بالثميمة المفرقون بين الاحبة  
الباغون لبراء العنت -

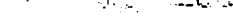
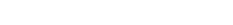
অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিশ্বেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা সালসার কারণে দীনের জরুরী কাজ বিস্মিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ—অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস

করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যাকিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ

কালে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিরুপিত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও কালে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছান আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।



## سورة الفيل

### সূরা ফীল

মক্কার অবতীর্ণঃ ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِكَ يَا صٰحِبَ الْفِیْلِ ۝ اَلَمْ یَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِی تَضَلُّیْلِیْ ۝

وَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ۝ تَوْمِیْئًا مِّنْ جِبْرٰٓئِیْمَ ۝ فَمَجَّامًا

كَصَفٍ مُّا كُوْلًا ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেন নি আপনার প্রাণনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন স্বাঁকে স্বাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাখরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভুক্তিত ভূণসমূহ করে দেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি জানেন না যে, আপনার প্রাণনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার উন্মাদহতা ফুটিয়ে তোলা। অতঃপর সেই ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে)। তিনি কি তাদের (কাবা গৃহকে ধ্বংসস্থাপে পরিণত করার)- চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণ করা)। তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন স্বাঁকে স্বাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাখরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ভুক্তিত ভূণের ন্যায় (দলিত) করে দেন। (সার-কথা এই যে, যারা আল্লাহর নির্দেশাবলীর অবমাননা করে, তাদের এ ধরনের শাস্তি থেকে নিশ্চিত থাকার উচিত নয়। দুনিয়াতেই শাস্তি এসে যেতে পারে; যেমন এসেছে হস্তী-বাহিনীর উপর। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো অবধারিতই)।

#### আনুষ্ঠানিক আশুবা বিষয়

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কাবা গৃহকে ভূমিসাৎ

করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল : মক্কা মোকাররমায় খাতামুল-আখিরা (সা)-র জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়াজে দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।—(ইবনে কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র এক প্রকার মো'জেযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নব্বয়ত দাবীর সাথে নবীর সম্বন্ধনের প্রকাশ করা হয়। নব্বয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতার মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীস-বিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নব্বয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় কিংবা এলৌকিক 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। "নবী করীম (সা)-এর নব্বয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতি হত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের ভাষা এরূপ : আরবের ইয়ামেন প্রদেশ মুশরিক, 'হেমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খৃস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মবিশ্বাসী। রাজা 'যু-নওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খৃস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহর ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের কাছাকাছি। এই গর্তের কথাই সূরা বুরাজে 'আসহাবুল-উখদুদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'বাল্টি কোনরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যোগে খৃস্টানদের প্রতি রাজা যু-নওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়ামেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই, সৈমানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যু-নওয়াসের মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেন্যবাহিনী ইয়ামেনের উপর বাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়ামেনকে হেমইয়ারীদের কবল মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমগ্র নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হল। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে কুমতাল লড়াই হল এবং আরবাত নিহত হল। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়ামেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হল যে, সে তথায় এমন একটি

বিশাল সুরমা গীর্জা নির্মাণ করলে, যার ন্যায় পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়ামেনের অধিক বাসিন্দারা প্রতি-বৎসর হজ্জ করার জন্য মক্কায় পমন করে এবং বাস্তুতন্ত্রের তওয়াক্ব করে। অতঃপর এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অতিভূত হয়ে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরমা গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে-দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-ক্রোম ও মুক্যাবান-স্বীরা-জহরত দ্বারা আবৃত কার্শখচিত্র এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করলঃ এখন থেকে ইয়ামেনের কোন বাসিন্দা হজ্জের জন্য কাবাগৃহে যেতে পারবে না। এক পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। অর্থাৎ যদিও শৌভলিকস্তর জেরে বেশী ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কান্বর মাহাত্ম্য ও মহাবত তাদের অন্তরে প্রথিত ছিল। তাই আদনান, কহতাম ও কোরায়েশ উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে-ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাষ্ট্রের অঙ্গকারে গা-ভাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রত্নাব-পায়খানা করল। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, তাদের এক হাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, জঁমেক কোরায়শী এই দুর্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করলঃ আমি কোরায়েশদের কাবাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমুদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরও আটটি হাতী এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হল। এতসব হাতী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কাবাগৃহ ভূমিসংহ করায় কাজে হাতী ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কাবাগৃহের শুভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সৈব শিকল হাতীর গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কাবাগৃহ (নাউয্বিল্লাহ) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরও এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মুক্যবিলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। ইয়ামেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আবরাহাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহাহার পরাজয় ও লাজ্বনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দী করল। অতঃপর সে সম্পূর্ণ অগ্রসর হয়ে 'খাসআম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে-হাবীব তার মুক্যবিলার অবতীর্ণ হল। কিন্তু আবরাহাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দী করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তাদেরকে নিকটবর্তী হলে তথাকার সর্কীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে ভীত ছিল। তারা আবরাহাহার সাথে সাক্ষাৎ

করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহা'র সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তারেকের নিমিত্ত তাদের লাভ নামক মৃতির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবু রেগালকেও আবরাহা'র সঙ্গে নিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সন্মত হয়ে আবু রেগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কোরায়েশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দী করে নিয়ে এল। এতে রুসুলে করীম (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারকুত মক্কা শহরে-কোরায়েশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কোরায়েশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে কাবা দ্বা দিলে কোরায়েশদের কোন ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পরগাঞ্চ নিয়ে মক্কার প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কোরায়েশ নেতা আবদুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহা'র পরগাঞ্চ পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে আবদুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন : আমরাও আবরাহা'র মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মুকাবিলা করার মতো শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহ'র ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নিমিত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের যিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ কি করেন। হানাতা বলল : তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহা'র সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আবদুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আবদুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে অসামনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। আবদুল মোত্তালিব বললেন : আমার প্রয়োজন এতটুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল : আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর ভ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কাবা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। আশচর্যের বিষয় যটে! আবদুল মোত্তালিব জওয়াব দিলেন : উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কাবা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সন্ত। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরাপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল : আপনার আল্লাহ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালিব বললেন : তাহলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, আবদুল মোত্তালিবের সাথে আরও কয়েকজন কোরায়েশ নেতা আবরাহা'র দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহা'র কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহ'র ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেঁরাজ প্রদান করব। কিন্তু

আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সন্মত হন না। আবদুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি রাস্তাভ্রমণের চৌকাত ধরে দোয়ার মশগুল হলেন। কোরায়েশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ার তাঁর সাথে শরীক হল। তারা বলল : হে আব্রাহা, আবরাহাহার বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। আপনিই আপনার ঘরের হিফাযতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আবদুল মোত্তালিব সন্নীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে হড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহাহার বাহিনীর উপর আব্রাহাহর গম্ব পতিত হবে। প্রত্যয়ে আবরাহা কাবা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমুদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দী নুফায়েল ইবনে হাবীব সন্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল : তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা, কেননা, তুই এখন আব্রাহাহর সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতীর কান ছেড়ে দিল। হাতী একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আশ্রয় চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা গিটানো হল, নাকের ভিতরে লোহার শিক চুকিয়ে দেওয়া হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে দণ্ডায়মান হল না। তখন তারা তাকে ইয়ামেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আব্রাহাহর যখন মক্কার দিকে চালানো হল, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আব্রাহাহর কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই, অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখী সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলির প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই খাবান্ন। ওয়াকেরী (র) বর্ণনা করেন : পাখীগুলো অদ্ভুত ধরনের ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলি আব্রাহাহার বাহিনীর উপরিভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পারেনা। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হত, তাকে এপার-ওপার ছিন্ন করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আঘাব দেখে সব হাতী ছুটছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতী মরদানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হল। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পশ্চিমমুখে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহাহকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পচে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়ামেনে নীত হল। রাজধানী 'সান'আন্ন' পৌঁছার পর তার সমস্ত শরীর ছিন্ন-খিঞ্জিল হয়ে যাওয়ার সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহাহর হস্তী মাহমুদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : আমি এই দু'জন



চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা)-র ভগিনী আসমা বলেন : আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ডিঙ্কারুত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

‘الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل’ — এখানে কি

দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রসঙ্গ উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রা) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ডিঙ্কুরূপে দেখেছিলেন।

‘أبا بيل—طهراً أبابيل’ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক—কোন বিশেষ

প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আশ্বিনে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এই জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।—(কুরতুবী)

‘بصجارة من سجبل’—ভিজা মাটি আঙুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সেই

কংকরকে **سجبل** বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

‘فجعلهم كغصف ما كؤل’—এর অর্থ ভূমি। ভূমি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন

তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে আবরাহাহর সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরায়শদের মাহাছ্যা আন্দোলন বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

এই মাহাছ্যের প্রভাবেই কোরায়শেরা বাগিজে ব্যাপদেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কোরায়শে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

## سورة القريش

### সূরা কোরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ : ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِّي لَأَنبَأُكُمْ نُبَأَ الَّذِي أُنبِئُكُمْ بِهِ الْغَيْثُ رَحْلَةَ الشَّيْءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا  
الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কোরায়শের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধার আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরায়শের আসক্তির কারণে, তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের আসক্তির কারণে। (এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) অতএব তারা যেন অবশ্যই ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার, যিনি তাদেরকে ক্ষুধার আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেন।

#### আনুষ্ঠানিক জাভাব্য বিষয়

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে গিফা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ গিফিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর খিলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের তাতে ইজমা হক্ক, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

এর -حرف لام- অনুযায়ী গঠনপ্রণালী ব্যাকরণিক— لا يَلْفَ تَرِيْشِ

এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لام-এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্ধপদ সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহা বাক্য হচ্ছে

اَنَا اَهْلَكْنَا اَصْحَابِ

الفِئَلِ অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কোরায়শদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহা বাক্য হচ্ছে

اعْتَجَبُوا

অর্থাৎ তোমরা কোরায়শদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে। কেউ কেউ বলেন : এই لام-এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য

فَلْيَعْبُدُوا-এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরায়শদের কৃতভ

হওয়া ও আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সার কথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরায়শরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্য-শালীরাপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও ব্রহ্মা প্রদর্শন করে।

সমগ্র আরবে কোরায়শদের শ্রেষ্ঠত্ব : এ সূরায় আরও ইঙ্গিত আছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শগণ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রসূলে করীম (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইসমাইল (আ)-এর সম্মান-সম্মতির মধ্যে কেননাকে কেনানার মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন : সব মানুষ কোরায়শের অনুগামী উল্লা ও মদে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অভ্যস্ত উচ্চতরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহর ওলাগণের অধিকাংশই কোরায়শের মধ্য থেকে হয়েছেন।—(মাহহারী)

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّهْفِ—একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থানে অবস্থিত,

সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই, যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ (আ) দোয়া করেছিলেন

وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ—অর্থাৎ হে আল্লাহ, এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের

রিষিক দান করুন। আরও বলেছিলেন : **يَجِبِي إِلَهِةَ ثَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ**—অর্থাৎ

বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রপিতামহ হাশিম কোরায়শকে ডিন্-দেশে যেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কোরায়শের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দরিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

**فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ**—নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

জন্য কোরায়শকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

**الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ**—সুখী জীবনের জন্য যা

যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোরায়শকে এগুলো দান করেছিলেন। **أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ** বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম

বোঝানো হয়েছে এবং **آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ** বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেন : এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছে :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَرِيَّةً كَأَنَّكَ آمِنَةٌ مَّطْمَئِنَّةٌ يَا أَيُّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ  
 كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرْتُ بِانْعَمِ اللَّهُ فَانْقَاهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا  
 كَانُوا يَصْنَعُونَ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা  
 সর্বপ্রকার বিপদাশংকা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা  
 থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামত-  
 সমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা  
 ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

আবুল্লা হাসান কাযবিনী (র) বলেন : যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা  
 করে তার জন্য সূরা কোরায়শের তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত  
 করে ইমাম জযরী (র) বলেন—এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ তফসীরে  
 মাযহারীতে বলেন : আমাকে আমার মুশিদ 'মির্ষা মাযহার জান-জানা' বিপদাপদের  
 সম্মুখে এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক বালামুসিবত দূর  
 করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ (র) আরও বলেন : আমি বারবার  
 এর পরীক্ষা করেছি।

## سورة الماعون

### সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ : ৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أُوَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْضُ

عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝ قَوْلًا لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে খাবা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর, (৬) যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং ব্যবহার্য বস্তু দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। (আপনি তার অবস্থা গুনতে চাইলে গুনুন) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে খাবা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে (অপরকেও) উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ সে এমন নিষ্ঠুর যে, নিজে দরিদ্রকে দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও একাজে উৎসাহিত করে না। বাস্তব হক নষ্ট করা যখন এমন মন্দ, তখন প্রল্টার হক নষ্ট করা আরও বেশী মন্দ হবে)। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর (অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়।) যারা (নামায পড়লেও) তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং যাকাত মোটেই দেয় না (যাকাত দেওয়ার জন্য সবার সামনে দেওয়া শরীয়ত মতে জরুরী নয়। কাজেই এটা মোটেই না দিলেও কেউ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু নামায আমা'আতের সাথে প্রকাশ্যে পড়া হয়, এটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে তা সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই কেবল লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে নেয়)।

## জানুমানিক জাতব্য বিষয়

এ সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় দুর্কর্ম উল্লেখ করে তজন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মু'মিন যদি এসব দুর্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বণিত দুর্কর্ম কোন মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোন অবিবাসী কাফিরই করতে পারে। বণিত দুর্কর্ম এই : ইয়াতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপন্নকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোগের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখ বাস। সূরায় (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَءُونَ

—এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিবাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেলাপ রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং **عَنْ صَلَاتِهِمْ** শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রসুলে করীম (সা)ও মুক্ত ছিলেন না—তা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে

পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে **فِي صَلَاتِهِمْ** বলি হত। এর পরিবর্তে **عَنْ صَلَاتِهِمْ**—এর পরিবর্তে

সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা)—এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ

বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও **مَاعُونَ** বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপন্নকে ধার দেয় এবং যেগুলির পারস্পরিক জেনসেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়, যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বাান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দুঃখীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে **مَاعُونَ** বলে যাকাত

বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে **مَاعُونَ** বলার কারণ এই যে, যাকাত পন্নিমাণে আসিল অর্থের তুলনায় খুবই কম—অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হকরত আলী ও ইবনে ওমর (রা) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (রা) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীর-বিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বণিত শাস্তি ফরম্ব কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব সওয়ালবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী কিন্তু ফরম্ব ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে **مَاعُونَ**-এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দিবে ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই—এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরম্ব যাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।



## سورة الكوثر

### সূরা কাউসার

মক্কার অবতীর্ণ : ৩ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ

هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালন-কর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার (জাম্বাতের একটি প্রস্তবণের নাম, তদুপরি সর্ব-প্রকার কল্যাণও এর অর্থের মধ্যে शामिल)। দান করেছি। (এতে ইহকাল ও পরকালের সব কল্যাণ অর্থাৎ ইহকালে ইসলামের স্থায়িত্ব ও উন্নতি এবং পরকালে জাম্বাতের সুউচ্চ মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন (কেননা সর্বস্বহৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সর্বস্বহৎ ইবাদত দরকার আর সেটা হচ্ছে নামায) এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করার জন্য শারীরিক ইবাদতের সাথে আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ তাঁরই নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের আদেশ আছে কিন্তু এখানে নামাযের সাথে কোরবানীর আদেশের কারণ সম্ভবত এই যে, কোরবানীর মধ্যে আর্থিক ইবাদতের সাথে সাথে মুশরিকদের ও মুশরিকসুলভ আচার-অনুষ্ঠানের কার্যত বিরোধিতাও রয়েছে। কারণ মুশরিকরা প্রতিমার নামে কোরবানী করত। রসুলুল্লাহ (সা)-র পুত্র কাসেমের শৈশবে ইত্তেকাল হলে কোন কোন মুশরিক দোষারোপ করেছিল যে, তাঁর বংশ বিস্মৃত হবে না এবং তাঁর ধর্মও অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এই দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আল্লাহর কৃপায় নির্বংশ নন, বলুন] আপনার শত্রুরাই নির্বংশ, লেজকাটা। (ওদের বাহ্যিক বংশ বিস্মৃত হোক বা না হোক, দুনিয়াতে ওদের শুভ আলোচনা অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু আপনার প্রতি মহকবত,

আপনার স্মৃতি ও সুখ্যাতি ভক্তি সহকারে কীর্তিত হবে। এসব নিয়ামত ‘কাউসার’ শব্দের অর্থে দাখিল রয়েছে। পুত্র-সন্তানজাত বংশ না থাকুক কিন্তু বংশের যা উদ্দেশ্য, তা তো ইহকালের পর পরকালেও অর্জিত রয়েছে। আপনার শত্রু এ থেকে বঞ্চিত)।

### জানুয়ারি জাতীয় বিষয়

শানে-নুযুল : মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে **إِنْسِر** নির্বংশ বলা হয়। রসূলুল্লাহ (সা)-র পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বংশ বলে দোষারোপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফির ‘আস ইবনে ওয়ালেদের’ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সামনে রসূলুল্লাহ (সা)-র কোন আলোচনা হলে সে বলত : আরে তাঁর কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—( ইবনে কাসীর, মাযহারী )

কোন কোন রেওয়াজে আছে, ইহুদী কা’ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কোরায়শরা তাঁর কাছে যেয়ে বলল : আপনি কি সেই খুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবী করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বাস্তুজাহর হিফায়ত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা’ব একথা শুনে বলল : আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—( মাযহারী )

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্র-সন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ (সা)-র বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উশ্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উশ্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ (সা) যে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা’ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : ‘কাউসার’ সেই

অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ তা’আলা রসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটা প্রস্তবণের নাম—কারও করারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র)-কে প্রর-করা হলে তিনি বললেন : একথাও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্তবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে দাখিল। তাই মুজাহিদ কাউসারের

তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জাহান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রদ্রবণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাউযে কাউসার : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত :

بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن اظهرنا في المسجد ازا اغفى اغفاءة ثم رفع راسه متبسمًا - قلنا ما اضحكك يا رسول الله قال لقد انزلت على انفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الم ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدن نية ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة انيته عدد نجوم السماء فيحتلج العبد منهم فاقول رب انه من امتي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك -

একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্‌সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটা জাহান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হাতিয়ে দিবে। আমি বলব : পরওয়ার-দিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার গণে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।—(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

উপরোক্ত রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর লিখেন :

وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة انه يشخب فيه مهر ابان من السماء من نهر الكوثر وان انيته عدد نجوم السماء -

হাউয সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দুটি পরনানা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউসার নহরের পানি দ্বারা হাউযকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এই হাদীস দ্বারা সূরা কাউসার অবতরণের হেতু এবং কাউসার শব্দের তফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউযে কাউসারও शामिल আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিরারণ করবে।

এ হাদীস আরও ফুটিয়ে তুলেছে যে; আসল কাউসার প্রস্তাবটি জাভাতে অবস্থিত এবং হাউসে কাউসার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পরনামার সাহায্যে এতে কাউসার প্রস্তাবণের পানি আনা হবে। কোন কোন রেওয়াজেও থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জাভাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউসে কাউসারের পানি পান করবে। এটা উপরোক্ত রেওয়াজেতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়—মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউসে কাউসার থেকে হাটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ হাদীসসমূহে হাউসে কাউসারের পানির স্বচ্ছতা মিশ্রিততা এবং কিনারাসমূহ মগি-মানিকা দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোন বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সূরার রসুলুল্লাহ (সা)-কে হাউসে কাউসারসহ কাউসার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যাগণ্ড সকল উম্মত অপেক্ষা বেশী হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

نَحْرٌ—শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর মজমুম

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْتَ نَحْرٌ

পদ্ধতি হাত-পা বেঁধে কঠনামীতে বশী অথবা ছুরিকা দিয়ে অঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-হাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তকে গুইয়ে কঠনামীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نَحْرٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে

এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতারূপ তাঁকে দু'টি বিশ্বের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বমুহৎ ইবাদত এবং কোরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্নাতক্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহর নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে—

إِنَّ مَلَائِكَةَ وَسُكُنَىٰ وَمَحَبَّاتِي وَمَا تَىٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আয়াতে وَأَنْتَ نَحْرٌ—এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) আতা

মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নামামে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়াজে প্রচলিত আছে, ইবনে কাসীর সেই রেওয়াজেতাকে মুনকার তথা অপ্রহণযোগ্য বলেছেন।

إِن شَأْنِي—এর অর্থ শত্রুতাগোষণকারী, দোষারোপ-

কারী। যেসব কাফির রসুলুল্লাহ (সা)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়াজে মতে 'আস ইবনে ওয়ালেদ, কোন কোন রেওয়াজে মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রসুলুল্লাহ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পন্নগছর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসুলুল্লাহ (সা)-র উম্মত পূর্ববর্তী সকল পন্নগছরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রসুলে করীম (সা)-এর স্মৃতিকে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহর নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ালেদ, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হল? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামী বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فَاَعْتَبُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

سورة الكافرون

সূরা কফিরুল

মক্কায় অবতীর্ণ : ৬ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا

أَعْبُدُ ۖ وَلَا أَنَا عَابِدٌ لِّمَا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۗ لَكُمْ

دِينِكُمْ وَإِلَىٰ دِينِ ۗ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ১৯

(১) বলুন, হে কফিরকুল, (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি ( কফিরদেরকে ) বলে দিন, হে কফিরকুল (তোমাদের ও আমার তরীকা এক হতে পারে না। বর্তমানে) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না। ( ভবিষ্যতেও ) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করবে না। ( উদ্দেশ্য এই যে, আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে শিরক করতে পারি না—এখনও না এবং ভবিষ্যতেও না। পক্ষান্তরে তোমরা মুশরিক হয়ে একত্ববাদী সাব্যস্ত হতে পার না—এখনও না, ভবিষ্যতেও না। মানে একত্ববাদ ও শিরক হাত মিলাতে পারে না )। তোমরা তোমাদের প্রতিদান পাবে এবং আমি আমার প্রতিদান পাব। ( এতে তাদের শিরকের কারণে শাস্তির খবর শুনানো হয় )।

আনুষ্ঠানিক জাতিব্য বিষয়

সূরার কবীলিত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আয়েশা (রা)-এর বণিত রেওয়াজেতে রসূল-জাহ্ (সা) বলেন : কজরের সূত্র নামাযে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম—সূরা

কাফিরান ও সূরা এখলাস।—(মায়হারী) তফসীর ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কজরের সূত্র এবং মাগরিবের পরবর্তী সূত্রে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আশ্রয় করলেন : আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরান পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) বলেন : একবার রসুলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন : তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সন্নীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হয়? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ্ (সা) আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন : কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা—সূরা কাফিরান, নহর, এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্মিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথের কম এবং সন্নীদের তুজনায় আমি দুর্দশাপ্রস্তু হতাম। কিন্তু যখন রসুলুল্লাহ্ (সা)-র এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ্যপীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন : একবার রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচ্ছ দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরান, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। —(মায়হারী)

শানে নুশুল : হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ওল্লাদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াল্লেল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোডালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে বলল : আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিতুষ্টি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব।—(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়াজেতে ইবনে আক্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কাফিররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনেদ্রব্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন।—(মায়হারী)

আবু সালাহ্-এর রেওয়াজেতে ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : মক্কার কাফিররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিব-রাইল সূরা কাফিরান নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফিরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্ক-হেদ এবং আত্মাহ্ন অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে-নুশুলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জওয়াবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিতুষ্টিতে বাধা দেওয়া জওয়াবেই মূল লক্ষ্য।

لا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ—এ সূরার কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায়

স্বভাবত প্রদর্শন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষেপে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরাপ হতে পারে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তফসীরে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ—আম্মাতের অর্থ এই

বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়ম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়ম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বন্য়ানুল-কোরআনে এখানে لِيْنِ অর্থ ধর্ম নয়—প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما কে-موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدر ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُونَ—আম্মাতের অর্থ

এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় لا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُونَ—আম্মাতের অর্থ এই যে,

আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধতি তাই, যা আন্না-হুর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেনে বলেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আন্নাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।



لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ—এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন : এ

বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে :

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ—আরও এক আয়াতে

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ—এর সারমর্ম এই যে, ইবনে কাসীর <sup>৬২১</sup>শব্দকে

ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বরানুল-কোরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়।

অনেক স্থানে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন—<sup>৬২১</sup>إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا—

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا— আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়-

বস্তুর তাক্বীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শাস্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

কাফিরদের সাথে শাস্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ : আলোচ্য সূরার কাফিরদের প্রস্তাবিত শাস্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্ক-

ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বল্পং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, <sup>৬২১</sup>فَإِنْ جَنَحُوا

لِلْعَلْمِ فَإِنَّ جَنَمَ لَهَا—অর্থাৎ কাফিররা সজ্জি করতে চাইলে তোমরাও সজ্জি কর।

মদীনায় হিজরত করার পর রসুলুল্লাহ (সা)ও ইহুদীদের সাথে শাস্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরানকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত

করেছেন এবং এর বড় কারণ <sup>৬২১</sup>لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ আয়াতখানি কেননা,

এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, <sup>৬২১</sup>لَكُمْ دِينُكُمْ

-এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শাস্তি চুক্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সূরা অবতীর্ণ

হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে।

فَاِنَّ جَٰنِحُوا

আরাত ঘারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চুক্তি ঘারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবরসাজা দিতে যেয়ে বলেছেন : **اَلَا مَلْحَا اِحْل حُرَا مَا اِحْرَم حَلَا لَا**

অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফিরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরান এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সম্মানহান ও শান্তি অন্বেষণ ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—আল্লাহ্‌র আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দর কষাকষির অবকাশ নেই।

## سورة النصر

### সূরা নহর

মদীনায অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[ হে মুহাম্মদ (সা) ] যখন আল্লাহর সাহায্য এবং ( মক্কা ) বিজয় ( তার সমস্ত লক্ষণসহ ) সমাগত হলো এবং ( এ বিজয়ের ফলশ্রুতিগুলো হচ্ছে ) আপনি লোকজনকে আল্লাহর দীনে ( ইসলামে ) দলে দলে যোগদান করতে দেখবেন, তখন ( বুঝবেন যে, দুনিয়াতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আল্লাহর দীনের পরিপূর্ণতা বিধান পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আধিরাতে যাত্রার সময় নিকটবর্তী, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং ) আপনার পালনকর্তার তসবীহ ও প্রশংসা কীর্তন করতে থাকুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমার আকুতি ব্যক্ত করতে থাকুন। ( অর্থাৎ জীবনে যেসব ছোট-খাটো ব্যতিক্রমী আচরণ অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন )। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী।

#### আনুষ্ঠানিক জাভাব্য বিষয়

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিদায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নহর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়াজেতে কোন কোন আয়াত নাখিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাখিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাখিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : সূরা নহর বিদায় হচ্ছে অবতীর্ণ হয়েছে।

এরপর **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**—আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)

মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কামালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার

সময় **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ مَزِيْرٌ عَلَيْهِ الْخ**—আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং

একশ দিন বাকী থাকার সময় **إِتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الْخ**—আয়াত অবতীর্ণ

হয়।—(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাখিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

আজাহ ভাষাদূষ্ট পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যিক মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়াজেতেও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাভাদাহ (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়াজেতে থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হচ্ছে নাখিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এখানে রসূলুল্লাহ (সা) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এছূপি নাখিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তি আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র)-এর রেওয়াজেতে আছে রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এক সমাবেশে সূরাটি তিলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সা) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাই রেওয়াজেত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত উমর (রা) একথা শুনে বললেন : এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি।—(কুরতুবী)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ—মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল,

যারা রসুলুল্লাহ (সা)-র রিসালত ও ইসলামের সভ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরায়েশদের ভয়ে অথবা কোন ইতস্ততের কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাতশ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পশ্চিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আয়বরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মুক্য নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ ও ইত্তেগফার করা উচিত :  
هَسْبُكَ رَبَّنَا وَاسْتَغْفِرُكَ—হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এই সূরা নাখিল হওয়ার

পর রসুলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا

وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي—(বুখারী)

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন : এই সূরা নাখিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ তিনি বলতেন : আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে।

অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : এই সূরা নাখিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সা) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়।—(কুরতুবী)

## سورة الذهب

### সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ

نَارًا ۚ ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا

حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেজিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও ..... যে ইজান বহন করে, (৫) তার গলদেশে খজুরের রশি নিয়ে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে বরবাদ হোক। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (ধনসম্পদ মানে আসল পুঁজি এবং উপার্জন মানে মুনাফা। উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই তাকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার অবস্থা। আর পরকালে) সত্বরই ( অর্থাৎ যত্নের পরই) সে প্রবেশ করবে লেজিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও—যে ইজান বহন করে আনে, [ অর্থাৎ কষ্টকরপূর্ণ ইজান, যা সে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পথে পুঁতে রাখত, যাতে তিনি কষ্ট পান। জাহান্নামে প্রবেশ করার পর] তার গলদেশে ( জাহান্নামের শিকল ও বেড়ী হবে, যেন সেটা ) হবে এক খজুরের রশি ( শক্ত মজবুত হওয়ার ব্যাপারে তুলা করা হয়েছে )।

#### আনুশঙ্গিক ভাষ্য বিষয়

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওহাব। সে ছিল আবদুল মোউলিবের অন্যতম সন্তান। গৌচবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন

পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্টের শত্রু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেনে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত।—(ইবনে কাসীর)

শানে-নুহুল : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**

আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসুলুল্লাহ্ (সা) সাক্ষা পর্বতে আরোহণ করে কোরাযশ গোত্রের উদ্দেশে **يا صاهحاه** বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোডালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হত)। ডাক শুনে কোরাযশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিরে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল : হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আঘাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বলল : **تباكى**

**الهدا جمعنا**—ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছে? অতঃপর সে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

**يَدٌ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব

কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া

হয়; যেমন কোরআনে **بِمَا قَدَّمْتَهُ يَدَاكَ** বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-

আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবু লাহাব একদিন বলতে লাগল : মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল : এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল :

**تبا لهما ما أرى فيكما شيئا مما قال محمد**—অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও ;

মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

**تبت**-এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোস্তার অর্থে **تبت** বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবু লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে **وتب**-এ বদ-দোস্তা

কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদ-দোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবু লাহাব যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে **تَبَا** বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আলাহ্ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবু লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদে প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জামগায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।—( বরানুল কোরআন )

এর **مَا كَسَبَ**—তফসীরের সার-সংক্ষেপে **مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ**

অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন :

অর্থাৎ মানুষ **أَنْ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَأَنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ**

যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হাল্য ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর।—( কুরতুবী ) একারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে

এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আলাহ্ তা'আলা আবু লাহাবকে যেমন

দিয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন স্বগোলকে আলাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলেন তখন আবু লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে চের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আলাহ্‌র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে :

এর অর্থ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে **سَيَمْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَبَ**

এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ **نَارٍ تَلَهَبُ** বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।



وَأَمْرًاۙ حَمَالَةَ الْعَطَبِ—আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসূলুল্লাহ্ (সা)-

এর প্রতি বিশেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উশেম-জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে **حَمَالَةَ الْعَطَبِ** বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ গুরুকাঠ বহনকারিণী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে **حَمَالَةَ** (খড়িবাহক) বলা হত। গুরু কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আশ্রয় জালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে **حَمَالَةَ الْعَطَبِ**—এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়দ ও যাহহাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কণ্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন **حَمَالَةَ الْعَطَبِ** বলে ব্যক্ত করেছে।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে মাল্কুম ইত্যাদি রুক থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত।—(ইবনে কাসীর)

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপ : রসূলে করীম (সা) বলেন : জাহান্নামে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেন : তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোযাদারের রোযা এবং অশুওয়ালার অশু নস্ট করে দেয়—গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র) বলেন : আমি হযরত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলাম : **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَا نَكَ دُمٌ وَلَا مَشَاءٌ بِلْمِئِمَّةٍ وَلَا تَاجِرٌ يَرْبِي**—অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জাহান্নামে প্রবেশে করবে না—অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সুদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম : হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সম-তুল্য কিরূপে করা হল? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

سِدٌّ—শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। **فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ**

অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।—(কামুস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খজুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আক্বাস (রা) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র)ও তাই তফসীর করেছেন।—(মাযহারী)

শাবী, মুকালিত (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খজুরের রশি। তাঁরা বলেন : আবু লাহাব ও তার স্ত্রী খনাযা এবং গোত্বের সরদাররূপে গণ্য হত। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরী করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মাথায় বোঝা এবং গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লাস্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই তফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা।—(মাযহারী) কিন্তু আবু লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম তফসীরই পছন্দ করেছেন।

سورة الاخلاص

## সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ : ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ  
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সূরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহর গুণাবলী ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লাহ্ এ সূরা নাযিল করে তার জওয়াব দিয়েছেন। আপনি (তাদেরকে) বলে দিন : তিনি (অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণে) এক, (সত্তার গুণ এই যে, তিনি স্বয়ং অর্থাৎ চিরকাল থেকে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সিক্ষেতের গুণ এই যে, তার জ্ঞান, কুদরত ইত্যাদি চিরন্তন ও সর্বব্যাপী)। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী (অর্থাৎ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং সবাই তার মুখাপেক্ষী)। তার সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

শানে-নুযুল : তিরমিযী, হাকিম প্রমুখের রেওয়াজেতে আছে মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্যাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল—আল্লাহ্ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ক্ষয়ীলত : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আরয় করল : আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন : এর ভালবাসা তোমাকে জাহান্নামে দাখিল করবে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন : এই সূরাটি কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান!—(মুসলিম, তিরমিযী) আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীরা এক দীর্ঘ রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বাল্য-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়।—(ইবনে কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, কোরআন সব কিতাবেই নামিল হয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততরূপ নিদ্রা যেনো না, যতরূপ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রা) বলেন : সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমন হাড়িনি।—(ইবনে কাসীর)

وَوَلَدٌ لِّمَوْلَانٍ ۚ قَالَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ —‘বলুন’ কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের

প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। ‘আল্লাহ্’ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বভূগণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। واحد ও -احد উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু اصل শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

وَاللَّهُ الصَّمَدُ ۚ شব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে।

তিব্বরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد-এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যার সমান মহান কেউ নয়। দান কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।—(ইবনে কাসীর)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ—যারা আল্লাহর বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা

তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য—স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ—অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-

আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা ইখলাসে তওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে : দুনিয়াতে তওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে : সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিক-সুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তওহীদের সবক দিয়েছে। তওহীদের বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গণাবলীর পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। **الله احد** বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব পূরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। **صمد** শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে **لم يلد** বলে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

## سورۃ الفلق

### সূরা ফালাক

মদীনায়ে অবতীর্ণ : ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পলানকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রহিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ও অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য তাঁর উপর তাওয়াজুহ তথা পুরোপুরি ভরসা করা ও ভরসা করার শিক্ষা দেওয়া। অতএব) আপনি (নিজে আশ্রয় চাওয়ার জন্য এবং অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ) বলুন, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, ( বিশেষত ) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, রাত্রিতে অনিষ্ট ও বিপদাপদের সম্ভাবনা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। গ্রহিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। [ প্রথমে সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণের কথা উল্লেখ করার পর বিশেষ বিশেষ বস্তুর উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, অধিকাংশ যাদু রাত্রিতেই সম্পন্ন করা হয়, যাতে কেউ জানতে না পারে এবং নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করা যায়। কবচে ফুৎকারদাত্রী মহিলার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর এভাবেই যাদু করা হয়েছিল, তা কোন পুরুষে করে থাকুক অথবা নারীরা نَفّٰثٰتِ -এর বিশেষ্য نفوس ও হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই शामिल আছে এবং নারীও এর বিশেষ্য হতে পারে। ইহদীরা রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর যে যাদু করেছিল, তার

কারণ ছিল হিংসা। এভাবে যাদু সম্পর্কিত সবকিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা হয়ে গেল।

অবশিষ্ট অনিষ্ট ও বিপদাপদকে শামিল করার জন্য **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**—বলা হয়েছে

আয়াতে আল্লাহকে প্রভাতের মালিক বলা হয়েছে অথচ আল্লাহ সন্ধান-বিকাল সবকিছুই পলানকর্তা ও মালিক। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করে যেমন প্রভাতরশ্মি আনয়ন করেন, তেমনি তিনি যাদুরও বিলুপ্তি ঘটাতে পারেন]।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যাম (র) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাখন্ডের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিমিত এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করার এ সূরাখন্ডের কার্যকারিতা অনেক। সত্যি বলতে কি মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানিহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাখন্ড তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মসনদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী যাদু করেছে এবং যে জিনিসে যাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ (সা) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেওয়ান সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শব্দা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সা) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেনি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেনি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রীতিমত দরবারে হাযির হত। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর জনৈক ইহুদী যাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেনি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন : আমার রোগটা কি আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল : তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল : ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : কে যাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিল্ল মুনাফিক মবীদ ইবনে আ'সাম যাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল : কি বস্তুতে যাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরযরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) সে কূপে গেলেন এবং বললেন : স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান

থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আপনি ঘোষণা করলেন, নূ কেন (যে, অশুক ব্যক্তি আমার উপর যাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্য কণ্ঠের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কণ্ঠ দিত)। মসনদে আহমদের রেওয়াজেতে আছে রসূলুল্লাহ (সা)-র এই অসুখ হয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়াজেতে আরও আছে যে, কতক সাহাবায়ে কিরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুঃখের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে এসে আরম্ভ করলেন : আমরা এই পাগিতকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র)-র রেওয়াজেতে আছে জনৈক বালক রসূলুল্লাহ (সা)-র কাজকর্ম করত। ইহদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা)-র চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তারে এগারটি গ্রহি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রহিতে একটি করে সুই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর-খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক গ্রহিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রহি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে।—(ইবনে কাসীর)

**যাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়ত্তের পরিগৃহীত নয় :** যারা যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রসূলের উপর যাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। যাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, যাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দাহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধে নন। যাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের যাদুগ্রস্ত হওয়া অবাস্তব নয়।

**সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযীলত :** প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা লক্ষ্য করো কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এমন



আম্নাত নাযিল করেছেন, যার স্মৃতিত্ব আম্নাত দেখা যায় না অর্থাৎ **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ**

**الْفَلَقِ** ও **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** আম্নাতসমূহ। অন্য এক রেওয়াজে আছে

তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও অনুরূপ কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ (সা) ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করানেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বললেন : এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাভ্রোথানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফু' দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইত্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফু'ক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম।—(ইবনে কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে রুগি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন : বল। আমি আরয় করলাম, কি বলব? তিনি বললেন : সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকল-সন্ধ্যায় এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কণ্ঠ থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মাযহারী)

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আম্নাতসমূহের তফসীর দেখুন :

**قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ**—এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য

নিশি শেষে ভোল হওয়া। অন্য এক আম্নাতে আল্লাহর গুণ **فَاتَّقِ الْأَسْبَاحَ** বর্ণনা

করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিচ্ছিত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন।—(মাযহারী)

**مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**—আল্লামা ইবনে কাইয়্যাম (র) লিখেন : **شَرِّ** শব্দটি দু'প্রকার

বিষয়বস্তুকে শামিল করেন—এক. প্রত্যক্ষ অনিশ্চিৎ ও বিপদ, মশ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, দুই. যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে, যেমন কুফর ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিশ্চিৎই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এখানে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে :

عَسَقٌ—مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হসরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান ও মুজাহিদ (র) غامسق-এর অর্থ নিয়েছেন রান্নি। وَقَب-এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে রুদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই রান্নি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রান্নিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কাঁট-পতল ও চোপ-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রান্নিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রান্নি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই :

عَقْدٌ—وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

শব্দটি عقدة-এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা যাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نفوس-এরও বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশী। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাহয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারা ই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। যাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিশ্চিৎ সর্বাধিক। কারণ, মানুষ যাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

হিংসার কারণেই রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদু করা হয়েছিল। ইহদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উম্মতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে যাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حسد শব্দের অর্থ কান্ড নিয়ামত ও সুখ দেখে দংশ হওয়া ও তাঁর অরসম কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্। আকাশে ইবলীস আদম (আ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে।—(কুর-তুবী) حسد তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غبط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কান্ড নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে غاسق-এর সাথে اِذَا وَقَبَ এবং এর সাথে اِذَا حَسَدَ সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نفثات-এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, মাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রান্নির ক্ষতি ব্যাপক নয় বরং রান্নি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্ররুত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

## سورة الناس

### সূরা নাম

মদীনা অবতীর্ণ : ৬ আয়াত ৥

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ  
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُّوسِّسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنْ  
اِجْتِهَاتِهِمُ وَالنَّاسِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আপ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মানুষদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলুন, আমি মানুষের মালিক, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মানুষদের আপ্রয় গ্রহণ করছি তার (অর্থাৎ সেই শয়তানের) অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও পশ্চাতে সরে যায়, (হাদীসে আছে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান সরে যায়। এখানে উদ্দেশ্য তাই)। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (অর্থাৎ আমি যেমন শয়তান জিন থেকে আপ্রয় গ্রহণ করছি, তেমনি শয়তান মানুষ থেকেও আপ্রয় গ্রহণ করছি। কোরআনের অন্যত্র আছে যে, মানুষ ও জিন উভয়ের মধ্য থেকে শয়তান হয়ে থাকে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِیْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

#### আনুষ্ঠানিক জাতিব্যবস্থা

সূরা কানাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আপ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য

সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

فلقِ النَّاسِ—এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায়  
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

এর দিকে—এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসন্নত শামিল আছে। তাই এখানে رَب শব্দের সম্বন্ধ ناس—এর দিকে করা হয়েছে।—(বায়যাতী)

إِلٰهِ النَّاسِ—মানুষের মাবুদ। এদু'টি গুণ  
مَلِكِ النَّاسِ—মানুষের অধিপতি,

সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رَب শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহৃত হয়, যথা رَب الدار গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই

মাবুদ হয় না। তাই إِلٰهِ النَّاسِ বলাতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মালিক, অধিপতি,

মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হিফায়ত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হিফায়ত করেন। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি—এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে

مَلِكِ النَّاسِ বলায় পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে

وَاللَّهُمَّ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে একই

শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ ناس শব্দটির বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন : এ সূরায়

نাস শব্দ পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ناس বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে (ب) অর্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় ناس দ্বারা যুবক শ্রেণী বোঝানো হয়েছে। ملك (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় ناس বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ ناس বলে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। و سوسة শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম ناس বলে দুষ্কৃতকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিশ্চ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ—যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য

অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وسواس শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে, সে যেন আপাদ-মস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।—(কুরতুবী) خناس শব্দটি خنس থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হ'শিম্মার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুটি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপয়স্টিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। মানুষ যখন আল্লাহর মিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন মিকিরে থাকে না, তখন তার চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।—(মাহহারী)

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ—অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং

মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিশ্চ থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিশ্চ থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, মানুষ শয়তানও

কান্নাও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযমুদ্দীন (র) তদীয় গ্রন্থে বলেন : মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রসূলুল্লাহ (সা) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে **اللهم اعوز بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه**—অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম : ইবনে কাসীর বলেন : এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মাবুদ—আল্লাহ তা'আলার এই গুণগ্রন্থ উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়্যা, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। বিশ্বাস লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হক্কে না আছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয় করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হল : হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মুকা-বিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যতীত কিছু বলে না।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে, একবার রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে এতে-কাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়া (রা) তাঁর সাথে সাক্ষা-তের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (সা)ও তাঁর সাথে রওযানা হলেন। গলিপথে ঠাকার সময় দু'জন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রসূলুল্লাহ (সা) আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধর্মিনী সফিয়া বিনতে-হুয়াই (রা) রয়েছেন। সাহাবীদ্বয় সন্তোষে আরয় করলেন : সোবহানাল্লাহ ইয়া রসূলুল্লাহ, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোন কু-ধারণা করব)। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : নিশ্চয়ই। কান্না, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশংকা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোন বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরী, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে কু-ধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরন্ত নয়। মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি

হয়—এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদেদর সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়।

এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়—সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোন গোনাহ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য : সূরা ফালাকে যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর), তার মাত্র একটি বিশেষণ **وَبِالْفَلَاقِ** উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি

বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এথেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্বত্রহৎ অনিষ্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্শ্বিক বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত্ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মুকাবিলা করার কোন বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহর যিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুদের আল্লাদা আলাদা প্রতিকার : মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি, সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মুকাবিলা কেবল আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরের ভূমিকায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরোক্ত শত্রুদের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায়-সচ্চরিত্রতা, প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান-শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন : সমগ্র কোরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সূরা আ'রাকের এক আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে : **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** এর অর্থ



এইসে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শত্রুর মুকাবিলা কর। এই আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে :

وَأَمَّا مَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

এতে শয়তান শত্রুর মুকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মুমিনুন' প্রথমে মানুষ

শত্রুর মুকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন : **إِن فَعَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** অর্থাৎ

মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শত্রুর মুকাবিলার জন্য বলেছেন :

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সিজদায় প্রথমে মানুষ শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য বলা হয়েছে :

إِن فَعَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শত্রু তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শত্রুর মুকাবিলার

জন্য বলা হয়েছে : **وَأَمَّا مَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ**

**هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** এটা প্রাক্ক সূরা আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারমর্ম এই যে,

শয়তান শত্রুর মুকাবিলা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শত্রুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। আর মেষ-নরপিশাচ মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যতীত হয়েছে। কেননা, সে প্রকাশ্য শত্রু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আসে। তার শত্রুর মুকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিযন্ত শয়তান স্বভাবগত দুষ্ট। অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সফলপ্রসূ নয়। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তাকে বাহ্যিক মুকাবিলাও সম্ভবপর নয়। এই উভয় প্রকার নরম ও গরম কৌশল কেবল মানুষ শত্রুর মুকাবিলায় প্রয়োজ্য—শয়তানের মুকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আল্লাহর আশ্রয়ে আসা এবং তাঁর যিকিরে মশগুফ হয়ে যাওয়া। সমগ্র কোরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কোরআন খতম করা হয়েছে।

পরিণতির বিচারে উত্তর শত্রুর মুকাবিলার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে : উপরে কোরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবার স্বর্গা মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সফল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উত্তম অবস্থায় মুকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শত্রুর মুকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সওয়াব ও শাহাদতের ফযীলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শত্রুর মুকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সম্ভ্রষ্ট করা এবং গোনাহ্ তার মুকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষার জন্য আলাহ্ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত রূপান্তর : উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই রহে। তার মুকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আলাহ্ তা'আলা বলেন :

أَنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا — নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সূরা

নহলে কোরআন পাঠ করার সময় আলাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আলাহ্‌র উপর ভরসাকারী অর্থাৎ আলাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। বলা হয়েছে :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ٥

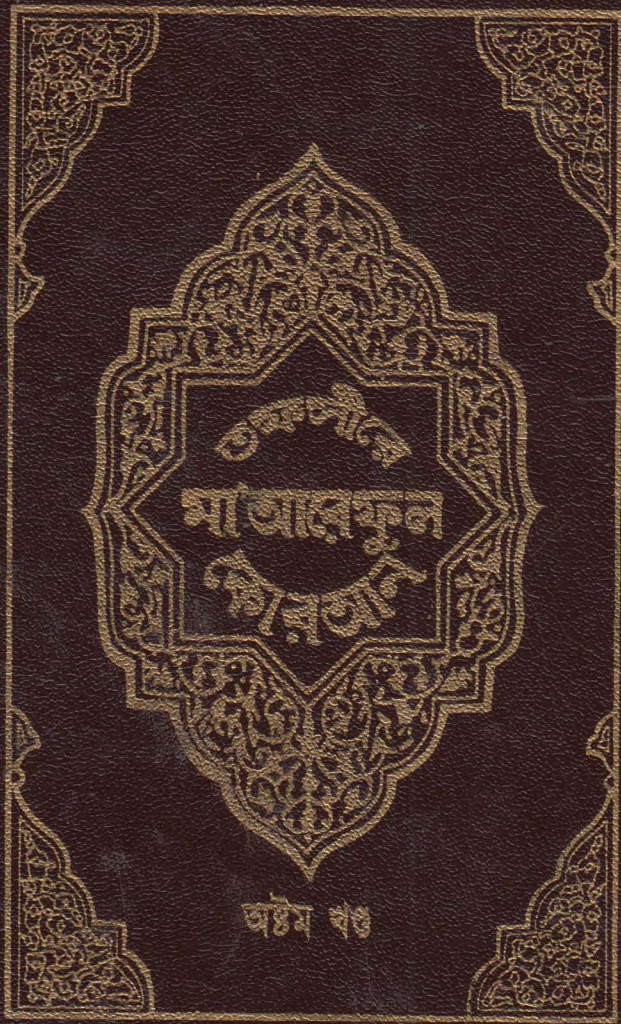
অর্থাৎ তুমি যখন কোরআন পাঠ কর, তখন বিভাড়িত শয়তান থেকে আলাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আলাহ্‌র উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বহুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল : আলাহ্ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আলাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর

উঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের স্বাভাবিক ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়ারী নিহিত আছে। কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এজাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

تمت

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/১০(রা)—৫,২৫০



ইসলামিক ফাউন্ডেশন